وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
তারিখুল খুলাফা
ইমাম জালালুদ্দিন সুয়্যুতি রহঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
“আর যখন তোমার রব মালাইকাদের বললেন, **‘নিশ্চয়ই আমি দুনিয়াতে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি’**, তারা বললেন, ‘আপনি কি এতে (এমন কাউকে) নিযুক্ত করবেন, যে এতে ফাসাদ করবে আর রক্ত ঝরাবে, যখন কিনা আমরা আপনার হামদ সহকারে (আপনার) তাসবিহ (স্তুতি) করি আর আপনার পবিত্রতা (ঘোষণা) করি?’ তিনি বললেন, **‘নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জানো না।’** ”
(সূরাহ আল বাকারাহ, ২ : ৩০)
www.almodina.com

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
“তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ চান। এরপর আল্লাহ তার সমাপ্তি ঘটাবেন।
তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে নবুওয়তের আদলে খিলাফত, আর তা ততক্ষণ বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ চাবেন। এরপর তিনি তারও সমাপ্তি ঘটাবেন।
তারপর আসবে যন্ত্রণাদায়ক বংশের শাসন, তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। এক সময় আল্লাহর ইচ্ছায় এরও অবসান ঘটবে।
তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জবরদস্তিমূলক জুলুমের শাসন, আর তা তোমাদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। এরপর তিনি তা অপসারণ করবেন।
তারপর পুনঃরায় আবার দুনিয়ার যমীনে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওওয়াহ (নবুওয়তের আদলে খিলাফত) প্রতিষ্ঠিত হবে।”
(মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী, খাছায়েছুল কুবরা)
www.almodina.com

তারিখুল খুলাফা

(খলীফাদের ইতিবৃত্ত)

মূলঃ আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহঃ)

অনুবাদঃ হাফেজ ফজলুল হক শাহ (রহঃ)

পিডিএফ ও ব্লগ ক্রিয়েশনঃ The Greatest Nation

এ বইটির বাংলা অনুবাদ মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো। এরপর সে বইটি টাইপিং করে এর ব্লগ ভার্সন বের করা হয়েছে ইসলামিক ইলমের আরো বিস্তার করার জন্য। বইটির মুল বাংলা অনুবাদের পিডিএফ এখানে ডাউনলোড করা যাবে

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহঃ) এর ভুমিকা

بسم الله الر حمن الر حيم

حمدا لله الذى وعد فو فى واو عد فعفى ـ والصلوة والسلا م على سيدنا محمد سيد الشر فاء ومسود الخلفاء وعلى اله واصحابه اهل الكرام الوفاء ـ امابعد

আমি এ গ্রন্থে খুলাফাদের ইতিবৃত্ত তথা আমিরুল মুমিনীনদের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করেছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পূর্ণ খিলাফত থেকে আমার যুগের খলিফা পর্যন্ত সকল খুলাফায়ে ইসলামের বিবরণ স্থান পেয়েছে। তাদের শাসনামলের আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী, ওলামা ও আইম্মায়ে কেরামগনের তত্ত্বে সমৃদ্ধশালী এ ভাণ্ডারটি ব্যাপক চাহিদার কারনে প্রনয়ন করা হয়েছে।

আমি অনেক বিষয়ে কলম চালিয়েছি, এ বিষয়েও অনেক গ্রন্থাদি প্রনিত হয়েছে - যেগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য যথেষ্ট। তবে সেগুলো বিশদ বিবরণ ও অসংখ্য তত্ত্বের ভারে ন্যুব্জ। ফলে জাতির অফুরন্ত আগ্রহ মেটানোর প্রয়োজনে অতি সংক্ষেপে বইটি রচনা করেছি।

যারা ফিতনা- ফাসাদের মাধ্যমে খিলাফত দাবি করেছে, এ গ্রন্থে তাদের বিবরণ পেশ করিনি। অনেক উলবী, আব্বাসী, উবায়দীদের নাম আমি বাদ দিয়েছি, অথচ তারা খিলাফতের দাবি করেছিলো; কারন তাদের নেতৃত্ব বৈধ ছিল না। তারা কুরাইশও নয়, আওয়ামরা তাদের ফাতেমী বলতো। তাদের দাদা ছিল অগ্নিপূজক। তারা ইসলাম বহির্ভূত লোক ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবী- রসুলদের গালি দিতো। তারা মদপান, যিনা ও নিজেকে সিজদা করা বৈধ ঘোষণা করেছিলো। তাদের কাছে শিয়া মতবাদ প্রাধান্য পেয়েছিলো। যাহাবি বলেন, তাতারিদের চেয়েও উবায়দীদের ফিতনা ছিল জঘন্য। তাই তার খলিফা নয়। তাদের খিলাফত, ইমামত ও বাইয়াত বৈধ ছিল না।

অনুবাদকের কথা

আল্লাম জালালুদ্দিন সুয়্যুতি (রহঃ) রচিত 'তারিখুল খুলাফা' খলীফাদের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কিত একটি প্রণিধানযোগ্য গ্রন্থ। সিদ্দীকে আকবর আবু বকর (রাঃ) থেকে শুরু করে ৯০০ হিজরি পর্যন্ত খলীফাদের মহোত্তম জীবনের আশ্চর্যজনক বর্ণনার এক অপূর্ব সমাহার এ বইটি। আমাদের জানা মতে, বাংলা ভাষায় এ বিষয়ের উপর এটিই প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ রচনা।

বিশ্বনন্দিত ইসলামী মনীষা আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়্যুতি (রহঃ) এর অনন্য ও অনবদ্য বইটির অনুবাদের আশা আমার অনেক দিনের। এই মহান কাজটি সমাপ্ত করতে পেরে আমি আজ সকলের সমীপে কৃতজ্ঞ। এ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় মদীনা পরিবারের কাছে আমার ঋণের কোন শেষ নেই।

বইটির জটিল তত্ত্বগুলো সহজভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। সাধারণ পাঠক, আলেমসমাজ বিশেষত গবেষকদের জ্ঞানের জগতকে সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। সমাজে এ গ্রন্থের আবেদন কিঞ্চিত প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজের শ্রমকে সার্থক মনে করবো। অনুবাদ করার ক্ষেত্রে নির্ভুল পথটি অনুসরণ করতে মোটেও কুণ্ঠিত হইনি। যতটুকু সম্ভব সুন্দর করার চেষ্টা করেছি, তবুও কোন বিদগ্ধ পাঠকের নজরে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার ও পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ রইলো। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ সেবাটুকু জাতির কাছে সমাদৃত করুন, আমীন!!

বিনীত,

হাফেজ ফজলুল হক শাহ

সাং - পোরশা, পুরইল

পোস্ট + থানা - পোরশা

নওগাঁ

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক আলোচনা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক খলীফা মনোনীত না করার রহস্য

বাযযার (রহঃ) তার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত হুজাইফা (রাঃ) এর বরাত দিয়ে বলেছেন যে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি আমাদের জন্য কাউকে খলীফা মনোনীত করছেন না কেন ?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি যদি কাউকে তোমাদের জন্য খলীফা মনোনীত করি, আর তোমরা আমার খলীফার অবাধ্য হও, তবে তোমাদের উপর আল্লাহ'র আযাব অবতীর্ণ হবে।" হাদিসটি হাকিম মুসতাদরাক গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এ হাদিসটি দুর্বল।

ইমাম বুখারি (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, উমার (রাঃ) এর ঘাতক যখন বর্শা দিয়ে আঘাত করে, তখন লোকেরা বললো, "আপনি কাউকে খলীফা মনোনীত করে যান।" তিনি বললেন, "যিনি আমার চেয়ে মহান, অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), তিনি খলীফা মনোনীত করেছেন। তবে আমি তোমাদের খলীফা মনোনীত না করে চলে যাচ্ছি, কারন তিনি এভাবেই চলে গেছেন - যিনি আমার চেয়ে মহান, অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"

দালায়েলুন নবুওয়ত গ্রন্থে আমর বিন সুফিয়ানের বরাত দিয়ে বায়হাকি (রহঃ) আর ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আলী (রাঃ) জামাল যুদ্ধ জয়ের পর ভাষণ দেন। এতে তিনি বলেন, "হে জনতা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খিলাফতের ব্যাপারে আমাদের থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেননি, বরং আমরা নিজেরাই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে খলীফা মনোনীত করেছিলাম। তিনি খুব ভালোভাবেই খিলাফতের কাজ করেছেন আর নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। এরপর নিজের কাছে মঙ্গল ও সঙ্গত মনে করে উমর (রাঃ) কে এ কাজের জন্য মনোনীত করে যান। তিনিও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন আর দ্বীন ইসলামের ভিত্তিকে শক্ত স্থানে স্থাপন করেছেন। এরপর অনেকেই দুনিয়ার মোহে পড়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ যা চান তাই ফায়সালা করেছেন।"

হাকিম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে আর বায়হাকি দালায়েল গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, লোকেরা হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি কাউকে খলীফা মনোনীত করবেন ?" তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খলীফা মনোনীত করে যাননি, তখন আমি তা কিভাবে করবো ? আমার পর তোমরা খলীফা নির্বাচিত করে নিবে, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর খলীফা মনোনীত হয়েছিলো।"

যাহাবী বলেন, শিয়াদের মধ্যে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) এর খিলাফতের জন্য প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারন হাযীল বিন শারজীল বলেন, এটা কি করে সম্ভব যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীর খিলাফতের জন্য প্রতিশ্রুতি নিবেন আর হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হবেন ! হযরত আবু বকর তো চেয়েছিলেন যে, রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কারো জন্য খিলাফতের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন, তবে তিনি তার অধীনস্থ হবেন। (বায়হাকী)

ইবনে সা'দ (রহঃ) হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন, "নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর আমরা চিন্তা করে বের করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুপস্থিতিতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে ইমাম বানিয়েছেন। সুতরাং, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে আমাদের দ্বীনের জন্য গ্রহণ করেছেন, তিনি দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট।"

ইমাম বুখারি (রহঃ) তার ইতিহাস গ্রন্থে সাফীনা (রাঃ) এর এ বর্ণনাটি লিখেছেন – রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) আর হযরত উসমান (রাঃ) এর ব্যাপারে বলেছেন, "আমার পর এরা খলীফা হবেন।" ইমাম বুখারি (রহঃ) বলেন, এ হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়, কারন বিশুদ্ধ হাদিস দিয়ে প্রমাণিত যে, হযরত উমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ) নিজেরাই বলেছেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে খলীফা মনোনীত করেননি।

ইমাম হাব্বান উপরোক্ত হাদিসটি আবুল আলী ও কয়েকজন বর্ণনাকারী থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময় প্রথমে পাথর নিজের হাতে স্থাপনের পর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে বললেন, "তোমার পাথর আমার পাথরের পাশে রাখো।" এরপর হযরত উমরকে হযরত আবু বকরের পাথরের পাশে পাথর রাখতে বললেন। এরপর হযরত উসমানকে হযরত উমরের পাথরের পাশে পাথর রাখতে বললেন। এরপর বললেন, "আমার পর এরাই হবেন খলীফা।"

আবু যর (রাঃ) বলেছেন, এ হাদিসের সনদে কোন ত্রুটি নেই। উপরন্তু, হাকেম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে এমনটাই উল্লেখ করেছেন। বায়হাকি দালাইল গ্রন্থে এ হাদিসকে সহিহ বলেছেন। গ্রন্থকার বলেছেন, এ হাদিস এবং হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এর কথার মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। কারন তাদের উদ্দেশ্য ও দাবী হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর সময় খিলাফত বিষয়ক কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেননি আর মৃত্যুর আগে যে সকল ইশারা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন, আমার সুন্নত ও আমার খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নতের উপর আমল করবে।

হাকেম (রহঃ) আরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) এর বর্ণনায় এ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার পর আবু বকর আর উমরের আনুগত্য করবে।" এছাড়াও অপর দুটো হাদিস, যা দিয়ে খিলাফতের ইশারা বের হয়।

খিলাফত কুরাইশদের জন্য

আবু দাউদ তায়ালাসী তার মুসনাদ গ্রন্থে আবু বারযাহ’র বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, খিলাফত কুরাইশদের জন্য মানানসই। তারা ইনসাফপূর্ণ বিচারকারী, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ও মেহেরবান। এ বর্ণনাটি তাবারানীও বর্ণনা করেছেন।

তিরিমিযী (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “প্রশাসন কুরাইশদের, বিচার বিভাগ আনসারদের এবং আযাদ হাবশীদের অধিকারে থাকা উচিত।” এ হাদিসের সকল সনদ সহিহ।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার মুসনাদ গ্রন্থে হাকিম ইবনে নাফি আর উতবা ইবনে আব্দুল্লাহ’র বর্ণনা নকল করে লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “খিলাফত কুরাইশদের, বিচারকাজ আনসারদের আর আহবানের দায়িত্ব হাবশীদের।”

বাযযার (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, খলীফাগণ কুরাইশদের মধ্য থেকে হবেন। এদের মধ্যে নেককারগণ নেককারগণের আমীর আর বদকাররা বদকারদের আমীর।

<u>প্রথম পরিচ্ছেদ</u>

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন যে হযরত সাফিনাহ (রাঃ) বলেছেন, “আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘খিলাফত মাত্র ত্রিশ বছর টিকবে। এরপর বাদশাহী প্রথা এসে যাবে।” আসহাবে সুনান এটি বর্ণনা করেছেন।

ওলামাগণ বলেন, তোমাদের দ্বীন ইসলাম প্রথমে নবুওয়ত ও রহমত দিয়ে শুরু হয়। এরপর খিলাফত ও রহমত এসে যায়, আর তারপর বাদশাহী ও অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

আবদুল্লাহ বিন আহমদ বলেন, জাবির বিন সামুরা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশদের বারোজন খলীফা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম সবসময় জয়যুক্ত থাকবে। এটি ইমাম বুখারী আর ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটি কয়েকভাবে বর্ণিত হয়েছে। ‘ইসলামের কাজ অটুট থাকবে’, ‘ইসলামের কাজ অব্যাহত থাকবে’ – এ দুটো পদ্ধতি ইমাম আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, “বারোজন শাসক অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের কাজ অব্যাহত থাকবে।” তিনি বর্ণনাটি এভাবেও বর্ণনা করেছেন, বারোজন খলীফা না আসা পর্যন্ত সমাজে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু কার্যকর হবে না। উপরন্তু ইসলাম শক্ত ও সংরক্ষিত থাকবে বারোজন

খলীফা পর্যন্ত। বাযযার এভাবে বর্ণনা করেছেন, (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন) আমার বারোজন খলীফা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত।

এ বর্ণনাটি আবু দাউদ একটু বৃদ্ধি করেছেন এভাবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এলে কুরাইশরা তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, বারোজন খলীফার পর কি হবে ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এরপর হত্যাযজ্ঞ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এক বর্ণনায় রয়েছে, উম্মাহ'র ইজমাকৃত বারোজন খলীফা পর্যন্ত এ দ্বীন সর্বদা অটুট থাকবে। এটি ইমাম আহমাদের রেওয়ায়েত।

হাসান সূত্রে বাযযার বর্ণনা করেন, ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, কতজন খলীফা এ উম্মতকে শাসন করবে ? ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, "একদিন আমরাও নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরণের প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, বনি ইস্রাইলদের অনুরূপ বারোজন।"

কাযী আয়ায বলেন, উক্ত হাদিস আর সমার্থ হাদিসে উল্লেখিত বারোজন খলীফা থেকে সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো, এ বারোজন খলীফা খিলাফতের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা আর ইসলামের শৌর্য- বীর্যকালে আসবেন। আর তাদের ব্যাপারে উম্মতের ইজমা (ঐক্যমত্য) থাকবে। কারন দুর্ভাবনার যুগ উমাইয়া বংশের ওয়ালীদ বিন ইয়াযিদের শাসনামল থেকে শুরু হয়, আর তা আব্বাসিয়া খিলাফত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আব্বাসিয়াদের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বনু উমাইয়ার মূলোচ্ছেদ হয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার (রহঃ) বুখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে কাযি আয়াযের সূত্র ধরে লিখেছেন, এ হাদিসের ব্যাপারে কাযি আয়াযের অভিমতটি খুবই চমৎকার। কারন কিছু বিশুদ্ধ হাদিস এ অভিমতকে সমর্থন করে যে, সমস্ত লোক খলীফার ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করে। এই ঐক্যমত্য বা ইজমার অর্থ হলো, লোকেরা বাইয়াতের ব্যাপারে অনুগত আর হযরত আবু বকর (রাঃ), হজরত উমর (রাঃ), হজরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলি (রাঃ) এর যুগের মতো কেউ বাইয়াতের ব্যাপারে বাহানা করবে না।

সিফফিনের বিবাদের সময় দুই জন প্রশাসকের আবির্ভাব ঘটে। সেদিন মুয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা হোন আর লোকেরা ইমাম হাসান (রাঃ) এর সাথে সন্ধি করার পর আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এর ব্যাপারে ইজমা তথা ঐক্যমত্যে পৌঁছান। এরপর ইয়াযিদের বিষয়েও ইজমা হয় আর ইমাম হুসাইনের ব্যাপারে ঐক্যমত্য হয়নি, বরং তিনি আগেই শহীদ হোন। ইয়াযিদের মৃত্যুর পর মতনৈক্য দেখা দেয় আর ইবনে যুবাইরের হত্যার পর আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের ব্যাপারে ইজমা হয়। আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের পর তার চার পুত্র ওয়ালিদ, সুলাইমান, ইয়াযিদ আর হিশামের ব্যাপারে ইজমা হয়। সুলাইমান আর ইয়াযিদের মধ্যবর্তীতে উমর বিন আবদুল আযিযের বিষয়েও ইজমা হয়েছিলো। এ হিসাব মোতাবেক খুলাফায়ে রাশিদা ছাড়া সাতজন খলীফা হয়। আর এতে মোট খলীফার সংখ্যা দাঁড়ায় এগারো জন। বারোতম খলীফা ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক। তার চাচা হিশামের মৃত্যুর পর তার ব্যাপারে ইজমা হয়। চার বছর পর

লোকেরা তার প্রতি অনাস্থা পোষণ করে আর তাকে হত্যা করে। এতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় আর সময় খুবই দ্রুত পাল্টে যায়। এরপর কোন খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে লোকদের আর কোন ইজমা নেই, কারন ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ তার চাচাতো ভাই ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তিনি (ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ) অল্প কিছুদিন জীবিত ছিলেন। তার পিতার চাচার ছেলে মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। ইয়াযিদের পরলোক গমনের পর তার ভাই ইব্রাহীম বাদশাহী হাতে নেন। কিন্তু মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান ইব্রাহীমকে হত্যা করেন। এরপর বনু আব্বাসিয়ার হাতে তার পতন হয় আর তারা তাকে হত্যা করে।

আব্বাসিয়া বংশের প্রথম খলীফা হলেন সাফফাহ। তিনি দীর্ঘ সময় রাজদণ্ড ধারণ করেছিলেন না। তার পর তার ভাই মনসুর খিলাফতের দায়িত্ব নেন। তিনি দীর্ঘ সময় রাজ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকেন। কিন্তু বনু উমাইয়া স্পেনে সংগঠিত হওয়ার কারণে পাশ্চাত্যের ভূখণ্ড তার শাসনামলে তার হাতছাড়া হয়ে যায়। বনু আব্বাসিয়া নিজেদের রাজত্বকে খিলাফত উপাধিতে ভূষিত করে। তাদের সময় অনেক ভ্রষ্টাচারের প্রবর্তন ঘটে আর নামেমাত্র খিলাফত থাকে। পক্ষান্তরে, আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের যুগে মুসলমানগণ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিজয় অর্জন করেছিলো। খলীফার নামে খুৎবা পাঠ করা হতো। খলীফার নির্দেশ ছাড়া কোন শহরে কিছু হতো না। স্পেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, সেখানে নামমাত্র খলীফাদের দুর্বল শাসন আর তার সাথে মিসরে উবায়দীদের খিলাফতের প্রতি আহবান - এ সবই বাগদাদ থেকে খিলাফতের কর্মকাণ্ড চলে যাওয়ার ফল। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্রই খিলাফত নিয়ে বিবাদ - সে একই কারন পঞ্চম শতাব্দীতে স্পেনে ছয়জন খলীফা দাবী করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, বারোজন খলীফার পর ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। বস্তুত তাই হল। অন্যায় হত্যাযজ্ঞ চললো আর তা দীর্ঘস্থায়ী হলো। দিন দিন তা বৃদ্ধিও পেতে থাকলো। তারা এটাও অপব্যাখ্যা করলো যে, বারোজন খলীফা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষৎবাণী ইসলামের আবির্ভাবকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। অর্থাৎ, বারোজন খলীফা প্রাথমিক যুগে পরপর আসবেন - এমন কোন ইঙ্গিত নেই। তারা কিয়ামতের আগেও আসতে পারেন। সুতরাং বারোজন খলীফা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এ উম্মতের ধ্বংস নেই। এ কথাগুলো তারা নিজেদের বড় বড় মুসনাদ গ্রন্থে আবু খালিদের বরাত দিয়ে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

বারোজন খলীফার পর বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা দেখা দিবে - রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ভবিষৎবাণীর ব্যাখ্যা তারা এভাবে করেছে, এ ফিতনা দিয়ে কিয়ামতের পূর্বের ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা উদ্দেশ্য। তারা বারোজন খলীফাকে এভাবে গণনা করে - খুলাফায়ে রাশিদার চারজন, ইমাম হাসান, আমীর মুআবিয়া, যুবাইর আর উমর বিন আবদুল আযীয -এ আটজন। নবম খলীফা মুহতাদী, কারন বনু আব্বাসিয়ার খলীফা মুহতাদী বনু উমাইয়ার খলীফা উমর বিন আবদুল আযিযের মতো ন্যায়বিচারক ছিলেন। এরপর মাহ্দী।

বনু উমাইয়ার খিলাফতকে ভীতিপ্রদ বর্ণনাকারী হাদিসসমূহ

ইমাম তিরমিযি (রহঃ) বলেন, ইউসুফ বিন সাদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ইমাম হাসান (রাঃ) মুয়াবিয়া (রাঃ) এর কাছে বাইয়াতের সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ইমাম হাসান (রাঃ) কে বলল, আপনি মুসলমানদের লজ্জিত করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আমাকে খারাপ বলবেন না। কারন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাতে বনু উমাইয়াকে মিম্বরের উপর দেখে বিহবলিত হয়ে পড়েছিলেন, সে সময় –

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

আর,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(সূরাহ আল- কাউসার আর সূরাহ আল- কাদর) অবতীর্ণ হয়।

অর্থাৎ, (সূরাহ আল- কদরের প্রথম তিন আয়াতের অর্থ -) “আমি সম্মানিত রাতে কুরআনকে নাযিল করলাম। আর আপনি কি জানেন সম্মানিত রাত কি ? সম্মানিত রাত এক হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।” হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনার মৃত্যুর পর বনু উমাইয়া হাজার মাসের মালিক হবে। কাসেম বলেন, আমি হিসাব করেছি, আমীর মুয়াবিয়ার বাইয়াত থেকে হাজার মাস তাদের রাজত্ব ছিল, এতোটুকুও কম বেশী হয়নি।

ইমাম তিরমিযি (রহঃ) বলেন, এ হাদিসটি গরীব। এটি কাসেম কর্তৃক বর্ণিত। যদিও তিনি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তার উস্তাদ মাজহুল। এ হাদিসটি হাকিম মুসতাদরাক গ্রন্থে আর ইবনে জারির নিজের তাফসীর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাফেয আবুল হাজ্জাজ (রহঃ) বলেন, হাদিসটি মুনকার (অস্বীকারকারী)। ইবনে কাসিরও একই অভিমত পেশ করেছেন। ইবনে জারির নিজের তাফসীর গ্রন্থে আব্বাস বিন সহলের দাদার বরাত দিয়ে লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনূ হাকাম বিন আসকে (বনু উমাইয়াকে) স্বপ্নে দেখেন, বাদুড়ের মতো এক মজলিসে নাচছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এটা খুব খারাপ মনে হলো। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কোন দিন মুখ খুলে হাসেননি। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয় –

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

“আর আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি, সেটা আর কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য ...” (সূরাহ আল- ইসরা, ১৭ : ৬০)

এ হাদিসের সনদগুলো দুর্বল। তবে আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ), ইয়ালা বিন মাররা (রাঃ) আর হুসাইন বিন আলি (রাঃ) এর হাদিসগুলো এ হাদিসের সমর্থক। এ হাদিসটি আমি বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাফসীর আর মাসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। উপরন্তু, আসবাবুন নুযুল গ্রন্থেও এ হাদিসের কিছুটা ইশারা করা হয়েছে।

যেসব হাদিসে বনু আব্বাসিয়া খিলাফতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে

ইমাম বাযযার সনদসহ আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস লিখেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস (রাঃ) কে বলেন, তোমার লোকদের মধ্যে নবুওয়ত আর রাজত্ব উভয়ই রয়েছে। এ হাদিসের সনদের মধ্যে আমেরী দুর্বল। কিন্তু আবু নুয়াইম দালায়েলুন নবুওয়ত, ইবনে আদি কামেল আর ইবনে আসাকির নিজের গ্রন্থে আমেরীর হাদিসটি কয়েকভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস (রাঃ) কে বললেন, সোমবার সকালে আপনার ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। আমি তার জন্য দুয়া করে দিবো, যাতে আল্লাহ আপনার আর আপনার আওলাদদের ভালো করেন। আব্বাস (রাঃ) সকালে ছেলেকে কাপড় পড়িয়ে হযরতের খেদমতে নিয়ে আসেন। তিনি দুয়া করলেন, হে আল্লাহ, আব্বাস আর তার ছেলেকে প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহের মধ্যে বাঁধবেন না এবং তাদের ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, তাকে আর তার আওলাদকে রক্ষা করুন।

ইমাম তিরমিযি নিজের জামে গ্রন্থে এতটুকুই লিখেছেন। তবে রাযীন আল উবায়দী এ হাদিসটির শেষাংশে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন – তার বংশে আমার খিলাফত জারি রাখবেন। আমার কাছে এ হাদিসটি খুবই চমৎকার। তাবারানি সাওবান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি বনু মারওয়ানকে বারবার মিম্বরে উঠতে দেখে খারাপ ভাবলাম। যখন বনূ আব্বাসকে বার বার আসতে দেখলাম, তখন আমার ভালো লাগলো।

আবু নুয়াইম আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস সনদসহ হুলিয়া গ্রন্থে লিখেছেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে এলে আব্বাস (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে আবুল ফজল, আমি আপনাকে একটি সংবাদ দিবো ? তিনি বললেন, অবশ্যই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ যে কাজ আমাকে দিয়ে শুরু করিয়েছেন, সে কাজ আপনার সন্তানদের মাধ্যমে সমাপ্ত করবেন।

এর সূত্রগুলো দুর্বল। হযরত আলি (রাঃ) এ হাদিসটি যে সূত্রে বর্ণনা করেছেন তা আরো দুর্বল।

খতীব ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আপনাদের থেকেই এ কাজ শুরু হয়েছে, আপনাদের দিয়েই তা শেষ হবে। শীঘ্রই এ হাদিসের সনদসহ বিস্তারিত বিবরণ মুহতাদি বিল্লাহ অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) এর আরেকটি হাদিস খতীব সনদসহ বর্ণনা করেছেন। আবু নুয়াইম হুলিয়া গ্রন্থে জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আব্বাসের বংশোদ্ভূত বাদশাহগণ আমার উম্মতের আমীর হবে। এজন্য আল্লাহ তাদের দ্বীনকে জয়যুক্ত করবেন। (সনদ দুর্বল)

আবু নুয়াইম দালায়েল গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উম্মুল ফযল আমার কাছে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন - তিনি বলেন, আমি একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার গর্ভে পুত্র সন্তান রয়েছে। ভুমিস্ট হলে তাকে নিয়ে আমার কাছে এসো। জন্মগ্রহণ করলে আমি নবজাতককে নিয়ে তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র খেদমতে হাযির হলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই পুত্রের ডান কানে আযান আর বাম কানে ইকামত দিলেন। নিজের লালা মুবারক নবজাতকের মুখে দিলেন আর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। এরপর বললেন, খলীফাগণের পিতাকে নিয়ে যাও। আমি সমস্ত ঘটনা আব্বাসের কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে কারন জিজ্ঞেস করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি সত্যিই বলেছি, সে খলীফাগণের পিতা। তার বংশ থেকে সাফফাহ আর মাহদির আবির্ভাব ঘটবে। ঈসা বিন মারইয়াম (আঃ) এর সাথে যিনি নামায আদায় করবেন।

দায়লিমা মুসনাদুল ফেরদৌস গ্রন্থে আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর একটি মারফু হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অচিরেই বনু আব্বাসিয়ার হাতে পতাকা আসবে। যতক্ষণ তারা সত্যের চর্চা করবে, তাদের হাত থেকে পতাকা যাবে না। দারে কুতনী ইফরাদ গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সনদসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস (রাঃ) কে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সম্প্রদায় ইরাকে থাকবে, কালো কাপড় পড়বে আর খুরাসানবাসী তাদের সাহায্য করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছেই ক্ষমতা থাকবে। এমন অবস্থায় ঈসা (আঃ) কে তাদের প্রদান করা হবে। এ হাদিসটি দুর্বল। তবে ইবনে জাওযী মাওযুআতের মধ্যে তা বর্ণনা করেছেন।

তাবারানি কাবিরে উম্মে সালমা (রাঃ) এর মারফু হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার চাচার ছেলে আর আমার বাবার পিতামহদের সন্তানদের মধ্যেই খিলাফত থাকবে।

আকেলি কিতাবুয যুআফায় সনদসহ আবু বকর (রাঃ) এর মারফু হাদিস বর্ণনা করেছেন। বনূ উমাইয়ার এক দিনের পরিবর্তে বনূ আব্বাস দুইদিন, আর এক মাসের পরিবর্তে দুই মাস রাজত্ব করবে।

ইবনে জাওজি মাওয়ুয়াতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। কারন এ হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে যে খারাপ, তাকে মুহতাম বলা হয়। বস্তুত, খারাপ লোক মিথ্যা বা বর্ণিত হাদিসে মুহতাম নাও হতে পারে। ইবনে আদি এই বর্ণনাকারীকে দুর্বলদের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু তিনি এও বলেছেন, এতে কোন ক্ষতি নেই আর হাদিসের অর্থ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কেননা, বনু আব্বাসিয়ার যুগে শুধু স্পেন ছাড়া পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তাদের রাজত্ব ছিল। তাদের শাসনামল ১৩০ হিজরি থেকে ২৯০ হিজরি। এরই মধ্যে মুকতাদার খিলাফতের দায়িত্ব

গ্রহণ করেন। তার প্রশাসনিক পদ্ধতিতে ভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে, পাশ্চাত্যের ভূখণ্ডগুলো হাতছাড়া হয়ে যায় আর এরপর মুসলিম সাম্রাজ্যে দারুন অরাজকতা, আত্মকলহ আর মতানৈক্য দেখা দেয়, যার বিবরণ সামনে উপস্থাপন করা হবে। এ হিসাব মোতাবেক বনূ আব্বাসিয়ার শাসনামল ছিল ১৬০ বছর। আর বনূ উমাইয়ার ২০ বছর। তারমধ্যে ইবনে যুবায়েরের খিলাফতকাল নয় বছর বাদ দিলে তিরাশি বছর হল। উমাইয়াদের যুগ, যা আব্বাসীয়দের শাসনকালের অর্ধেক সময়।

যুবায়ের বিন বাকার মুআফিকাত গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা নকল করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুআবিয়া (রাঃ) কে বললেন, আপনারা যদি একদিন রাষ্ট্র চালান, তবে আমরা দুইদিন; আপনারা এক মাস চালালে আমরা দুই মাস; আপনারা এক বছর চালালে আমরা দুই বছর রাষ্ট্র চালাবো।

যুবায়ের মুআফিকাতে লিখেছেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কালো পতাকা আমাদের পাশ্চাত্য থেকে শুরু হবে। তারিখে দামেশক গ্রন্থে ইবনে আসাকির লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার হযরত আব্বাস (রাঃ) এর জন্য এ দুয়া করেছেন - হে আল্লাহ, আব্বাস আর তার সন্তানদের সাহায্য করুন। এরপর হজরত আব্বাস (রাঃ) কে সম্বোধন করে বলেন, চাচা, আপনি জানেন না, আপনার বংশধরদের মধ্যে মাহদী মুওয়াফফাক খুবই ভালো মানুষ হবেন।

ইবনে সাদ তবকাত গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের বর্ণনা লিখেছেনঃ একদিন হযরত আব্বাস (রাঃ) আবদুল মুত্তালিবের বংশধরকে একত্রিত করেন। তিনি আলি (রাঃ) কে খুবই ভালোবাসতেন। এজন্য তিনি তাকে বললেন, আমি তোমার সাথ একটি পরামর্শ করতে চাই, তবে প্রথমে তোমার পরামর্শ ছাড়া চূড়ান্ত ফয়সালা নিতে চাই না। তুমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে গিয়ে আরয করো, যদি খিলাফত আমাদের জন্য না হয়, তবে আমরা আজ থেকেই তাকে কোন পাত্তা দিবো না। হজরত আলি (রাঃ) বললেন, হে চাচা, নিশ্চয়ই খিলাফত আপনার জন্যই, কারো শক্তি নেই আপনার থেকে তা কেড়ে নিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাইলামী মুসনাদুল ফেরদৌস গ্রন্থে লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বাদশাহীর জন্য যে জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সে জাতির কপালে হস্ত সঞ্চালন করে দিয়েছেন। এ হাদিসের একজন বর্ণনাকারী মাইসারা, তিনি পরিত্যক্ত। দাইলামী এই হাদিসটি তিন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর, যা সর্বশেষ খলীফা পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয়েছে

সলফী তুওরিয়াতে লিখেছেন, কাব বিন যুবাইর (রাঃ) স্বরচিত কবিতা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে আবৃত্তি করলে তিনি পরনের চাদরটি কাবের প্রতি এ মর্মে চিঠি লিখেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদরটি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমাকে দিয়ে দাও। কিন্তু তিনি তা দেননি। কাবের মৃত্যুর পর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তার সন্তানদের কাছ থেকে বিশ হাজার দিরহামে চাদরটি কিনে নেন। এরপর সে চাদরটি বনূ আব্বাসিয়ার খলীফাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

সলফী ছাড়াও অন্য লোকেরা এমনই বলেছে।

যাহাবী স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে এটাও লিখেছেন, খলীফাদের চাদরটি হযরত মুয়াবিয়ার খরিদকৃত চাদর না, বরং সেটি ঐ চাদর, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধে শান্তির প্রতীকস্বরূপ নিজের চিঠিসহ আয়লাবাসীর প্রতি পাঠান। এরপর সাফফাহ তিনশো দিনারে চাদরটি কিনে নেন। আমার মতে, হযরত মুয়াবিয়া যে চাদর কিনেছিলেন, তা আব্বাসীয় যুগে চুরি হয়ে যায়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) যুহদ গ্রন্থে লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চাদর পড়ে প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তা মোতি- মুক্তা খচিত ছিল। চার হাত লম্বা, দুই হাত প্রস্থ এ চাদরটি খলীফাদের কাছে ক্রমান্বয়ে হস্তান্তরিত হয়। চাদরটি খুবই পুরানো হওয়ায় তা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হতো। খলীফাগণ দুই ঈদে চাদরটি পড়তেন। উত্তরাধিকার সূত্রে চাদরটি এক খলীফা থেকে অপর খলীফার হাতে চলে যেতো। বড় বড় অনুষ্ঠানে তারা চাদরটি বরকতের জন্য পড়তেন।

কথিত আছে, যখন মুকতাদার ফিতনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত হন, তখন এ চাদরটি তিনি পড়ে ছিলেন। তার রক্তে চাদরটি অপবিত্র হয় আর সেখানেই তা নষ্ট হয়ে যায়।

কিছু ফাওয়ায়েদঃ

বর্ণিত আছে যে, আব্বাসীয় বংশের খলীফাগণের মধ্যে একজন শুরু করেছেন, একজন মধ্যবর্তীতে রয়েছেন, আর একজন শেষ করেছেন। মনসুর প্রবর্তনকারী, মামুন মধ্যবর্তীতে অবস্থানকারী আর মুতাদার সর্বকনিষ্ঠ। আব্বাসীয় বংশের খলীফাদের মধ্যে সাফফাহ, মাহদী আর আমীন ছাড়া বাকি সকলেই দাসীর গর্ভজাত সন্তান। হযরত আলি বিন আবু তালিব, হাসান বিন আলি বিন আবু তালিব এবং আমীন বিন রশিদ ছাড়া হাশেমি বংশীয় খলীফা হাশেমি মায়ের গর্ভজাত নন। এ বর্ণনাটি সুলী বর্ণনা করেছেন।

যাহাবি বলেন, হজরত আলি বিন আবু তালিব আর আলি আল মুকতাফী ছাড়া কোন খলীফার নাম আলি ছিল না। আমি বলছি, অধিকাংশ খলীফার নাম একক, নকল নাম অনেক কম। আবদুল্লাহ, আহমদ, মুহাম্মাদ - এই নামগুলো অনেকের ছিল।

বাগদাদের সর্বশেষ খলীফা মুতাসিম পর্যন্ত সকলেই পৃথক উপাধি ধারণ করেছিলেন। মিসরে খলীফাগণ আগের খলীফাদের উপাধি অনুসরণ করে নিজেদের উপাধি ধারণ করেন, যেমন - মুসতানসির, মুসতাকফী, ওয়াসেক, হাকিম, মুতাদাত, মুতাওয়াক্কিল, মুসতাসিম, মুসতাইন, কায়িম, মুসতানজিদ। এর মধ্য থেকে মুসতাকফী আর মুসতানসির তিনজনের উপাধি ছিল, বাকিগুলো দুই জনের।

বনু আব্বাসিয়ার খলীফাগণের মধ্যে কেউ বনু উবাইদির খলীফাদের উপাধি গ্রহণ করেননি। কায়িম, হাকিম, তাহির আর মুসতানসির ছাড়া। মাহদি আর মনসুর আগে থেকেই উবাইদিদের উপাধি ছিল। বনু আব্বাসিয়ার মধ্যেও সে উপাধি ছিল।

কেউ কেউ বলেন, কাহির উপাধি ধারণ করে খলীফা বা বাদশাহ সফলকাম হতে পারেন না। আমার মতে, মুসতাকফী আর মুসতাইন উপাধি ধারণকারীর একই অবস্থা। দেখুন, আব্বাসীয়দের মধ্যে দুইজন খলীফার উপাধি ছিল অনুরূপ। তাদের পতন হয়েছে। তবে মুতাযদ খুবই সুন্দর উপাধি।

ভাতিজার স্থানে মুকতাদা আর মুসতানসির ছাড়া আর কেউ বসেননি। মুকতাদা রাশেদের পর আর মুসতানসির মুতাসিমের পর খলীফা হোন। (যাহাবী) একই পিতার তিন পুত্র আমীন, মামুন, মুতাসিম ছাড়া হারুন রশিদের বংশে মুসতানসির, মুতায ছাড়া মুতাওয়াক্কিলের বংশে রাযী, মুকতাদা আর মতী ছাড়া মুকতাদার বংশে কেউ খিলাফতের দায়িত্বে আসেনি।

আবদুল আল্লিকের চার সন্তান খিলাফতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যার দৃষ্টান্ত খলীফাদের মধ্যে নেই। তবে এ দৃষ্টান্ত রাজা বাদশাহদের মধ্যে বিদ্যমান। আমি বলেছি, এ দৃষ্টান্ত খলীফাদের মধ্যে নেই। মুতাওয়াক্কিলের পাঁচ সন্তান ছিল - মুসতাইন, মুতাযদ, মুসতাকফী, কায়িম আর মুসতানজিদ। পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ) আর বকর আল তায়ী বিন মতী ছাড়া কেউ খলীফা হননি। আবু বকর আল তায়ী'র পিতার প্যারালাইসিস হওয়ায় তিনি ছেলেকে খলীফা মনোনীত করেন।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, যিনি পিতার জীবদ্দশায় খিলাফতের কর্ণধার হয়েছেন, তিনি আবু বকর (রাঃ)। তিনি যুবরাজ নির্ধারিত করেছিলেন, সর্বপ্রথম বাইতুল মাল গঠন করেন আর কুরআন শরীফকে গ্রন্থ আকারে রূপ দেন।

যিনি সর্ব প্রথম আমিরুল মুমিনীন বলেছেন, চাবুক মারার প্রথা প্রবর্তন করেছেন, হিজরি সনের সূচনা করেছেন, ইতিহাস অধ্যয়নের নির্দেশ দিয়েছেন আর বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি হলেন উমর ফারুক (রাঃ)।

উসমান গনী (রাঃ) সর্বপ্রথম চারণভূমি নির্ধারণ করেন, জায়গীর দেন, জুমআর প্রথম আযান আর মুয়াযযিনদের ভাতা নির্ধারণ করেন, খুৎবায় কম্পন সৃষ্টি না করা আর পুলিশ নিয়োগ দেন।

যিনি সর্বপ্রথম নিজের জীবদ্দশায় নিজের পুত্রকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা দেন আর নিজ সেবার জন্য লোক নিয়োগ করেন, তিনি হলেন মুয়াবিয়া (রাঃ)।

যার দরবারে সর্বপ্রথম শত্রুর কাটা মাথা এসেছিলো, তিনি হলেন যুবায়ের (রাঃ)।

সর্বপ্রথম মুদ্রায় নিজের নাম অংকন করেন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান।

সর্বপ্রথম নিজের নাম ঘোষণা করতে নিষেধ করেছিলেন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক।

বনু আব্বাসিয়ার খলীফাগণ সর্বপ্রথম নতুন নতুন উপাধি আবিস্কার করেন।

ইবনে ফাজলুল্লাহ বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, বনূ আব্বাসীয়ার মতো বনু উমাইয়াও উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। আমার মতে, কিছু ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, মুয়াবিয়া (রাঃ) আন-নাসিরুদ্দীনিল্লাহ, ইয়াযিন আল মুসতানসিরি, মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদ আর রাজি ইলাল হাক, মারওয়ার আল মুতামিন বিল্লাহ, আবদুল মালিক আল মুওয়াফফিক আমরিল্লাহ, তার ছেলে ওয়ালিদ আল মুনতাকসিম বিল্লাহ, উমর বিন আবদুল আযিয আল মাসুম বিল্লাহ, ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক আল কাদির বি সুনাআল্লাহ আর ইয়াযিদ নাকেস আল শাকির বিন আন আমিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন।

যার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিভিন্ন কথা হয়েছিলো, তিনি হলেন সাফফাহ।

যিনি সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ডেকে তাদের কথা মতো কাজ করতেন আর নিজের গোলামদের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করেন আর আরবদের চেয়ে তাদের প্রাধান্য দিতেন, তিনি হলেন মানসুর।

মাহদি সর্বপ্রথম ভিন্ন মতাবলম্বীদের মতবাদ খণ্ডনের জন্য গ্রন্থ রচনা করান।

যিনি সর্বপ্রথম লাগামের মধ্যে অসি, বল্লম প্রভৃতি নিয়ে সৈন্য পরিচালনা করেন তিনি হলেন হাদী।

যিনি সর্বপ্রথম হকি খেলেছেন তিনি হারুনুর রশিদ।

যে খলীফাকে সর্বপ্রথম উপাধিসহ ডাকা হয় আর যিনি সর্বপ্রথম উপাধিসহ নিজের নাম লিখেছেন তিনি হলেন আমীন।

মুতাওয়াক্কিল সর্বপ্রথম অমুসলমান বন্দীদের পোশাক নির্দিষ্ট করেন। মুতাওয়াক্কিলকে সর্বপ্রথম তুর্কীরা শহীদ করে দেয়। এ ঘটনা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিসের সমর্থক, যা তাবারানি ইবনে মাসউদ থেকে নকল করে বর্ণনা করেছেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুর্কীরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দিবে, তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা তাদের অবকাশ দিবে। কারন সর্বপ্রথম তারাই আমার উম্মতের বাদশাহী আর আল্লাহ'র নিয়ামত কেড়ে নিবে।

যিনি সর্বপ্রথম জরির পাড়যুক্ত পোশাক আর ছোট টুপি ব্যবহার করেছেন, তিনি মুসতাইন।

মুতায সবপ্রথম ঘোড়াকে স্বর্ণের অলংকারাদি পড়ান।

যার উপর সর্বপ্রথম অত্যাচার ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়, তিনি হলেন মুতামাদ। তার সকল খরচ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো আর তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়।

যিনি সর্বপ্রথম বিচলিত অবস্থায় খলীফা মনোনীত করেছিলেন, তিনি হলেন মুকতাদার।

রাযী হলেন শেষ খলীফা, যাকে অর্থ আর সৈন্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তিনি কবিতা আকারে খুৎবা দিতেন, সবসময় নামাজের ইমামতি করতেন, সভাষদের নিজের সামনে বসিয়ে পরামর্শ করতেন, খুলাফায়ে রাশেদীনদের চালচলন মেনে চলতেন।

মুসতানসির সর্বপ্রথম ব্যবহৃত উপাধি গ্রহণ করেন, যিনি মুসতানসিনের পর খলীফা হোন।

আওয়ালে আসকারী গ্রন্থে রয়েছে, যিনি সর্বপ্রথম মায়ের জীবদ্দশায় খলীফা হোন, তিনি হলেন উসমান গনী (রাঃ)। এরপর হাদী, রশিদ, আমীন, মুতাওয়াক্কিল, মুসতানসির, মুসতাইন, মুতায, মুতাযদ আর মতী। আবু বকর (রাঃ) আর আল তায়ী ছাড়া কেউ পিতার জীবদ্দশায় খিলাফতের তখতে আরোহণ করেননি।

সূলী বলেন, আবদুল মালিকের দুই পুত্র ওয়ালিদ আর সুলাইমানের জননী ইয়াযিদ নাকেয আর ইব্রাহীমের জননী শাহীন এবং হাদী ও রশীদের জননী খিযরান ছাড়া কোন নারী দুজন খলীফা প্রসব করেন নি। তবে আমার মতে, এক্ষেত্রে আব্বাস ও হামযার জননী এবং দাউস ও সুলাইমানের জননীকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। দাউদ আর সুলাইমান মুতাওয়াক্কিলের শেষ দুই সন্তান।

ফায়দা ১ – বনু উবাইদের চৌদ্দ জন খলীফা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তারা হলেন মাহদী, কায়িম, মানসুর, মুয়ায, আযিয, হাকিম, তাহির, মুসতানসির, মুসতালা, আমর, হাফিয, জাফর, কায়েম, আসেদ মিসর। তাদের বাদশাহীর সূচনা ২৯০ হিজরিতে আর পতন ৫৬৭ হিজরিতে।

ফায়দা ২ – যাহাবী বলেন, তাদের রাজত্ব অগ্নি উপাসক আর ইহুদীদের রাজ্যের অনুরূপ ছিল। সুতরাং তাদের রাজত্বকে খিলাফত বলা যেতে পারে না।

ফায়দা ৩ – পাশ্চাত্যে বনু উমাইয়ার মধ্য থেকে যারা খিলাফত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তারা উবাইদিদের তুলনায় শরীয়ত, সুন্নত, ইনসাফ, দয়া, জ্ঞান, জিহাদ প্রভৃতি থেকে উত্তম। তারা সংখ্যায় বেশী ছিল আর স্পেনে একই সময়ে পাচজন খলীফা দাবী করে।

অনেক প্রবীণ ওলামায়ে কেরাম খলীফাদের ইতিহাস লিখেছেন। তাদের মধ্য থেকে লাফজুয়া নাহবী দুই খণ্ডে একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি কাহিরের যুগ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। সূলী শুধু বনু আব্বাসিয়ার ইতিহাস সম্বলিত একটি ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন, এটি আমি দেখেছি। তিনিও কাহিরের যুগ পর্যন্ত লিখেছেন। ইবনে জাওজী শুধু আব্বাসীয়দের ইতিহাস লিখেছেন, এতে নাসিরের যুগের ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। এ বইটিও আমি অধ্যয়ন করেছি। আবুল ফজল আহমদ বিন আবু তাহির আল মুরুযী ২৮০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি বড় মাপের কবি আর সুলেখক ছিলেন। তিনিও আব্বাসিয়দের ইতিহাসনির্ভর

একটি গ্রন্থ লিখেন। এতে বনূ আব্বাসিয়ার আমীর আবূ হারুন বিন মুহাম্মাদ আল আব্বাসীয়ার যুগ পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে।

ফায়দা ৪ - খতীব লিখেছেন, হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ) আর মামুন ছাড়া কোন খলীফা কুরআনের হাফেজ ছিলেন না। আমার মতে এটি ভুল। বরং বিশুদ্ধ অভিমত হলো, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও কুরআনের হাফেজ ছিলেন। একদল ঐতিহাসিক এ অভিমতের সমর্থক। নববী তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর আলি (রাঃ) কুরআন হিফয করেন।

ফায়দা ৫ - ইবনুস সায়ী বলেন, খলীফা তাহিরের বাইয়াত গ্রহণের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাহির সাদা কাপড় পড়ে ছাতার নিচে উপবেশন করেছিলেন। তিনি নিজের চাদর পড়ে ছিলেন আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদরটি কাঁধের উপর রেখেছিলেন। মন্ত্রী পরিষদ মিম্বরে আর সেনাপতিগণ সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। লোকদের থেকে এ কথা বলে তিনি বাইয়াত গ্রহণ করাচ্ছিলেন - আমি আপনাদের নেতা ও ইমাম, যার অনুসরণ ও আনুগত্য করা পৃথিবীর সকলের জন্য ফরয। তার পবিত্র নাম শরীফ, সুন্নতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর আমিরুল মুমিনীনের ইজতিহাদের জন্য বাইত করছি। তিনি ছাড়া আর কোন খলীফা নেই।

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর খলীফা। তার নাম আবদুল্লাহ বিন আবি কুহাফা উসমান বিন আমের বিন আমর বিন কাব সাদ বিন তায়ম বিন মুররাহ বিন কাব বিন লুয়াই বিন গালিব আল কারশী তায়মী। তার বংশ পরম্পরা মুররাহ বিন কাব পর্যন্ত পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলে গেছে।

ইমাম নববী তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেন, আবু বকর (রাঃ) এর প্রসিদ্ধ নাম ছিল আবদুল্লাহ। এটা বিশুদ্ধতম অভিমত। কেউ কেউ বলেন, তার নাম আতিক। তবে সকল ওলামা এতে একমত নন। তাদের মতে এটা তার উপাধি, কারন ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন হাদিস শরীফে রয়েছে, তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে আতিক অর্থাৎ মুক্ত।

কেউ কেউ বলেন, তিনি সৌন্দর্য ও সুদর্শনের কারনে আতিক উপাধিতে ভূষিত হোন। কারন আতিক অর্থ সৌন্দর্য ও কান্তিময়। কারো মতে, আবু বকর (রাঃ) এর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল না বলে তাকে আতিক বলা হয়।

মুসআব বিন যুবাইর সহ প্রমুখ ব্যক্তি লিখেছেন, মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত যে, তার উপাধি ছিল সিদ্দীক। কারন তিনি নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের সাক্ষ্য প্রদান করেন আর বিশ্বাসের উপর অটল ছিলেন। তিনি কখনো কোন কাজে এতটুকু পিছপা হননি। ইসলামের মধ্যে তার মর্যাদা সবার শীর্ষে। সিদ্দীক উপাধি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মিরাজের ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি কাফিরদের জবাবে নিজের চিন্তা- চেতনার উপর অবিচল ছিলেন আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিমতকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরত করা, নিজের পরিবারের মায়া ত্যাগ করা, গুহায় ও গোটা রাস্তায় তার সর্দারের (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সেবা প্রদানকে নিজের জন্য কর্তব্য মনে করে নেওয়া, বদর যুদ্ধে কথা বলা, হুদায়বিয়ার প্রান্তর থেকে মক্কায় প্রবেশ করতে না পারায় লোকদের মধ্যে যে সংশয় দেখা দেয় তা দূর করা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই হাদিস যা শুনে তিনি কেঁদেছিলেন। হাদিসটি হল - আল্লাহ তাআলা তার এক বান্দাকে দুনিয়া বা আখিরাত দুটোর একটি বেছে নেওয়ার অবকাশ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর খুৎবার মাধ্যমে লোকদেরকে শান্ত রাখা, মুসলমানদেরকে যুক্তিসিদ্ধ উপদেশের কারনে খিলাফতের জন্য প্রস্তুত হওয়া, উসামা বিন যায়েদকে সৈন্যে সহকারে সিরিয়ার পাঠানো আর এ সিদ্ধান্তে অটল থাকা, দুর্বল মুহূর্তে মুরতাদদের সাথে লড়াই করা আর এ ব্যাপারে সাহাবাদের সম্মত করানো, সিরিয়া বিজয় করা, সিরিয়া নির্ধারণ করা - এ সবই তার প্রকৃষ্টতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর অনন্য গুণাবলীর কোন পরিসীমা নেই, যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করা যেতে পারে (এটা ইমাম নববীর অভিমত)। তবে আমার ইচ্ছা হলো, আমার যতটুকু জানা আছে, সে অনুযায়ী কয়েকটি অধ্যায়ে তা সবিস্তারে লিখবো।

নাম ও উপাধি

ইবনে কাসির (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে সকল ওলামা একমত যে, তার নাম আবদুল্লাহ বিন উসমান। তবে ইবনে সিরীন (রহঃ) থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেন যে, তার নাম আতিক। বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, আতিক হল তার উপাধি। এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে, এ উপাধি কখন আর কেন হয়। কেউ কেউ বলেন, তার সৌন্দর্য আর সুদর্শনের কারনে তাকে এ উপাধি দেওয়া হয়। লায়েস বিন সাদ, আহমদ বিন হাম্বল প্রমুখ এ বর্ণনাটি বর্ণিত করেছেন।

আবু নুয়াইম লিখেছেন, পুণ্যময় কাজে অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে তাকে এ উপাধি দেওয়া হয়। কেউ কেউ বর্ণনা করেন, তার বংশের পূর্বপুরুষদের চরিত্রে কোন অপবাদ না থাকার কারনে তাকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। কারো মতে, তার নাম আতিক রাখা হয়েছিলো, পরবর্তীতে আবদুল্লাহ নাম হয়।

কাসিম বিন মুহাম্মাদ থেকে তাবারানি বর্ণনা করেন, তিনি আবু বকর (রাঃ) এর নাম আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলে আয়েশা (রাঃ) বললেন, "আবদুল্লাহ।" প্রশ্ন করা হলো, লোকেরা তো আতিক বলে। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আবু কুহাফার তিন পুত্র – আতিক, মুকি আর মুতাইন।

মুসা বিন তালহা (রাঃ) থেকে ইবনে মান্দা আর ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, আমি আবু তালহা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, আবু বকরের নাম আতিক রাখা হলো কেন ? আবু তালহা (রাঃ) বললেন, তার পিতার কোন সন্তান জীবিত থাকতো না। তার জন্মের সময় তার পিতা তাকে নিয়ে কাবা শরিফে গিয়ে আরয করলেন – হে আল্লাহ, এ নবজাতককে মৃত্যু অবধি আতিক (মুক্ত) করে আমাকে দান করুন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে তাবারানি বর্ণনা করেছেন, লাবণ্যময় আকৃতির জন্য তার নাম আতিক রাখা হয়।

আয়েশা (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, পারিবারিকভাবে তার নাম আবদুল্লাহ রাখা হয়। তবে তিনি আতিক নামে অধিক প্রসিদ্ধ হয়ে যান।

এক বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নামে রেখেছিলেন আতিক।

মুসনাদ গ্রন্থে আবু ইয়ালা লিখেছেন, ইবনে সাদ (রহঃ) আর হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, একদিন আমি নিজের ঘরে ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে ঘরের বারান্দায় ছিলেন। আমাদের মধ্যে একটি পর্দার আড়াল ছিলো। এমন সময় আবু বকর (রাঃ) সেখানে এলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে জাহান্নামের আগুন থেকে চিরমুক্ত ব্যক্তিকে

দেখতে চায়, সে যেন আবু বকরকে দেখে। পারিবারিকভাবে তার নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ, তবে তিনি আতিক নামে প্রসিদ্ধ হোন।

তিরমিযি ও হাকিম বর্ণনা করেন যে আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আবু বকর (রাঃ) উপস্থিত হলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে আবু বকর, আল্লাহ তাআলা তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেছেন। সেদিন থেকেই তার নাম হয় আতিক।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সূত্রে বাযযার আর তাবারানি বর্ণনা করেন, সিদ্দিকে আকবরের (অর্থাৎ, আবু বকরের) নাম আবদুল্লাহ ছিলো। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করা হয়েছে। সেদিন থেকে তার নাম হয় আতিক। আর সিদ্দীক উপাধি জাহেলিয়াতের যুগ থেকেই ছিলো। কারন তিনি সবসময়ই সত্য বলতেন। এ বর্ণনাটি মুসদিও লিপিবদ্ধ করেছেন। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত সংবাদকে সত্যায়িত করায় তাকে সিদ্দীক উপাধি দেওয়া হয়। কাতাদা ও ইবনে ইসহাক বলেন, মিরাজের রাতের পরদিন থেকে আবু বকর এ উপাধিপ্রাপ্ত হোন।

হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মুশরিকরা আবু বকরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি কি কিছু জানেন ? আপনার বন্ধু গত রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গিয়েছিলো বলে দাবী করেছেন। আবু বকর বললেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি এভাবেই বলেছেন ? মুশরেকরা বললো, হ্যা। আবু বকর বললেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি সকাল- সন্ধ্যা দূর আসমানের সংবাদ সরবরাহ করেন, তবুও আমি তা বিশ্বাস করবো। এ কারণে তাকে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ হাদিসটি আনাস (রাঃ) আর আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে তাবারানি বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদ গ্রন্থে সাদ বিন মানসুর লিখেছেন, মিরাজের রাতে ফেরার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'যী তোয়া' নামক স্থানে পৌঁছে বললেন, হে জিবরাঈল, আমার সম্প্রদায় আমাকে সত্যায়িত করবে না। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আবু বকর আপনাকে সত্যায়িত করবেন, তিনি সিদ্দীক।

তাবারানি 'আওতাস' গ্রন্থে আর হাকিম 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আলি (রাঃ) কে ইবনে উসায়ের বললেন, আবু বকর তো সেই মহান মনীষী, যার নাম আবদুল্লাহ। জিবরাঈল আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম রাখেন সিদ্দীক। তিনি আমাদের নামায পড়িয়েছেন আর তিনি হলেন রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাধ্যমে আমাদের দ্বীনের কাজ করে নিয়েছেন, আর আমরা দুনিয়ার কাজ করে নেওয়ার জন্য তার প্রতি রাজি হয়েছি।

আবু ইয়াহইয়া থেকে দারা কুতনী আর হাকিম বর্ণনা করেন, আমি অসংখ্যবার হযরত আলি (রাঃ) কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে তার নাম সিদ্দীক রেখেছেন।

হাকিম বিন সাদ থেকে তাবারানি বর্ণনা করেন, একদিন হযরত আলি (রাঃ) কসম করে বললেন, আবু বকরের নাম আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে নাযিল করেছেন। হাদিসে উহুদে রয়েছে, উহুদ পাহাড় নড়ে উঠলে বলা হলো - থেমে যাও, তোমার বুকে সিদ্দীক আর শহীদ রয়েছেন।

সিদ্দিকে আকবরের (আবু বকরের) মা তার পিতার চাচাতো বোন। তার নাম সালমা বিনতে সখর বিন বিন আমের বিন কাব, তার উপাধি উম্মুল খায়ের। যুহরি বলেন, এ বর্ণনাটি ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন।

জন্মগ্রহণ ও লালন- পালন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মগ্রহণের দুই বছর কয়েক মাস পর আবু বকর (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইয়াযিদ বিন আসাম থেকে খলিফা বিন খাইয়াত বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে বড় – আপনি না আমি ?" আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন, "বড় তো আপনি, তবে আমার বয়স বেশী।" এ মুরসাল হাদিসটি খুবই গারীব। বস্তুত, এর উল্টোটাই অধিকতর বিশুদ্ধ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সমর্থক।

আবু বকর (রাঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজন ছাড়া মক্কা থেকে বের হননি। নিজ গোত্রে তাকে ধনাঢ্য, ভদ্র, দয়ার্দ্র আর সম্মানিত মনে করা হতো।

ইবনুদ দাগানা বলেন, তিনি দয়াশীল ও সত্যবাদী। প্রতিবন্ধীদের সেবা করতেন, বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতেন আর অতিথিপরায়ণ ছিলেন।

ইমাম নববি লিখেছেন, তিনি জাহেলিয়াতের যুগে কুরাইশ সর্দারদের অন্যতম ছিলেন। কুরাইশরা তার পরামর্শ গ্রহণ করতো আর খুবই শ্রদ্ধা করতো। তিনিও তাদের লেনদেনের প্রতি সচেতন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সর্বস্ব ইসলামের জন্য উজাড় করে দেন।

যুবাইর ইবনে বাকার আর ইবনে আসাকির লিখেছেন, কুরাইশদের এগারোজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম, যাকে ইসলাম ও জাহেলিয়াত উভয় যুগেই সম্মান করা হতো। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে হত্যা ও অত্যাচারের বিচার করতেন। কারন কুরাইশদের কোন বাদশাহ ছিলো না, সকল কাজের দণ্ড তার হাতেই ছিলো। তবে প্রত্যেক গোত্র প্রধানদের এক একটি দায়িত্ব ছিলো। বনু হাশেম হাজীদের পান করানো আর খাবার খাওয়ানোর দায়িত্ব পালন করতো। অর্থাৎ, তারা ছাড়া কেউই হাজীদেরকে পানি- খাবার সরবরাহ করতো না। কেউ যদি তা দিতো, তবে বনু হাশেমদেরগুলোই সরবরাহ করতো। বনু আব্দুদ্দার পতাকা বহন আর মজলিসে শুরার দায়িত্ব পালন করতো। অর্থাৎ, তাদের অনুমতি ছাড়া কেউ বাইতুল্লাহ

শরীফে যেতে পারতো না। যুদ্ধের ময়দানে তার পতাকা বহন করতো। মজলিসে শুরা কাবার দারুন নাদওয়াতে বসতো আর কাবা তাদের অধীনে ছিলো।

জাহেলিয়াতের যুগে তার সংযম

আয়েশা (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) জাহেলিয়াত আর ইসলাম কোন যুগেই কবিতা আবৃত্তি করেননি। তিনি আর উসমান (রাঃ) জাহেলিয়াতের যুগে মদ বর্জন করেছিলেন।

হজরত আয়েশা (রাঃ) থেকে আবু নুয়াইম বর্ণনা করেন, তিনি জাহেলিয়াতের যুগে মদ পান নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, তিনি কখনো কবিতা আবৃত্তি করেননি।

ইবনে আসাকির বলেন, সাহাবীদেরকে মজলিসে এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কখনো ভুলেও মদ পান করেছেন ? তিনি আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, কখনো না। এরপর তিনি আবার বললেন, মদ পান করার কারনে মর্যাদা বিনষ্ট হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ জানার পর দুই বার বললেন, আবু বকর সত্যিই বলেছেন। এ হাদিসটি সনদ ও পাঠকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গারীব।

তার আকৃতি

আয়েশা (রাঃ) থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, তার চেহারার রং উজ্জ্বল ছিলো। তার অবয়বে রগ দেখা যেতো। দৃষ্টি সবসময় নিচে থাকতো। কপাল বুলন্দ ছিল। আঙ্গুলের জোড়াগুলো ফাঁকা ছিলো। তিনি মেহেদী ব্যবহার করতেন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরতের সময় আবু বকর সিদ্দীক ছাড়া সাদা কালো মিশ্রিত দাড়ি কারো ছিলো না। এ জন্য তিনি মেহেদী ও কাসাম (লাল বর্ণের ফুলবিশেষ) দিয়ে চুলে কলব করতেন।

ইসলাম গ্রহণের বিবরন

আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে তিরমিযি আর ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, খিলাফত সম্পর্কে বাকবিতন্ডার সময় আবু বকর (রাঃ) বলেন, খিলাফতের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে বেশী হকদার নই কি ? আমি কি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিনি ? আলি (রাঃ) বলেন, সর্বপ্রথম আবু বকর সিদ্দীক ইসলাম গ্রহন করেন। এটি ইবনে আসাকির কতৃক বর্ণিত।

যায়েদ বিন আরকাম বলেন, হজরত আবু বকর (রাঃ) সর্বপ্রথম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছেন।

ইবনে সাদ বলেন, আবু বকর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

শা'বী বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, সর্বপ্রথম কে মুসলমান হয়েছে ? তিনি বললেন, আবু বকর, আর তুমি কি হাসসানের কবিতা শোননি ? (কবিতার অর্থ) তুমি যখন কোন ভালো মানুষের অবদান স্মরণ করবে, তখন আবু বকরের আবদান স্মরণ করো। তিনি জগত বিখ্যাত পরহেযগার, ন্যায়পরায়ণ ও সংযমী। নিজ প্রচেষ্টায় লোকদের পবিত্র করেছেন। তিনি আল্লাহ'র প্রতি নির্ভরশীল। হেরা গুহায় নিজ নেতার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেবাকারী। তিনি সর্বপ্রথম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যায়িত করেছিলেন। এটি তাবারানি কতৃক বর্ণিত হয়েছে।

মাইমুন বিন মিহরানকে ফুরাত বিন সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কাছে হযরত আলি না হযরত আবু বকর - কে বেশী উত্তম ? এ কথা শুনে মাইমুন রেগে গেলেন। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, এ মুহূর্তে জীবিত আছি কিনা। কারন এটা তো উভয়কে পরীক্ষা করার সময়। দুজনই মহান আর ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। এরপর প্রশ্ন করা হলো, কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, হজরত আবু বকর না হযরত আলি ? তিনি বললেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) বুহাইরা পাদ্রীর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর হযরত খাদিজা (রাঃ) এর বিয়ের ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন, সে সময় হযরত আলির জন্মই হয়নি। (আবু নুয়াইম)

অনেক সাহাবা ও তাবেঈনের অভিমত হচ্ছে, হজরত আবু বকর সকল সাহাবার পূর্বে ঈমান এনেছেন। কেউ কেউ বলেন, হযরত খাদিজা সর্বপ্রথম মুসলমান হয়েছেন। উভয় অভিমতকে এভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম মুসলমান হয়েছে পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রাঃ), তরুণদের মধ্যে আলি (রাঃ) আর নারীদের মধ্যে খাদিজা (রাঃ)। এ সুন্দর সমন্বয়টি সাধন করেছেন ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)।

মুহাম্মাদ বিন হানাফি (রাঃ) কে সালেম বিন জাদ জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর কি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন ? তিনি বললেন, না। প্রশ্ন করা হলো, তবে কেন তিনি এতো প্রসিদ্ধতা লাভ করলেন ? তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল মুসলমান থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ। এটি ইবনে আবি শাইবা (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত।

মুহাম্মাদ বিন সাদ তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকরই কি প্রথম ঈমান এনেছেন ? তিনি বললেন, না, তবে তার ঈমান আমাদের সবার চেয়ে উত্তম ছিল। তার পূর্বে পাঁচ জনেরও বেশী ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এটি ইবনে আসাকির কর্তৃক বর্ণিত।

ইবনে কাসির (রহঃ) বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেন আহ্‌লে বাইত, অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীন খাদিজাতুল কুবরা, তার গোলাম যায়েদ, যায়েদের স্ত্রী উম্মে আইমান, আলি আর ওয়ারাকা।

আবু বকর (রাঃ) বলেন, একবার আল্লাহ'র ঘরের কাছে যায়েদ বিন আমরকে নিয়ে বসেছিলাম। এমন সময় উমাইয়া বিন আবি সালাতের আগমন ঘটলো। কুশলদী বিনিময়ের পর বললেন, তোমরা কিছু শুনেছো ? যায়েদ বললেন, না তো। তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন, কবিতার সারাংশ এমন - আল্লাহ'র ধর্ম ছাড়া সব ধর্মই বিলুপ্ত হবে। এরপর উমাইয়া বললেন, আমরা যে নবীর অপেক্ষা করছি, তিনি আমাদের মধ্য থেকে হবেন, নাকি তোমাদের মধ্য থেকে ? আমি এর আগে নবী সম্পর্কে কখনোই শুনিনি। এজন্য আমি ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে গেলাম। তিনি আসমানি গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান রাখতেন। তার মুখ থেকে এমন জ্ঞান সুলভ কথা বের হতো, যা সহজে বুঝে আসতো না। আমি তার কাছে বসলাম আর সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, আমি অধিকাংশ ঐশী গ্রন্থ অধ্যয়নে জেনেছি যে, সম্মানিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরবের অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। তুমি তো আরবের অভিজাত বংশোদ্ভূত। সুতরাং তোমাদের বংশেই তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুভাগমন ঘটবে। আমি বললাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি শিক্ষা দিবেন ? ওয়ারকা বললেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যাচার করতে নিষেধ করবেন। সুতরাং যে সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব হয়, সাথে সাথে আমি তাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যায়ন করি। এটি ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি যখন ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, সবার অন্তরে কিছু না কিছু সন্দেহ এসেছে। কিন্তু আবু বকর সিদ্দীককে যখন আমি ইসলামের প্রতি আহবান করলাম, তখন তিনি যে কোন চিন্তা ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেন।

বায়হাকি বলেছেন, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নবুওয়তের প্রমাণপঞ্জি ইসলামের দাওয়াত প্রদানের আগেই বুঝতে পেরেছিলেন আর তা শোনামাত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। কারন তিনি আগেই চিন্তা- ভাবনা করেছিলেন। চিরসত্য হলো, প্রত্যেকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক জাহেলিয়াতের যুগেই সিদ্দীক ছিলেন, যেমনটি ইসলামের যুগে ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি যাকেই মুসলমান হওয়ার জন্য বলেছি, সে-ই আমার কথাকে পুনরাবৃত্তি করেছে আর দলীল চেয়েছে। কিন্তু কুহাফার পুত্রকে (আবু বকর) আমি ইসলামের গ্রহণ করতে বললে তিনি সাথে সাথে তা গ্রহণ করেন।

আবু দারদা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারি (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি আমার বন্ধুকে ত্যাগ করবে ? তিনি সেই ব্যক্তি। যখন আমি বললাম - আমি আল্লাহ'র রাসুল, আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমাদের হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন; তখন তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো, (কিন্তু) সে সময় আবু বকর আমাকে সত্যায়ন করেছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য ও যুদ্ধসমূহ

ওলামায়ে কেরামগণ বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঈমান গ্রহণ থে কে মৃত্যু অবধি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য ছাড়েন নি। তবে হাজ্জ ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতিক্রমে সাহচর্য থেকে পৃথক হয়েছেন। তিনি সকল যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরত করেছেন, পরিবার পরিজন ছেড়ে গারে সাওরে থেকেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন -

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّـهَ مَعَنَا

"তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন দু'জনের মধ্যে একজন - যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি নিজের সাথীকে (অর্থাৎ, আবু বকরকে) বললেন - বিষণ্ন হবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।" (সূরাহ আত- তাওবাহ, ৯ : ৪০)

ওলামায়ে কেরামগণ বলেন, যুদ্ধের ময়দানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ত্যাগ করে, বিশেষত উহুদ ও হুনায়নের যুদ্ধে যখন সকলেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ত্যাগ করে পালিয়েছিলেন, এ সময়ও তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই ছিলেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে ফেরেশতারা পরস্পরে বলাবলি করছিলো যে, ওই দেখো, হযরত আবু বকর ছাউনির নিচে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন। (ইবনে আসাকির)

হযরত আলি (রাঃ) থেকে আবু ইয়ালা, হাকিম ও আহমাদ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আর আবু বকর (রাঃ) কে বললেন, তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনের সাহায্য জিবরাঈল (আঃ), অপরজনের সাহায্য মিকাইল (আঃ) করছেন।

ইবনে আসাকির বলেন, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রাঃ) মুশরিকদের সাথে বদর যুদ্ধে গিয়েছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর আব্দুর রহমান তার পিতাকে বললেন, বদর যুদ্ধে কয়েকবার আপনি আমার তীরের আওতায় পড়েছিলেন, কিন্তু আমি নিজের হাত গুটিয়ে নিয়েছি। আবু বকর (রাঃ) বললেন, যদি তুমি আমার নিশানার মধ্যে এসে যেতে, তবে আমি কখনোই ছাড়তাম না।

বীরত্ব

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সব সাহাবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুর ছিলেন। হযরত আলি (রাঃ) একদিন বললেন, হে লোকসকল, আমাকে বলুন তো, কোন ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ? লোকেরা বললো, আপনি। তিনি বললেন, আমি সবসময় নিজের শক্তি দিয়ে লড়াই করেছি, এটি কোন বীরত্ব নয়। আপনারা সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের কথা বলুন। লোকেরা বললো, আমাদের জানা নেই। হযরত আলি (রাঃ) বললেন, সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। বদর যুদ্ধে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ছাউনি তৈরি করেছিলাম। আমরা পরামর্শ করলাম যে, সেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তার জন্য কে থাকবে। আল্লাহ'র কসম, আমাদের কারো সাহস হয়নি। কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আর কাউকে সেখানে ভিড়তে দেননি। যদি কেউ তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে তো তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

আলি (রাঃ) বলেছেন, একদিন মক্কার মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামকে টানাহেঁচড়া করছিলো আর বলছিলো, তুমিই এক ইলাহের (ব্যাপারে) দাবী করছো ? আল্লাহ'র কসম! কারো সাহস ছিলো না যে, এ অবস্থায় সে মুশরিকদের মোকাবিলা করবে। কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মুশরিকদের মেরে ছত্রভঙ্গ করেন আর ধাক্কা দিয়ে ফেলে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যান আর বলতে থাকেন, আফসোস, শত আফসোস, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চেয়েছিলে, যিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন - আমার প্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয়। এ পর্যন্ত বলে আলি (রাঃ) চাদর উঠিয়ে কাঁদতে লাগলেন আর তার দাড়ি ভিজে গেলো। এরপর তিনি বললেন, বলো, ফেরাউনের যুগের মুমিন শ্রেষ্ঠ, না আবু বকর ? লোকদের নীরব থাকতে দেখে তিনি নিজেই বললেন, তোমরা কেন উত্তর দিলে না ? আল্লাহ'র কসম, আবু বকরের এক মুহূর্ত তাদের হাজার ঘণ্টা থেকেও উত্তম। কারন তারা নিজেদের ঈমান গোপন করে রেখেছিলো, আর আবু বকর (রাঃ) নিজের ঈমানের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন। (বাযযার)

উরওয়া বিন যুবাইর বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আসকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বেশী কষ্ট কিভাবে দেওয়া হয়েছিলো ? তিনি বললেন, আমি দেখলাম যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযরত অবস্থায় উকবা পিছন থেকে এসে গলায় চাদর পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে। এমন সময় আবু বকর (রাঃ) সেখানে এসে উকবাকে সরিয়ে দেন আর বলেন, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ও অদ্বিতীয় প্রভুর আওয়াজ তুলেছেন। বস্তুত, তিনি আল্লাহ'র কাছ থেকে দলীলসহ প্রেরিত হয়েছেন। (বুখারি)

ইবনে তালিব বলেছেন যে, আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে সবাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে পালিয়ে গেলে আমি তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে ছিলাম। সে সংকটময়

পরিস্থিতিতে যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেফাজত করার জন্য এগিয়ে আসেন, তিনি হলেন আয়েশা (রাঃ)।

আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আটত্রিশ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করলে আবু বকর (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেকে বললেন, আপনি ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণা দিন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাদের দল এখনো যথেষ্ট ছোট। আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বারবার একই কথা বলতে থাকেন। অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য দ্বীনের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। ফলে লোকেরা মসজিদের চারদিকে গোত্র-গোত্রভাবে এলোমেলো হয়ে যায়। আবু বকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দেন আর লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। মুশরিকরা তাকে আক্রমণ করে আর এজন্য লোকদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। (ইবনে আসাকির)

আলি (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, যখন আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখনই তিনি ইসলামকে প্রকাশ করে দিয়েছেন আর লোকদেরকে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আহবান করেছেন।

দানশীলতা

সকল সাহাবার মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশী দানশীল হলেন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। আল্লাহ তাআলা বলেন –

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ (١٨)

“যে (আল্লাহকে) বেশী বেশী ভয় করে তাকে আমি (এ থেকে) বাঁচিয়ে দিবো, যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য (আল্লাহ’র পথে অর্থ-সম্পদ) ব্যয় করেছে।” (সূরাহ আল-লাইল, ৯২ : ১৭-১৮)

ওলামায়ে কেরাম একমত যে, এ আয়াত তার শানে নাযিল হয়েছে । (ইবনে জাওযী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আবু বকরের সম্পদ আমার যতটুকু উপকার করেছে, আর কারো সম্পদ ততটুকু করেনি। আবু বকর (রাঃ) খুবই বিনয়ের সাথে বলেছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি আর আমার সব সম্পদ আপনার। এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

আয়েশা (রাঃ) এর অপর হাদিসটি এমনই। তবে সে হাদিসে এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সম্পদের মতো নিজ সম্পদ মনে করে আবু বকরের সম্পদ খরচ করেছেন। (খতীব)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইসলাম গ্রহণের সময় আবু বকরের কাছে চল্লিশ হাজার দিরহাম বা দিনার ছিলো। তিনি এগুলো সম্পূর্ণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ব্যয় করেছেন। (ইবনে আসাকির)

ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের সময় আবু বকরের কাছে চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিলো। আর হিজরতের সময় পাঁচ হাজারের বেশী ছিলো না। বাকি অর্থ তিনি ইসলামের সাহায্য আর মুসলমান গোলাম কিনে আযাদ করার পিছে ব্যয় করেছেন। (ইবনে সাইদ)

আয়েশা (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রাঃ) এমন সাতজন গোলামকে কিনে আযাদ করে দিয়েছেন, যাদের মালিক তাদের উপর অত্যাচার করতো।

ইবনে উমর বলেছেন, একদিন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। আবু বকর (রাঃ) জুব্বা পড়ে দরবারে এলেন - যে জুব্বায় বোতামের পরিবর্তে কাঁটা ব্যবহার করা হয়েছিলো। এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবু বকর সিদ্দীক কাঁটা জড়ানো জুব্বা পড়ে এসেছেন, আজ এ ব্যতিক্রম কেন ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে জিবরাঈল, মক্কা বিজয়ের আগে আমার জন্য তার সকল সম্পদ ব্যয় করে দিয়েছেন। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলা আবু বকরকে সালাম জানিয়েছেন আর বলেছেন, হে আবু বকর, আমার জন্য যে দারিদ্রতা গ্রহণ করেছো, এতে কি তুমি সন্তুষ্ট ? আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। এটি ইবনে আসাকির প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসের সনদ খুবই দুর্বল। এ ধরণের দুর্বল বর্ণনা অনেক রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এক বর্ণনায় আছে, জিবরাঈল (আঃ) কাঁটাযুক্ত জুব্বা পড়ে নাযিল হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে জিবরাঈল, এটা কেমন রীতি ? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আবু বকরের মতো পোশাক পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ বর্ণনাটিও খুব দুর্বল, যদিও তা অনেক লোক বর্ণনা করেছেন। তবে এ ধরণের বর্ণনাকে পরিহার করে চলাই উত্তম। এটি খতীব বর্ণনা করেছেন।

উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন, একদিন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনলাম, আমি কিছু মাল গ্রহণ করবো। উমর (রাঃ) বলেন, এটা শুনে আমি পূর্ণ অভিপ্রায় গ্রহণ করলাম যে, আবু বকরের চেয়ে আমি এবার বেশী সদকা করবো। এ জন্য আমার ধনসম্পদের অর্ধেকাংশ নিয়ে হাজির হলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিবারের জন্য কতটুকু রেখে এসেছো? আমি বললাম, যতটুকু এনেছি। এমন সময় আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাযির হলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, নিজ পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো ? তিনি বললেন, তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যথেষ্ট। আমি তখন বুঝলাম যে, আমি তার সমকক্ষ নই। (আবু দাউদ ও তিরমিযি কর্তৃক বর্ণিত)

হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, একবার আবু বকর (রাঃ) সদকার মাল নিয়ে এসে তার পরিমাণ গোপন রেখে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এগুলো আমার সদকা। আল্লাহ'র কসম, আপনার প্রতিপালক আমার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। আর উমর (রাঃ) সদকার মাল এনে তার পরিমাণ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আপনার রবের সাহায্যই যথেষ্ট। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের দুই জনের সদকার মধ্যে পার্থক্য এতটুকু, যতটুকু পার্থক্য উভয়ের কথার মধ্যে। আবু নুয়াইম এটি বর্ণনা করেন, এর সনদ সুন্দর।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উপর কারো অনুগ্রহ নেই, সকলের উপকারের প্রতিদান দিয়েছি। কিন্তু আবু বকরের দয়ার প্রতিদান এখনো বাকি রয়ে গেছে। তার অনুগ্রহ এতোই বিশাল যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এর প্রতিদান দিবেন। কোন সম্পদ আমাকে ততটুকু লাভবান করতে পারেনি, যতটুকু আবু বকরের সম্পদ করেছে। (তিরমিযি)

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেছেন, একদিন আমার পিতাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ নবী করীম আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি বৃদ্ধকে কষ্ট দিয়ে কেন নিয়ে এলে ? আমি যেতাম। আমি বললাম, আপনাকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে তার আসাটাই শ্রেয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহ, তাতে তোমার পিতাকে কষ্ট দেওয়া আমার জন্য সহনযোগ্য নয়। (বাযযার)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার প্রতি আবু বকরের চেয়ে বেশী অনুগ্রহ কারো নেই। তিনি নিজের জীবন দিয়ে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছেন আর নিজের মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন।

ইলম (জ্ঞান)

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম (জ্ঞানী) আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম নববি তাহযিব গ্রন্থে লিখেছেন, ওলামায়ে কেরাম হযরত আবু বকরের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের উপর ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের একটি হাদিস দিয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ'র কসম, কেউ যদি নামায ও রোযার মধ্যে সামান্যতমও তারতম্য করে, তবে আমি তার সাথে লড়াই করবো। তারা আমাকে দুর্বল ভেবেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তারা যতটুকু যাকাত আদায় করেছে, যদি তারা এর চেয়ে তিল পরিমাণ কম করে, আমি তাদের মোকাবেলা করবো।

শায়খ আবু ইসহাক এ হাদিস দিয়ে দলীল দেন যে, আবু বকর (রাঃ) সর্বাধিক জ্ঞানী আর সবচেয়ে বড় আলেম। কারন সাহাবায়ে কেরাম যখন এ মাসআলা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন, তখন মাসআলাটি আবু বকর

(রাঃ) এর খেদমতে এ মর্মে পাঠানো হয় যে, আপনার অভিমতটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে পরিশুদ্ধ হিসেবে সাহাবাগণ গ্রহণ করবেন।

ইবনে উমরকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কে ফতোয়া দিতেন ? তিনি বললেন, আবু বকর (রাঃ) আর উমর (রাঃ) এর চেয়ে বড় আলেম আর কেউ ছিলেন না।

আবু সাইদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুৎবার মধ্যে বললেন, আল্লাহ তাআলা তার এক নেককার বান্দাকে দুনিয়া বা আখিরাত উভয়ের যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার দিয়েছেন। আর সেই বান্দা আখিরাতকে পছন্দ করেছেন। এটা শুনে আবু বকর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন আর বললেন, আমার পিতামাতা তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি কুরবান হোক। আমরা তার কান্নায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কারন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃশ্যত এক ব্যক্তির কথা বলেছেন। আর সেই এক ব্যক্তি যে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি, কিন্তু আবু বকরের জ্ঞান ভাণ্ডারে তা ধরা পড়েছে। এ কারনে তিনি সবচেয়ে বড় আলেম ও জ্ঞানী। (বুখারি, মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে আবু বকরের সম্পদ আর সাহচর্য আমার উপর সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছে। যদি আল্লাহ ছাড়া আমি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি, তবে তিনি আবু বকর। ইসলামের প্রতি তার সত্যিকারের ভালোবাসার কথা সবসময় আমার অন্তরে বিদ্যমান থাকবে। (নববি)

ইবনে কাসির (রহঃ) বলেন, আল্লাহ'র কালাম সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল সবচেয়ে বেশী। কারন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নামাযের জন্য সাহাবীদের ইমাম বানিয়েছিলেন। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো নিজেই বলেছেন, জাতির ইমাম সে- ই হবে, যার জ্ঞান ভাণ্ডার কুরআনের জ্ঞানে সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ। অধিকন্তু, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন, যে সম্প্রদায়ে আবু বকর রয়েছে, সেখানে তিনি ছাড়া কেউ ইমাম হতে পারবে না। এ হাদিসটি তিরমিযি বর্ণনা করেছেন।

একইভাবে, হাদিসের উপরও তার বিরাট দখল ছিল। সাহাবাগণ হাদিস সম্পর্কে অধিকাংশ বিষয়ে তার মুখাপেক্ষী থাকতেন। সবসময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস তার সামনে পেশ করা হতো। কারন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস ভাণ্ডার মনে রাখতেন আর জরুরী মুহূর্তে বিষয়াদি তার সমীপেই উপস্থাপন করা হতো। তিনি সর্বাধিক হাদিসের হাফেজ ছিলেন। কারন রিসালাতের ঊষালগ্ন থেকে মৃত্যু অবধি তিনি সবসময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকতেন। তার মুখস্ত শক্তি ছিল খুবই প্রখর। তিনি ছিলেন জ্ঞানবান ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি।

আবু বকর (রাঃ) থেকে খুবই কম সংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে - এ কথাটি বেদনাদায়ক, আর এটা বিস্ময়ের জন্ম দেয়। কম হাদিস বর্ণনা করার কারন হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তিনি খুব সামান্য ক'দিন বেঁচেছেন। যদি লম্বা সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতেন, তবে তার বর্ণনা সকল সাহাবার চেয়ে বেশী

হতো আর আবু বকরের সনদ ছাড়া কোন হাদিস পাওয়া যেতো না। হাদিস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আবু বকরের জন্য অন্য সাহাবীর সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হতো না। এ জন্য যে, তিনি সবসময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকতেন আর হাদিস শুনতেন। সুতরাং তিনি নিজেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন। তবে এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, আবু বকর (রাঃ) অন্য সাহাবীর থেকে কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন, এটা কেন ? তিনি নিজে যা শোনেননি, তা শুনে নিয়ে বর্ণনা করেছেন।

মাইমুন বিন মেহরান (রহঃ) বলেছেন, আবু বকরের কাছে কোন বিচার আসলে এ সংক্রান্ত মাসআলা কুরআন শরীফে অনুসন্ধান করতেন আর কুরআন শরীফের নির্দেশিত পথে ফয়সালা করতেন। যদি কুরআন শরীফে সমাধান না পেতেন, তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস অনুযায়ী ফয়সালা করতেন। যদি এ সংক্রান্ত কোন হাদিস তার মনে না থাকতো, তবে বাইরে এসে লোকদের জিজ্ঞেস করতেন, আমার কাছে এ ধরণের বিচার এসেছে, আপনাদের মধ্যে কেউ কি জানেন এ ধরণের বিচারের প্রেক্ষিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সমাধান দিয়েছেন ? তার কাছে সব সাহাবী একত্রিত হতেন আর যদি কেউ এ সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করতেন, তবে এ অনুযায়ী তিনি ফয়সালা করতেন আর খুশী হয়ে আল্লাহ'র শোকর আদায় করতেন - আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছেন, যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস মনে রেখেছেন। যদি হাদিসেও সমাধান পাওয়া না যেতো, তবে তিনি বড় বড় সাহাবীদের একত্রিত করে পরামর্শ করতেন, অধিকাংশ অভিমতের উপর তিনি ফয়সালা দিতেন। উমর ফারুক (রাঃ) ও সেটাই করতেন।

আবু বকর (রাঃ) আরবের সাধারণ ও কুরাইশদের বিশেষ বংশ পরম্পরা সম্পর্কে দারুণভাবে জানতেন। আরব ও কুরাইশ বংশ পরম্পরা বিশেষজ্ঞ জুবায়ের বিন মুতঈম (রহঃ) বলেন, আমি বংশ পরম্পরার জ্ঞান আবু বকর (রাঃ) এর কাছ থেকেই নিয়েছি। তিনি আরবের এক বিশিষ্ট বংশ পরম্পরা বর্ণনাকারী। তার স্বপ্নের ব্যাখ্যাজ্ঞান ছিল অগাধ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। মুহাম্মাদ বিন সিরিন (রহঃ) স্বপ্নের একজন বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আবু বকর (রাঃ) সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাকারক।

সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে আবু বকর সিদ্দিকের কাছ থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (দাইলামি)

ইবনে কাসির (রহঃ) বলেছেন, আবু বকর (রাঃ) সবচেয়ে বেশী বাকপটু ও বাগ্মী ছিলেন। তিনি খুব সুন্দর করে বক্তৃতা দিতে পারতেন। যুবাইর বিন বাকার বলেন, আমি ওলামাদের কাছ থেকে শুনেছি যে, সবচেয়ে বড় বাগ্মী ছিলেন আবু বকর (রাঃ) আর আলি (রাঃ)। তিনি আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আল্লাহ'র ভয় আর বাগ্মীতা পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম হওয়ার ক্ষেত্রে সুলেহ হুদায়বিয়ার হাদিস দিয়ে দলীল পেশ করা হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে উমর (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন,

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) তার জবাবও দেন। এরপর উমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) এর কাছে গিয়ে একই প্রশ্ন করেন। আবু বকর (রাঃ) হুবহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরগুলো আবার প্রদান করেন। (বুখারি) এজন্য তাকে সর্বোত্তম জ্ঞানী বলা হয়।

ইবনে আস প্রমুখ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জিবরাঈল আমাকে বলেছেন, আল্লাহ তাআলার হুকুম – আমি যেন আবু বকরের সাথে পরামর্শ করি। (তামামুর রাযী)

মাআয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, আমাকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় মজলিসে শুরা গঠন করা হয়। এতে আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, উসাইদ বিন হাযীর উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নিজ নিজ মতামত পেশ করেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মত জানতে চাইলে আবু বকরের অনুরূপ মত ব্যক্ত করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু বকর ভুল করুক - এটা আল্লাহ তাআলা চান না। হাদিসটি তাবারানি বর্ণনা করেছেন। ইবনে উসামার বক্তব্য এ ধরণের – আসমানে আল্লাহ'র অভিপ্রায় এটা নয় যে, জমিনে আবু বকর ভুল করবে। এটিও তাবারানি বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম নববি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সাহাবীদের মধ্যে অনন্য হাফেজে কুরআন ছিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আনসারদের চার সাহাবী কুরআনকে একত্রিত করেছেন। আবু দাউদ শাবী বলেন, আবু বকরের মৃত্যু পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ জমা হয়নি – এ কথাটি পরিত্যাজ্য; অথবা কথাটিকে এভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে - উসমান (রাঃ) যে পদ্ধতিতে কুরআনকে সন্নিবেশিত করেছেন, সেভাবে জমা করা হয়েছিলো না।

তিনি সকল সাহাবা থেকে উত্তম

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সকল ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সব উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলেন আবু বকর (রাঃ), এরপর উমর (রাঃ), এরপর উসমান (রাঃ), এরপর আলি (রাঃ), এরপর আশরায়ে মুবাশশারা, এরপর আহলে বদর, এরপর আহলে উহুদ, এরপর আহলে বাইত, এরপর সকল সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

আবুল মনসুর বাগদাদী একটি ইজমা বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, আমরা পরস্পরে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে সাহাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম হিসেবে গণ্য করেছি, এরপর উমর (রাঃ) কে, এরপর

উসমান (রাঃ) কে। এ হাদিসটির শেষে তাবারানী এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, এ কথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনার পরও তা অপছন্দ করেননি।

ইবনে উমর থেকে ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, আমাদের মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থাকা অবস্থায় আমরা সাহাবীদের মধ্যে আবু বকরকে সর্বোত্তম মনে করতাম। এরপর উমর (রাঃ) কে, এরপর উসমান (রাঃ) কে, এরপর আলী (রাঃ) কে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আমরা অসংখ্য সাহাবী পরস্পরের মধ্যে এ কথা বলতাম যে, এ উম্মতের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর, এরপর উমর, এরপর উসমান; এরপর আমরা নীরব হতে যেতাম। (ইবনে আসাকির)

জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার উমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) কে "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি" বলে সম্বোধন করেন। আবু বকর তাকে বললেন, আপনি নিজেকে বাদ দিলেন কেন ? আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, উমর থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর সূর্য কখনো উদিত হয় না। (তিরমিযি)

মুহাম্মদ বিন আলি বিন আবু তালিব (রাঃ) বলেছেন, আমি আমার পিতা হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কে সর্বোত্তম ? তিনি বললেন, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। আমি বললাম, তারপর ? তিনি বললেন, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। আমি বললাম, তারপর ? তিনি বললেন, উমর (রাঃ)। এরপর উসমান (রাঃ) এর নাম নিতে গিয়ে তিনি ভয় করলেন। এরপর বলা হলো, তারপর আপনিই কি সর্বোত্তম ? তিনি বললেন, আমি আবার এমন কি ? আমি একজন সাধারণ মুসলমান। (বুখারি)

আহমদ (রহঃ) বলেন, আলী (রাঃ) এর কয়েকটি মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, এ উম্মতের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আবু বকর হলেন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। রাফেযীদের উপর আল্লাহ'র অভিশাপ অবতীর্ণ হোক, তারা নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে ফেঁসে গেছে।

উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আবু বকর আমাদের নেতা, তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি আমাদের মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। (তিরমিযি)

একবার উমর (রাঃ) মিম্বরে উঠে বললেন, এ উম্মতের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর (রাঃ)। যে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে অপবাদ দিবে, তার অপবাদকারীর গুনাহ হবে। (ইবনে আসাকির)

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আর উমর ফারুক (রাঃ) থেকে আমাকে যে প্রাধান্য দিবে, আমি তাকে আশিটি চাবুকাঘাত করবো। (ইবনে আসাকির)

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নবী ছাড়া কোন ব্যক্তি এমন নেই, যার উপর সূর্য উদিত ও অস্ত যায় এবং তিনি আবু বকর থেকে উত্তম।

এক বর্ণনায় আছে, নবী ও রাসূলদের পর আবু বকরের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই।

জাবের (রাঃ) এর হাদিস, কারো উপর সূর্য উদিত হয় না যে, আবু বকর থেকে শ্রেষ্ঠ হয়। (তাবারানী) এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত। ইবনে কাসির সে দিকেই ইশারা করেছেন।

সালমা বিন আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নবীর পর লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর।

সাদ বিন যেরারাহ বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জিবরাঈল আমাকে এ সংবাদ জানিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে আমার পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর। (তাবারানী)

আমর বিন আস (রাঃ) বলেছেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, লোকদের মধ্যে আপনার প্রিয়তম ব্যক্তি কে ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আয়েশা সিদ্দিকা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তার পিতা আবু বকর। আমি বললাম, তারপর ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, উমর। (বুখারী, মুসলিম) ইমাম তিরমিযী বলেন, এক বর্ণনায় উমরের নাম নেই।

আবদুল্লাহ বিন শাকিক থেকে হাকিম বর্ণনা করেন, আমি আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় কে ? তিনি বললেন, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। আমি বললাম, তারপর ? তিনি বললেন, আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রাঃ)।

আনাস (রাঃ) বলেছেন, আবু বকর (রাঃ) আর উমর (রাঃ) এর শানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তার দু'জনে পয়গম্বরগণ ছাড়া জান্নাতে সকল মানুষদের সর্দার হবেন। আলি (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে উমার (রাঃ), আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) আর জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি আবু বকর (রাঃ) আর উমর (রাঃ) এর উপর সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে সে যেন আনসার আর মুহাজিরদের প্রতি অত্যাচার করলো আর অপবাদ দিলো। (তাবারানী)

যুহরি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসসান বিন সাবিতকে বললেন, তুমি আবু বকরের শানে কোন কবিতা রচনা করো নি ? তিনি বললেন, করেছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবৃত্তি করে শোনাও, আমি শুনবো। তিনি আবৃত্তি করলেন (যার অর্থ) – "আবু বকর তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুহার সাথী। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন পর্বত

শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন, তখন শত্রুরা তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চারদিকে ঘুরছিল। পৃথিবীর যতো প্রেম ভালোবাসা, তিনি নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি নিবেদন করেছেন। পৃথিবীতে আর কেউ তাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতটুকু ভালোবাসেননি।" এ কবিতা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন আর বললেন, হাসসান, তুমি সত্যিই বলেছো। তিনি এমনটাই। (ইবনে সাদ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেহেরবান আবু বকর, সবচেয়ে বেশী কঠোর উমর, খুবই লজ্জাশীল উসমান, সবচেয়ে বেশী হালাল হারাম সম্পর্কে অবগত মুআয বিন জাবাল, উত্তরাধিকার আইনবেত্তা যায়েদ বিন সাবিত, সবচেয়ে বড় ক্বারি উবাই বিন কাব; সকল উম্মতে একজন বিশ্বাসী লোক থাকেন, আমার উম্মতের বিশ্বাসী ব্যক্তি আবু উবায়দা বিন জাররাহ। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

এ হাদিসটি ইবনে উমর এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন, সর্বোত্তম বিচারক আলী। (আবু ইয়ালা) শাদ্দাদ বিন আউস এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন, সর্বাধিক ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আবু যর। সবচেয়ে বেশী ইবাদতকারী ও মুত্তাকী আবুদ দারদা, আর সবচেয়ে বেশী সহনশীল ও ধৈর্যশীল মুয়াবিয়া। (দাইলামী)

কুরআনের আয়াত দিয়ে আবু বকর (রাঃ) এর প্রশংসা ও সত্যায়নের বিবরণ

আমি এ বিষয়ে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছি আর একটি প্রণিধানযোগ্য গ্রন্থও লিখেছি। সেই পদ্ধতি অনুসারে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّـهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّـهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

"তিনি (রাসুলুল্লাহ) ছিলেন দু'জনের মধ্যে একজন - যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি নিজের সাথীকে (অর্থাৎ, আবু বকরকে) বললেন - বিষণ্ন হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন। এরপর আল্লাহ তার উপর তার প্রশান্তি নাযিল (করে তাকে সাহায্য) করলেন ..." (সূরাহ আত- তাওবাহ, ৯ : ৪০)

মুসলিম জাতি এ বিষয়ে একমত যে, উল্লেখিত আয়াতে صَاحِبِ (সাহিব) শব্দের উদ্দেশ্য আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। এ ব্যাপারে স্বয়ং আবু বকর (রাঃ) এর বিবরণ শীঘ্রই আসছে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হিজরতের সফরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভরসা হারাননি। সুতরাং صَاحِبِ শব্দ দিয়ে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে বুঝানো হয়েছে। (ইবনে আবি হাতেম)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন, যখন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) উমাইয়া বিন খালফের কাছ থেকে বিলাল (রাঃ) কে একটি চাদর ও চারশত দিরহামের বিনিময়ে কিনে মুক্ত করে দেন, তখন আবু বকরের শানে আর উমাইয়ার ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয় -

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ (٤)

"রাতের শপথ, যখন তা (আঁধারে) ঢেকে যায়; দিনের শপথ, যখন তা (আলোয়) উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো; পুরুষ ও নারী যা তিনি সৃষ্টি করেছেন (তারও শপথ); অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা- সাধনা (হবে) নানামুখী।" (সূরাহ আল- লাইল, ৯২ : ১-৪)

আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেছেন, মক্কী জীবনে আবু বকর (রাঃ) এর নীতি ছিল - যখন কোন দুর্বল ও বৃদ্ধা নারী ইসলাম গ্রহণ করতেন, তখন তিনি তাদেরকে কিনে আযাদ করে দিতেন। একদিন তার পিতা বললেন, হে আমার বৎস, আমি দেখেছি তুমি দুর্বল লোকদের কিনে আযাদ করে দিচ্ছো। এর পরিবর্তে যদি শক্তিশালী ও তরুণদের কিনে আযাদ করে দিতে, তবে তারা বিপদের দিনে তোমার সাহায্য করতে পারতো। তিনি বললেন, বাবা, আমার উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার স্বীকৃতি আর সন্তুষ্টি অর্জন, দুনিয়ায় লাভবান হওয়া আমার কামনা না। এ ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয় -

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (٥)

"অতএব যে (আল্লাহ'র পথে) দান করেছে আর আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে" (সূরাহ আল- লাইল, ৯২ : ৫)

ইবনে জারির এটি বর্ণনা করেছেন।

উরওয়া বর্ণনা করেন, মুসলমান হওয়ার পর যে সাতজন ব্যক্তির উপর অকথ্য নির্যাতনের রোলার চালানো হয়, তাদেরকে কিনে আযাদ করে দেওয়ার প্রেক্ষিতে তার ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয় -

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ (١٨)

"যে (আল্লাহ্‌কে) বেশী বেশী ভয় করে, তাকে আমি (এ থেকে) বাঁচিয়ে দেবো, যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য (আল্লাহ'র পথে অর্থ সম্পদ) ব্যয় করেছে " (সূরাহ আল- লাইল, ৯২ : ১৭- ১৮)

তাবারানী এটি বর্ণনা করেছে।

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতটি আবু বকরের ব্যাপারে নাযিল হয় -

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ (١٩)

"(অথচ) তোমাদের কারোই তার কাছে এমন কিছু ছিলো না, (যার জন্য) তোমাদের কোন রকম প্রতিদান দেওয়া হবে।" (সূরাহ আল- লাইল, ৯২ : ১৯)

বাযযার এটি বর্ণনা করেছেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, কসমের কাফফারা নাযিল না হওয়া পর্যন্ত আবু বকর (রাঃ) কসম ভাঙ্গেন নি। (বুখারী)

আলী (রাঃ) বলেন, وَالَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। আর وَصَدَّقَ بِهِ দিয়ে আবু বকর (রাঃ) উদ্দেশ্য। ইবনে আসাকির বলেন, আলি (রাঃ) এর কেরাত وَالَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ আর ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন - وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ - আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। (হাকিম)

ইবনে শাওজিব থেকে ইবনে হাতেম বর্ণনা করেন, এ আয়াতটি আবু বকর (রাঃ) এর শানে নাযিল হয়েছে -

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

"যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটো উদ্যান।" (সূরাহ আর-রহমান, ৫৫ : ৪৬)

আমার (অর্থাৎ, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতির) আসবাবে নুযুল গ্রন্থে এ হাদিসের সম্পূর্ণ সনদ বর্ণনা করেছি।

ইবনে উমর (রাঃ) এর ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ দিয়ে উমর ফারুক (রাঃ) আর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) উদ্দেশ্য। (তাবারানী, আওসাত)

মুজাহিদ বর্ণনা করেন, إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ - এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবু বকর (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমাকে সম্পৃক্ত না করে আল্লাহ আপনার জন্য কোন আয়াত নাযিল করেননি, শুধু এ আয়াত ছাড়া। এ প্রেক্ষিতে নাযিল হয় -

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

"তিনিই (মহান আল্লাহ, যিনি) তোমাদের উপর অনুগ্রহ (বর্ষণ) করেন, আর তার ফেরেশতারাও (তোমাদের জন্য আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চেয়ে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেন) ..." (সূরাহ আল- আহযাব, ৩৩ : ৪৩)

ইমাম যাইনুল আবেদীন বিন আলী বিন হুসাইন থেকে ইবনে আসাকির নকল করেছেন, আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) ও আলি (রাঃ) এর শানে এ আয়াত নাযিল হয় -

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

"তাদের অন্তরের ঈর্ষা বিদ্বেষ আমি (সেদিন) দূর করে দেবো, তারা একে অপরের ভাই হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি সেখানে অবস্থান করবে।" (সূরাহ আল-হিজর, ১৫ : ৪৭)

আলি (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا (সূরাহ আল- আহকাফ, ৪৬ : ১৫) থেকে وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (সূরাহ আল- আহকাফ, ৪৬ : ১৬) পর্যন্ত আবু বকরের শানে নাযিল হয়েছে।

ইবনে উয়াইনিয়্যা থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানের উপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, কিন্তু এ অসন্তোষ আবু বকরের উপর ছিল না। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত প্রণিধানযোগ্য –

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

"যদি তোমরা তাকে (রাসুলুল্লাহকে) সাহায্য না করো, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিলো, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন।" (সূরাহ আত- তাওবাহ, ৯ : ৪০)

আবু বকর (রাঃ) আর উমর (রাঃ) এর শানে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, একটা চারণভূমিতে একজন রাখাল বকরী চরাতো। একদিন হঠাৎ বাঘ এসে বকরীর পালে আক্রমণ করে আর একটি বকরী ধরে ফেলে। রাখাল বাঘকে তাড়া করে বকরীটি উদ্ধার করলো। বাঘ বললো, সেদিন কি হবে, যেদিন তোমার বকরীর পালের সাথে তুমি থাকবে না, অথচ আমি থাকবো। একজন ব্যক্তি মাল বোঝাইকৃত বলদকে নিয়ে যায়। বলদ আমাকে দেখে বললো, আমি বোঝা বহন করার জন্য জন্ম নেইনি, আমার জন্ম ক্ষেতে কাজ করার জন্য। উপস্থিত জনতা আশ্চর্য হয়ে গেলো। তারা বললেন, বলদ কথা বলতে লাগলো! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার সাথে এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন আবু বকর আর উমর। সে সময় সেখানে তারা দু'জন উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তাদের বিশ্বাসের প্রতি ভরসা রাখার ব্যাপারে তাকীদ দিলেন।

আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন কোন নবী নেই, যার দু'জন মন্ত্রী আকাশে আর দু'জন যমিনে আছে। আমার আকাশের দুই মন্ত্রী জিবরাঈল ও মিকাইল, আর যমিনের দুই মন্ত্রী আবু বকর ও উমর।

সাইদ বিন যায়েদ থেকে আসহাবে সুনান প্রমুখ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী জান্নাতি। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাকি আশরায়ে মুবাশশারাগণের নাম উল্লেখ করে বললেন, এরা জান্নাতি।

আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহামনীষীগণ আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। যেমন আবু বকর ও উমর। এ বর্ণনাটি জাবের বিন সামুরা ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন।

আনাস (রাঃ) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আদবের কারনে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে তাকাতেন আর মৃদু হাসতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতেন।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে তিরমিযী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে প্রবেশের সময় তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডানে- বামে আবু বকর ও উমর ছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের হাত ধরে বললেন, আমি কিয়ামতের দিন এভাবে উঠবো। আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বরাত দিয়ে আওসাত গ্রন্থে তাবারানী এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে তিরমিযী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমি উঠবো, এরপর আবু বকর, এরপর উমর।

আবদুল্লাহ বিন হানযালা থেকে তিরমিযী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন, একদিন নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমরকে দেখে বললেন, এরা দু'জন আমার কান ও চোখ। এ হাদিসটি ইবনে উমর ও ইবনে আমর থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন।

আবু আরওয়া আদ্দুওসী থেকে বাযযার ও হাকিম বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আবু বকর ও উমর হাজির হলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সেই আল্লাহ'র শোকর, যিনি তোমাদেরকে আমার সাহায্যকারী বানিয়েছেন। এ হাদিসটি মুররা বিন আযেব (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, তাবারানী এটি বর্ণনা করেছেন।

আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একদিন জিবরাঈল আমীন আমার কাছে আসেন। আমি উমর বিন খাত্তাবের গুণাবলী সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নূহ (আঃ) এর মতো দীর্ঘ জীবন পর্যন্ত যদি উমরের গুণাবলী বর্ণনা করি, তবুও তা শেষ হবে না।

আবদুর রহমান বিন গানাম থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর আর উমরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা দুজনে যে বিষয়ে একমত হবে, সে বিষয়ে আমি দ্বিমত করবো না।

বারা বিন আযেব থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন আর ইবনে সাদ লিখেছেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কে ফতোয়া দিতেন ? তিনি বললেন, সে সময় আবু বকর ও উমর ছাড়া কেউ ফতোয়া দিতেন বলে আমার জানা নেই।

আবুল কাসিম মুহাম্মদ বর্ণনা করেন, ফতোয়ার জন্য লোকেরা আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) এর কাছে যেতেন।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীগণের উম্মতে বিশেষ ব্যক্তি রয়েছেন। আমার উম্মতের বিশেষ ব্যক্তি আবু বকর আর উমর।

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আবু বকরের উপর রহম করুন। কারন নিজ কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন, মদিনা পর্যন্ত আরোহণ করিয়ে আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন আর তাছাড়া বিলালকে আযাদ করেছেন। আল্লাহ তাআলা উমরের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন। তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সত্য কথা বলেন, এ জন্য লোকেরা তার ভয়ে দূরে থাকে আর তার বন্ধু নেই। আল্লাহ তাআলা উসমানের প্রতিও রহম করুন। ফেরেশতাকুল তাকে দেখে লজ্জা করেন। আল্লাহ পাক আলীর উপরও রহম করুন। আল্লাহ তাআলা আলীর সাথে রয়েছেন। (ইবনে আসাকির)

সুহাইল (রাঃ) বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জ থেকে ফিরে এসে মিম্বরের উপর আরোহণ করে বললেন, হে জনতা, আবু বকর আমাকে কখনো কষ্ট দেননি। তোমরা তাকে মনে রেখো। হে জনতা, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট। উপরন্তু উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, সাদ, আবদুর রহমান বিন আউফ প্রাথমিক যুগের মুহাজিরদের উপরও সন্তুষ্ট। (তাবারানী)

ইবনে আবি হাযেম থেকে আবদুল্লাহ বিন আহমদ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি যাইনুল আবেদীন আলী বিন হুসাইন (রাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আবু বকর ও উমরের মর্যাদা কতটুকু ছিল ? তিনি বললেন, সে সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার যতটুকু মর্যাদা ছিল।

বাসতাম বিন মুসলিম থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর আর উমরকে সম্বোধন করে বললেন, আমার পর তোমাদের উপর কোন ব্যক্তি প্রশাসক হতে পারবে না।

আনাস (রাঃ) থেকে মারফুয়ান সূত্রে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, আবু বকর আর উমরকে ভালোবাসা ঈমান, আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরী।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বকর ও উমরের প্রতি ভালোবাসা পোষণ ও তাদের জ্ঞানের পথ অবলম্বন করা সুন্নত।

আনাস (রাঃ) মারফুয়ান বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে আশাবাদী যে, তারা কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" থেকে যেমন পালাবে না। অর্থাৎ, উভয়ের প্রতি আমার উম্মতের অখণ্ড ভালোবাসা অটুকু থাকবে।

আবু বকর (রাঃ) এর শানে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এক জোড়া কোন জিনিস আল্লাহ'র পথে ব্যয় করবে, জান্নাতের সকল দরজা থেকে তাকে আহবান করা হবে। হে আল্লাহ'র বান্দাগণ, এ পথে এসো। এ দরজা খুবই সুন্দর। সুতরাং, যে ব্যক্তি নামাযী, তাকে নামাযের দরজা থেকে; যে ব্যক্তি মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে; যে সদকাকারী, তাকে সদকার দরজা থেকে; রোজাদারকে রোজার দরজা থেকে তার নাম ধরে ডাকা হবে। আবু বকর (রাঃ) বললেন, ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যাকে সব দরজা থেকে আহবান করা হবে। ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কোনো ব্যক্তিকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে কি ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যা, আমি মনে করি যাদের ডাকা হবে তাদের মধ্য থেকে আপনি অন্যতম।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আবু দাউদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে সবচেয়ে বেশী আমাকে অনুগ্রহ করেছেন, তিনি আবু বকর। যদি আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই করতাম। কিন্তু ইসলামের ভাতৃত্বের বন্ধন অটুট। এ হাদিসটি ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, ইবনে মাসউদ, জুনদুব বিন আবদুল্লাহ, বাররা, কাব বিন মালিক, জাবের বিন আবদুল্লাহ, আনাস, উবাই বিন কাব, আবি ওয়াকিদুল লাইসী, আবুল মুয়ালা, আয়েশা, আবু হুরায়রা আর ইবনে উমর (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত।

আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বুখারী বর্ণনা করেছেনঃ একবার আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে বসেছিলাম। আবু বকর (রাঃ) এলেন আর সালাম দিয়ে বললেন, আমার আর উমর বিন খাত্তাবের মধ্যে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে মনমালিন্যতা দেখা দেয়। আমি তার কাছেই বসেছিলাম। আমার মাঝে অনুতাপ এলো আর আমি তার কাছে ক্ষমা চাইলাম, কিন্তু তিনি ক্ষমা করতে অস্বীকার করলেন। এরপর আমি আপনার কাছে এসেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন। এরপর উমর লজ্জিত হয়ে আবু বকরের বাড়িতে যান। কিন্তু সেখানে তাকে না পেয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আসেন। তাকে দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা রাগে রক্তিম হয়ে যায়। এমন অবস্থায় উমর ফারুকের প্রতি আবু বকর সিদ্দীকের দয়া হয়। ফলে তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি তার চেয়ে বেশী অপরাধী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ যখন আমাকে তোমাদের কাছে পাঠান, তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলে। কিন্তু আবু বকর আমাকে সত্যায়িত করেছে, নিজের জীবন আর সম্পদ

দিয়ে সাহায্য করেছে। আজ তোমরা সেই বন্ধুকে বর্জন করছো ? (এ কথাটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইবার উচ্চারন করেন) এ আচরণ কখনোই গ্রহণীয় হতে পারে না।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে ইবনে আদী অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে সে হাদিসে এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে - আমার বন্ধু ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। যে সময় আল্লাহ তাআলা আমাকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠালেন, তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো, আর আবু বকর আমাকে সত্যায়িত করেছেন। যদি আল্লাহ তাআলা তাকে আমার জন্য সাহিব (সহচর) বলে সম্বোধন না করতেন, তবে আমি তাকে খলীল (বন্ধু) বলে ডাকতাম।

মুকতাম থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, আকীল বিন আবু তালিব আর আবু বকরের মধ্যে ঝগড়া হয়। যদিও আবু বকর তার বংশ পরম্পরা সম্পর্কে অবগত ছিলেন যে, আকীলের আত্মীয়তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য তিনি নীরব হয়ে যান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আকিল এ ব্যাপারে নালিশ করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার বন্ধুকে আমার উপর ন্যস্ত করো এবং নিজেদের অবস্থান ও তার শান সম্পর্কে চিন্তা করো। আল্লাহ'র কসম, তোমাদের সকলের দরজা অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু আবু বকরের দরজা আলোকময়। আল্লাহ'র কসম, তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো আর আবু বকর আমাকে সত্যায়িত করেছেন। তোমরা আমার সাথে কৃপণতা করেছো আর আবু বকর আমার জন্য খরচ করেছেন। তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিলে আর আবু বকর আমার আনুগত্য করেছেন।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি গর্ব করে নিজের পরিধেয় কাপড় মাটির সাথে ঝুলিয়ে পড়বে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।" আবু বকর (রাঃ) বললেন, "যদি আমি সবসময় সতর্ক না থাকি তবে আমার পরনের বস্ত্রের একাংশ ঝুলে যায়।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি তো এ কাজ গর্ব করে করো না।"

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কে রোজাদার ?" আবু বকর (রাঃ) বললেন, "আমি।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাযার সাথে গিয়েছে ?" আবু বকর বললেন, "আমি।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কে দুস্থকে অন্ন দিয়েছে?" আবু বকর বললেন, "আমি।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কে রোগীর সেবা করেছো ?" আবু বকর বললেন, "আমি।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যে ব্যক্তির মধ্যে এতগুলো বিষয় একত্রিত হয়েছে, তিনি অবশ্যই জান্নাতী।" আনাস ও আবদুর রহমান বিন আবু বকরও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণনায় এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।"

আবদুর রহমান থেকে বাযযার বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাজ আদায় করে সাহাবীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলেন, "আজ তোমাদের মধ্য থেকে কে রোজা মুখে সকাল পেয়েছো ?" উমর ফারুক বললেন, "আমি আমার ব্যাপারে বলছি, আজ আমি রোজা নেই।" আবু বকর বললেন, "রাতেই রোজার নিয়ত করেছিলাম আর আলহামদুলিল্লাহ, আমি রোজা রেখেছি।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমাদের মধ্যে থেকে আজ কে রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করেছে ?" উমর (রাঃ) বললেন, "আমি তো এখনো মসজিদ থেকেই বের হইনি, রোগীর সেবা আবার কখন করলাম।" সিদ্দীকে আকবর আবু বকর (রাঃ) বললেন, "খবর পেলাম ভাই আবদুর রহমানের (আল্লাহ'র বান্দা) অবস্থা খুবই গুরুতর। ফলে মসজিদে আসার পথে তিনি কেমন আছেন তা দেখে এসেছি।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কেউ কি ফকিরকে কোন খাদ্যদ্রব্য দিয়েছো?" উমর বললেন, "আমি তো সবেমাত্র নামায পড়লাম, এখন পর্যন্ত কোথাও যাইনি।" আবু বকর বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি মসজিদে প্রবেশের সময় হঠাৎ এক ভিক্ষুক এলো। আমি সে সময় আবদুর রহমানের (আবু বকরের ছেলে) হাতে যবের রুটির একটি টুকরো দেখলাম আর সেটি তার কাছ থেকে নিয়ে ভিক্ষুককে দিয়েছিলাম।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি।" এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও বললেন, যা দ্বারা উমরও সন্তুষ্ট হোন, আর উমর বুঝলেন, পুণ্যময় কোন কাজে তিনি আবু বকরের সমান নন।

আবু ইয়ালার গ্রন্থে ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একদিন আমি নামায পড়ে মসজিদে দুয়া করছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমরকে নিয়ে মসজিদে এসে (আমাকে দেখে) বললেন, "যে চাইবে সে পাবে।" এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যে সুন্দর করে কিরাত (কুরআন তিলাওয়াত) করতে চায়, সে যেন আবদুল্লাহ বিন মাসউদের কিরাত অনুসরণ করে।" এরপর আমি বাড়ি এলাম। কিছুক্ষন পর আবু বকর আমাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য আমার কাছে এলেন। পরক্ষণে উমরও এলেন। তিনি আবু বকরকে দেখে বললেন, আপনি প্রত্যেকটি ভালো কাজে এগিয়ে রয়েছেন।

রবিআ আসলামী বর্ণনা করেনঃ আমার আর আবু বকরের মধ্যে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে তিনি আমাকে এমন কথা বলেন, যা আমাকে দুঃখ দেয়। এরপর তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন, "রবিআ, তুমি কথার দ্বারা প্রতিশোধ নাও।" আমি বললাম, "তা হতে পারে না।" তিনি বললেন, "তুমি আমার প্রতিশোধ নাও, নাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নালিশ করবো।" আমি বললাম, "তবুও না।" এরপর আবু বকর চলে গেলেন। আমার কাছে বনু আসলাম গোত্রের কিছু লোক এসে বললো, "ভালোই হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন অসন্তুষ্ট হবেন, আবু বকরই তো বাড়াবাড়ি করেছেন। কেন তিনি এতোটা করতে গেলেন ?" আমি তাদের বললাম, "তোমরা কি আবু বকরের মর্যাদা সম্পর্কে জানো না ? তিনি ثَانِيَ اثْنَيْنِ আয়াতের প্রতিবিম্ব আর মুসলমানদের মধ্যে বুযুর্গ ও বড় ব্যক্তিত্ব। তোমরা নিজেদের মঙ্গল তালাশ করো। যদি তিনি দেখেন যে, তার বিরুদ্ধে তোমরা সাহায্য করছো, তবে তিনি রাগ করবেন। তার রাগ করার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাগের

কারনে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা রাগ করবেন। আর এতে করে রবিআ ধ্বংস হয়ে যাবে।" সুতরাং আমি আবু বকরের পিছে পিছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম। আবু বকর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হুবহু সম্পূর্ণ ঘটনা বললেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা তুলে আমাকে বললেন, "রবিআ, ঘটনা কি ?" আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ঘটনা তা- ই (যা তিনি বলেছেন)। তিনি এমন কথা বলেছেন, যা আমাকে মর্মাহত করেছে। তিনি আমাকে অনুরূপ কথা বলে তার প্রতিশোধ নিতেও বলেছিলেন।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "খবরদার, ওই কথা মুখে আনবে না (অর্থাৎ, আবু বকরের প্রতিশোধ নিতে যেয়ো না); বরং বলো, হে আবু বকর, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।" (মুসনাদে আহমদ)

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে বললেন, "তুমি গুহায় আমার সাথী ছিলে, হাউজে কাউসারেও আমার সাথী হয়ে থাকবে।" আবদুল্লাহ বিন আহমাদও অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত করেছেন যে, আবু বকর গুহায় আমার সাথী ছিল। এ হাদিসের সনদগুলো সহিহ।

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বায়হাকি বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বেহেশতে খোরাসানের উটের মতো অনেক পাখি থাকবে।" আবু বকর (রাঃ) আরয করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সে তো অনেক ভালো হবে।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাকে ভক্ষণকারী তার চেয়েও ভালো হবে ? তার মধ্যে তুমি অন্যতম।"

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মিরাজের রাতে আকাশের অনেক স্থানে আমার নামের পিছনে আবু বকরের নাম দেখেছি।" এ হাদিসের সনদগুলো দুর্বল। যদিও তা ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আনাস, আবু সাঈদ আর আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে পৃথক পৃথক সূত্রে বর্ণিত।

সাঈদ বিন জাবের (রাঃ) থেকে ইবনে আবী হাতিম আর আবু নুয়াঈম বর্ণনা করেছেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - এ আয়াত (সূরাহ আল- ফজর, ৮৯ : ২৭) তিলাওয়াত করলে আবু বকর বললেন, "এ কতোই না সুন্দর কথা।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "মৃত্যুর সময় ফেরেশতা তোমাকে এভাবে সম্বোধন করবে।"

আমের বিন আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের থেকে ইবনে হাতিম বর্ণনা করেছেন,

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

"আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও ..." (সূরাহ আন- নিসা, ৪ : ৬৬)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবু বকর (রাঃ) বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি যদি আমাকে নির্দেশ করেন, তবে আমি নিজেকে বিধ্বস্ত করে ফেলবো।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি সত্যিই বলেছো।"

ইবনে আবি মুলাইকা (রাঃ) থেকে আবুল কাসেম বাগাবী বর্ণনা করেছেনঃ একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সাথে এক জলাশয়ে গিয়ে বললেন, "সবাই নিজ নিজ সাথী আর বন্ধুর কাছে ফিরে যাও।" এটা শুনে সবাই সেটাই করলো। শুধু বাকি থাকলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের কাছে গিয়ে তার সাথে কোলাকুলি করলেন আর বললেন, "যদি আমি নিজের জীবনে কোন বন্ধু গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম, কিন্তু সে আমার সাথী।" (ইবনে আসাকির)। এ হাদিসটি মুরসাল ও গরীব সনদে বর্ণিত হয়েছে।

সুলায়মান বিন ইয়াসার থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ভালো অভ্যাস তিনশ ষাটটি। আল্লাহ কাউকে জান্নাত দিতে চাইলে এ অভ্যাসগুলোর মধ্যে যে কোন একটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে দেন।" আবু বকর (রাঃ) আরয করলেন, "সেগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি আমার মধ্যে কি আছে ?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "সবগুলোই আছে।"

ইবনে আসাকির এ হাদিসটি দুইভাবে বর্ণনা করেছেন। আরেক পদ্ধতিটি হলো - রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নেক অভ্যাস তিনশ ষাটটি।" আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এর মধ্য থেকে আমার মাঝে কিছু কি আছে ?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ধন্যবাদ, সব নেক অভ্যাস তোমার মধ্যে সঞ্চিত আছে।"

ইয়াকুব আনসারীর পিতা থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গায়ে গায়ে মিলে বসতো, এ দৃশ্য দুর্গের দেওয়ালের মতো লাগতো। কিন্তু আবু বকরের বসার জায়গা পড়েই থাকতো, সেখানে কেউ বসতো না। তিনি যখন আসতেন, তখন সেখানে বসতেন আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে চেহারা ফিরিয়ে কথা শুরু করতেন আর সকল উপস্থিত ব্যক্তিগণ মনোযোগ সহকারে কথা শুনতেন।

আনাস (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আবু বকরের প্রতি ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার সকল উম্মতের জন্য ওয়াজিব।" সাহল বিন সাদ (রাঃ) একটি হাদিস এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

উপরন্তু, আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে একটা মারফু হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, সকল লোকের হিসাব নেওয়া হবে, কিন্তু আবু বকর থেকে হিসাব নেওয়া হবে না।

আবু বকর (রাঃ) এর শানে সাহাবা ও সলফে সালেহিনদের অভিমত

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন, "আবু বকর সিদ্দীক আমাদের সর্দার।" (বুখারী)

শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে বায়হাকী হযরত উমরের অভিমত নকল করেছেন - "যদি আবু বকরের ঈমানকে এক পাল্লায় আর পৃথিবীবাসীর ঈমান আরেক পাল্লায় তুলে দেওয়া হয়, তবে আবু বকরের ঈমানের পাল্লা বেশী ভারী হবে।"

ইবনে আবি হাইসামা ও আবদুল্লাহ বিন আহমদ যাওয়াইদুয যুইদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রাঃ) বলেছেন, "আবু বকর সিদ্দিকের প্রত্যেকটি অভিমতই শ্রেষ্ঠ আর সর্বোত্তম।"

মিসদাদ তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রাঃ) বলেছেন, "হায়, আমি যদি আবু বকর সিদ্দীকের বুকের একটি পশম হতাম!"

ইবনে আসাকির ও ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন যে, উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন, "আমার একান্ত ইচ্ছা হলো, আবু বকরের জন্য যেরূপ জান্নাত নির্ধারিত, অদ্রুপ জান্নাত যেন আমি পাই।"

আবু নুয়াইম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন, "আবু বকরের শরীর মেশকের থেকেও অধিক সুগন্ধ।"

আলী (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় আবু বকর এক খণ্ড কাপড় পড়ে বসেছিলেন। তিনি আবু বকরকে দেখে বললেন, "কোনো নেককার ব্যক্তি আল্লাহ'র কাছে কাছে আমার মতে এ কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তির চেয়ে তিনি বেশী প্রিয় নন।"

আবদুর রহমান বিন আবু বকর (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাকে কয়েকবার উমর বিন খাত্তাব বলেছে, 'আবু বকর সিদ্দীক আমার চেয়ে প্রত্যেক কাজে অগ্রগামী।' "

আওসাত গ্রন্থে তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন, "পবিত্র সত্তার কসম - যার হাতে আমার প্রাণ, আমি নেক কাজে অগ্রগামী হয়ে দেখেছি সে কাজে আবু বকর আমার চেয়েও অগ্রগামী।"

আওসাত গ্রন্থে তাবারানি আলী (রাঃ) এর আরেকটি অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আবু বকর আর উমরই আমার কাছে প্রিয়। কোন মুমিনের অন্তরে আমার প্রতি ভালোবাসা এবং আবু বকর ও উমরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্নতা একত্রে জমা হবে না।"

আবু আমর (রাঃ) বলেছেন, "কুরাইশদের মধ্যে তিনজন ব্যক্তি ছিলেন, যারা দৃশ্যত আর চরিত্রগতভাবে অসাধারণ ও বিস্ময়কর সাদা মনের মানুষ। যদি তারা তোমাকে কিছু বলেন, তবে সত্য বলবেন। আর তুমি যদি তাকে কিছু বলো, তবে তারা তা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন। তারা হলেন - আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), আবু উবাইদা বিন জাররা (রাঃ) আর উসমান বিন আফফান (রাঃ)।"

ইবনে সাদ ইব্রাহীম নখয়ী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর উপাধি তার দয়ার্দ্রতার কারনে দেওয়া হয়েছে।

রবীআ বিন আনাস (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, "আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এমন এক পানির ফোঁটা, (তা) যেখানে পড়বে সেটাই মহিমান্বিত হবে।"

রবীতা বিন আনাস থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, "আমি আবু বকর সিদ্দীকের মতো পূর্ববর্তী নবীদের কোন সাহাবীকে পাই নি।"

যুহরি বলেছেন, "আবু বকর সিদ্দীকের মর্যাদার মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি আল্লাহ'র ব্যাপারে কোনই সন্দেহ করতেন না।" (ইবনে আসাকির)

যুবায়ের বিন বাকার বলেন, "আমি আলেমদের থেকে শুনেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খতীব আবু বকর (রাঃ) ও আলি (রাঃ)।"

আবু হুসাইন বর্ণনা করেছেন, "আদম সন্তানদের মধ্যে নবী রাসুলের পর কোন ব্যক্তি আবু বকরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর মুরতাদদের প্রতি সৈন্য পাঠিয়ে আবু বকর এক নবীওয়ালা কাজ করেছেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দাইনূরী তার রচিত মাজালিসাত গ্রন্থে আর ইবনে আসাকির শাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ তাআলা আবু বকরকে এমন চারটি গুণ দান করেছিলেন, যা আজ পর্যন্ত কাউকে দেওয়া হয়নি। এক - তিনি সিদ্দীক, দুই - তিনি গুহায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী, তিন - হিজরতের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন, চার - রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইমাম ও বাকি সকল মুসলমানকে মুকতাদী হওয়ার নির্দেশ দেন।"

মাসাহাফ গ্রন্থে আবু দাউদ লিখেছেন যে, আবু জাফর বলেছেন, "আবু বকর (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর জিব্রাঈলের কথা শুনতে পেতেন, কিন্তু জিবরাঈলকে দেখতে পেতেন না।"

ইবনে মুসাইয়াব বলেছেন, "আবু বকর ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ মন্ত্রী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের মধ্যে, গুহায়, বদর যুদ্ধের ছাউনির নিচে, এমনকি কবরেও আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে প্রাধান্য দেননি।"

আয়াত, হাদিস ও ইমামদের অভিমতে আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতের প্রতি ইশারা

হুযাইফা (রাঃ) থেকে তিরমিযী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার পর আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করবে। এ হাদিসটি আবুদ দারদা থেকে তাবারানী আর ইবনে মাসউদ থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে আবুল কাসেম বাগাবী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "আমার পর বারোজন খলীফা হবেন আর আবু বকর সিদ্দীক আমার পর সামান্য জীবিত থাকবেন।" এ হাদিসের প্রথম অংশের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসই একমত। এটি কয়েক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, এ সম্পর্কে আমি অন্য ব্যাখ্যা গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

বুখারি ও মুসলিম শরীফের এ হাদিস, যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতের আগে বক্তৃতায় বলেছিলেন, আল্লাহ তার এক বান্দাকে অবকাশ দিয়েছেন ...। সেই বক্তৃতায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছিলেন, "সব দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু আবু বকরের দরজা খোলা থাকবে।"

এক বর্ণনায় আছে, আবু বকরের জানালা ছাড়া মসজিদের সকল জানালা বন্ধ থাকবে। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এটা দিয়ে আবু বকরের খিলাফতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, কারন তিনি এ পথেই মসজিদে নামায পড়ানোর জন্য আসতেন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আবু বকরের দরজা ছাড়া সকল দরজা বন্ধ করে দাও।" এ হাদিসটি ইবনে আদী, ইমাম তিরমিযী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে, যাওয়াইদুল মুসনাদ গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে, তাবারানী হজরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে এবং বাযযার হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

জুবায়ের বিন মুতঈম থেকে বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেনঃ একদিন এক মহিলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে পুনরায় আসতে বললেন। সে বললো, "আমি আবার এলে হযরতকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাবো না, অর্থাৎ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকাল করবেন।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তবে আবু বকর সিদ্দীকের কাছে এসো।"

আনাস (রাঃ) বলেছেনঃ "আপনার পর আমরা কার কাছে সদকা দিবো" - এ বার্তা দিয়ে বনু মুসতালিকের লোকেরা আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আবু বকরের কাছে।" (হাকিম)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক মহিলা এসে কিছু জানতে চাইলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে পরে আসতে বললেন। সে বললো, "আমি এসে যদি আপনাকে না পাই আর আপনার মৃত্যু হয়ে যায় ?" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি এসে আমাকে না পেলে আবু বকরের কাছে যাবে, কারন আমার পর তিনি খলীফা হবেন।"

আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেনঃ মৃত্যুর সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে আয়েশা, তোমার পিতা আর তোমার ভাইকে আমার কাছে আসতে বলো, আমি তাদের দলীল লিখে দিতে চাই। কারন আমার আশংকা হয় যে, আমার পর কোন আশান্বিত ব্যক্তি খিলাফতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতে পারে আর বলতে পারে – 'আমি খিলাফতের উপযুক্ত'। কিন্তু আল্লাহ আর মুমিনগণ আবু বকরকে ছাড়া মেনে নিবে না।" (মুসলিম)

এ হাদিসটি আহমদ ভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর সময় আমাকে বললেন, "তোমার ভাই আবদুর রহমানকে ডেকে আনো, আমি আবু বকরের জন্য একটি দলীল লিখে দিবো, যাতে লোকেরা মতভেদ করতে না পারে।" এরপর নিজেই বললেন, "তাকে লাগবে না। আল্লাহ আবু বকরের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য রাখবেন না।"

আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলো, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি খলীফা নির্ধারণ করতেন, তবে কাকে (খলীফা) বানাতেন ?" তিনি বললেন, "আবু বকরকে।" সে বললো, "তার পর ?" তিনি বললেন, "উমর ফারুক।" সে বললো, "তার পর ?" তিনি বললেন, "আবু উবায়দা বিন জাররাহ।"

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমূর্ষ অবস্থায় বললেন, "হে জনতা, তোমরা আবু বকরের কাছে যাও। তিনি তোমাদের নামায পড়াবেন।" আয়েশা (রাঃ) বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর খুবই নরম মনের মানুষ। তিনি আপনার সাথে জায়নামাযে দাঁড়ালে নামাজ পড়াতে পারবেন না।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাকেই নামাজ পড়াতে বলো।" আয়েশা আবার একই আবেদন করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আবু বকরকেই বলো, তিনি যেন নামাজ পড়ান। তুমি তো ইউসুফ (আঃ) এর যুগের নবীর মতো।" এরপর লোকেরা আবু বকরের কাছে এলেন আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই (আবু বকর) লোকদের নামায পড়ান।

এ হাদিসটি মুতাওয়াতির। এটি আয়েশা, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আবদুল্লাহ বিন যামআ, আলি বিন আবু তালিব ও হাফসা (রাঃ) পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। এদের পদ্ধতিও হাদিসে মুতাওয়াতির পদ্ধতির অনুরূপ।

আয়েশা (রাঃ) আরেকভাবে বর্ণনা করেছেন, "আমি এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ জন্যই জিদ করেছিলাম যে, আমার অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছিলো - রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্তকে মানুষ ভালবাসবে না। কারন আমি বুঝেছিলাম, যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলবর্তী হবেন, লোকেরা তাকে হতভাগা মনে করবে। এজন্য আমি চাইছিলাম যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে ছাড়া নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন।"

ইবনে যামআ (রাঃ) বলেছেন, "যে সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের নামাজ পড়ার নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তখনো আবু বকর আসেননি, এজন্য উমর এগিয়ে আসেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন - 'না না না (তিনবার), আবু বকরই নামাজ পড়াবেন।' "

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, উমর (রাঃ) তাকবীরে তাহরীমা বললে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হয়ে মাথা তুলে বললেন, "আবু কুহাফার ছেলে কোথায় ?" এ হাদিসের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামগণের অভিমত হলো, এটি সুস্পষ্ট দলীল যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সকল সাহাবার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। তিনিই সবচেয়ে বেশী খিলাফতের হকদার আর ইমামতের যোগ্য।

ইমাম আশআরী বলেন, "এটা প্রকাশ্য যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর সিদ্দীককে লোকদের নামায পড়াতে নির্দেশ দেন। সেখানে মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী - তিনিই ইমামতি করবেন, কুরআনের জ্ঞান যার সবচেয়ে বেশী। সুতরাং এ হাদিসের আবেদন হলো, আবু বকর গোটা উম্মত থেকে কুরআনের জ্ঞান বেশী রাখতেন। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাঈনও উক্ত হাদিস দিয়ে এ ফলাফল বের করেছেন যে, আবু বকর সিদ্দীকই খিলাফতের বেশী হকদার ছিলেন। (যারা ফলাফল বের করেছেন) তাদের মধ্যে উমর (রাঃ) আর আলি (রাঃ) অন্যতম।

আলী (রাঃ) এর বর্ণনা ইবনে আসাকির নকল করে বলেছেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আবু বকরকে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, অসুস্থ ছিলাম না, আমার জ্ঞান ও চৈতন্য ছিল। এরপর আমরা নিজেদের দুনিয়ার জন্য তার প্রতি রাজি হলাম, যার প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দ্বীনের জন্য রাজি হয়েছিলেন।"

ওলামায়ে কেরাম বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই আবু বকর সিদ্দীক ইমামতি করেন আর পরামর্শদাতা হোন।

সহল বিন সাদ থেকে আহমাদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেনঃ একবার বনু বিন আউফ গোত্রে বিবাদ ও কলহ দেখা দিলে সংবাদ পেয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের পর মীমাংসার জন্য সেখানে যান, আর যাওয়ার সময় বলেন, "হে বিলাল, নামাযের সময় হলে এবং আমি না ফিরলে আবু বকরকে নামায পড়াতে বলবে।" সুতরাং যখন আসরের সময় হলো, বিলাল (রাঃ) ইকামত দিলেন আর তার কথায় আবু বকর (রাঃ) নামায পড়ালেন।

আবু বকর শাফেঈ গীলানিয়াত গ্রন্থে এবং হাফসা থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন, "আমি আরয করলাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি অসুস্থ থাকা অবস্থায় কি আবু বকরকে ইমাম বানিয়েছিলেন ?' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, 'না, বরং আল্লাহই তাকে ইমাম বানিয়েছেন।' "

দারা কুতনী ইফরাদ গ্রন্থে, খতীব এবং ইবনে আসাকির আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ'র দরবারে তোমার ব্যাপারে তিনবার প্রশ্ন করেছি যে, তোমাকে ইমাম বানবো। কিন্তু সেখান থেকে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় আর আবু বকর ইমামতির নির্দেশপ্রাপ্ত হোন।"

হাসান (রাঃ) থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর সিদ্দীক বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি স্বপ্নে নিজেকে অধিকাংশ লোকের আবর্জনা অতিক্রম করতে দেখেছি।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি অবশ্যই লোকদের কাজ করার সুযোগ পাবে।" আবু বকর বললেন, "আমি আমার বুকে দুটো চিহ্ন দেখেছি।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমার খিলাফতের সময় দুই বছর।"

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, "আমি একদিন উমর ফারুকের কাছে গেলাম। সে সময় তার কাছে কিছু লোক খাবার খাচ্ছিলো। আমি পিছনের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি পূর্ববর্তী নবীগণের কিতাবগুলো পড়েছো ?' সে বললো, 'এতে লেখা রয়েছে শেষ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খলীফা হবেন সিদ্দীক।"

ইবনে আসাকির কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে মুহাম্মদ বিন যুবায়ের বলেছেনঃ উমর বিন আব্দুল আযীয (রাঃ) আমাকে কিছু প্রশ্ন করার জন্য হাসান বসরী'র কাছে পাঠালেন। আমি তাকে বললাম, "আবু বকরের খিলাফত নিয়ে লোকেরা মতভেদ করেছিলো। আপনি আমাকে পূর্ণাঙ্গ জবাব দিন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তাকে খলীফা বানিয়েছিলেন ?" তিনি রেগে বসে পড়লেন আর বললেন, "কেন ? এতে কি কোন সন্দেহ আছে ? আল্লাহ'র কসম, আল্লাহ তাআলাই তাকে খলীফা বানিয়েছেন। আল্লাহ কেন খলীফা বানাবেন না, তিনি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী আর মুত্তাকী লোকেরা তাকে খলীফা না বানানো পর্যন্ত তিনি মৃত্যুবরণ করতেন না।"

ইবনে আদী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে আবু বকর বিন আয়াস বলেছেনঃ হাকিম রশীদ আমাকে বললেন, "লোকেরা আবু বকরকে কিভাবে খলীফা বানিয়ে নিলো ?" আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, এ কাজে আল্লাহ, তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর সকল মুসলমান নীরব ছিলেন।" খলীফা হারুন রশীদ বললেন, "একটু ব্যাখ্যা করে বলুন।" আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আটদিন অসুস্থ ছিলেন। এ সময় বিলাল (রাঃ) আরয করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কে নামায পড়াবেন ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আবু বকরকে নামাজ পড়াতে বলো।" আবু বকর আট দিন পর্যন্ত নামাজ পড়ান আর এ দিনগুলোতে নিয়মিত ওহী নাযিল হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ'র নীরবতার কারনে নীরব ছিলেন আর সকল মুসলমান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীরবতার কারনে নীরব ছিলেন।" খলীফা হারুন রশীদের কাছে এ অভিমতটি খুবই পছন্দনীয় মনে হলো আর তিনি বললেন, "বারাকাল্লাহু ফিক।"

ওলামায়ে কেরামের একটি দল আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতের প্রমাণ পেশ করেছেন। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, ইমাম হাসান বসরী এ আয়াত দিয়ে দলীল দিয়েছেন -

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে।" (সূরাহ আল- মাইদাহ, ৫ : ৫৪)

হাসান বসরী বলেন, "আল্লাহ'র কসম, আরব যখন ধর্মত্যাগী হয়, আবু বকর আর তার সাথীরাই মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাদের ইসলামে ফিরিয়ে আনেন।"

কাতাদা (রাঃ) এর বরাত দিয়ে ইউনুস বিন বাকীর লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর আরবের কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়। তখন আবু বকর (রাঃ) তাদের সাথে জিহাদ করেছিলেন। সে সময় আমরা পরস্পরে বলতাম, "কুরআনের এই আয়াত - فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ আবু বকর সিদ্দীক আর তার সাথীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।"

কুতায়বা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন -

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ

"পিছনে পড়ে থাকা (আরব) বেদুইনদের তুমি (আরো) বলো - অচিরেই তোমাদের একটি শক্তিশালী জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্য ডাক দেওয়া হবে ..." (সূরাহ আল- ফাতহ, ৪৮ : ১৬)

এ আয়াতে উল্লেখিত কঠোর লড়াইকারী দারা বনূ হুলায়ফা গোত্র উদ্দেশ্য। ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে কুতাইবা বলেন, "এ আয়াতটি আবু বকরের খিলাফতের দলীল। কারন তিনিই লোকদের তীব্র থেকে তীব্রতরভাবে লড়াই করার আহবান জানান।"

শায়খ আবুল হাসান আশআরী (রহঃ) বলেছেনঃ আবু আব্বাস সুরাইহ থেকে শুনেছি যে তিনি বলেছেন, "আবু বকর সিদ্দীকের খিলাফত কুরআন শরীফের উপরোল্লিখিত আয়াত দিয়ে প্রমাণিত। কারন ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ছাড়া যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কেউ জিহাদ করেননি।"

সুতরাং এ আয়াতটি আবু বকরের খিলাফতের দাবী রাখে আর তার আনুগত্য করা মানুষের জন্য ফরয, কারন যে তা মান্য করবে না, আল্লাহ অবশ্যই তাকে শাস্তি দিবেন।

ইবনে কাসির (রহঃ) বলেছেন, "কিছু মুফাসসিরীন রোম, শাম আর পারস্যের যুদ্ধ দিয়ে এ আয়াতের তাফসীর করেছেন। কিন্তু এ যুদ্ধগুলো প্রস্তুতি আবু বকরই গ্রহণ করেন, যদিও তা উমর ফারুক ও উসমান গনীর যুগে এসে শেষ হয়েছে। তারা দু'জনই আবু বকরের অনুসারী ছিলেন।"

ইবনে কাসির বলেন, এ আয়াতটি আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর খিলাফতের দলীল –

وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন " (সূরাহ আন- নূর, ২৪ : ৫৫)

ইবনে আবী হাতিম তার তাফসীর গ্রন্থে আবদুর রহমান বিন আবদুল হামীদ আল মাহদি থেকে বর্ণনা করেছেন, "এ (উপরোক্ত) আয়াত দিয়ে আবু বকর (রাঃ) আর উমর (রাঃ) এর খিলাফত প্রমাণিত।"

আবু বকর বিন আয়াশ থেকে খতীব বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর সিদ্দীক হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা আর তার খিলাফত কুরআন দিয়ে প্রমাণিত। এ প্রেক্ষিতে ইরশাদ হচ্ছে –

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"(এ সম্পদ) সেসব অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, যাদের (আল্লাহ'র উপর ঈমানের কারণেই) নিজেদের ভিটেমাটি ও সহায়- সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে, অথচ এ লোকগুলো আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও তার সন্তুষ্টিই হাসিল করতে চায়, আল্লাহ ও তার রাসুলের সাহায্য সহযোগিতায় তৎপর থাকে, (মূলত) এ লোকগুলোই হচ্ছে সত্যবাদী।" (সূরা আল- হাশর, ৫৯ : ৮)

এ আয়াতে الصَّادِقُونَ শব্দ দিয়ে সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ যাকে "সাদিক" বলেছেন, তিনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। আর সাহাবাগণ আবু বকরকে সবসময় "হে রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খলীফা" বলে সম্বোধন করতেন। ইবনে কাসির বলেন, "এ গবেষণাটি খুবই সুন্দর।"

যাফারানী বলেছেনঃ আমি ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর কাছে শুনেছি যে তিনি বলেছেন, "আবু বকরের খিলাফতের বিষয়ে ইজমা হয়েছিলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর লোকদের মধ্যে দুনিয়ায় আবু বকরের চেয়ে ভালো মানুষ না থাকায় লোকেরা তার হাতে বাইয়াত দেয়।" (বায়হাকী)

আসাদুস সুন্নাহ ফায়ায়েল গ্রন্থে মুয়াবিয়া বিন কাররাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, "আবু বকরের খিলাফত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামগণ কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করতেন না। তারা সবসময় আবু বকরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা বলে সম্বোধন করতেন। আর সাহাবীদের ইজমা কখনো ভুল ও বিভ্রান্তকর হতো না।"

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেন, "যে জিনিসকে সকল মুসলমান ভালো মনে করে সেটা আল্লাহ'র কাছেও ভালো। আর যা সকল মুসলমানদের কাছে মন্দ তা আল্লাহ'র কাছেও মন্দ। সকল মুসলমান আবু বকরের খিলাফতকে ভালো মনে করতো। সুতরাং তা আল্লাহ'র কাছেও ভালো আর উত্তম।"

হাকিম ও যাহাবী লিখেছেন, "আবু বকরের খিলাফতের পর একদিন আবু সুফিয়ান বিন হরব হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে এসে বললেন, 'লোকদের কাজগুলো দেখুন, তারা কুরাইশদের এক নগণ্য ব্যক্তির কাছে বাইয়াত দিয়েছে। আপনি চাইলে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দিয়ে মদিনা ভরে দিবো।" আলী (রাঃ) বললেন, "হে আবু সুফিয়ান, আপনি দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামের শত্রুতা করে এসেছেন, আপনি কলহ প্রিয়। আমার দৃষ্টিতে আবু বকরের খিলাফতের কোন মন্দ বিষয় নেই। কারন তিনি প্রত্যেক বিষয়ে দক্ষ ও হকদার।"

আবু বকর (রাঃ) এর কাছে বাইয়াত

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হাজ্জ থেকে ফিরে তার এক ভাষণে বললেন, "আমি সংবাদ পেয়েছি যে, অমুক ব্যক্তি বলেছে - উমরের মৃত্যুর পর সে অমুক ব্যক্তির হাতে বাইয়াত দিবে। কেউ যেন এ ধোঁকায় পড়ে না যে, আবু বকর সিদ্দীকের বাইয়াত কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আর তা সহসাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ লোকদেরকে খিলাফত সম্বন্ধে ফিতনা- ফাসাদ থেকে বাচিয়েছেন আর আজ তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যাকে আবু বকর ছাড়া লোকেরা নিজেদের খলীফা করতে পারে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আবু বকর সিদ্দীকই সর্বোত্তম। ঘটনা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর আলী, যুবায়ের ও তাদের সাথীরা ফাতিমার ঘরে অবস্থান নেন। সকল আনসার সাহাবী আমাদের থেকে পৃথক হয়ে সাকীফা বনূ সাদাহ গোত্রে সমবেত হোন। আর মুহাজির সাহাবীগণ আবু বকর সিদ্দীকের কাছে আসেন। আমি আবু বকর সিদ্দীককে বললাম, 'আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাই আনসার সাহাবীদের কাছে চলুন।' তিনি আমাদের সাথে যাত্রা করলেন। পথে দু'জন নেককার লোকের সাক্ষাৎ হয়। তারা আমাদের বললেন, 'তোমরা আনসারদের কাছে যেয়ো না, আর মুহাজিররা পরস্পরের মধ্যে সিদ্ধান্ত স্থির করে নাও।' আমি বললাম, 'আল্লাহ'র কসম, আমরা সেখানে যাবোই।' আমরা সাকীফা বনূ সাদাহ গোত্রে গিয়ে দেখলাম, তারা সকলে

সেখানে সমবেত আর তাদের মধ্যভাগে একজন চাদর পরিহিত লোক বসে আছেন। আমি বললাম, 'তিনি কে, আর তার কি হয়েছে ?' লোকেরা বললো, 'সাদ বিন উবাদা অসুস্থ।' আমরা গিয়ে বসলে তাদের বক্তা হামদ ও সানার পর বলতে লাগলেন, 'আমরা আনসার, আল্লাহ'র সৈনিক। হে মুহাজিরগণ, আপনারা কিছু লোক এ ইচ্ছা পোষণ করেন যে, আপনারা আমাদের উচ্ছেদ করবেন, বের করে দিবেন আর খিলাফতের সাথে সংযুক্ত রাখবেন না।' তার অভিভাষণ শেষ হলে আমি কিছু বলতে চাইলাম, কারন এ বিষয়ে আমি আগেই একটি সুন্দর বক্তব্য তৈরি করেছিলাম। আবু বকর (রাঃ) বাধা দিলেন। মূলত আমি তার অধীনস্থ ছিলাম। তার উপর তিনি আমার চেয়ে বেশী প্রজ্ঞাবান আর সম্মানিত ছিলেন। এ জন্য আমি নীরব হয়ে গেলাম আর তাকে অসন্তুষ্ট করতে চাইলাম.না। তিনি আমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী ছিলেন। আল্লাহ'র কসম, আমি যা বলার জন্য আগেই বক্তব্য ঠিক করেছিলাম, আবু বকর শেষ পর্যন্ত সেই বক্তব্যই শুরু করলেন, বরং তার চেয়েও উত্তমভাবে বললেন – 'আপনারা নিজেদের সম্বন্ধে যে প্রশংসা করলেন, সত্যিই আপনারা তা- ই। গোটা আরব বিশ্ব জানে যে, প্রশাসন সবসময় কুরাইশদের জন্য, কারন কুরাইশরা (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) আত্মীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে আরব জাহানের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং, খিলাফত সুনির্দিষ্টভাবে কুরাইশদের হক।' তিনি আমার আর আবু উবাইদার হাত ধরে বললেন, 'আমি খুশী হবো, যদি এদের মধ্য থেকে একজনের হাতে বাইয়াত দেন।' আবু বকর যা বললেন, তা সবই আমার মনঃপূত, কিন্তু বাইয়াতের জন্য আমার নাম ঘোষণা করা আমার পছন্দ হয়নি। আল্লাহ'র কসম, আমার গর্দান উড়িয়ে দিলেও আমি অনুতপ্ত হতাম না, তবে বিব্রত বোধ করেছিলাম এ জন্য যে, আমি সে জাতির শাসনকর্তা কিভাবে হতে পারি, যেখানে আবু বকর রয়েছেন! আনসারদের মধ্য থেকে একজন বললেন, 'আমরাও কুরাইশদের সাহায্যকারী ও সম্মানিত লোক। ভালো হবে যদি আমাদের মধ্যে থেকে একজন আর আনসারদের মধ্য থেকে একজনকে শাসক নির্ধারণ করা হয়।' এ কথার প্রেক্ষিতে হট্টগোল শুরু হলো। আমার সন্দেহ হলো যেন সংঘাত সৃষ্টি না হয়। আমি আবু বকরকে বললাম, 'আপনি হাত দিন।' তিনি হাত প্রসারিত করলেন, আর আমি সর্বপ্রথম বাইয়াত করলাম, এরপর মুহাজিরগণ, এরপর আনসারগণও বাইয়াত করলেন। কি সংকটময় আর বিস্ময়কর মুহূর্তই না ছিল সেটি। আমার ভয় হচ্ছিলো যে, মুসলমানরা যেন বিভক্ত হয়ে না পড়ে। যদি তারা আলাদা বাইয়াত করতো, তবে সে ব্যক্তির কাছে আমাদের বাইয়াত করতে হতো। অথবা যদি আমরা বাধা দিতাম, তবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো।"

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে নাসাঈ, হাকিম আর আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর আনসারগণ বললেন, "আমাদের আর আপনাদের মধ্য থেকে একজন করে শাসক নির্ধারণ করা হোক।" উমর বিন খাত্তাব তাদের কাছে গিয়ে বললেন, "হে আনসার সম্প্রদায়, আপনারা জানেন না, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর সিদ্দীককে আপনাদের নামাজ পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখন আপনারাই ইনসাফ করেন যে, আপনাদের মধ্যে আবু বকরের চেয়ে কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম!" আনসারগণ বললেন, "নাউযুবিল্লাহ, আমরা তার চেয়ে কখনোই অগ্রগামী নই।"

আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে ইবনে সাদ, হাকিম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর লোকেরা সাদ বিন উবাদার বাড়িতে সমবেত হোন। তাদের মধ্যে আবু বকর

সিদ্দীক ও উমর ফারুকও উপস্থিত ছিলেন। একজন আনসার সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, "হে মুহাজিরগণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে কোথাও পাঠালে আমাদের মধ্য থেকে একজনকে তার সাথী বানিয়ে দিতেন। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত এটাই যে, একজন আমীর আপনাদের মধ্য থেকে আর একজন আমাদের মধ্য থেকে হোক।" এরপর কিছু আনসার সাহাবী একই ধরণের বক্তব্য পেশ করলেন। যায়েদ বিন সাবিত দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনারা কি এ কথা জানেন না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজিরদের মধ্য থেকে অন্যতম ছিলেন ? সুতরাং তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খলীফাও মুহাজিরদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত। আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যকারী ছিলাম, আমরা তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খলীফারও সাহায্যকারী হবো।" এরপর তিনি আবু বকরের হাত ধরে বললেন, "ইনি তোমাদের নেতা আর প্রশাসক।" এরপর যথাক্রমে তিনি, উমর, মুহাজিরগণ আর আনসারগণ বাইয়াত দেন। এরপর আবু বকর সিদ্দীক মিম্বরে আরোহণ করেন আর উপস্থিত জনতার প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, "যুবায়েরকে দেখা যাচ্ছে না, তাকে ডেকে আনুন।" তিনি এলে আবু বকর বললেন, "তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফুর ছেলেমেয়ে হয়ে আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হয়ে মুসলমানদের দুর্বল করতে চাও, মুসলমানদের কোমর ভেঙে দিতে চাও?" আলী বললেন, "চিন্তা করবেন না।" এরপর তিনিও বাইয়াত দিলেন।

ইবনে ইসহাক সিরাত গ্রন্থে লিখেছেনঃ আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেছেন, "বনু সাকীফার ঘরে বাইয়াতের পরের দিন আবু বকর (রাঃ) মিম্বরে আরোহণ করেন। তিনি ভাষণ দেওয়ার আগে উমর ফারুক (রাঃ) হামদ ও সালাতের পর বললেন, "উপস্থিত জনতা, আল্লাহ আপনাদেরকে এমন একজনের কাছে সমবেত করেছেন, যিনি সকলের মধ্যে উত্তম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচর আর গুহার সাথী। তোমরা দাঁড়াও আর তাকে বাইয়াত দাও।" লোকেরা আম (সাধারণ) বাইয়াত দিলেন। এ বাইয়াতটি সাকীফার ঘরে বাইয়াত অনুষ্ঠিত হওয়ার পরের ঘটনা। এরপর আবু বকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে হামদ ও সানার পর বললেন, "আপনারা আমাকে খলীফা বানিয়েছেন, অথচ আমি তার যোগ্য নই, কারন আমি আপনাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না। আমি জনহিতকর কাজ করলে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন, আর অমঙ্গলজনক কাজ করলে আমাকে শুধরিয়ে দিবেন। সত্যবাদিতা আমানত আর মিথ্যাচার খিয়ানতের সমতুল্য। তোমাদের মধ্য থেকে দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে ওই পর্যন্ত শক্তিশালী, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার অধিকার বুঝিয়ে দিবো। আর অন্যের হক আদায় না করা পর্যন্ত তোমাদের শক্তিশালী লোকেরা দুর্বল হয়ে থাকবে। যে জাতি জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে, সে জাতি অপদস্থ হয়েছে। যে সম্প্রদায়ে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ সে সম্প্রদায়কে রোগাক্রান্ত করে দেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমার অনুসরণ করবেন। আর আমি আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য না করলে আমার অনুসরণ আপনাদের জন্য বৈধ নয়। নামায পড়ুন, আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া করুন।"

মুসা বিন উকবা তার রচিত মাগাযী গ্রন্থে আর আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর সিদ্দীক এ খুৎবা দেন – "আল্লাহ'র কসম, আমি কখনো রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা করিনি, এর প্রতি

আমার মোহও ছিল না, এর জন্য প্রকাশ্য কিংবা গোপনেও প্রার্থনা করিনি। মূলত আমার ভীষণ ভয় হচ্ছিলো এ জন্য যে, যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়! খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমার কোন আরাম ছিল না। আমার প্রতি এক বিশাল কাজ অর্পণ করা হয়েছে, যা আমার গর্দানের বহনযোগ্যতার অতিরিক্ত। কিন্তু আল্লাহ'র ক্ষমতার প্রতি আমার ভরসা ছিল।" এটা শুনে আলী (রাঃ) আর যুবায়ের (রাঃ) বললেন, "আমরা এ কারনে অনুতপ্ত হলাম যে, খিলাফতের পরামর্শে কেন আমরা অংশগ্রহণ করলাম না। আমরা খুব ভালো করে জানতাম যে, আবু বকর সিদ্দীকই খিলাফতের সবচেয়ে বেশী হকদার। কারন তিনি গুহায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী ছিলেন। আমরা তার গুণাবলী সম্পর্কে জানি। আমরা এটাও জানি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবদ্দশাতেই আবু বকরকে নামাযের ইমামতির নির্দেশ দিয়েছিলেন।"

ইব্রাহীম তামিমী থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ) এর কাছে উমর (রাঃ) গিয়ে বললেন, "আমি আপনার হাতে বাইয়াত করবো, কারন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে 'আমীন' (বিশ্বস্ত) বলেছেন, এ কথা আমি চাক্ষুস শুনেছি।" আবু উবাইদা বললেন, "আমি আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করি, কিন্তু আজ কেন মেধাহীনতার পরিচয় দিলেন ? আপনি আমাকে বাইয়াত দিতে চাচ্ছেন, অথচ আপনাদের মধ্যে সিদ্দীক, সানীয়াসনাইনি আর ফিল গার জীবিত।" (টীকাঃ এ তিনটিই হল আবু বকরের উপাধি)

মুহাম্মাদ থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন যে, উমরকে আবু বকর বলেছিলেন, "হাত দিন, আমি আপনার হাতে বাইয়াত করতে চাই।" উমর বললেন, "আপনি আমার চেয়ে বেশী বুযুর্গ।" আবু বকর বললেন, "আপনি আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী।" এভাবে কথাবার্তা চলতে থাকে। অবশেষে উমর বললেন, "আপনি আমার চেয়ে বেশী বুযুর্গ আর আমার প্রতাপ আপনার জন্য থাকবে।" এরপর তিনি আবু বকরকে বাইয়াত দিলেন।

আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) বলেছেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের সময় আবু বকর মদিনার জন্য অন্য কোথাও ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটে আসেন আর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে চুমু দিয়ে বললেন, "আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। জীবিত অবস্থায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেমন সুশ্রী ও পবিত্রতম ছিলেন, মৃত্যুর পরও একই রকম সুদর্শন ও পবিত্রতম রয়েছেন। কাবার রবের কসম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন।" আবদুর রহমান বিন আওফ বর্ণনা করেনঃ এরপর আবু বকর আর উমর আনসারদের কাছে গেলেন। আবু বকর সেখানে গিয়ে ভাষণ দেন। তিনি তার ভাষণে আনসারদের সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে বিধৃত সকল প্রশংসার উল্লেখ করে বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - 'যদি সমস্ত লোক এক বনে আর আনসারগণ অন্য বনে চলে যায়, তবে আমি আনসারদের সাথেই যাবো।' হে সাদ, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সামনে বলেছিলেন, খিলাফত কুরাইশদের জন্য। ভালো লোকেরা ভালো কাজের আর মন্দ লোকেরা মন্দ কাজের আনুগত্য করবে।" সাদ জবাবে বললেন, "আপনি সঠিক বলেছেন। আমরা মন্ত্রী আর আপনারা বাদশাহ।" (আহমদ)

আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ বাইয়াত গ্রহণের পর আবু বকর সিদ্দীক চেহারা দেখে ধারণা করলেন যে, কিছু লোকের মাঝে অসন্তোষের ছাপ বিরাজ করছে। তাই তিনি বললেন, "হে লোকসকল, কোন কাজ তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করে রেখেছে ? আমি কি সর্বপ্রথম মুসলমান হইনি ? ... হইনি ? ... হইনি ?" তিনি নিজের কিছু গুণাবলী বর্ণনা করে বললেন, "তোমাদের মধ্য থেকে আমি সবচেয়ে বেশী খিলাফতের হকদার।"

আহমদ লিখেছেন যে, রাফে তাঈ বর্ণনা করেছেনঃ আমার কাছে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নিজের খিলাফতের সকল ঘটনা বলে শুনিয়েছেন। উমর আর আনসার সাহাবীগণ যা বলেছিলেন, তা আমাকে বলার পর তিনি বললেন, "এরপর লোকেরা আমাকে বাইয়াত দেয়, আর এ কারনে আমি খিলাফতের দায়িত্ব নিলাম যে, কোথাও যেন বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয় আর চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার পর লোকেরা যেন মুরতাদ না হয়ে যায়।"

ইবনে ইসহাক আর ইবনে আবিদ কিতাবুল মাগাযী রাফে থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আমি আবু বকর সিদ্দীককে বললাম, "আপনি আমাকে দু'জন লোকের শাসন থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, অথচ আপনি নিজেই শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলেন কেন ?" তিনি বললেন, "আমি তাদের নিন্দাকারী নই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত বিভক্ত হয়ে যাবে বলে আমার আশংকা ছিল।"

কায়েস বিন আবু হাযেম বলেছেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আমি আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর খেদমতে বসেছিলাম। তিনি বাইয়াতের সব ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, এমন সময় নামাজের ঘোষণা দেওয়া হলো। সাহাবীগণ সমবেত হলেন। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, "উপস্থিতি, আমি স্বেচ্ছায় সম্মত যে, আপনারা অন্য কাউকে খলীফা বানিয়ে নিন। কারন আপনারা যদি আমার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুবহু পথ খুঁজে পেতে চান, তবে তা আমার ক্ষমার অতীত। কারন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়তান থেকে নিরাপদ ছিলেন আর তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে ওহী আসতো।"

হাসান বসরী থেকে নকল করে ইবনে সাদ লিখেছেনঃ বাইয়াত দেওয়ার পর আবু বকর সিদ্দীক মিম্বরে আরোহণ করে হামদ ও সানার পর বললেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হে সাহাবীগণ, যদিও আমি খলীফা হয়েছি, কিন্তু এতে আমি খুশী নই। আল্লাহ'র কসম, যদি আপনাদের মধ্যে কেউ এ কাজের দায়িত্ব নিতে চান, তবে তিনি নিজ হাতে তা গ্রহণ করুন। যখন আপনারা এ গুরুভার একতাবদ্ধ হয়ে আমার উপর চাপিয়েছেন, তখন আমি অবিকল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো করে চালাতে পারবো না, সেটা সম্ভবও না। কারন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহী নাযিল হতো। আমি আপনাদের মতোই একজন মানুষ। আমি কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে সঠিক পথ অনুসরণ করতে দেখবেন, আমার অনুসরণ করবেন। আর চুল পরিমাণ বিচ্যুতি দেখলে সংশোধন করে দিবেন। মনে রাখবেন, শয়তান আমার সাথেও লেগে আছে। যখন আমি রেগে যাবো, তখন আমার থেকে আলাদা হয়ে যাবেন। কবিতার মাধ্যমে আমার প্রশংসা গাঁথা আবৃত্তি করবেন না।"

ইবনে সাদ ও খতীব মালিক এবং তিনি উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর তার ভাষণে হামদ ও সানা পড়ে বললেন, "যদিও আমি আপনাদের নেতা, কিন্তু আমি আপনাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই। কুরআন নাযিল হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নতের পথ দেখিয়েছেন আর আমরা তা খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছি - আপনারা সে পথই অনুসরণ করবেন। বুদ্ধিমান তো সে- ই, যে পরহেজগার; আর পাপাসক্ত ব্যক্তি হল সবচেয়ে বেশী বোকা। জনতার প্রাপ্য বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি মিল্লাতের কাছে দুর্বল। হে উপস্থিতি, আমি সুন্নতের অনুসারী, বিদআতী নই। ভালো কাজ করলে আমাকে সাহায্য করবেন, আর মন্দ কাজ করতে দেখলে সাবধান করে দিবেন। আমি এতটুকুই বলতে চাই। আল্লাহ'র কাছে নিজের আর তোমাদের সবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন, "উল্লেখিত শর্তাবলী ছাড়া কোন ব্যক্তি ইমাম হতে পারে না।"

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মুসতাদরাক গ্রন্থে হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর মক্কা শরীফে চরম ব্যাকুলতা ও বিলাপের সুর উঠে। আবু কুহাফা কান্নার আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে ?" বলা হলো, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন।" তিনি বললেন, "আফসোস, অনেক বড় কাজ ও গুরুদায়িত্ব এসে গেলো।" এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থানে কে বসবেন ?" বলা হলো, "আপনার ছেলে ?" তিনি বললেন, "বনূ আব্দে মানাফ আর বনূ মুগীরা গোত্রদ্বয় কি তা মেনে নিবে ?" বলা হলো, "হ্যা।" তিনি বললেন, "আল্লাহ যাকে বড় করতে চান তাকে কেউ ছোট এবং যাকে ছোট করতে চান তাকে কেউ বড় করতে পারবে না।"

ওকেদী কয়েক পদ্ধতিতে আয়েশা সিদ্দীকা, ইবনে উমর, সাঈদ বিন মুসাইয়াব ইন্তেকালের দিন একাদশ হিজরির বারো রবিউল আউয়াল সোমবারে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে তাবারানী আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন, "আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কখনো মিম্বরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থানে বসেননি, এভাবেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। উমর ফারুক আবু বকর সিদ্দিকের স্থানে আর উসমান গনী উমর ফারুকের স্থানে জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত বসেননি।"

বিবিধ ঘটনাবলী

উমর (রাঃ) বলেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আরবের কিছু লোক মুরতাদ হয়ে বলতে লাগলো, "আমরা নামায পড়বো, কিন্তু যাকাত দিবো না।" আমি আবু বকর সিদ্দীকের কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, "রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হে খলীফা, আপনি মানুষের মনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করুন আর তাদের প্রতি নমনীয়তা দেখান। তারা তো অসভ্য জাতি।" আবু বকর সিদ্দীক বললেন, "আমি আপনার সহযোগিতা কামনা করতাম, কিন্তু আপনি তো আমার ভাবনার প্রাসাদ ধ্বংস

করেছেন। অন্ধকার যুগে আপনি বড়ই কার্যক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করে আপনি অলস হয়ে গেছেন। আমি তাদের মনকে কিভাবে আকৃষ্ট করবো ? আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, আমি কি তাদের জাদু করবো ? আফসোস, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন, ওহী বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ'র কসম, যদি তারা একটি দড়ি দিতেও অস্বীকার করে, আমার হাতে তলোয়ার থাকা পর্যন্ত আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।" উমর (রাঃ) বলেন, "আমি তাকে এ কাজে এতো বেশী কঠোর হাতে দেখেছি যে, তিনি এভাবেই মানুষকে সঠিক পথে এনেছেন।"

আবুল কাসেম বাগবী আর আবু বকর শাফেঈ রচিত ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে এবং আয়েশা (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালে অপবিত্রতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আরবের বৃহৎ অংশ মুরতাদ হয়ে যায়, আনসারগণ পৃথক হয়ে যান। পাহাড়ও এ সমস্যাগুলো বহন করতে পারতো না। কিন্তু আমার পিতা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বিস্ময়কর ধৈর্যের সাথে সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করেছেন আর মতভেদযুক্ত প্রতিটি মাসআলার সঠিক সমাধান দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোথায় সমাহিত করা হবে তা নিয়ে সর্বপ্রথম মতভেদ দেখা যায়। সকলেই এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন আর কেউ কিছু জানতেন না। আবু বকর সিদ্দীক বললেন, "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মৃত্যুর স্থানেই প্রত্যেক নবীকে সমাহিত করা হয়।" দ্বিতীয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাস নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে আবু বকর সিদ্দীক বললেন, "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নবীদের কোন উত্তরাধিকারী নেই। তাদের সকলের সম্পদ সদকা হিসেবে বিবেচিত।"

ওলামায়ে কেরাম বলেন, "সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন নিয়ে মতভেদ হয়। কিছু সাহাবী বলেন, 'নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মস্থান মক্কা শরীফে দাফন করা উচিত। কেউ বলেন, 'মসজিদে নব্বীতে', কেউ বলেন, 'জান্নাতুল বাকীতে', কেউ আবার বাইতুল মুকাদ্দাসের কথা বলেন; অবশেষে আবু বকর সিদ্দীক এ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করলেন, তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো।"

ইবনে যানজুয়া বলেন, "এটা আবু বকরের হাদিসই ছিল। কিন্তু সকলই মুহাজির ও আনসারদেরকে তার বিশাল জ্ঞানের প্রতি ঝুকিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল।"

বায়হাকি ও ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, "এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ'র কসম, আবু বকর খলীফা না হলে পৃথিবীতে কেউ ইবাদাত করতো না।" তিনি এভাবে তিনবার বললেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "হে আবু হুরায়রা, আপনি একথা বলছেন কেন ?" তিনি বললেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামা বিন যায়েদকে সাতশো সৈন্যসহ রোমে পাঠান। তিনি শুষ্ক সীমানা অতিক্রম না করতেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন আর মদিনার পার্শ্ববর্তী আরব জনগোষ্ঠী মুরতাদ হয়ে যায়। সাহাবাগণ আবু বকরকে বললেন, "আপনি উসামা বাহিনীকে ফিরিয়ে নিন, কারন মদিনার পার্শ্ববর্তী লোকেরা মুরতাদ হয়ে গেছে। এখন আর তার প্রয়োজন নেই।" তিনি বললেন, "এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ'র কসম, যদি আল্লাহ'র পয়গম্বরের বিবিদের পা নিয়ে কুকুরের দল টানা হেঁচড়া

করে, তবুও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাহিনী পাঠিয়েছেন, তা আমি ফিরিয়ে নিবো না, আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে পতাকা উড়িয়েছেন তা নামিয়ে নিবো না।” সুতরাং তিনি উসামা বাহিনীকে আবার পাঠালেন। উসামা পথিমধ্যে যে গোত্রের মুখোমুখি হয়েছেন, সকল গোত্রই বাধা দিয়েছে আর পরাজিত হয়েছে। ফলে তারা পরস্পরে এ কথা বলেছে যে - যদি মুসলমানদের শক্তি না থাকতো, তবে তারা এ মুহূর্তে অন্য জাতির প্রতি সৈন্য পাঠাতো না। সুতরাং দেখুন, রোমানদের মোকাবিলায় ফলাফল কি হয়েছিলো। যখন এ বাহিনী রোম সাম্রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করে, তখন উভয় দিক থেকে আক্রমণ হয় আর মুসলিম বাহিনী বিজয় অর্জন করে নিরাপদে ফিরে এলে সকলেই ইসলামকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে।

হযরত উরওয়া (রাঃ) বলেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমূর্ষু অবস্থায় উসামা বাহিনীকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। জরফ নামক স্থানে উসামা পৌঁছলে তার স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়েস লোক মারফত জানালেন, “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তিম শয্যায় শায়িত, আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না।” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল হলে আবু বকরের কাছে উপস্থিত হয়ে উসামা বললেন, “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে রোম সাম্রাজ্যে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সংকটময় অবস্থা। আমার আশংকা হচ্ছে আরবের লোকেরা মুরতাদ হয়ে যেতে পারে। যদি তারা মুরতাদ হয়ে যায়, তবে আমি সর্বপ্রথম তাদের সাথে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত আছি। আর যদি তারা মুরতাদ না হয়, তবে আমি চলে যাবো। আমার সাথে যেসব তরুণ সৈনিক আর বড় বড় সর্দারগণ ছিলেন, তাদেরকে আমি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইছি।” আবু বকর সিদ্দীক লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “আল্লাহ’র কসম, যদি আমার প্রাণ বিপন্ন হয় আর হিংস্র পাখীরা আমার শরীরের গোশত খেয়ে ফেলে, তবুও আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ সামান্যতমও সংশোধন ও পরিমার্জন করবো না।” এ বলে তিনি উসামা বাহিনী আবার পাঠিয়ে দিলেন। (ইবনে আসাকির)

যাহাবী বলেছেনঃ মদিনার চারদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে অনেক গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে আর যাকাত দিতে অস্বীকার করলে আবু বকর সিদ্দীক তাদের কাছে সৈন্য পাঠান। কিন্তু উমর বাধা দেন। সিদ্দীকে আকবর বললেন, “আল্লাহ’র কসম, তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছাগলের বাচ্চার যে যাকাত দিতো, তা এক বছরের জন্য দিতে অস্বীকার করলে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।” উমর বললেন, “আপনি কিভাবে যুদ্ধ করবেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে বলেছেন - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) না বলা পর্যন্ত আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করবো, এ কালেমা পাঠ করলে তার জান ও মাল আমার জিম্মায়। কিন্তু যাকাত দিতে হবে - এর হিসাব আল্লাহ’র জিম্মায়। এবার বলুন কিভাবে যুদ্ধ হতে পারে ?” সিদ্দিকে আকবর বললেন, “আল্লাহ’র কসম, নামায ও যাকাতের মধ্যে পরিবর্তন করার জন্য আমি যুদ্ধ করবো। কারন যাকাত মালের হক, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - যাকাত আদায় করতে হবে।” উমর বললেন, “আল্লাহ’র কসম, আবু বকরের বুক খুলে দেওয়া হয়েছিলো। আমিও বুঝলাম তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।”

উরওয়া (রাঃ) বলেছেনঃ আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মুহাজির ও আনসারদের নিয়ে নজদের নিকটবর্তী হয়ে মুরতাদদের পরাজিত করলে কিছু মন্দ চরিত্রের লোকেরা নিজেদের বউ- বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে যায়। ফলে লোকেরা তাকে বললো, "আপনি ফিরে যান আর সৈনিকদের মধ্যে একজনকে সেনাপতি বানিয়ে পাঠিয়ে দিন।" লোকেরা এ ব্যাপারে জোরাজুরি করলে তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতি বানিয়ে ফিরে এলেন। আসার সময় বললেন, "তারা ইসলামে ফিরে এলে আর যাকাত দিতে সম্মত হলে আপনাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা মদিনায় ফিরে যেতে পারবেন।"

ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেনঃ সিদ্দীকে আকবর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে জিহাদে যাত্রার প্রাক্কালে আলী ঘোড়ার রজ্জু ধারণ করে বললেন, "আমি আপনাকে সে কথাই বলতে চাই যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধে আপনাকে বলেছিলেন - তরবারি কোষবদ্ধ করুন, যাতে আকস্মিক কোন ঘটনাই না ঘটে আর আপনি মদিনায় ফিরে চলুন। আল্লাহ'র কসম, আল্লাহ না করুন, যদি আপনার কিছু হয় তাহলে এখানে এমন কেউ নেই যিনি ইসলামের ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।" (দারা কুতনী)

খানযালা বিন আলী লাইসী বলেছেনঃ খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বাহিনীর আমীর বানিয়ে পাঠানোর সময় নসিহত করলেন, "তাদেরকে পাঁচটি আহকাম পালনের নির্দেশ দিবে। যদি একটি হুকুমও তারা অস্বীকার করে, তবে তাদের সাথে এমনভাবে লড়াই করবে, পাঁচটি আহকাম অস্বীকারকারীদের সাথে যেভাবে লড়াই করো। সেই পাঁচটি আহকাম হলো -

(১) আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাসুল,

(২) নামায পড়তে হবে,

(৩) যাকাত দিতে হবে,

(৪) রোযা রাখতে হবে,

(৫) বাইতুল্লাহ শরীফে এসে হাজ্জ আদায় করতে হবে।"

খালিদ বিন ওয়ালিদ তার বাহিনী নিয়ে জমাদিউল আখির মাসে রওনা দেন। বনী আসাদ ও গাতফান গোত্রের সাথে তার যুদ্ধ হয়। অনেক মুরতাদ নিহত, অনেক বন্দী আর বাকিরা আবার মুসলমান হয়। সাহাবীদের মধ্যে আকাশা বিন মুহসিন আর সাবেত বিন আরকাম খালিদ বিন ওয়ালীদের সাথে ছিলেন। এ বছর রমযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে জান্নাতের নেত্রী ফাতেমা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। যাহাবী বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধারা ফাতেমা থেকেই সূচিত হয়।"

যুবায়ের বিন বাকার বলেছেনঃ ফাতেমা (রাঃ) এর এক মাস আগে উম্মে আয়মান ইন্তেকাল করেন আর শাওাল মাসে আবদুল্লাহ বিন আবু বকরের মৃত্যু হয়। এ বছরের শেষ দিকে খালিদ তার বাহিনী নিয়ে মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যা করার জন্য ইয়ামামায় পৌঁছলে উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

অবশেষে কয়েকটি দুর্গ বিজিত হওয়ার পর হামযা (রাঃ) এর হত্যাকারী ওয়াহশী মুসায়লামাকে হত্যা করেন। এ ঘটনায় যারা শহীদ হোন তারা হলেন – আবু হুযায়ফা বিন উতবা, আবু হুযাইফার গোলাম সালিম, শুজা বিন ওয়াহাব, যায়েদ বিন খাত্তাব, আবদুল্লাহ বিন সহল, মালিক বিন আমর, তোফায়েল বিন আমর দৌসী, ইয়াযিদ বিন কায়েস, আমের বিন বাকার, আবদুল্লাহ বিন মুহরেমা, সায়িব বিন উসমান বিন মাজউন, উবাদা বিন বশর, মাআন বিন আদী, সাবিত বিন কায়েস বিন শামাস, আবু দুজানা, সামাক বিন হরব প্রমুখ।

মুসায়লামা কাযযাবের বয়স হয়েছিলো দেড় শত বছর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ'র চেয়ে বয়সে বড় ছিল।

দ্বাদশ হিজরিতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আলা বিন হাযরামীকে বাহরাইনে পাঠান। সেখানেও লোকেরা ধর্ম ত্যাগ করেছিলো। জাওয়াসী নামক স্থানে লড়াই হয়। মুসলমানরা বিজয় অর্জন করেন। ওমানেও এ ফিতনা মাথাচাড়া দেওয়ার কারণে ইকরামা বিন আবু জাহেলকে তাদের দমনের জন্য পাঠানো হয়। আবু উমাইয়াকে মুহাজিরদের দলপতি করে বাইরে এ ফিতনা দমনের জন্য পাঠানো হয়। যিয়াদ বিন লাবীদ আনসারীকে আরেক দিকে পাঠানো হয় একদল ধর্মত্যাগীকে শায়েস্তা করার জন্য। এ বছর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা আবুল আস বিন রবীআ ইন্তেকাল করেন। সুআব বিন জিসামা লাইসী আর আবু মুরসাদ গুনুভীও এ বছর ইন্তেকাল করেন।

মুরতাদদের ফিতনা দমনের পর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খালিদ বিন ওয়ালিদকে বসরায় পাঠান আর লড়াই করে আয়লা শহর বিজিত করেন। এরপর কিছু সন্ধি কিছু যুদ্ধ করে ইরাকের মাদায়েন শহর দখল হয়। দ্বাদশ হিজরিতে বাইতুল্লাহ যিয়ারত থেকে ফিরে এসে আমর বিন আসকে শামে পাঠান।

শামে তের হিজরিতে যুদ্ধ হয় আর বিজয়ের মুকুট মুসলমানদের মাথায় প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু আবু বকরে (রাঃ) এর কাছে যখন এ সুসংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি মৃত্যু পথযাত্রী। এ যুদ্ধে ইকরামা বিন আবু জাহেল আর হিমাম বিন আসসহ অন্যান্য সাহাবী অংশগ্রহণ করেন। এ বছর মরজুস সফর যুদ্ধ হয় আর এ যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হয়। এ ঘটনায় অন্যান্যদের সাথে ফযল বিন আব্বাস (রাঃ) শহীদ হোন।

কুরআন একত্রিত করার বিবরণ

সহিহ বুখারী শরীফে যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ মুসায়লামা কাযযাবের সাথে যুদ্ধের পর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি এসে দেখলাম, তার কাছে উমর (রাঃ) নীরবে বসে আছেন। আবু বকর আমাকে বললেন, "উমর আমাকে বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক মুসলমান ক্বারি শহীদ হয়েছেন। আমার ভয় হয়, যদি এভাবে মুসলিম ক্বারিগণ শহীদ হতে থাকেন, তাহলে হাফেযদের সাথে কুরআন শরীফও উঠে যাবে। তাই আমি কুরআনকে একত্রিত করতে চাই।" আমি বললাম, "আমি এ কাজ কিভাবে করতে পারি, যা স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি ?" উমর বললেন,

"আল্লাহ'র কসম, এটি সওয়াবের কাজ, এতে কোনই ক্ষতি নেই।" তিনি বারবার অনমনীয়ভাবে এ কথা বলছিলেন, অবশেষে বিষয়টি ভালোভাবে আমার বুঝে আসলো।

যায়েদ (রাঃ) বলেছেনঃ উমর নীরবে শুনছিলেন। আবু বকর (রাঃ) আবার আমাকে বললেন, "তুমি তরুণ ও বুদ্ধিমান। তোমার ব্যাপারে কোন অভিযোগও নেই। তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওহী লেখক। সুতরাং অনুসন্ধান করে তুমি কুরআন জমা করো।"

যায়েদ (রাঃ) বলেছেনঃ এ কাজটি আমার কাছে খুবই দুঃসাধ্য মনে হলো। আমাকে যদি পর্বত উত্তোলনের নির্দেশ দেওয়া হতো, তাহলে আমি একে (পর্বত উত্তোলনকে) তার চেয়ে (অর্থাৎ, কুরআন সংকলনের কাজের চেয়ে) হালকা মনে করতাম।" আমি বললাম, "আপনারা দুজন কেন এ কাজ করতে চাইছেন, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি ?" আবু বকর (রাঃ) বললেন, "এ কাজে কোনই ক্ষতি নেই।" কিন্তু আমি দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লাম আর নিজেকে এ কাজের অনুপযুক্ত মনে করলাম। অবশেষে আল্লাহ আমার অন্তরচক্ষু খুলে দিলেন আর বিষয়টি খুবই সুন্দরভাবে বুঝতে পারলাম। আমি অনুসন্ধান শুরু করলাম আর কাগজের টুকরো, উট ও ছাগলের রানের হাড়, গাছের পাতা, হাফেযদের মুখস্ত জ্ঞান থেকে কুরআন সংগ্রহ করে জমা করলাম। সূরা তাওবার দুটো আয়াত - لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ খুযাইমা বিন সাবেত (রাঃ) ছাড়া অন্য কারো কাছে পাইনি। কুরআন জমা করে আমি তা আবু বকরের কাছে পেশ করলাম, যা মৃত্যু অবধি তার কাছেই ছিলো। এরপর তা উমরের হস্তগত হয়। তার মৃত্যুর পর হাফসা বিনতে উমর (রাঃ) তা সংরক্ষণ করেন।

আলী (রাঃ) এর বরাত দিয়ে আবু ইয়ালা বলেন, "কুরআন শরীফ জমা করার সবচেয়ে বেশী সওয়াব আবু বকর সিদ্দীকের প্রাপ্য। কারন তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম কুরআন শরীফকে গ্রন্থাকারে রূপ দেন।"

তিনি সর্বপ্রথম যা যা করেছেন

আবু বকর সিদ্দীক সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম কুরআন জমা করেছেন আর কুরআনকে মাসহাফ নাম দিয়েছিলেন। তাকে সর্বপ্রথম খলীফা বলা হয়েছে।

আবু বকর বিন আবু মালিকা থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকরকে আল্লাহ'র খলীফা বলা হলে তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খলীফা। আমি এতেই সন্তুষ্ট আর এটাই আমার গৌরব।"

তিনি সর্বপ্রথম খলীফা, যিনি তার পিতার জীবদ্দশায় খলীফা হোন। তিনিই সর্বপ্রথম খলীফা, যার প্রজারা তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছিলো।

বুখারী শরীফে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ আমার সম্প্রদায় জানে যে, আমার উপার্জন পরিবারের খরচ জোগাতে সক্ষম না। আবার, আমি খিলাফতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, ফলে আমার কোনো উপার্জন নেই। সুতরাং, আমার পরিবারকে আমি বাইতুল মাল থেকে খাদ্য দিবো।

আতা বিন সায়েব থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর (রাঃ) বাইয়াতের দ্বিতীয় দিন কিছু চাদর নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় চলেছেন ?" তিনি বললেন, "বাজারে।" উমর বললেন, "আপনি এগুলোর (ব্যবসা) ছেড়ে দিন, আপনি জনগণের খলীফা।" তিনি বললেন, "আমার পরিবার কি খাবে ?" উমর বললেন, "আপনি চলুন, আপনার জন্য আবু উবায়দা (ভাতা) নির্ধারণ করবেন।" তারা আবু উবায়দা (রাঃ) এর কাছে গিয়ে বললেন, "আবু বকর আর তার পরিবার- পরিজনের জন্য একজন মধ্যম মানের মুহাজিরের খোরাকী নির্ধারণ করে নিত্যদিনের খোরাকী এবং শীত ও গ্রীষ্মকালীন পোশাক নির্ধারণ করে দিন। কিন্তু যখন এগুলো পুরনো হয়ে যাবে, তখন এগুলোর পরিবর্তে নতুন কাপড় নিয়ে নিবেন।" তিনি আবু বকরের জন্য প্রতিদিনের খাবার হিসেবে অর্ধেক ছাগলের গোস্ত, শরীর ঢাকার উপযোগী কাপড় আর পেট ভর্তি রুটি নির্ধারণ করলেন।

মাইমুন থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার সময় তার জন্য বার্ষিক দুই হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করা হয়। ফলে তিনি বলেন, "আমার পারিবারিক পরিসর বৃহৎ, এতে আমার চলবে না। আপনাদের প্রদত্ত খিলাফতের দায়িত্ব আমাকে ব্যবসা করতে বাধা দিচ্ছে, কিছু বাড়িয়ে দিন।" ফলে পাঁচশো দিরহাম বৃদ্ধি করা হলো।

হাসান বিন আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) থেকে তাবারানী তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর মৃত্যুর সময় আয়েশা সিদ্দীকাকে বললেন, "যতক্ষণ মুসলমানদের কাজ করবো, যে উটনীর দুধ আমি পান করি, যে পেয়ালা আর চাদর আমি ব্যবহার করি, তা আমার জন্য বৈধ। আমার মৃত্যুর পর সেগুলো উমরকে দিয়ে দিবে, কারন সেগুলো বাইতুল মাল থেকে নেওয়া হয়েছে।" তার মৃত্যুর সময় আয়েশা (রাঃ) সেগুলো উমর (রাঃ) এর কাছে পাঠিয়ে দেন। উমর বলেন, "আল্লাহ আবু বকরের প্রতি রহম করুন, তিনি তার এ সকল কষ্ট আমার কারনে সহ্য করেছেন।"

আবু বিন হাফস থেকে ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেনঃ মৃত্যুর সময় আবু বকর (রাঃ) আয়েশা সিদ্দীকাকে বললেন, "হে আমার কন্যা, যদিও আমি মুসলমানদের খলীফা ছিলাম, কিন্তু আমি কখনোই অর্থ সম্পদ অর্জন করিনি। খুব সাধারণভাবেই খাবার- দাবার করেছি। হাবশী গোলাম, উটনী আর পুরনো চাদর ছাড়া বাইতুল মাল থেকে আমি আর কিছু গ্রহণ করিনি। আমার মৃত্যুর পর এগুলো উমরের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।"

তিনি সর্বপ্রথম বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন। সহল বিন আবী খাইসামা থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ সিদ্দীকে আকবরের যুগে বাইতুল মালে কোন পাহারাদার ছিল না। লোকেরা বললো, "আপনি বাইতুল মালে পাহারাদার নিয়োগ করেননি কেন ?" তিনি বললেন, "তালা লাগিয়ে রাখার পরও পাহারাদারের প্রয়োজন

কি?” বস্তুত, বাইতুল মালে কিছু এলেই তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হতো আর বাইতুল মাল শুন্য হয়ে থাকতো। এক বছর পর বাইতুল মাল আবু বকর তার বাড়িতে স্থানান্তরিত করে নিয়ে যান। যখনই মাল আসতো, তিনি গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন আর কখনো উট, ঘোড়া, অস্ত্র কিনে আল্লাহ’র রাস্তায় দিয়ে দিতেন। একবার তিনি চাদর কিনে মদিনায় বিধবাদের মধ্যে বিতরন করেন। তার মৃত্যুর পর তাকে সমাহিত করে উমর কয়েকজন সম্মানিত সাহাবী - যাদের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আওফ ও উসমান বিন আফফান ছিলেন, তাদের নিয়ে হিসাব পরীক্ষা করার জন্য বাইতুল মালে গিয়ে দেখেন আল্লাহ’র নাম ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই।

আমার (গ্রন্থাকারের) মতে, উক্ত বর্ণনা দিয়ে রাওয়েলে আসকারীদের মতামত খণ্ডিত হয়েছে। তাদের মতে, বাইতুল মালের প্রতিষ্ঠাতা উমর (রাঃ)। তাদের এ অভিমতটি আমি তাদের এক গ্রন্থে দেখেছি। তাদের আরেক রচনায় আমি এটাও দেখেছি যে, আবু বকরের বাইতুল মালের সর্বপ্রথম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন আবু উবায়দা।

হাকিম বলেন, “আবু বকর ইসলামের প্রাথমিক যুগে আতিক উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বুখারী ও মুসলিম শরীফে জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যদি বাহরাইন থেকে গনিমতের মাল আসে, তবে আমি তোমাকে এই এই দিবো।” তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের পর বাহরাইন থেকে গনিমতের মাল এলে সিদ্দীকে আকবর ঘোষণা দিলেন, “এমন কেউ আছেন, যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু পাবেন, অথবা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাউকে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ?” আমি উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, “এখান থেক গ্রহণ করো।” আমি গ্রহণ করলাম, যা গণনা করে পাঁচশত মুদ্রা হলো, কিন্তু তিনি আমাকে দেড় হাজার মুদ্রা দিলেন।

দয়া ও নম্রতা

উনাইসা থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যেঃ আবু বকর খিলাফতের আগে তিন বছর আর খিলাফতের পর এক বছর আমার সাথে ছিলেন। যখন পাড়ার মেয়েরা ছাগল নিয়ে আসতেন, তখন তিনি দুধ দোহন করে দিতেন।

মাইমুনা (রাঃ) বলেছেনঃ আবু বকরের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, "রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হে খলীফা, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।" তিনি বললেন, "সকল মুসলমানের প্রতিও।" (আহমাদ)

আবু সালিম গিফারী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ উমর (রাঃ) এক পঙ্গু ও অন্ধ বৃদ্ধার সেবা করতেন। সে মদিনার পাশে বসবাস করতো। তিনি তাকে খাওয়াতেন। একদিন তিনি তার কাছে গেলে বৃদ্ধা বললেন, "আপনি আসার আগে কে যেন এসে প্রতিদিন আমার সেবা করে যান।" তিনি আশ্চর্য হোন। এমন সময় আবু বকর বেরিয়ে আসেন। সে সময় তিনি খলীফা। তাকে দেখে উমর বললেন, "আল্লাহ'র কসম, আপনি ছাড়া সেই ব্যক্তি কেউ হতে পারেন না।"

আব্দুর রহমান আসবাহানী থেকে আবু নুয়াইম প্রমুখ বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আবু বকর মিম্বরে আরোহণ করেছিলেন, এমন সময় হাসান বিন আলী এসে পড়লেন, সে সময় তিনি কিশোর, তিনি বললেন, "এ মিম্বর আমার বাবার, আপনি নেমে যান।" তিনি বললেন, "তুমি সত্য বলেছো, এ মিম্বর তোমার বাবার।" এ কথা বলে তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন আর ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আলী (রাঃ) বললেন, "আল্লাহ'র কসম, এ সম্বন্ধে তাকে আমি কিছুই বলিনি।" তিনি বললেন, "তুমি সত্যিই বলেছো, আমি তোমাকে সন্দেহ করছি না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ ইসলাম সর্বপ্রথম যে হাজ্জ অনুষ্ঠিত হয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে আবু বকরকে পাঠিয়েছিলেন। এর পরের বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজ্জ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খলীফা হলে তিনি সর্বপ্রথম উমরকে হাজ্জ করার জন্য পাঠান, এরপর তিনি হাজ্জ করেন। তার মৃত্যুর পর উমর খলীফা হলে তিনি সর্বপ্রথম আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) কে হাজ্জের জন্য পাঠান, আর উমর পরের বছর থেকে মৃত্যু অবধি প্রতিবার হাজ্জ করেছেন। উসমান (রাঃ) খলীফা হয়েও সর্বপ্রথম আব্দুর রহমান বিন আউফকেই হাজ্জ অরার জন্য পাঠান।

অসুস্থতা, মৃত্যু, উপদেশ আর উমরকে খলীফা নির্ধারণ

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে সাইফ ও হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর সিদ্দীকে আকবরের মৃত্যুর কারন ছিল এক ও অভিন্ন। তার জীবন বিপন্ন হয় আর সর্বদা দুর্বল হতে থাকেন। অবশেষে তিনি পরপারে যাত্রা করেন।

ইবনে শিহাব থেকে ইবনে সাদ আর হাকিম বিশুদ্ধ সূত্রে লিখেছেনঃ একদিন আবু বকর সিদ্দীকের কাছে হাদিয়ার গোশত আসে। তিনি হারেস বিন কিলদাহ'র সাথে তা আহার করেন। হঠাৎ হারেস বললেন, "রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হে খলীফা, আপনি খাবেন না। আল্লাহ'র কসম, আমার মনে হয় এতে বিষ মেশানো আছে। আপনি দেখে নিবেন, আমরা উভয়ই একই বছর একই দিনে ইন্তেকাল করবো।" আবু বকর খাবার থেকে হাত সংকুচিত করলেন। সেদিন থেকে তারা দুজনই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে এক বছর পর উভয়ে একই দিনে ইন্তেকাল করেন।

শাবী বলেন, "এ দুনিয়ায় আমরা আর কি আশা করতে পারি, (যে দুনিয়ায়) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর আবু বকর - উভয়কেই বিষ খাওয়ানো হয়!"

আয়েশা সিদ্দীকা থেকে ওকেদী আর হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকরের অসুস্থতা এভাবে শুরু হয়েছিলো যে, তিনি জমাদিউল আখের মাসের ৭ তারিখ সোমবার গোসল করেন। সেদিন ঠাণ্ডা পড়েছিলো। তিনি জ্বরে আক্রান্ত হোন। পনেরো দিন অসুস্থ থাকার কারনে তিনি বাইরে এসে নামায পড়তে পারেননি। অবশেষে ১৩ হিজরির জমাদিউল আখের মাসের ২২ তারিখ মঙ্গলবার রাতে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আবুস সফর থেকে ইবনে সাদ ও ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেনঃ সাহাবাগণ আবু বকরের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি অনুমতি দিলে আমরা কোন ডাক্তার দেখাই।" তিনি বললেন, "ডাক্তার তো আমাকে দেখেছেন।" তারা বললেন, "ডাক্তার কি বলেছেন ?" আবু বকর বললেন, "বলেছেন - إني فعال لما أريد (অর্থাৎ, আল্লাহ বলেছেন, আমি যা চাই তা- ই করি)।"

ওকেদী ভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকরের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তিনি আব্দুর রহমান বিন আউফকে ডেকে বললেন, "তুমি উমর ফারুককে কেমন মনে করো ?" আব্দুর রহমান বিন আউফ বললেন, "তিনি আমার চেয়ে জ্ঞানী।" তিনি বললেন, "এরপরও তোমার কোন মতামত থাকলে বলো।" আব্দুর রহমান বিন আউফ বললেন, "আমার মতে এরচেয়েও তিনি বেশী উত্তম।" আবু বকর এরপর উসমানকে ডেকে একই প্রশ্ন করলেন আর জবাবে উসমান বললেন, "তিনি আমার চেয়েও বড় জ্ঞানী।" আবু বকর বললেন, "তবুও তোমার মতামত পেশ করো।" উসমান বললেন, "তার অভ্যন্তরীণ রূপ বাহ্যিক রূপের চেয়ে অনেক বেশী সমৃদ্ধশালী। আমাদের মধ্যে তার মতো আর কেউ নেই।" আবু বকর এরপর সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) আর উসাইদ বিন হুযায়ের (রাঃ) এর সাথেও এ নিয়ে পরামর্শ করেন। উসাইদ বললেন, "আল্লাহ জানেন যে, আপনার পর উমরই সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ'র সন্তুষ্টিকে নিজের সন্তুষ্টি মনে করেন আর আল্লাহ যে কাজে অসন্তুষ্ট, তিনিও সে কাজে অসন্তুষ্ট হোন। তার ভিতরটা বাইরের থেকে উত্তম। এ কাজের জন্য তার চেয়ে দক্ষ আর প্রতাপান্বিত আর কেউ নেই।" তারপর অন্যান্য সাহাবাগণ এলেন। তাদের মধ্যে একজন বললেন, "আপনি আল্লাহ'র প্রতি আনুগত্যশীল কঠোর মেজাজের এক ব্যক্তিকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহ'র দরবারে এর কি জবাব দিবেন ?" আবু বকর বললেন, "আল্লাহ'র কসম, তোমরা তো আমাকে ভীতগ্রস্ত করে ফেললে। তবে আমাকে প্রশ্ন করলে বলবো - হে আল্লাহ, আমি মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করেছি। আমি যা বলেছি, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ।"

এরপর তিনি উসমানকে ডেকে বললেন, "লিখো - বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, এ ওসিয়তনামা আবু বকর বিন আবু কুহাফা দুনিয়ার অন্তিম মুহূর্তে আর পরপারে যাত্রার প্রাক্কালে লিপিবদ্ধ করায়েছেন, যখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস স্থাপন, দুশ্চরিত্রেরা চরিত্রবান আর মিথ্যুকরা সত্যবাদী হয়ে যেতে চায়। হে জনতা, আমি আপনাদের জন্য আমার পর উমরকে খলীফা নির্বাচন করলাম। তার কথা শুনবেন আর তার আনুগত্য করবেন। আমি আল্লাহ, তার রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), দ্বীন ইসলাম, নিজের আর আপনাদের সেবায় ত্রুটি করিনি। আমার বিশ্বাস উমর ইনসাফ করবেন। যদি এমন হয়, তবে আমার অভিব্যক্তি এ অভিমত উপযুক্ত বলে গৃহীত হবে। আর যদি তিনি পরিবর্তন হয়ে যান, তাহলে প্রত্যেক লোকের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আমি আপনাদের কাছ থেকে মঙ্গলময় কাজের আশাবাদী। আমি অদৃশ্যের বার্তাবাহক নই। অত্যাচারী অচিরেই জেনে যাবে যে, সে কোথায় শায়িত হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।"

এরপর ওসিয়তনামা ভাঁজ করে উসমানকে দিলেন। তিনি তা নিয়ে চলে এলেন। লোকেরা স্বেচ্ছায় উমরের কাছে বাইয়াত করলেন। এরপর আবু বকর উমরকে নির্জনে ডেকে যা বলার তা বললেন। উমর চলে আসার পর আবু বকর হাত উঠিয়ে আল্লাহ'র কাছে দুয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমি মুসলমানদের কল্যাণের জন্য এ কাজ করেছি। আমি ফিতনাকে ভয় পেয়ে যা কিছু করলাম, আপনি তো সে ব্যাপারে জানেনেই। আমি এ সম্বন্ধে ইজতিহাদ (গবেষণা) করেছি আর আমার মতে, মুসলমানদের জন্য এমন খলীফা নির্বাচন করেছি, যিনি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম, প্রতাপশালী আর সৎ কাজ প্রত্যাশী। আমি আপনার হুকুমে নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে আপনারই সান্নিধ্যে উপস্থিত হচ্ছি। হে আল্লাহ, আপনিই নিজের বান্দাদের মালিক। বাগডোর আপনারই হাতে। হে আল্লাহ, মুসলিম শাসকদের যোগ্যতা দিন, উমরকে খুলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত করুন আর প্রজা সাধারণের উত্তম জীবনযাপন করার তাওফিক দিন।"

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে ইবনে সাদ আর হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ বুদ্ধিমানদের মধ্যে তিনজন অধিক বুদ্ধিমান। প্রথমজন, আবু বকর সিদ্দীক, তিনি উমরকে খলীফা নির্বাচন করেছেন। দ্বিতীয়জন, মুসা (আঃ) এর স্ত্রী, তিনি বলেছিলেন - তাকে ভৃত্য বানিয়ে নাও। তৃতীয় জন, মিসরের আযীয, তিনি ইউসুফ (আঃ) এর অনুকূলে অভিমত পেশ করে তার স্ত্রীকে বলেছিলেন - তাকে সুন্দর ভালো স্থানে রাখো।

ইয়াসার বিন হামযা (রহঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকরের অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে বললেন, "হে জনতা, আমি আপনাদের জন্য একজনকে খলীফা মনোনীত করেছি, এতে কি আপনারা রাজি আছেন ?" জনতার দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে বললেন, "রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হে খলীফা, আমার সম্পূর্ণভাবে রাজি।" কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে আলী বললেন, "যদি সেই ব্যক্তি উমর হোন, তবে আমরা রাজি আছি।" আবু বকর বললেন, "না, তিনি উমরই।"

আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর মৃত্যুর সময় জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কি বার ?" লোকেরা বললেন, "মঙ্গলবার।" তিনি বললেন, "যদি আজ রাতে আমার মৃত্যু হয়। তবে সমাহিত করতে কালকের অপেক্ষা করবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যতো তাড়াতাড়ি পৌছতে পারি ততোই মঙ্গল।"

আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে ইমাম মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেনঃ বাগানের বিশ ওসক (এক উটের বোঝা সমপরিমাণ এক ওসক) খেজুর দিয়ে তিনি মৃত্যুর সময় বললেন, "মা, আল্লাহ'র কসম, আমি সব অবস্থাতেই তোমাকে খুশী দেখতে চাই। তোমার চেয়ে বেশী ধনী আমি কাউকে পছন্দ করি না। তোমার দুস্থতা আমাকে ভীষণ পীড়া দেয়। স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমি তোমাকে যে খেজুর দিলাম, তা যদি গ্রহণ করো তবে ভালো। নাহলে আমার মৃত্যুর পর তা পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। তোমার অপর দুই বোন আর ভাই আছে। তাদেরকে কুরআনের বন্টন নীতি অনুযায়ী ভাগ দিবে।" আমি বললাম, "বাবা, সেটাই হবে।" যদি এর চেয়েও বেশী সম্পদ তার কাছে থাকতো, তবে তিনি আমাদের দিয়ে যেতেন। আসমা নামে আমার এক বোন ছিল, কিন্তু তিনি দুই বোনের কথা বলেছিলেন। তিনি বললেন, "তোমার সৎ মা হাবীবা বিনতে খারিজা গর্ভবতী, আমার মনে হয় তার পেটে কন্যা সন্তান আছে।"

এ বর্ণনাটিও ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাতে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, আয়েশাকে আবু বকর বললেন, "বিনতে খারিজা গর্ভবতী। আমার ধারণা তার গর্ভে কন্যা সন্তান আছে। আমি তার ব্যাপারেও তোমাকে অসিয়ত করছি।" তার ইন্তেকালের পর উম্মে হাবিবা বিনতে খারিজার গর্ভ থেকে উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন।

ইবনে সাদ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর সিদ্দীক তার সমস্ত সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করেছিলেন, যেভাবে মুসলমানদের সম্পদ এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ'র রাস্তায় ব্যয় করা হয়।

ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, "এক পঞ্চমাংশের চেয়ে আমার কাছে পছন্দনীয় হলো এক চতুর্থাংশ, যা এক তৃতীয়াংশের চেয়ে উত্তম।"

সাঈদ বিন মানসুর তার সুনান গ্রন্থে যাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন, "আবু বকর আর আলী এক পঞ্চমাংশের ওসিয়ত করেছিলেন।"

যাওয়ায়িদুয যুহদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আয়েশা সিদ্দীকার বর্ণনা বর্ণিত করেছেন - "কসম, তিনি এক দিরহামও রেখে যাননি। সব কিছু আল্লাহ'র পথে ব্যয় করে দিয়েছেন।"

ইবনে সাদ প্রমুখ লিখেছেন যে, আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, "সিদ্দীকে আকবরের যন্ত্রণা তীব্র হলে আমি এ কবিতাটি আবৃত্তি করলাম - (ভাবার্থ) - "আপনার বয়সের শপথ, মৃত্যুর হেচকি যখন এসে গেছে আর অন্তর সংকুচিত হয়ে গেছে, তখনো কোন সম্পদ নিয়ে গেলেন না।" তিনি চাদর থেকে মুখ সরিয়ে বললেন, "এ কথা বলো না, বরং বলো -

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

'মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যিই আসবে, এ থেকেই তুমি পালিয়ে বেড়াতে।' (সূরাহ কাফ, ৫০ : ১৯)

দেখো, আমার এ দুটো কাপড় ধুয়ে আমাকে কাফন পড়াবে, কারন নতুন কাপড় মৃত ব্যক্তির চেয়ে জীবিত ব্যক্তির বেশী প্রয়োজন।"

আয়েশা (রাঃ) থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেনঃ অন্তিম মুহূর্তে আমি আবু বকরের কাছে গিয়ে এ কবিতা আবৃত্তি করলাম (যার ভাবার্থ) – "যার অশ্রু সর্বদা প্রবাহিত হয়, তার অশ্রু যখন থেমে যায় না।" তিনি বললেন, "এ কথা বলো না, বরং বলো –

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

'মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যিই আসবে, এ থেকেই তুমি পালিয়ে বেড়াতে।' (সূরাহ কাফ, ৫০ : ১৯) "

এরপর তিনি বললেন, "মনে হয় আমি এ রাতেই ইন্তেকাল করবো।" তিনি মঙ্গলবার রাতে ইন্তেকাল করেন আর সকাল হওয়ার আগেই তাকে দাফন করা হয়।

যাওয়ায়িদুয যুহদ গ্রন্থে বাকার বিন আবদুল্লাহ মাযানী থেকে আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকরের ইন্তেকালের সময় আয়েশা তার শিয়রে বসে এ কবিতা পড়েন (যার ভাবার্থ) – "প্রত্যেক আরোহীর একটি মঞ্জিল আছে, আর প্রত্যেক কাপড় পরিধানকারীর একটি করে হলেও কাপড় আছে।" তিনি বিষয়টি বুঝতে পেরে বললেন, "এভাবে নয় মা। বরং আল্লাহ বলেছেন –

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

'মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যিই আসবে, এ থেকেই তুমি পালিয়ে বেড়াতে।' (সূরাহ কাফ, ৫০ : ১৯) "

আয়েশা (রাঃ) থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ তিনি এ কবিতা পাঠ করেন (যার ভাবার্থ) – "সেই শ্বেত অবয়বে মেঘের বর্ষণ শুরু হয়েছে, তিনি ছিলেন এতিমদের আশ্রয় আর বিধবাদের সহায়।" তিনি এ কবিতা শুনে বললেন, "এ পংতি তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য।"

যাওয়ায়িদুয যুহদ গ্রন্থে উবাদা বিন কায়েস থেকে আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর ইন্তেকালের সময় বললেন, "হে আয়েশা, আমার ব্যবহৃত দুটো কাপড় পরিস্কার করে আমার কাফন পড়াবে। আমি তোমার বাবা, তোমাকে বলে যাচ্ছি যে, যদি আমাকে নতুন কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়, তবে নিষেধ করবে।"

ইবনে আবু মালীকাহ থেকে ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর ওসিয়ত করেন যে, তার স্ত্রী আসমা বিনতে আমীস তাকে গোসল দিবেন আর আব্দুর রহমান বিন আবু বকর গোসলের কাজে মাকে সাহায্য করবেন।

ইবনে সাঈদ বিন মুসাইয়াব থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, “উমর ফারুক এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের মধ্যবর্তী স্থানে আবু বকরের জানাযা পড়ান আর তিনি চার তাকবীল বলেন।”

উরওয়া আর কাসিম বিন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, “আবু বকর সিদ্দীকের কবর যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের বরাবর হয়, এজন্য তিনি আয়েশাকে ওসীয়ত করেন। ইন্তেকালের পর তার কবর এমনভাবে খনন করা হয় যে, তার মাথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধ বরাবর ছিল, আর উভয়ের কবর ছিল একই বরাবর।”

ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, “উমর, তালহা, উসমান, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রাঃ) সিদ্দীকে আকবরকে কবরে নামান।”

এ বর্ণনাটি কয়েকটি পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, “আবু বকরকে রাতেই সমাহিত করা হয়।”

ইবনে মুসাইয়াব বর্ণনা করেছেন, “আবু বকরকে রাতেই সমাহিত করা হয়।” তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, “আবু বকরের ইন্তেকালে মক্কায় কান্নার রোল পড়লে তার পিতা আবু কুহাফা জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি হয়েছে ?’ লোকেরা বললেন, ‘আপনার ছেলের ইন্তেকাল হয়েছে।’ তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ, এটা কি ধরণের কষ্ট ?’ এরপর বললেন; ‘তার স্থলাভিষিক্ত কে হয়েছেন ?’ বলা হলো, ‘উমর।’ তিনি বললেন, ‘মরহুমের সহচর খুবই উত্তম।’

মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন, “আবু কুহাফা শরীয়তের ফারায়েজ সূত্রে আবু বকরের যে পরিত্যক্ত সম্পদ পান, তা তিনি নাতিদের কাছে ফিরিয়ে দেন। তিনি আবু বকরের ছয় মাস কয়েকদিন পর ১৪ হিজরির মুহাররম মাসে ৯৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।”

ওলামায়ে কেরামগণের অভিমত হলো, “পিতার জীবদ্দশায় আবু বকর ছাড়া কেউ খিলাফত পরিচালনা করেননি। আর আবু কুহাফা ছাড়া কোন খলীফার পিতা খলীফার পরিত্যক্ত সম্পদ পাননি।”

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেন, “তিনি দুই বছর সাত মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।”

তারীখে ইবনে আসাকির গ্রন্থে আসমাআয়ী সূত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ আবু বকরের মৃত্যুতে খাফফাফ বিন মাযবাহ আসলামী এ শোক গাঁথা রচনা করেন (ভাবার্থ) - “কোন জীবিত প্রাণীই অমর নয়, পৃথিবী ধ্বংসশীল। মানুষ এ বিশ্বচরাচরের তিমিরে আচ্ছন্ন, মানুষ চেষ্টা করলে মুক্তি পাবে। যদিও তারা সংগ্রাম করে, কিন্তু তারা শয়তানের ষড়যন্ত্রে আক্রান্ত। চোখের প্লাবন থেমে গেছে। প্রাণীকুল আজ বিপন্ন, বয়সের কারনে মৃত্যু, আকস্মিক নিহত বা অসুস্থতার কারনে মৃত্যু - সব মৃত্যুই মানুষকে পীড়া দেয়। তিনি ছিলেন প্রশান্তির মেঘমালা, তিনি সর্বদা শুস্ক প্রান্তরে বৃষ্টি হয়ে ঝড়ে পড়তেন। কসম আল্লাহ’র, আবাল বৃদ্ধবণিতা সবাই তার যুগে সুখ ভোগ করেছে।

সিদ্দিকে আকবর কর্তৃক যে সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে

তাহযীব গ্রন্থে ইমাম নূদী লিখেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সিদ্দীকে আকবর ১৪২ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতো কম সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করার কারন হলো, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর অল্প কিছুদিন জীবিত ছিলেন আর সে যুগে হাদিসের ব্যাপক চর্চা ছিল না। হাদিস শোনা, সংরক্ষণ আর হিফয করার প্রক্রিয়া তাদের পরবর্তী তাবেঈ যুগে ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

আমি (গ্রন্থকার) আগেই উমরের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছি যে, বাইয়াতের সময় উমর ফারুক বলেছেন, "আবু বকর আনসারদের সম্বন্ধে আল্লাহ আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ বর্ণনা করেন।" এ হাদিসটি এ বিষয়ের প্রকাশ্য দলীল যে, কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানে তিনিই সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ও পন্ডিত।

আবু বকর থেকে যে সকল সাহাবী (২৮ জন) হাদিস বর্ণনা করেছেন, তার হলেন - উমর, উসমান, আলী, ইবনে আউফ, ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা, ইবনে উমর, ইবনে যুবাইর, ইবনে আমর, ইবনে আব্বাস, আনাস, যায়েদ বিন সাবিত, বারা বিন আযেব, আবু হুরায়রা, উকবা বিন হারেস, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর, যায়েদ বিন আরকাম, আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল, উকবা বিন আমের জুহানী, ইমরান বিন হাসীন, আবু বারযা আসলামী, আবু সাইদ খুদরী, আবু মুসা আশআরী, আবু তোফায়েল লাইসী, জাবের বিন আবদুল্লাহ, বিলাল, আয়েশা সিদ্দিকা আর আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)। আর আসলাম ও ওয়াসেত আল বাযসহ তাবেঈনের একটি বিরাট জামাআত তার থেকেই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সূত্রসহ আমি আবু বকর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসগুলো উল্লেখ করলাম -

(১) হিজরত সংক্রান্ত হাদিস। (বুখারী, মুসলিম)

(২) পানি সংক্রান্ত হাদিস; অর্থাৎ, সমুদ্রের পানি পবিত্র আর জলপ্রাণী মৃত খাওয়া জায়েয। (দারা কুতনী)

(৩) মিসওয়াক মুখকে পরিস্কার করে আর তা ব্যবহার করা আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। (আহমাদ)

(৪) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাগলের ঝুঁটি খেয়ে নামাজ পড়েছেন এবং অজু করেননি। (বাযযার, আবু ইয়ালা)

(৫) কেউ যেন হালাল খাবার খেয়ে ওযু না করে। (বাযযার)

(৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজরত অবস্থায় আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। (আবু ইয়ালা, বাযযার)

(৭) যিনি আমার পরে নামায পড়াবেন, তিনি একই কাপড় পরিধান করবেন। (আবু ইয়ালা)

(৮) যে ব্যক্তি কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে চায়, সে যেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কেরাতের অনুসরণ করে। (আহমাদ)

(৯) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বললাম, “আপনি আমাকে এমন একটি দুয়া শিক্ষা দিন, যা আমি নামাযে পড়বো।” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “পড়বে –

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(বুখারী, মুসলিম)

(১০) যিনি সকালের নামায পড়বেন, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিবেন। তোমরা আল্লাহ’র প্রতিশ্রুতিতে অনুমান করো না। যে অনুমানের ভিত্তিতে সে নামাযীকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (ইবনে মাজা)

(১১) উম্মতের পিছে নামাজ না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ কোন নবীকে মৃত্যু দেন না। (বাযযার)

(১২) যে ব্যক্তি গুনাহ করার পর ভালোভাবে অজু করে দুই রাকআত নামাজ পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। (আহমাদ, আসহাবে সুনানে আরবাআ, ইবনে হিব্বান)

(১৩) মৃত্যুর স্থানেই প্রত্যেক নবীকে সমাহিত করা হয়। (তিরমিযি)

(১৪) ইহুদী আর খ্রিষ্টানদের প্রতি আল্লাহ’র অভিশাপ, কারন তারা নবীদের কবরগুলোকে উপাসনালয়ে পরিণত করেছে। (আবু ইয়ালা)

(১৫) মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করলে মৃত ব্যক্তির আযাব হয়। (আবু ইয়ালা)

(১৬) খেজুরের টুকরো সমপরিমাণ দান করে হলেও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ নাও। কারন সে দান বাঁকাকে সোজা, মৃত্যুকে সহজ আর ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করে। (আবু ইয়ালা)

(১৭) ফারায়েজ আর সদকার হাদিস। (বুখারী, মুসলিম)

(১৮) একদিন আবু বকর উটের উপর সওয়ার হলে চাবুকটি পড়ে যায়। তিনি উট বসিয়ে সেখান থেকে নেমে চাবুকটি নিলেন। লোকেরা বললেন, “আমাদেরকে কেন নির্দেশ করলেন না ?” তিনি বললেন, “আমার প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের থেকে চাইতে আমাকে নিষেধ করেছেন।” (আহমাদ)

(১৯) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, “কোন হাজ্জ উত্তম ?” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “যেখানে জোরে জোরে আর বেশী বেশী তাকবীর বলা হয় এবং অনেক কুরবানী দেওয়া হয়।” (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

(২০) আসমা বিনতে আমীসের গর্ভে মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নেফাস অবস্থায় গোসল করে হাজ্জ ও উমরার ইহরাম বাধার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। (বাযযার, তাবারানী)

(২১) হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেওয়ার সময় তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যদি আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চুমু দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না।" (দারা কুতনী)

(২২) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা বারাআতের বিধান মক্কায় পাঠিয়ে নির্দেশ করেন যে, এ বছর থেকে মুশরিকরা আর হাজ্জ করতে পারবে না আর কেউ উলঙ্গ হয়েও তাওয়াফ করবে না। (আহমাদ)

(২৩) আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের একটি বাগান, আর আমার মিম্বর জান্নাতের একটি অংশ। (আবু ইয়ালা)

(২৪) আবুল হাইসামের বাড়ি তালাক সংক্রান্ত হাদিস। (আবু ইয়ালা)

(২৫) চান্দী আর স্বর্ণ - এগুলো সমান সমান। যে লেনদেনে কমবেশি করবে, সে জাহান্নামী। (আবু ইয়ালা)

(২৬) সে মুমিনের সাথে প্রতারণা আর কষ্ট দিবে, সে অভিশপ্ত জাহান্নামী। (তিরমিযী)

(২৭) কৃপণ, উচ্চভিলাসী ও অধীনস্তদের কাছে গর্বকারী জালেম বাদশাহ জান্নাতে যাবে না। নিজ মনিবের প্রতি আনুগত্যশীল গোলাম জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহমাদ)

(২৮) গোলামের পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যে তাকে আযাদ করেছে। (যিয়াউল মুকাদ্দাসী)

(২৯) নবীদের সম্পদের কোন উত্তরাধিকার নেই, তাদের সকল পরিত্যক্ত সম্পদ সদকা হিসেবে বিবেচিত। (বুখারি)

(৩০) নবীদের ওয়ারেস হলেন নবীর স্থলাভিষিক্ত খলীফা। (আবু দাউদ)

(৩১) বংশপরিচয় অস্বীকার করা কুফুরী। (বাযযার)

(৩২) তুমি আর তোমার সম্পদ তোমার বাবার জন্য। আবু বকর বলেন, "এ থেকে উদ্দেশ্য হলো, খোরপোষ দেওয়া।" (বায়হাকি)

(৩৩) যার পা আল্লাহ'র রাস্তায় গিয়ে ধুলায় ধূসরিত হবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। (বাযযার)

(৩৪) আমাকে কাফেরদের সাথে লড়াই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (বুখারি, মুসলিম)

(৩৫) খালিদ বিন ওয়ালীদের প্রশংসায় বলেন, "তিনি আল্লাহ'র তলোয়ার। আল্লাহ তাকে কাফির ও মুনাফিকদের উপর বিজয়ী করেছেন।" (আহমাদ)

(৩৬) উমরের চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয় না। (তিরমিযি)

(৩৭) মুসলিম সরকার (অর্থাৎ, খলীফা'র নেতৃত্বাধীন গভর্নমেন্ট) মুসলমানদের প্রাপ্য বুঝিয়ে না দিলে তার উপর অভিশাপ। আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরয (ইবাদাত) কবুল করবেন না। (আহমাদ)

(৩৮) মাআযকে সঙ্গেসার (অপরাধের কারনে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা) সংক্রান্ত হাদিস। (আহমাদ)

(৩৯) ইস্তিগফার করার পর তার প্রতি জেদ করবে না, যদিও সে একই কাজ (অপরাধ) দিনে সত্তর বার করে। (তিরমিযী)

(৪০) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লড়াইয়ের পরামর্শ সংক্রান্ত হাদিস। (তাবারানী)

(৪১) مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

"যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে ..." (সূরাহ আন- নিসা, ৪ : ১২৩)

এ আয়াত সংক্রান্ত হাদিস। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

(৪২) তোমরা এ আয়াত তিলাওয়াত করো –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ

"হে ইমানদার লোকেরা, তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের উপর ..." (সূরাহ আল- মাইদাহ, ৫ : ১০৫)

(আহমাদ, আইম্মায়ে আরবা, ইবনে হিব্বান)

(৪৩) হিজরতের সেই হাদিস, যেখানে গুহায় সিদ্দীকে আকবরের ভীতি দূর করার জন্য তাদের দুজনের সাথে আল্লাহ আছেন আর তিনি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। (বুখারী, মুসলিম)

(৪৪) اللَّهُمَّ طَعْنًا وَطَاعُونًا – সংক্রান্ত হাদিস। (আবু ইয়ালা)

(৪৫) সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। (দারা কুতনী)

(৪৬) আমার উম্মতের মধ্যে পিঁপড়ার গতির চেয়েও গোপনে শিরক বিস্তার লাভ করবে। (আবু ইয়ালা)

(৪৭) আমি বললাম, "ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিন, যে দুয়া সকাল সন্ধ্যা পাঠ করবো।" (আল- হাইসাম বিন কালীব, তিরমিযী)

(৪৮) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আর ইস্তেগফার করো। কারন ইবলিস বলেছে, আমি গুনাহকে ধ্বংস করি, আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও ইস্তেগফার আমাকে ধ্বংস করে। (আবু ইয়ালা)

(৪৯) لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

"তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না ......" (সূরাহ আল- হুজুরাত, ৪৯ : ২)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমি আপনার কাছে নিচু স্বরে কথা বলবো।" (বাযযার)

(৫০) كل ميسر لما خلق له - সংক্রান্ত হাদিস। (আহমাদ)

(৫১) যে জ্ঞাতসারে আমাকে মন্দ বলবে আর আমার কোন আদেশ অমান্য করবে, সে জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিবে। (আবু ইয়ালা)

(৫২) مَا نَجَاتَ فِيْ هَذَا الْأَمْرِ - সংক্রান্ত হাদিস। (আহমদ)

(৫৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, "তুমি বলে দাও, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব।" আমি রওয়ানা করলাম, পথিমধ্যে উমরের সাথে দেখা ...। (আবু ইয়ালা) এ হাদিসটি আবু হুরায়রার বর্ণনা দ্বারা সংরক্ষিত, আবু বকরের দ্বারা নয়।

(৫৪) আমার উম্মতের মধ্যে মুরজিয়া আর কাদেরিয়া - এ দুটো দল জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (দারে কুতনী)

(৫৫) আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। (আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

(৫৬) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক কাজের সময় এ দুয়া পড়তেন - "হে আল্লাহ, আমার জন্য এ কাজ পছন্দনীয় আর উত্তম করে দিন।" (তিরমিযী)

(৫৭) اللهم فارج الهم । দুয়া। (বাযযার, হাকিম)

(৫৮) হারাম পন্থায় প্রতিপালিত শরীর অপেক্ষা আগুন শ্রেয়। অপর বর্ণনায় আছে, অবৈধ পথে লালিত শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আবু ইয়ালা)

(৫৯) শরীরের প্রত্যেক অংশ তোমাদের কর্কশ কথার প্রতিবাদ করবে। (আবু ইয়ালা)

(৬০) মধ্যবর্তী শাবানের রাতে আল্লাহ নিচে অবতরণ করেন। সে রাতে কাফির ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করা হয়। (দারে কুতনী)

(৬১) প্রাচ্যের খুরাসান থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, সূচলা মুখের একদল মানুষ তার অনুগামী হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

(৬২) আমার প্রতি আল্লাহ'র এতটুকু মেহেরবানী যে, আমি সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবো। (আহমাদ)

(৬৩) কিয়ামতের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ সংক্রান্ত হাদিস। (আহমাদ)

(৬৪) লোকেরা যদি একদিকে যায় আর আনসারগণ অন্যদিকে, তবে আমি আনসারদের সাথে থাকবো। (আহমাদ)

(৬৫) কুরাইশগণ এ উম্মতের নেতা। চরিত্রবানরা চরিত্রবানদের আর মন্দ লোকেরা মন্দ কাজের অনুসারী। (আহমাদ)

(৬৬) ওমান সম্বন্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেখানে এক আরব গোত্র রয়েছে। আমার দূত সেখানে গেলে ওমানবাসী তীর ছুঁড়বে।" (আহমাদ, আবু ইয়ালা)

(৬৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আবু বকরকে নিয়ে এমন স্থানে গেলেন, যেখানে ইমাম হাসান (রাঃ) ছেলেদের সাথে খেলছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বললেন, "এর সাথে আলীর চেহারার মিল আছে।" (বুখারী) ইবনে কাসির হাকিমের সূত্র ধরে বলেন, এ হাদিসটি মারফু।

(৬৮) উহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদিস। (তায়ালাসী, তাবারানী)

(৬৯) পঞ্চমবারে চোরকে হত্যা করবে। (আবু ইয়ালা, দায়লামি)

(৭০) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে আইমানের কবর যিয়ারত করতে যেতেন। (মুসলিম)

(৭১) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা বসেছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাত দিয়ে কি যেন সরাচ্ছিলেন। আমরা সেখানে কিছু দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি করছেন ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "দুনিয়া সরাচ্ছি।" (বাযযার) ইবনে কাসির অপর হাদিসের মাধ্যমে এ বর্ণনাটি পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন।

(৭২) একজন বাকি থাকা পর্যন্ত রদবাসীকে হত্যা করো। (তাবারানী)

(৭৩) কোন স্থানে বাড়ি তৈরির আগে সেখানের আবাসন, প্রতিবেশী ও রাস্তাঘাট দেখে নিবে।

(৭৪) আমার কাছে অসংখ্যবার দরূদ প্রেরণ করো। কারন আল্লাহ আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। কোন ব্যক্তি দরূদ পাঠালে সে ফেরেশতা আমাকে বলেন, "অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি দরূদ পাঠিয়েছেন।" (দাইলামী)

(৭৫) এক জুমা অপর জুমার কাফফারা ......! (আকীলী)

(৭৬) আমার উম্মতের জন্য জাহান্নামের উষ্ণতা হবে হাম্মামখানার উষ্ণতার মতো। (তাবারানী)

(৭৭) মিথ্যাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করো, কারন মিথ্যাচার ঈমান ধ্বংস করে দেয়। (ইবনে লা-ল)

(৭৮) বদর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। (দারা কুতনী)

(৭৯) দ্বীন আল্লাহ'র এক মহান ঝাণ্ডা। এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে তা উত্তোলন করবে। (দাইলামী)

(৮০) সূরা ইয়াসিনের ফযিলত সংক্রান্ত হাদিস। (দাইলামী)

(৮১) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ পৃথিবীর জন্য আল্লাহ'র ছায়া ও বর্শা। প্রতিদিন রাতে তিনি সত্তর সিদ্দীকের সওয়াব পান। (আকীলী, ইবনে হিব্বান)

(৮২) মুসা (আঃ) আল্লাহকে বললেন, "অবলা নারীর সেবা করলে কি ধরণের সওয়াব পাওয়া যাবে ?" তিনি বললেন, "আমি তাকে আমার ছায়া দান করবো।" (ইবনে শাহিন, দাইলামী)

(৮৩) হে আল্লাহ, উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন। (তাবারানী)

(৮৪) প্রাণী শিকার করবে না, বৃক্ষের প্রশাখা আর মূল কাটবে না, কারন তারা তাসবীহ পড়ে।

(৮৫) আমি নবী হয়ে প্রেরিত না হলে উমর নবী হতেন। (দাইলামী)

(৮৬) কাপড়ের ব্যবসা করবে। (আবু ইয়ালা)

(৮৭) যে ব্যক্তি নেতা থাকার পরও অন্যের জন্য বিদ্রোহ করবে, তার প্রতি আল্লাহ'র ফেরেশতা আর মানবকুলের অভিশাপ, তাকে হত্যা করো। (দাইলামী)

(৮৮) যে আমার থেকে জ্ঞান অর্জন করবে বা হাদিস লিখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জ্ঞান ও হাদিস সংরক্ষিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সওয়াব পেতেই থাকবে। (হাকিম)

(৮৯) যে নাঙ্গা পায়ে আল্লাহ'র পথে বের হবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন স্বীকৃত পন্থায় তাকে প্রশ্ন করবেন না। (তাবারানী)

(৯০) যে ব্যক্তি জান্নাত আর আল্লাহ'র (আরশের) ছায়ার আকাঙ্ক্ষা করে, সে যেন মুসলমানদের উপর কঠোরতা না করে, বরং রহম করে। (ইবনে লাল, ইবনে হিব্বান, আবুশ শায়েখ)

(৯১) যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ'র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কারো প্রয়োজন মিটাবে, ঐ দিন তার থেকে কোন গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে সেদিন পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। (দাইলামী)

(৯২) যে জাতি জিহাদ ছেড়ে দিবে, সে জাতি শাস্তি ভোগ করবে। (তাবারানী)

(৯৩) মিথ্যা অপবাদ দানকারী জান্নাতে যাবে না। (দাইলামী)

(৯৪) কোন মুসলমানকে অবজ্ঞা করো না। একজন অতি সাধারণ মুসলমানও আল্লাহ'র কাছে অনেক মর্যাদাবান। (দাইলামী)

(৯৫) আল্লাহ বলেন, "তোমরা আমার রহমতের আশা করলে আমার সৃষ্টির উপর রহম করো।" (আবুশ শায়েখ, ইবনে হাব্বান, দাইলামী)

(৯৬) টাখনুর নীচ পর্যন্ত কাপড় পড়ো না। (আবু নুয়াইম)

(৯৭) আমার আবু বকর আর আলী ইনসাফের পাল্লা বরাবর।

(৯৮) শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে অলসতা করো না। তোমরা তাকে দেখো না, কিন্তু সে তোমাদের ব্যাপারে অমনোযোগী নয়। (দাইলামী)

(৯৯) যে শুধু আল্লাহ'র জন্য মসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন। (তাবারানী)

(১০০) যে তরকারীর মধ্যে কাঁচা পেয়াজ ও রসুন খাবে, সে যেন মসজিদে না আসে। (তাবারানী)

(১০১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের শুরু, রুকু যাওয়ার সময় আর রুকু থেকে উঠে রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। (বাইহাকী)

(১০২) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জাহেলকে একটি উট হাদিয়াস্বরূপ দিয়েছেন। (ইসমাঈলী)

(১০৩) আলীর প্রতি তাকানো ইবাদত। (ইবনে আসাকির)

(১০৪) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে ওসীয়ত করেছেন, "তাদের ভালো মানুষদের গ্রহণ করো আর মন্দদের ক্ষমা করে দাও।" (বাযযার, তাবারানী)

কুরআন শরীফের তাফসীর

আবু মালীকা থেকে আবুল কাসিম বাগাবী বর্ণনা করেছেনঃ সিদ্দীকে আকবরকে কোন আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "আমি কোন ভূখণ্ডে আর কোন আকাশের নিচে বসবাস করবো, যদি আমি কিতাবুল্লাহ'র বিপরীতে কোন কিছু করি ?"

ইব্রাহীম তাহমী থেকে আবু উবাইদা নকল করেনঃ আবু বকর সিদ্দীককে - فا كهة وا با - এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "কুরআনের যে অর্থ আমার জানা নেই, তা যদি বর্ণনা করি, তবে কোন যমীন আমাকে ধারণ করবে আর কোন আকাশ তার নিচে আমাকে বসতে দিবে ?"

বায়হাকী প্রমুখ লিখেছেনঃ একদিন আবু বকর সিদ্দীককে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "আমি এর অর্থ যা করেছি, তা আমার অভিমত। যদি তা যথার্থ হয়, তবে আল্লাহ'র করুণা মনে করবে। আর যদি সঠিক না হয়, তবে আমার এ অভিমত শয়তানের কাজ মনে করবে। আমার মতে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কালালাহ ওই সমস্ত সন্তানাদি, যাদের মাতাপিতা নেই।" উমর খলীফা হওয়ার সময় বলেন, "আবু বকর যে বিষয়ে কথা বলেছেন, সে বিষয়ের উপর কথা বলতে আমার লজ্জা লাগে। আমি তার অভিমতকে প্রাধান্য দেই।"

হুলীয়া গ্রন্থে আসওয়াদ বিন হিলাল থেকে আবু নুয়াঈম নকল করেনঃ একদিন আবু বকর সিদ্দীক সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন -

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ

এ দুটো আয়াত সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি ? তারা বললেন, "এর অর্থ হচ্ছে, তার দৃঢ়পদ ছিলেন, কোন গুনাহ করেননি আর ঈমানকে গুনাহ'র সাথে একীভূত করেননি।" তিনি বললেন, "আপনারা একে অপাত্র মনে করেছেন। এর অর্থ হলো, তারা আল্লাহকে নিজেদের প্রতিপালক বলেছেন, এরপর এর উপরই মজবুত ছিলেন, অপর প্রতিপালকের প্রতি আসক্ত হোননি আর ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেননি।"

আমের বিন সাদ বাজালী থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন,

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

"যারা সৎ কর্ম করেছে তাদের জন্য থাকবে উত্তম পুরস্কার (জান্নাত) এবং এর থেকেও বেশী" (সূরাহ ইউনুস, ১০ : ২৬)

এ আয়াতের তাফসীরে আবু বকর সিদ্দীক বলেন, زِيَادَةٌ - থেকে উদ্দেশ্য আল্লাহ'র মুখ।

আবু বকর সিদ্দীক থেকে ইবনে জারীর নকল করেন যে,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

এ আয়াতের অর্থ সম্বন্ধে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি (এ কথা) বলবে আর বিশ্বাস নিয়ে ইহধাম ত্যাগ করবে, সে ঠিক বলে বিবেচিত।"

অভিমত বিচার, ভাষণ আর প্রার্থনা

সুন্নাহ গ্রন্থে ইবনে উমর থেকে আলকায়ী বর্ণনা করেনঃ আবু বকরের কাছে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বললেন, "ভাগ্যে আছে বলেই তো মানুষ যেনা (ব্যাভিচার) করে, নাকি ?" তিনি বললেন, "হ্যা।" সে বললো, "আল্লাহ যেনা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, আবার শাস্তিও দেবেন!" তিনি বললেন, "সত্যিই তো। আল্লাহ'র কসম, আমার কাছে এ সময় কেউ থাকলে আমি তাকে নির্দেশ দিতাম, সে তোমার নাক কেটে নিতো।"

ইবনে আবী শায়বা তার রচনায় যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আবু বকর তার এক অভিভাষণে বললেন, "উপস্থিতি, আল্লাহকে লজ্জা করো। আল্লাহ'র কসম, আমি যখন কোন খোলা প্রান্তরে টয়লেট করতে যাই, তখন আল্লাহ'র থেকে লজ্জায় আমার মাথা ঢেকে নেই।"

আব্দুর রাজ্জাক তার রচনায় উমর বিন দিনার থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর বলেছেন, "আল্লাহকে লজ্জা করো। আল্লাহ'র কসম, আমি টয়লেটে গিয়ে আল্লাহ'র লজ্জায় আমার কোমর টয়লেটের দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে দিতাম।"

সুনান গ্রন্থে আবদুল্লাহ আল- সানাবাহী থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আবু বকরের পিছে মাগরিবের নামায পড়লাম। তিনি প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার পর ছোট্ট দুটো সূরাহ পড়লেন, আর তৃতীয় রাকআতে পড়লেন –

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

"হে আমাদের রব, (একবার যখন) আপনি আমাদেরকে (সঠিক) পথের দিশা দিয়েছেন, (তখন আর) আপনি আমাদের মনকে বাঁকা করে দিয়েন না ......" (সূরাহ আলি ইমরান, ৩ : ১০৮)

ইবনে আয়নিয়া থেকে ইবনে আবী খাইসামা আর ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর সিদ্দীক কোন এক মৃত ব্যক্তির সমবেদনা জানাতে গিয়ে বললেন, "সান্ত্বনায় কোন ক্ষতি নেই, আর কাঁদলে কোন লাভ হবে

না। মৃত্যু পূর্বে যন্ত্রণাদায়ক আর পরে শান্তিদায়ক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালে (জাতির অবস্থার কথা) মনে করো। (সে তুলনায়) তোমাদের বেদনা ক্ষীণ। আল্লাহ তোমাদের অধিকহারে পুরস্কৃত করবেন।"

সালিম বিন উবায়দা থেকে ইবনে আবী শায়বা আর দারা কুতনী বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর সিদ্দীক আমাকে বলেছেন, "আসো, আজকে আবারো আমার সাথে ইবাদত করো, যাতে ভোর হয়ে যায়।"

আবু সফর থেকে আবু কেলায়া বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর সিদ্দীক অধিকাংশ সময় বলতেন, "আমার দরজা বন্ধ করো, যাতে ভোর পর্যন্ত আমি ইবাদাতে লিপ্ত থাকি।"

হুযায়ফা বিন উসাইদ থেকে কিতাবুয যিয়াদাত গ্রন্থে বায়হাকী আর আবু বকর বিন যিয়াদ নিশাপুরি বর্ণনা করেছেন, "লোকেরা যেন সুন্নত মনে না করে, সেজন্য আবু বকর আর উমর চাশতের নামায পড়তেন না।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, "পানির মৃত মাছ খাওয়া জায়েয।"

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) আআম গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি করা মাকরূহ মনে করতেন।

বুখারী শরীফে ইমাম শাফেঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর সিদ্দীক দাদাকে বাবার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করতেন।

ইবনে আবী শায়বা তার রচনায় বর্ণনা করেছেন, আবু বকর সিদ্দীক দাদাকে বাবার অবর্তমানে বাবা হিসেবে আর নাতিকে ছেলের অনুপস্থিতিতে ছেলে বলে গণ্য করতেন।

কাসিম (রাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি বাবাকে অস্বীকার করলে তিনি তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তার মাথায় শয়তান ভর করে আছে।"

ইবনে আবী মালেক বলেছেনঃ তিনি জানাযার নামায পড়ানোর সময় বলতেন, "হে আল্লাহ, আপনার এ বান্দার পরিবার, সম্পদ ও সম্প্রদায় তাকে আপনার কেউ সোপর্দ করেছে। তার গুনাহ যদিও বেশী হয়ে থাকে, কিন্তু আপনার রহমত ও অনুগ্রহ এর চেয়ে অনেক বেশী, আপনি তো দয়াবান।"

সাঈদ বিন মানসুর স্বরচিত সুনান গ্রন্থে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আসেম বিন উমর বিন খাত্তাব তার মায়ের সাথে ঝগড়া করলে আবু বকর মীমাংসা করার পর আসেমকে সম্বোধন করে বললেন, "আসেম, খুব ভালো করে জেনে নাও যে, তোমার মায়ের শরীরের ঘাম আর গন্ধ তোমার চেয়ে হাজার গুণ উত্তম।"

কায়েস বিন আবু হাযেম থেকে বায়হাকি বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি আবু বকরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, "আমার বাবা আমার সব সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে অসহায় করে দিতে চান।" আবু বকর তার বাবাকে বললেন, "যতটুকু আপনার প্রয়োজন, আপনার ছেলের কাছ থেকে ততটুকু নিবেন।" সে ব্যক্তি বললেন, "রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হে খলীফা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি যে - তোমার সম্পদ তোমার বাবার ?" আবু বকর বললেন, "হ্যা, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাই বলেছেন। তবে এর অর্থ এটা না, বরং তার কথার উদ্দেশ্য ছিল - এ থেকে ব্যয় করা।"

আমর বিন শোয়াইবের দাদা বর্ণনা করেছেন, আবু বকর সিদ্দীক ও উমর গোলামের কিসাস হিসেবে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করতেন না। (আহমাদ)

বুখারী শরীফে ইবনে মালিকার দাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাতে দংশন করতে গিয়ে তার দুটো দাঁত ভেঙে গেলে আবু বকর এ ক্ষেত্রে দিয়ত ও কিসাস কোনটিই জারি করেননি।

ইকরামা থেকে ইবনে আবী শাইবা আর বায়হাকি বর্ণনা করেছেন, আবু বকর সিদ্দীক কান কাটার কিসাস হিসেবে পনেরোটি উট গ্রহণ করতেন। এরপর বলতেন, "কান কাটা ক্ষতটি চুল আর পাগড়ির মধ্যে ঢেকে রেখো।"

আবু ইমরান জুনী থেকে বায়হাকি প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে আবু বকর সিদ্দীক সিপাহসালার করে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণের প্রাক্কালে বলেন, "আমি তোমাদেরকে কয়েকটি উপদেশ দিবো, এর উপর অটুট থাকবে - নারী, শিশু, পঙ্গু আর বৃদ্ধাদের হত্যা করবে না, ফলজ বৃক্ষ কাটবে না, বস্তি উচ্ছেদ করবে না, ছাগল ও উট হত্যা করবে না, তবে খেলে কোন ক্ষতি নেই। ফসলের ক্ষেত ধ্বংস আর জ্বালিয়ে দিবে না। আর অপচয় ও কৃপণ থেকে বেঁচে থাকবে।"

আবু বারযা আসলামী থেকে আহমাদ, আবু দাউদ আর নাসাঈ নকল করে লিখেছেনঃ একদিন আবু বকর সিদ্দীক এক ব্যক্তির প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়লে আমি বললাম, "রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হে খলীফা, তাকে হত্যা করুন।" তিনি বললেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর এ কাজ কারো জন্যই বৈধ নয়।"

কিতাবুল ফুতুহ গ্রন্থে সাইফ তার শিক্ষক থেকে বর্ণনা করেছেনঃ উমাইয়া বংশের কিছু মুহাজির সাহাবী ইয়ামামার গভর্নরের কাছে এমন দুজন নারীকে ধরে নিয়ে এলেন, যাদের মধ্যে একজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে, আর অপরজন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা গাইতো। ইয়ামামার গভর্নর শাস্তি হিসেবে তাদের হাত কেটে দিলেন আর দাঁত উপড়ে ফেললেন। আবু বকর এ মর্মে তার কাছে চিঠি লিখলেন - "আমি সংবাদ পেয়েছি যে, আপনি দুজন মহিলাকেই এই এই শাস্তি দিয়েছেন। আপনি যদি শাস্তি প্রদান না করতেন, তবে যে নারী রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, শাস্তি হিসেবে তাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিতাম। কারন নবীগণের মর্যাদা সর্বোচ্চ। বিশেষত, যদি কোন মুসলমান এ

বেয়াদবী করে, তবে সে মুরতাদ। আর যদি কোন জিম্মি করে, তবে সে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিবেচিত হবে। যে নারী মুসলমানদের কুৎসা গায়, সে মুসলমান হলে তাকে আদব ও শরম দিতে হবে, এজন্য হাত পা কাটা উচিত নয়। আর জিম্মি হলে এ কাজ (মুসলমানদের গালমন্দ করা) শিরকের চেয়ে বেশী খারাপ নয়। শিরকের ক্ষেত্রে যেমন ধৈর্য ধারণ করো, এ ক্ষেত্রেও সবর করা আবশ্যক। নমনীয়তা দেখাও। কিসাস ছাড়া হাত পা কাটা আমি মাকরূহ মনে করি, কারন এ শাস্তিপ্রাপ্তরা সর্বদা লজ্জা পায়।"

সুফিয়া বিনতে আবু উবায়দা থেকে মালিক আর দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, এক লোক এক অবিবাহিত যুবতির সাথে যেনা করে আর সে তা স্বীকার করলে আবু বকর সিদ্দীক তাকে বেত্রাঘাত করেন আর ফিদাক অঞ্চলে নির্বাসন দেন।

মুহাম্মদ ইবনে আতিব থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর সিদ্দীকের কাছে এক চোরকে বন্দী করে নিয়ে আসা হলো। চুরির অপরাধে তার হাত পা এর আগে একবার কেটে ফেলা হয়েছিলো। তিনি তাকে হত্যা অরার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "আমি তোমার প্রতি ওই দণ্ড আরোপ করছি, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করে গেছেন। তিনিই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বাধিক জ্ঞানী।"

কাসিম বিন মুহাম্মাদ থেকে মালিক বর্ণনা করেছেনঃ ডান হাত ও ডান পা কাটা ইয়েমেনের এক বাসিন্দা সিদ্দীকে আকবরের বাড়িতে এসে অভিযোগ করলো, "ইয়েমেনের প্রশাসক আমার প্রতি নির্যাতন চালিয়েছে। সে সারারাত নামায আদায় করে।" সিদ্দীকে আকবর তার দীর্ঘ নামাজ দেখে আফসোস করেন। এমন অবস্থায় জানা গেলো যে, আবু বকর সিদ্দীকের সম্মানিতা স্ত্রী আসমা বিনতে আমিসের অলংকার হারিয়ে গেছে। ইয়েমেন থেকে আগত লোকটি সবসময় আবু বকর সিদ্দীক আর অন্যান্য লোকদের সাথেই অবস্থান করছিলো আর সে তার মেজবান, অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দীকের জন্য এ বলে দুয়া করলো, "হে আল্লাহ, এ বাড়িওয়ালার সাথে যে এ আচরণ করেছে, তাকে আপনি শাস্তি দিন।" খোঁজ করার পর সে অলংকার এক স্বর্ণকারের কাছে পাওয়া গেলো। আর ইয়েমেন থেকে আগত লোকটি তা সরবরাহ করেছে। এক ব্যক্তির সাক্ষীর প্রেক্ষিতে সে তার অপরাধ স্বীকার করলে তিনি তার বাম হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "আল্লাহ'র কসম, এ চুরি সম্বন্ধে তার দুয়া আমাকে সন্দিহান করেছিলো।"

আনাস (রাঃ) থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, পাঁচ দিরহাম মূল্যের ঢাল চুরির দায়ে তিনি হাত কাটার নির্দেশ দিতেন।

আবু সালিম থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ আবু বকর সিদ্দীকের খিলাফতের যুগে ইয়েমেন থেকে কিছু লোক এসে কুরআন তিলাওয়াত শুনে খুব কান্নাকাটি করলে তিনি বললেন, "আমাদেরও এ অবস্থা ছিল, তবে পরবর্তীতে মন শক্ত হয়ে গেছে।" আবু নুয়াইম মন শক্ত হওয়ার অর্থ আল্লাহ'র মারেফাত দ্বারা মন শক্ত ও শান্ত হয়ে যাওয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

গারীব গ্রন্থে আবু উবাইদ বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মারা গেছে, সে ভাগ্যবান। সে তো ঝগড়া থেকে পবিত্র ছিল।"

কাবিসা থেকে আইম্মায়ে আরবাআ আর মালিক বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকরের কাছে এক মৃত ব্যক্তির দাদী তার মৃত নাতির পরিত্যক্ত সম্পদের ফারায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তার ভাগ চাইলো। তিনি বললেন, "আপনার অংশ প্রাপ্ত সম্পর্কে কুরআনে কিছু নেই। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সম্পর্কিত কোন ফায়সালাও আমার জানা নেই। আপনি আসুন।" আমি লোকদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে মুগীরা বিন শোবা বললেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দাদীকে ষষ্ঠাংশ প্রদান করেছেন।" তিনি বললেন, "তোমার মত কারো এ কথা মনে আছে কি ?" মুহাম্মাদ বিন মাসলামা দাঁড়িয়ে তার কথার প্রতি সমর্থন জানালে তিনি তাকে ষষ্ঠাংশ প্রদান করলেন।

কাসিম থেকে মালিক আর দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, মৃত ব্যক্তির দাদী আর নানী তার কাছে উপস্থিত হয়ে মিরাস চাইলে তিনি নানীকে অংশ দিলেন।

বদরী সাহাবী আব্দুর রহমান বিন সহল আনসারী আবেদন করলেন, "রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হে খলীফা, আপনি মৃত ব্যক্তির সম্পদ (দাদী ও নানীর মধ্যে) বন্টন করেছেন। কিন্তু তার ওয়ারিশরা যদি তাদের না চিনে ?" (এরপরও) তিনি তাদের অংশ দিয়েছেন।

আয়েশা সিদ্দীকা থেকে আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেনঃ এক মহিলা স্বামীর থেকে তালাক নিয়ে আব্দুর রহমান বিন যুবাইরের সাথেও তার কোন এক গোপন বিষয়ে বনিবনা না হওয়ায় তার থেকেও তালাক নিয়ে আগের স্বামীকে বিয়ে করতে চাইলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস না করলে তোমার তালাক বৈধ নয়।" এ হাদিসটি বুখারী শরীফেও আছে। তবে আব্দুর রাযযাক এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে - সে মহিলা নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কছে দুইবার উপস্থিত হয়ে বললেন, "আব্দুর রহমান আমার সাথে সহবাস করেছে।" এরপরও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন আর এ বলে দুয়া করলেন, "ইয়া আল্লাহ, এ নারী বিচ্ছিন্ন স্বামীর মিলন প্রত্যাশায় তার কাছে ফিরে যেতে চায়। তার দ্বিতীয় বিয়ে পূর্ণ করবেন না।" এ মহিলা আবু বকর সিদ্দীক আর উমর ফারুকের খিলাফতকালেও একই আবেদন নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হয়, কিন্তু তারা দুজনই তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

উকবা বিন আমের থেকে বায়হাকি বর্ণনা করেছেনঃ উকবাকে দূত বানিয়ে আমর বিন আস আর শারজীল বিন হাসানা তার হাতে সিরিয়ার (লোকের) মাথার খুলি আবু বকরের কাছে পাঠান। দূত এসে পৌঁছলে তিনি এ ধরণের কাজ করতে নিষেধ করলেন। উকবা বললেন, "রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হে খলীফা, তারাও তো আমাদের সাথে এমন আচরনই করেছে।" তিনি বললেন, "আমর বিন আস আর শারজীল কি তাহলে পারস্য আর রোমানদের অনুসরণ করছে ? কাউকে হত্যা না করে অগ্রসর হও। অনুসরণের জন্য কুরআন আর হাদিসই যথেষ্ট।"

বুখারী শরীফে কায়েস বিন আবু হাযেম থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ যায়নব নামের এক মহিলা কোন কথা বলতো না। আবু বকর তাকে কথা বলতে বললেও সে কথা বললো না। লোকেরা বললো, "সে নীরবতার সাথে হাজ্জ

আদায় করেছো।” তিনি তাকে বললেন, “কথা বলো, তোমার এ আচরণ জাহেলিয়াতের কাজ। ইসলামে এ ধরণের বৈরাগ্য জীবনযাপন নাযায়েজ।” এ কথা শুনে সে কথা বলতে লাগলো আর জিজ্ঞেস করলো, “আপনি কে ?” আবু বকর বললেন, “আমি মুহাজির।” মহিলা বললো, “আপনি কোন মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ?” তিনি বললেন, “আপনি তো জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। আমি আবু বকর।” সে বললো, “জায়েলিয়াতের পর আল্লাহ এ দ্বীন পাঠিয়েছেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি আমাদেরকে এর উপর প্রতিষ্ঠিত করবে ?” তিনি বললেন, “তোমাদের ইমামগণ কর্তৃক।” সে বললো, “ইমাম কে ?” তিনি বললেন, “তোমার সম্প্রদায়ের কি কোন নেতা নেই, যিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন ?” সে বললো, “জি, রয়েছেন।” তিনি বললেন, “তিনিই ইমাম।”

আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বুখারী বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকরের এক গোলাম ছিল। সে শ্রমিকের কাজ করতো আর তিনি তার জন্য বেতন নির্ধারণ করেছিলেন। উভয়ে একত্রে খাবার খেতেন। একদিন গোলাম কিছু জিনিস আনলো আর আবু বকর তা থেকে কিছুটা খেয়ে ফেললেন। গোলাম বললো, “আপনি কি জানেন, এ জিনিস কিভাবে সংগৃহীত হয়েছে ?” তিনি পুরো বিষয় জানতে চাইলে সে বললো, “জাহেলিয়াতের যুগে আমি ভবিষৎবাণী করতাম। আর আপনি জানেন যে, সত্য ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ভবিষৎবাণী করা হয়। আমি এক ব্যক্তিকে ভবিষৎবাণী দ্বারা প্রতারিত করেছিলাম। আজ সেই বদলা হিসেবে আমাকে এ জিনিস দিয়েছে, যা আপনি খেয়েছেন।” এটা শুনে তিনি সাথে সাথে তা বমি করে ফেলে দিলেন।

যুহদ গ্রন্থে আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে সিরিন বলেছেন, “আবু বকর সিদ্দীক ছাড়া আমি কাউকে সন্দেহযুক্ত খাবার আহারের পর বমি করতে শুনিনি।” এরপর তিনি উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

আসলাম থেকে নাসাঈ বর্ণনা করেছেনঃ একদিন উমর ফারুক (রাঃ) দেখলেন যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নিজের জিহ্বা টেনে ধরে বলছিলেন, “এটা আমাকে খারাপ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।”

গারীব গ্রন্থে আবু উবায়দ লিখেছেনঃ আব্দুর রহমান বিন আউফকে নিজ আত্মীয়ের সাথে লড়াই করতে দেখে আবু বকর সিদ্দীক বললেন, “আত্মীয়- পরিজনের সাথে লড়াই করো না, এ লড়াই বিবাদকে জিয়ে রাখে, ফলে লোকেরা তোমার সমালোচনা করবে।”

মুসা বিন উকবা (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তার অভিভাষণে বলেন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ’র জন্য, আমি তার তারীফ করছি, তার কাছে প্রার্থনা করছি আর মৃত্যুর পর তার কাছে মর্যাদা কামনা করছি। আমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর কোন কাজে তার কোনই অংশীদার নেই; আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ’র বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যসহ সুসংবাদ প্রদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী আর প্রদীপমালার উজ্জ্বল রশ্মি করে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত লোকদের ভীতি প্রদর্শন আর অবিশ্বাসীদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। যারা আল্লাহ ও তার

রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য করবে, তারা সুপথ প্রাপ্ত। আর যারা বক্রতা দেখাবে, তারা পথভ্রষ্ট।

হে লোকসকল, আমি আপনাদেরকে ওসীয়ত করছি আল্লাহকে ভয় করার। আল্লাহ হিদায়াতের যে পথ আপনাদেরকে দেখিয়েছেন, সে পথে আপনারা অটল থাকবেন। কালেমায়ে ইখলাসের পর হিদায়াতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নেতার আনুগত্য করা, কারন আল্লাহ আর সেই নেতা, যিনি সত্যের আদেশ ও অসত্যের প্রতি বাধা প্রদান করেন, তার আনুগত্য করলে কল্যাণ লাভ করবে আর তার প্রতি যে হক ছিল সেটাও আদায় হবে। নফসের আনুগত্য করবেন না। আত্মার ভোগমুক্ত ব্যক্তি কল্যাণকামিতার নাগাল পাবেন। অহংকার করবেন না। ভেবে দেখুন, অহংকারী ব্যক্তি তো মাটি থেকে সৃষ্ট আর একদিন সে মাটির সাথেই মিশে যাবে। আজ যে জীবিতকাল বদ দুয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবেন। সবসময় নিজের অন্তরকে মৃত মনে করবেন। অটুট ও দৃঢ়তা অভিপ্রায় পোষণ করবেন। কারন পোকতা ইরাদা নেক আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে। (মন্দ কাজ) পরহেয করবেন। (মন্দ কাজ) বর্জন করা অনেক লাভজনক। আমল করবেন, কারন আমল কবুল করা হয়। যে কাজ আল্লাহ'র আযাবের প্রতি ঠেলে দেয়, সে কাজ বাদ দিন। আর যে কাজের মধ্যে আল্লাহ তার রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে কাজ সবসময় করবেন। বুঝেন আর বুঝান; ভয় করুন আর ভয় দেখান। কোন কাজ করলে ধ্বংস অবধারিত, আর কোন কাজ করলে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে নিজের নফস সম্পর্কে ওসীয়ত করতে কুণ্ঠিত হইনি। আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী। তার সাহায্য ছাড়া ভালো কাজ করা আর মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি কারো নেই। নিষ্ঠার সাথে ইবাদাত করবেন, আল্লাহ'র আনুগত্য করবেন, নিজ অংশ সংরক্ষণ করবেন আর হিংসা পরায়ণ হবেন না। ফরয ইবাদতে কমতি থাকার কারণে নফল ইবাদত বেশী বেশী করবেন।

হে আল্লাহ'র বান্দাগণ, নিজেদের ভাই আর বন্ধুগণ যারা পরকালের চলে গিয়েছেন, তারা যা করে গেছেন, তা- ই তাদের প্রাপ্য।

সৃষ্টজীব আর তাদের জাতের মধ্যে আল্লাহ'র কোন শরীক নেই, কোন বংশ পরম্পরাও নেই। তিনি নিজ মেহেরবানীতে মাখলুককে ক্ষমা করেন। মাখলুক ইবাদত আর আনুগত্য থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি মাখলুকের উপর মুসীবত চাপিয়ে দেন না। যে ভালো কাজের ফলাফল জাহান্নামে, সেটি কোন ভালো কাজই না; আর যে মন্দ কাজের পরিণাম জান্নাত, সেটা তো কোন মন্দ কাজই না। আমি এটাই বলতে চাই। আমি আল্লাহ'র কাছে আপনাদের আর নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম এবং তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর আল্লাহ'র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক।"

আবদুল্লাহ বিন হাকিম থেকে হাকিম ও বায়হাকি বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আমাদের সামনে এক অভিভাষণ প্রদান করলেন। তিনি হামদ ও সানার পর বললেন, "আমি আপনাদের ওসীয়ত করছি – আল্লাহকে ভয় করুন, প্রশংসিত পরিবারের গুণকীর্তন করুন আর আর আপনাদের প্রবল বাসনাকে ভয়ের সাথে মিলিয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা যাকারিয়া (আঃ) এর বংশের প্রশংসা করেছেন এভাবে –

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

'নিশ্চয়ই তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তো, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো আর তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।' (সূরাহ আল- আম্বিয়া, ২১ : ৯০)

আল্লাহ'র বান্দাগণ, মনে রাখুন, আল্লাহ আপনাদের অন্তরগুলো নিজের অধিকারের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছেন আর এ বিষয়ে তিনি আপনাদের থেকে প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন। আর তিনি আপনাদের থেকে নশ্বর দুনিয়াকে অবিনশ্বর আখিরাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। আপনাদের কাছে আল্লাহ'র যে পবিত্র কালাম আছে, তার দীপ্তি কখনোই নিভে যাবে না আর এর রহস্য কখনোই নিঃশেষ হবে না। আপনারা ঐশী কিতাবের আলোয় আলোকিত হোন, এ কিতাবের নসীহত গ্রহণ করুন আর যেদিন কোন আলো থাকবে না সেদিন এ কিতাবের আলো পাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিন। আল্লাহ আপনাদের সৃষ্টি করেছেন ইবাদত করার জন্য আর কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করেছেন। তারা আপনাদের সব কাজ সম্পর্কে জানেন।

হে আল্লাহ'র বান্দাগণ, আপনারা প্রত্যেক মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন, এ সম্পর্কিত জ্ঞান আপনাদের অগোচরে রয়েছে। যদি আপনারা এ সম্পর্কে জানতেন, তবে মৃত্যুর সময় আপনারা নেক আমল করতেন, আর এমনটা আল্লাহ'র রহমত ছাড়া আপনারা পাবেন না। মৃত্যুর প্রাক্কালে কিছু ভালো আমলের চেষ্টা করুন, যাতে মন্দ কাজ থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন। আপনাদের পূর্বে অনেক জাতি ছিল, মৃত্যুর সময় এলে তারা শিরক করেছে আর আল্লাহকে ভুলে গেছে। আমি আপনাদের হুশিয়ার করছি - আপনারা তাদের মতো হবেন না। সুতরনাগ তাড়াতাড়ি করুন, তাড়াতাড়ি করুন, ক্ষমা প্রাপ্তির চেষ্টা করুন। মৃত্যু তো খুবই নিকটবর্তী। ভীতি ছড়ানোর জন্য মৃত্যু ধেয়ে আসছে। হে মুসলমান, ক্ষমা আপনাদের জন্যই।"

হুলীয়ার ইয়াইয়া বিন কাসির থেকে ইবনে আবিদ দুনিয়া আর আবু নুয়াইম বর্ণনা করেনঃ আবু বকর এক ভাষণে বলেন, "উজ্জ্বল চেহারার সেই তরুণেরা কোথায়, যাদের যৌবন দেখে লোক পেরেশান থাকতো ? রাজা- বাদশাহরা কোথায়, যারা শহর আর দুর্গ নির্মাণ করেছে ? যারা লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে তারা কোথায় ? তাদের প্রতাপ তো আজ খর্ব হয়েছে। যুগের আবর্তে তারা আজ অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে। (সুতরাং) সব সময় ভালো আমল করুন, আর নেক কাজের প্রতি ধাবিত হোন।"

যুহদ গ্রন্থে সালমান (রাঃ) থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আবু বকরের কাছে উপস্থিত হয়ে সালমান বললেন, "আমাকে নসীহত করুন।" তিনি বললেন, "হে মুসলমান, আল্লাহকে ভয় করো আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, অচিরেই প্রত্যেক গোপন কথা প্রকাশ পেয়ে যাবে আর লোকেরা জেনে নিবে প্রত্যেক জিনিসে তোমার অংশ কতটুকু তুমি খেয়েছো আর কি রেখেছো। মনে রেখো, যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার নিরাপত্তা আল্লাহ'র যিম্মায়। আর যার যিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ, তাকে কে আঘাত করতে পারে ? আর যে আল্লাহ'র সাথে প্রতিশ্রুতি ভাঙবে, তিনি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" তিনি আরো বললেন, "একে একে নেককার বান্দাদের উঠিয়ে নেওয়া হবে। অবশেষে আটার বোঝার মতো অসমর্থ কিছু লোক থেমে যাবে, যাদের সাথে আল্লাহ'র কোনোই সম্পর্ক থাকবে না।"

মুআবিয়া বিন কাররাহ থেকে সাঈদ বিন মানসুর বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর সিদ্দীক অধিকাংশ সময় এ দুয়া করতেন, "হে বিশ্ব প্রতিপালক, আমার শেষ বয়সটাও সুন্দর করে দিন। নেক আমলে থাকা অবস্থায় যেন আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। আপনার সাথে সাক্ষাতের দিনটা যেন সকল দিনের চেয়ে উত্তম হয়।"

যুহদ গ্রন্থে হাসান (রাঃ) থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি অধিকাংশ সময় এ দুয়া করতেন - "হে আমার রব, আমি সেই জিনিষের প্রার্থনা করছি, যা আমাকে নিরাপত্তা দিবে। হে আমার রব, আমাকে আপনার সন্তুষ্টি আর জান্নাতের বুলন্দ মর্তবা দান করুন।"

আরফাজ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলতেন, "যে আল্লাহ'র ভয় নিয়ে চলাফেরা করে, সে যেন আল্লাহ'র ভয়ে কাঁদে, নাহলে সে যেন কাঁদার ভান করে।"

আযরা বর্ণনা করেছেন যে আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, "জাফরান ও স্বর্ণের সংমিশ্রণে রক্তিম বর্ণ মেয়েদের ধ্বংস করে দিয়েছে।"

মুসলিম বিন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন যে আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, "মুসলমানগণ প্রতিটি কাজের প্রতিদান পাবেন, এমনকি সামান্যতম দুঃখ, জুতার ফিতা ছিড়ে যাওয়া আর সম্পদ কম হওয়ারও।"

মাইমুন বিন মিহরান থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ একটি পাখি শিকার করে আবু বকর সিদ্দীকের কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি পাখিটিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে বললেন, "আল্লাহ'র তাসবিহ ছেড়ে দেওয়ার কারনে প্রাণীকে মেরে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আর বৃক্ষ কেটে ফেলা হয়।"

বুখারী আদব অধ্যায়ে আর আবদুল্লাহ বিন আহমাদ যাওয়ায়িদুয যুহদ গ্রন্থে যানাবাহি থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি আবু বকর সিদ্দীকের কাছে শুনেছেন যে আবু বকর বলেছেন, "আল্লাহ'র ওয়াস্তে এক ভাই অপর ভাইয়ের জন্য যদি দুয়া করে, তবে অবশ্যই তা কবুল হবে।"

যাওয়ায়িদুয যুহদ গ্রন্থে উবাইদ বিন উমায়ের থেকে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকর সিদ্দীকের কাছে লবীদ শায়ের উপস্থিত হয়ে কবিতার এ পংক্তিটি আবৃত্তি করলো - "মনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া প্রতিটি বস্তু বাতিল।" তিনি বললেন, "আপনি সত্য বলেছেন।" কবি আবার দ্বিতীয় পংক্তিটি আবৃত্তি করলো - "সকল নেয়ামত ধ্বংসশীল।" তিনি বললেন, "আপনি অসত্য বলছেন। আল্লাহ'র কাছে এই এই নিয়ামতগুলো আছে, যা কখনোই ধ্বংস হবে না।" কবি লাবীদ চলে গেলে তিনি বললেন, "কবি হেকমত অর্থাৎ সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা বলে থাকেন।"

আবু বকরের যেসব বাণী আল্লাহ'র ভয় সম্পর্কিত

মাআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে আবু আহমদ হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এক বাগানে ঢুকে গাছের ছায়ায় একটি পাখি দেখে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন, "হে পাখি তুমি বড়ই ভাগ্যবান। গাছের ফল খাচ্ছো, গাছের ছায়ায় থাকছো, তোমার কোন হিসাব নেই। হায়, আবু বকর যদি তোমার মতো হতো!"

বায়হাকি থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ প্রশংসা করার সময় তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ, আপনি আমার নফস সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী জানেন। আর আমি নিজের ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে বেশী জানি। হে আল্লাহ, তারা আমার ভালো কাজ সম্পর্কে যে ধারণা করে, আমাকে অনুরূপ করে দিন। আর আমার যে গুনাহ তারা জানে না, তা ক্ষমা করুন।"

যুহদ গ্রন্থে আহমাদ লিখেছেন যে, আবু বকর বলেছেন, "আমি যদি মুমিনের একটি পশমও হতাম, তবে তা আমার কাছে অধিক প্রিয় হতো।"

যুহদ গ্রন্থে মুজাহিদ থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ ইবনে যুবাইর নামাযের সময় খুবই বিনয়ের সাথে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন, যেন তিনি শুকনো একটি কাঠের টুকরো। আবু বকরের অবস্থাও ছিল একই।

হাসান বলেছেন যে, আবু বকর বলতেন, "আল্লাহ'র কসম, আমি যদি গাছ হতাম, আমাকে কেটে ফেলতো, আমি কেটে যেতাম – এটাই আমার জন্য প্রিয় ছিল।"

কাতাদা বলেছেনঃ এ বর্ণনা আমার জানা, যা আবু বকর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। আবু বকর এক মহিলার মৃত্যুর সময় বারবার তার বালিশের দিকে দেখছিলেন। মহিলার মৃত্যুর পর এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বালিশের নিচে পাঁচ বা ছয় দিনার দেখিয়ে হাতে হাত মেরে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়ে বললেন - "হে অমুক, আমি চাইনি তোমার এ অবস্থা হোক।"

সাবিত বানানী বলেছেন যে, তিনি সবসময় এ কবিতা পাঠ করতেন - "তুমি মানুষের সংবাদ বহন করছো, কখন তোমার সংবাদ তারা বহন করবে সেটা কি জানো ?"

ইবনে সিরীন থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সিদ্দীকে আকবরের খিলাফতকালে লোকেরা অসঙ্গত কথা বলতে ভয় করতো না। তারপর ফারুকের আযমের (উমরের) সময় লোকেরা তাই করতো। বিচারের সময় কুরআন ও হাদিস থেকে রায় দিতে না পারলে তিনি রায় ঘোষণার সময় বলতেন, "আমি এ রায় ঘোষণার ব্যাপারে ইজতিহাদ করেছি। যদি তা সঠিক হয়, তবে মনে করবে এটি আল্লাহ'র পক্ষ থেকে হয়েছে; আর যদি তা সঠিক না হয়, তবে আমি আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

স্বপ্নের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার

সাঈদ বিন মুসাইয়াব থেকে সাইদ বিন মানসুর বর্ণনা করেছেনঃ আয়েশা সিদ্দীকা একবার স্বপ্নে দেখেন, তার ঘরে তিনটি চাঁদ উদিত হয়েছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা নেওয়ার জন্য আবু বকরকে এ কথা বললে তিনি বললেন, "এ স্বপ্ন সত্য হলে তোমার ঘরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিন মনীষীর দাফন হবে।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনি বললেন, "হে আয়েশা, তোমার দেখা স্বপ্নে তিন চাঁদের মধ্যে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

উমর বিন শারজীল থেকে সাঈদ বিন মানসুর বর্ণনা করেছেনঃ একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেছিলেন – "আমি একদল কালো ছাগলের পশ্চাৎপদ অনুসরণ করছি। এরপর দেখলাম, সাদা ছাগলের পালের পিছে পিছে চলছি। আর এক সময় সাদা ছাগলের দল কালো ছাগলের ভিড়ে হারিয়ে গেলো।" আবু বকর সিদ্দীক বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাদা ছাগল আরবের মুসলমান, আর কালো ছাগলের দল অনারব মুসলমান। ভবিষ্যতে আরব মুসলমানদের তুলনায় অনারব মুসলমানদের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাবে।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "সত্য বলেছো। সকালে ফেরেশতা এসে আমাকে এমন ব্যাখ্যাই দিয়ে গেছেন।"

সাঈদ বিন মানসুর থেকে ইবনে আবী লায়লা বর্ণনা করেছেনঃ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি একটি কুপের পানি সিঞ্চন করছেন, আর তার পিছে কৃষ্ণকায় ছাগলের পাল এসে দাঁড়ায়। আর এর পিছে এমন একদল ছাগল আসে, যাদের লালবর্ণের পশুগুলো সাদার উপর প্রাধান্য পায়। আবু বকর এ প্রেক্ষিতে উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মুহাম্মাদ বিন সিরীন থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ এ উম্মতের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) স্বপ্নের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার।

ইবনে শিহাব থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ আমরা একই সোপানে আরোহণ করতে গিয়ে আমি তোমার চেয়ে দেড় সিঁড়ি এগিয়ে গেলাম। এটা শুনে আবু বকর সিদ্দীক বললেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আল্লাহ আপনাকে নিজের রহমত আর মাগফেরাতের মাধ্যমে আগেই আহবান জানাবেন। আর আমি আপনার দেড় বছর পর ইন্তেকাল করবো।"

আব্দুর রাযযাক তার রচনায় আবু কিলাবার বরাত দিয়ে লিখেছেনঃ এক ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দীককে বললেন, "আমি স্বপ্নে নিজেকে রক্ত প্রস্রাব করতে দেখেছি।" তিনি বললেন, "মনে হয় তুমি হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হও। আল্লাহ'র কাছে তাওবা করো এবং এমনটা করো না।"

<u>ফায়দাঃ</u> বায়হাকি দালায়েল গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর বিন আস (রাঃ) কে দলপতি বানিয়ে এক যুদ্ধে পাঠালেন। এ দলে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আর উমর ফারুক (রাঃ) ছিলেন। রনাঙ্গনে পৌঁছে আমর বিন আস আগুন জ্বালাতে নিষেধ

করলে আবু বকর সিদ্দীক তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমর বিদ্যায় অধিক দক্ষ ভেবে তাকে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তাকে অনুসরণ করো।"

বায়হাকি অন্য বরাত দিয়ে লিখেছেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি (কখনো) কোন জাতির নেতা হিসেবে এমন ব্যক্তি নির্বাচন করে থাকি, যদিও তার চেয়ে উত্তম আর সমর বিদ্যায় অধিকতর দক্ষ ব্যক্তি রয়েছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইয়াজিদ বিন আসাম থেকে খলীফা বিন খাইয়াত, আহমদ বিন হাম্বল আর ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি, না আপনি বৃদ্ধ ?" তিনি বললেন, "বয়সে আমি বড় হলেও আপনি বৃদ্ধ।" এ বর্ণনাটি মুরসাল আর গরীব। যদি একে সহিহ মনে করা হয়, তবে এতে করে আবু বকরের বুদ্ধিমত্তা আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রমাণিত হয়।

কথিত আছে, আব্বাস (রাঃ) একই প্রশ্নের ভিত্তিতে এ জবাবই দিয়েছিলেন। সাঈদ বিন ইয়াবু'র বরাতে তাবারানী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাঈদ বিন ইয়াবু'কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের মধ্যে বড় কে ?" তিনি বললেন, "আপনি বড়, যদিও পৃথিবীতে আমিই আগে এসেছি।"

আবু নাঈম লিখেছেন যে, আবু বকর সিদ্দীককে বলা হলো, "আপনি কেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের কাজের প্রতি নির্দেশ করেন না ?" তিনি বললেন, "আহলে বদরের মর্যাদা সম্পর্কে আমি জানি বলে তাদেরকে বৈষয়িক কাজে ব্যস্ত করে রাখা মাকরূহ মনে করি।"

যুহদ গ্রন্থে ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আবু বকর সিদ্দীক লোকদের মধ্যে সমানভাগে কিছু ভাগ করে দিচ্ছিলেন। উমর ফারুক বললেন, "আপনি আহলে বদর আর সাধারণ জনতাকে এক সমান করে দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "পৃথিবীতে এতটুকুই যথেষ্ট, যদিও তারা মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে অনেক বেশী।"

নবম পরিচ্ছেদ

আবু বকর বিন হাফস থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) গরমে রোযা রাখতেন আর শীতে ইফতার করতেন।

ইবনে সাদ হাইয়ান, সানীআ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ আবু বকর সিদ্দীকের মোহরে نِعْمَ الْقَادِرُ اللهُ লিখা ছিল।

মুসা বিন উকবা থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেনঃ একই বংশের চার পুরুষ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেননি। কিন্তু আবু কুহাফা, তার ছেলে আবু বকর, তার ছেলে আব্দুর রহমান, তার ছেলে আবু আতিক (যার নাম ছিল মুহাম্মাদ) - তারা সকলেই নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন।

ইবনে মিন্দা আর ইবনে আসাকির আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আবু বকরের পিতা ছাড়া কোন মুহাজিরীনের পিতা ইসলাম গ্রহণ করেননি।

ইবনে সাদ আর বাযযার সুন্দর সনদের মাধ্যমে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর, সুহাইল বিন আমর এবং আমর বিন বাইযার বয়স ছিল সবচেয়ে বেশী।

দালায়েল গ্রন্থে আসমা বিনতে আবু বকরের বরাত দিয়ে বায়হাকি লিখেছেনঃ মক্কা বিজয়ের বছর আবু বকরের বোন বাইরে কোথাও বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে এক দল অশ্বারোহীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। এদের মধ্যে কেউ একজন তার গলায় চান্দীর হারটি খুলে নেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে এলে আবু বকর দাঁড়িয়ে দুই বার তার বোনের হারটি ফেরত চাইলে কেউ কোন সাড়া দিলো না। এরপর তিনি তার বোনকে বললেন, "তুমি তোমার হারের আশা ছেড়ে দাও আর সবর করো। আল্লাহ'র কসম, বর্তমান আমানতদারী কমে গেছে।"

হাফেজ যাহাবীর কোন এক রচনায় লিপিবদ্ধ আছেঃ আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন।

উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

উমর বিন খাত্তাব বিন নফীল বিন আবদুল উযযা বিন রুবাহ বিন কুরাত বিন যরাহ বিন আদী বিন কাব বিন লুবী আমিরুল মুমিনীন আবু হাফস আল- কুরাইশী আল- ফারুক নবুওয়াতের ষষ্ঠ বর্ষে ২৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। যাহাবী আর ইমাম নববী লিখেছেন, হস্তি বাহিনীর ঘটনার ১৩ বছর পর তার জন্ম।

তিনি কুরাইশদের উঁচু বংশের লোক ছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগে তিনি দূতের দায়িত্ব পালন করেন। কুরাইশদের মধ্যে বা অন্য কোন রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ বেঁধে গেলে শান্তি স্থাপনের জন্য তিনি কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতেন, অথবা নিজেদের মধ্যে বংশের গৌরব প্রদর্শনের প্রয়োজন দেখা দিলে সবার আগে তিনিই সে কাজের জন্য মনোনীত হতেন।

তিনি ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলার পর মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মুসলমানগণ খুবই আনন্দিত হোন।

তিনি আশারায়ে মুবাশশারা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শ্বশুর হওয়ার গৌরব অর্জনকারী এবং সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে বিজ্ঞ আলেম ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন।

তার থেকে ৫৩৯টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ হলেন - উসমান বিন আফফান, আলী বিন আবু তালিব, তালহা ইবনে আউফ, ইবনে মাসউদ, আবু যর, আমর বিন আবসাহ, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আবসাহ, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, আবু হুরায়রা, আনাস, আমর বিন আস, আবু মূসা আশআরী, বারা ইবনে আযেব, আবু সাঈদ খুদরী, সাদ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামগণ।

ইসলাম গ্রহণ

আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেনঃ একদিন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুআর মধ্যে বললেন - "হে আল্লাহ, উমর বিন খাত্তাব অথবা আবু জাহেল বিন হিশাম, যাকে ইচ্ছে মুসলমান করে ইসলামকে বিজয় দান করুন।" এ হাদীসটি ইবনে মাসউদ আর আনাস থেকেও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস থেকে হাকীম বর্ণনা করেনঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দুআ করেন, "হে আল্লাহ, উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে জয়যুক্ত করুন।" এ বর্ণনায় অন্য কারো নাম নেই। এ বর্ণনাটি তিরমিযী আওসাত গ্রন্থে আবু বকর সিদ্দীক থেকে এবং কবীরা গ্রন্থে সাওবান থেকে বর্ণনা করেছেন।

হযরত উমর থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ আমি রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বন্দী করার জন্য মসজিদে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন শরীফের কোন এক সূরা তিলাওয়াত করছিলেন। কুরআনের মহিমান্বিত ও সুষমাসিক্ত বাণী শুনে মনে মনে বললাম, "কুরাইশদের কথাই সঠিক, সত্যিই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক অনন্য কবি।" কিন্তু যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ (٤١)

"নিঃসন্দেহে এ কিতাব একজন সম্মানিত রাসুলের (আনীত) বাণী। এটি কোন কবির কাব্যকথা নয়, যদিও তোমরা খুব কমই বিশ্বাস করো।" (সূরাহ আল-হাককাহ, ৬৯ : ৪০-৪১)

- এ আয়াতগুলো পাঠ করলেন, তখন ইসলাম আমার অন্তরকে নাড়া দিলো, আর এর শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হলো।

হযরত জাবের থেকে ইবনে আবু শায়বা বর্ণনা করেছেনঃ হযরত উমর তার ইসলাম গ্রহণের বিবরণ এভাবে পেশ করেন - আমার বোন ঘরে এলে আমি কাবা শরীফে গিয়ে দেখলাম, নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আওফী কাপড় পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইতুল্লাহ চত্বরে ফিরে এসে নামায পড়লেন এবং পুনরায় ফিরে গেলেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এমন কথা শুনলাম যে পূর্বে শুনিনি। যাবার সময় আমি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছু নিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "কে ?" আমি বললাম, "উমর।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "উমর কখনো আমার পিছু ছাড়ে না।" একথা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এরপর কালেমা পড়লাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখবে।" আমি বললাম, "ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, আমি অবশ্যই তা প্রকাশ করবো, যেমন শিরকের প্রকাশ ঘটিয়েছি।"

ইবনে সাদ, আবু ইয়ালা, হাকীম এবং বাইহাকী দালায়েল গ্রন্থে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেনঃ উমরকে পথিমধ্যে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে দেখে বনু যোহরা বংশীয় এক ব্যক্তি বললেন, "কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছেন?" উমর বললেন, "মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হত্যা করতে।" তিনি বললেন, "এ কাজ করলে বনী হাশিম ও বনী আব্দুল মুত্তালিব কি তোমাকে ছেড়ে দিবে ভেবেছো ?" উমর বললেন, "মনে হয় তুমি বিধর্মী (মুসলমান) হয়ে গেছো ?" তিনি বললেন, "এর চেয়েও আশ্চর্যের কথা হলো তোমার ভগ্নি আর ভগ্নিপতি উভয়েই তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছেন।" উমর ভগ্নিপতির বাড়িতে গেলেন। খাব্বাব তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেবার জন্য আগেই সেখানে এসেছিলেন। তাঁর পদধ্বনি শুনে খাব্বাব আত্মগোপন করলেন আর তাঁরা কুরআন তিলাওয়াত থামিয়ে দিলেন। সে সময় তাঁরা সূরা "ত্বহা" পাঠ করছিলেন। ঘরে ঢুকে উমর বললেন, "তোমরা কি পড়ছিলে ?" তার বোন বললেন, "কিছু না, আমরা কথা বলেছিলাম।" তিনি বললেন, "মনে হয় তোমরা বিধর্মী (মুসলমান) হয়ে গেছো।" তার বোন রাগত স্বরে বললেন, "যেহেতু

তোমার ধর্মে সত্যের কোনো স্থান নেই, সেজন্য আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি - এক আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" উমর বললেন, "তোমাদের গ্রন্থটি দাও, আমি পড়বো।" তার বোন বললেন, "তুমি অপবিত্র হয়ে পবিত্র গ্রন্থটি স্পর্শ করতে পারো না। তুমি গোসল অথবা অযু করে এসো।" তিনি অযু করলেন আর তা নিয়ে পাঠ করলেন - যেখানে সূরা "ত্বহা" লিখা ছিল।

إِنَّنِي أَنَا اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)

"আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; অতএব আমার ইবাদাত করো আর আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো।" (সূরাহ ত্বহা, ২০ : ১৪)

- এ আয়াত পর্যন্ত পাঠ শেষে উমর বললেন, "আমাকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে নিয়ে চলো।" খাব্বাব উমরকে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে যান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবস্থানরত বাড়ির দরজায় হামযা, তালহা প্রমুখ সাহাবাগণ বসা ছিলেন। উমরকে আসতে দেখে হামযা বললেন, "উমর আসছেন। যদি তার উদ্দেশ্য ভালো হয়, তবে তিনি আমার হাত থেকে রক্ষা পাবেন, নতুবা আমি তাঁকে হত্যা করবো।" এ অবস্থায় ওহী নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমরের জামার প্রান্ত আর তলোয়ার ধরে বললেন, "হে উমর, এ বিশৃঙ্খলা কি ওলীদ বিন মুগীরার মতো অনন্তকাল অব্যাহত থাকবে ?" উমর এই বলে মুসলমান হয়ে গেলেন -

اشهد ان لا اله الا الله وانك عبد الله ورسوله

বায্যার, তিরমিযী আর আবু নাঈম হুলয়া গ্রন্থে এবং বায়হাকি দালায়েল গ্রন্থে হযরত আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমর বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবচেয়ে বড় প্রাণের দুশমন ছিলাম। একদিন গ্রীষ্মকালে আমি মক্কার আলি- গলিতে ঘুরে ফিরছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বললো, "হে উমর, আশ্চর্য! তুমি নিজেকে কি মনে করো ? তোমার ঘরে এ কি হচ্ছে ?" আমি বললাম, "কি হচ্ছে ?" সে বললো, "তোমার বোন মুসলমান হয়েছে।" আমি রাগান্বিত হয়ে বোনের দরজায় গিয়ে আওয়াজ দিলাম। ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলো, "কে ?" বললাম, "আমি উমর।" সবাই ভীত হয়ে পড়লো এবং যা পড়ছিল তা পড়ে রইলো। আমার বোন দরজা খুললো। আমি বললাম, "হে প্রাণের দুশমন, তুমি ধর্মত্যাগ করেছো ?" এ কথা বলে আমার হাতে যা ছিল তা দিয়ে বোনের মাথায় আঘাত করলাম। তার মাথা থেকে রক্ত বের হলো। সে বললো, "আমি ধর্মত্যাগ করেছি, আর আমার যা বুঝে এসেছে তাই করেছি।" আমি ভিতরে গিয়ে বসলাম এবং একটি কিতাব দেখতে পেয়ে বললাম, "এটা কি ?নিয়ে এসো।" আমার বোন বললো, "তুমি একে স্পর্শ করার উপযুক্ত নও, কারণ তুমি অপবিত্র, আর পবিত্র লোকেরাই একে ছুঁতে পারে।" বারবার চাওয়ার পর সে তা এনে দিলো। আমি খুলে দেখলাম, সেখানে প্রথমে লেখা রয়েছে -

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর নাম দেখে আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম এবং আমার হাত থেকে কিতাবটি পড়ে গেলো। আমি উঠিয়ে পড়তে লাগলাম, সেখানে লেখা ছিল -

سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

"নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে।" (সূরাহ আস- সফ, ৬১ : ১)

আমি আবার কাঁপতে আরম্ভ করলাম। বারবার যখন এ আয়াতটি পড়ছিলাম -

آمِنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ

"তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো ..." (সূরাহ আল- হাদিদ, ৫৭ : ৭)

তখন আমি পড়লাম -

أشهد أن لا إله إلاَّ الله

(অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি - আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)

এরপর সকলে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়ে বললো, "আপনাকে স্বাগতম, গত সোমবারে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বলে দুআ করেন - হে আল্লাহ, আবু জাহেল বিন হিশাম অথবা উমর বিন খাত্তাব - এদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছে তার মাধ্যমে আপনার দ্বীনকে বিজয় দান করুন।"

(আরেকটি বর্ণনাঃ) সে সময় রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফা পাহাড়ের নিচে অবস্থান করছিলেন। লোকেরা আমাকে সেখানে নিয়ে গেলো। আমি দরজায় টোকা দিলে আওয়াজ এলো, "কে ?" বললাম, "উমর।" যেহেতু লোকেরা আমার শত্রুতা সম্পর্কে জানতো, তাই কেউ দরজা খোলার সাহস পেলো না। অবশেষে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশে দুজন দরজা খুলে আমার বাহু ধরে তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে নিয়ে গেলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা তাকে ছেড়ে দাও।" এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পোশাকের প্রান্ত ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললেন, "মুসলমান হয়ে যাও। হে আল্লাহ, তাকে হিদায়েত দিন।" আমি কালেমায়ে শাহাদাত পড়লাম। মুসলমানগণ উচ্চ কণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি দিলে মক্কার অলি- গলি প্রকম্পিত হয়ে পড়লো। কারো সাহস ছিল না যে, মুসলমান হওয়ার জন্য কেউ আমাকে বাধা দিতে পারে। অথচ সে সময় মুসলমানদের উপর চালানো হতো অবর্ণনীয় অত্যাচার, যা আমার পছন্দ হতো না। সুতরাং কুরাইশদের মধ্যে অভিজাত হিসেবে গণ্য আমার মামা আবু জাহেলের দরজায় গিয়ে আঘাত করলে ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, "কে ?" বললাম, "উমর, আমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছি।" সে বেড়িয়ে এসে বললো, "এমনটা

করতে নেই।" এরপর সে দরজা বন্ধ করে দিলো। এরপর আমি আরেক জনের কাছে গেলাম। সেখানেও এই ঘটনা ঘটলো।

ইসলাম গ্রহণের ফলে তারা অন্যান্য মুসলমানের উপর ভীষণ অত্যাচার করতো, কিন্তু আমার প্রতি চোখ তুলে তাকাতে সাহস করতো না। একজন বললো, "তুমি কি তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে চাও ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" সে বললো, "লোকেরা কাবার পাদদেশে সমবেত হলে তুমি তাদের সম্মুখে তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে পারো। তখন তারাই তা সর্বত্র প্রচার করবে।" আমি যথাসময়ে কাবা ঘরে এসে তাই করলাম। তারা জোরে আওয়াজ দিয়ে বললো, "হে লোক সকল, উমর বিন খাত্তাব আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে গেছে।" এ কথা শুনে মুশরিকরা মারমুখী হয়ে আমার প্রতি ধেয়ে আসে। আমার মামা আবু জাহেল হট্টগোলের কারণ জানতে চাইলে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা তাকে বলা হলো। সে ছাদে উঠে আমার নিরাপত্তার ঘোষণা দিলে লোকেরা সরে যায়। অপর মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলবে আর আমি মুসলমান হয়েও নিরাপত্তা লাভ করে তাদের অত্যাচার দেখবো - তা হতেই পারে না। আমি আবু জাহেলের কাছে গিয়ে বললাম, "আমি তোমার নিরাপত্তার অধীনে থাকতে চাই না।" অতঃপর আবার মারপিট আরম্ভ হয়।

আবু নাঈম দালায়েল গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আমি উমরকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার ফারুক উপাধি কিভাবে হলো ?" তিনি বললেন - হামযা আমার তিন দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। একদিন আমি মসজিদে গিয়ে দেখলাম, আবু জাহেল কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গালি দেওয়ায় হামযা এসে তার পিঠে তীর দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে কোমর পর্যন্ত রক্ত গড়িয়ে পড়লো। সে সময় নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরকাম বিন আবী আরকামের ঘরে অবস্থান করছিলেন। হামযা সেখানে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ঘটনার তৃতীয় দিনে মাখযুমী গোত্রীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে আমি তাকে বললাম - "তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করলে ?" সে বললো, "আমি করলাম, তাতে কী - আমার চেয়ে বড়রা যখন তা করছে ?" আমি বললাম, "তারা কে ?" সে বললো, "আপনার বোন আর ভগ্নিপতি।" বোনের বাড়ি গেলাম। প্রবেশের সময় তারা কিছু পড়ছিলো বলে আমরা মনে হলো। প্রবেশান্তে কিছু বাক্য বিনিময়ের পর আমার ভগ্নিপতিকে আঘাত করলাম আর আঘাতস্থল থেকে রক্ত বেরিয়ে এলো। অতঃপর আমার বোন বললো, "আমরা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাজ করেছি।" আমি তার প্রবাহিত রক্ত দেখে লজ্জিত হয়ে বসে পড়লাম আর বললাম, "তোমাদের পঠিত কিতাবটি আমাকে একটু দেখাও।" আমার বোন বললো, "কিতাবটি পবিত্র লোকেরা স্পর্শ করে।" আমি গোসল করলে সে তা আমার হাতে দিলো। প্রথমেই লিখা ছিল -

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

আমি বললাম, "এ নামটি খুবই পবিত্রতম।"

এরপর (দেখলাম) লিখা রয়েছে -

طه (١) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ (٢) إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ (٣) تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى (٤) الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ (٥) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ (٦) وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (٧) اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (٨)

"ত্ব- হা। তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি। কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য - যারা ভয় করে। এটা তার কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমন্ডল ও সমুচ্চ নভোমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। নভোমন্ডলে, ভুমন্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আর সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তো তারই। যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বলো, তিনি তো গুপ্ত ও তার চাইতেও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমন্ডিত নাম তো তারই।"

(সূরাহ ত্বহা, ২০ : ১-৮)

এর প্রতি আমার অন্তর শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়লো। আমি বললাম, "কুরাইশরা কি তবে এর থেকেই দূরে সরে গেছে ?" আমি তৎক্ষণাত মুসলমান হয়ে দারুল আরকামের দিকে রওয়ানা হলাম। আমাকে আসতে দেখে হামযা কি যেন বললেন। লোকেরা বললো, "উমরের উদ্দেশ্যে ভালো হলে কথা নেই, নতুবা আমরা তাকে হত্যা করবো।" এ কথা শুনতে পেয়ে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইরে এলে আমি কালেমা শাহাদাত পড়লাম। উপস্থিত লোকেরা এত জোরে তাকবীর ধ্বনি দিলো, যার আওয়াজ সকল মক্কাবাসীর কানে পৌঁছে যায়। এরপর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললাম, "আমরা কি হকের উপর নেই ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "কেন নেই ? অবশেষে আমরা হকের উপর রয়েছি।" আমি বললাম, "তাহলে গোপনে কেন ?" অবশেষে আমরা দুই কাতার বিভক্ত হয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম। এক কাতারে ছিলেন হামযা আর অন্য কাতারে ছিলাম আমি নিজে। কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে আমাদের দুই জনকে দেখে খুবই মর্মাহত হলো। সেদিন থেকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ফারুক উপাধি দেন, কারণ ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য হয়েছে।

ইবনে সাদ আর যাকওয়ান বলেছেনঃ আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, "উমরের নাম ফারুক কে রেখেছেন?" তিনি বললেন, "নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।"

ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা আর হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ উমর ফারুকের ইসলাম গ্রহণের ফলে জিবরাঈল (আঃ) আকাশের ফেরেশতাদের খুশি হওয়ার সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে পেশ করেন।

ইবনে আব্বাস থেকে বাযযার আর হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ উমরের ইসলাম গ্রহণের দিন কাফিররা বলেছিলো, "আজ মুসলমানরা আমাদের বদলা নিলো।" আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন -

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّـهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"হে নবী, তোমার জন্য আর তোমার অনুসরণকারী মুমিনদের জন্য তো আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ৬৪)

বুখারী শরীফে রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ মাসউদ বলেছেন, "উমর ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা সম্মানিত হয়েছি।"

ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে সাদ আর তাবারানী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ উমরের ইসলাম গ্রহণ করাটা ছিল গোটা ইসলামের বিজয়, তার হিজরত হলো সাহায্য এবং অবস্থান ছিল বরকতময়। বাইতুল্লাহ শরীফে প্রকাশ্যে নামায পড়ার সাহস আমাদের ছিল না। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের সাথে এমন ঝগড়া বিবাদ করেন, যার ফলে বাইতুল্লাহ শরীফে আমাদের নামায পড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

হুযাইফা থেকে ইবনে সাদ আর হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ উমর মুসলমান হওয়ায় ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি পায় আর তিনি শহীদ হওয়ার ফলে সে গৌরব রবি নেতিয়ে পড়ে।

তাবারানীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে ইবনে আব্বাস বলেছেন, "সর্বপ্রথম উমর ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটান।" এ হাদীসের সূত্রগুলো সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

সহীব থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ উমরের ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করে, প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু হয়। আমরা কাবার পাদদেশে বসা, তাওয়াফ করা, মুশরিকদের বদলা নেওয়া আর তাদের উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত হলাম।

উমরের আযাদকৃত গোলাম আসলাম থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, "উমর নবুওয়াতের ষষ্ঠ বর্ষের যিলহজ্জ মাসে ২৬ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।"

হিজরত

আলী (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ আমরা উমর ছাড়া অন্য কারো নাম বলতে পারবো না - যিনি প্রকাশ্যে হিজরত করেছেন। হিজরতের সময় তিনি গলায় তলোয়ার আর কাঁধে কামান ঝুলিয়ে হাতে কয়েকটি তীর নিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে যান, সেখানে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ বসে ছিল। তিনি সাতবার তাওয়াফ করে মাকামে ঈবরাহীমে দুই রাকআত নামায পড়েন। এরপর কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে এসে পৃথক পৃথকভাবে বললেন, "তোমাদের মুখ কালো হোক। যে মাকে ছেলেহারা, সন্তানকে এতিম, স্ত্রীকে বিধবা করতে চায় - সে যেন আমার সাথে লড়াই করে।" কিন্তু তার ছায়া মাড়ানোর সাহসটুকুও কারো ছিল না।

হযরত বারা বলেছেনঃ আমাদের কাছে সর্বপ্রথম মুসআব বিন উমায়ের, তারপর ইবনে উম্মে মাকতুম, এরপর বিশজন আরোহীর একটি কাফেলা নিয়ে উমর হিজরত করেন। আমরা তার কাছে রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিপ্রায় সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, "হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছনে আসছেন।" এরপর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে নিয়ে মদীনায় এলেন।

ইমাম নববী বলেছেন, "উমর সকল যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে ছিলেন আর উহুদ যুদ্ধেও অটল ছিলেন।"

উমর (রাঃ) এর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "স্বপ্নে আমি জান্নাতে এক মহিলাকে প্রাসাদ চূড়ায় বসে ওযু করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম - 'এটা কার প্রাসাদ ?' ফেরেশতাগণ বললেন, 'উমর বিন খাত্তাবের।' রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'হে উমর, আমি তোমার মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে সে প্রাসাদে প্রবেশ করিনি।' " একথা শুনে হযরত উমর কেঁদে ফেললেন ।

ইবনে উমর থেকে ইমাম বুখারী আর ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমি স্বপ্নে দুধ পান করার সময় এর স্বাদ আর গন্ধ আমার নাকে এলে অবশিষ্ট দুধ উমরকে দিলাম।" সাহাবাগণ বললেন, "এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "ইলম।"

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী আর ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, "স্বপ্নে আমার সামনে কিছু লোক পেশ করা হলো - যাদের পোশাক বক্ষদেশ (পর্যন্ত) এবং কিছু লোকের পোশাক তারো বেশি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল, আর উমরের পোশাক যমীন পর্যন্ত ঘেঁষে ছিল।" সাহাবাগণ বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সে পোশাকটি কি ছিল ?" নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "দ্বীন।"

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী আর ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "হে উমর, সে সত্তার শপথ - যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ; যে পথে তুমি চলো, শয়তান সে পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।"

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে মুহাদ্দিস ছিল, আর আমার উম্মতের মুহাদ্দিস হলেন উমর বিন খাত্তাব।"

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনন, "আল্লাহ তাআলা উমরের মুখে ও অন্তরে সত্যের প্রবর্তন ঘটিয়েছেন।"

ইবনে উমর বলেছেন, "লোকদের অভিমত ভিন্নতর হলে উমর যে রায় দিতেন, সে মোতাবেক কুরআনের আয়াত নাযিল হতো।"

উকবা বিন আমর (রাঃ) থেকে ইমাম তিরমিযী আর হাকেম বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমার পর যদি কেউ নবী হতেন, তবে তিনি উমর বিন খাত্তাব।" এ বর্ণনাটি আবু সাঈদ খুদরী আর আসমা বিন মালিক থেকে তাবারানী এবং ইবনে উমর থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন।

আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে ইমাম তিরমিয়ী বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "উমরকে দেখে শয়তান পালিয়ে যেতে দেখেছি।"

উবাই বিন কাব থেকে ইবনে মাজা আর হাকিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম হযরত উমরের সাথে মুসাফাহ করবেন, সালাম দিবেন আর হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

আবু যর (রাঃ) থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেনঃ আমি রাসুলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, "উমরের মুখে ও অন্তরে আল্লাহ তাআলা সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সবসময় সত্য বলতেন।"

ইবনে মানীআ মুসনাদ গ্রন্থে আলী (রাঃ) থেকে নকল করে লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সহচরদের মধ্যে কোনো সংশয় নেই যে, উমরের যবান ছিল প্রশান্তময়।

ইবনে উমর থেকে বাযযার বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "উমর হলেন জান্নাতীদের জন্য উজ্জ্বল প্রদীপ।"

কাদাম বিন মাজউন আর তিনি তার চাচা উসমান বিন মাজউন থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরের পানে ইশারা করে বললেন, "যতক্ষণ তিনি তোমাদের মাঝে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিতনার দরজা শক্তভাবে বন্ধ থাকবে।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আওসাদ গ্রন্থে তাবারানী বর্ণনা করেছেনঃ একদিন জিবরাঈল (আঃ) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "উমরকে সালাম জানাবেন, আর তাকে এ সুসংবাদ দিবেন যে - তার ক্রোধ হলো বিজয়, আর সন্তুষ্টি হলো দর্শন।"

আয়েশা (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "শয়তানরা উমরকে দেখে ভয় পেতো।"

ইমাম আহমদ এ হাদীসটি বুরাইদার সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "হে উমর, শয়তান তোমাকে ভয় পায়।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আসমানের সকল ফেরেশতা উমরকে সম্মান আর পৃথিবীর সকল শয়তান তাকে ভয় করে।"

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আওসাত গ্রন্থে তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা আরাফাতে অবস্থানকারী (হাজীদের - অনুবাদক) নিয়ে সাধারণত এবং উমরকে নিয়ে বিশেষত গর্ব করেন।" এ ধরনের আরেকটি বৃহৎ হাদিস আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

ফজল বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে তাবারানী আর দাইলামী বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "উমর যেখানেই থাকুক, তার সাথেই থাকবে।"

ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেনঃ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন - "একটি কূপে বালতি নামানো দেখে আমি কয়েক বালতি উত্তোলন করলাম। আমার পর আবু বকর বালতি নিলেন এবং এক অথবা দুই বালতি উত্তোলন করলেন, কিন্তু তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেছেন। এরপর উমর বালতি ধারণ করলেন আর এমনভাবে উত্তোলন করলেন, যা আমি একজন যুবককেও এভাবে উত্তোলন করতে দেখিনি, আর তখন চতুর্দিক থেকে তৃষ্ণার্তরা এসে পিপাসা নিবারণ করে।"

ইমাম নববী তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেনঃ ওলামাগণ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে - এটা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আর উমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত; আর উমরের খিলাফতকালে শরীয়তের অনেক বিধি- বিধান ও ইসলামের ব্যাপক প্রসার হবে।"

সদীসা থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "উমর ইসলাম গ্রহণের পর থেকে শয়তান তার মুখোমুখি হলে সে মুখ ফিরিয়ে উলটে পড়তো।"

উবাই বিন কাব থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলেছেন - উমরের ইন্তেকালে ইসলাম কাঁদবে।"

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে তাবারানী আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে উমরের সাথে শত্রুতা করবে, সে আমার সাথে শত্রুতা করলো; আর যে উমরকে ভালোবাসবে, সে যেন আমাকে ভালোবাসলো। আল্লাহ তাআলা আরাফাতে অবস্থানরত (হাজীদের - অনুবাদক) নিয়ে সাধারণত আর উমরকে নিয়ে বিশেষত গর্ব করেন। সকল নবীর উম্মতের মধ্যে একজন মুহাদ্দিস ছিলেন, আর আমার উম্মতের মুহাদ্দিস হলেন উমর।" সাহাবাগণ বললেন, "কে মুহাদিস হতে পারে?" নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যার ভাষায় ফেরেশতাগণ কথা বলেন।" এর সূত্রগুলো বিশুদ্ধ।

উমর সম্পর্কে সাহাবা আর সালাফে সালেহিনদের অভিমত

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেছেন, "আমার কাছে উমরের চেয়ে প্রিয়তম আর কেউ নেই।" (ইবনে আসাকির)

আবু বকরকে মৃত্যু শয্যায় এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, "উমরকে খলীফা নির্ধারণের জন্য আল্লাহ তাআলা আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে কি উত্তর দিবেন ?" তিনি বললেন, "বলবো লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করেছি।" (ইবনে সাদ)

আলী (রাঃ) বলেছেন, "তোমরা সৎ লোকদের আলোচনায় উমরকে অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলো না, কারণ বেশিদিন গত হয়নি তার যবান ছিল প্রশান্তময়।" (তাবারানী - আওসাত)

ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, "রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর আমরা কাউকে উমরের চেয়ে অধিক মেধাবী এবং দানশীল আর কাউকে পাইনি।" (ইবনে সাদ)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, "উমরের জ্ঞান পাল্লার এক দিকে, আর পৃথিবীর সকল জ্ঞান পাল্লার অপর দিকে তুলে দিলে উমরের জ্ঞানের পাল্লা ভারি হবে। কারণ জ্ঞানের দশমাংশের নবমাংশ উমরকে দেওয়া হয়েছে।" (তাবারানী, হাকিম)

হুযাইফা (রাঃ) বলেছেন, "পৃথিবীর ইলম উমরের কোলে লুকিয়ে ছিল।" তিনি আরো বলেছেন, "উমর আল্লাহর পথে নিরাপত্তার কোনো পরোয়া করতেন না।"

মুআবিয়া বলেছেন, "আবু বকর সিদ্দীকের কাছে দুনিয়া ধরা দেয়নি, তিনি এর কামনাও করতেন না। আর উমরের কাছে দুনিয়া এলেও তিনি তা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন, কিন্তু আমরা দুনিয়াকে পেটের মধ্যে নিয়ে ফেলেছি।"

জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ উমর ইন্তেকালের পর তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পর আলী এসে বললেন, "রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর এ কাপড় পরিহিত ব্যক্তির চেয়ে কারো আমল বেশি পছন্দনীয় ছিল না।" (হাকিম)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, "পুণ্যবান লোকদের আলোচনার সময় অবশ্যই হযরত উমরের নাম নিবে, কারণ তিনি আমাদের মধ্যে কুরআনের সবচেয়ে বড় আলেম আর আল্লাহর দ্বীনের সবচেয়ে বড় ফকীহ।" (তাবারানী)

এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে আবু বকর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "তিনি আপাদমস্তক কল্যাণকর।" এরপর উমর সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, "তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুবই সচেতন পাখির মতো, চারণ ক্ষেত্রের প্রতিটি স্থানে যার মনে এ কথা থাকতো যে, পাতানো জালে পা দিলে ফেঁসে যাবে।" আবার আলী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "দৃঢ়সংকল্প, সামুদ্রিক জ্ঞান, সাহসিকতা ও বীরত্ব তার মধ্যে ঢুকে দেওয়া হয়েছে।" (তাওরিয়াত)

উমায়ের বিন রাবীআ থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, কাব আহবারকে উমর বিন খাত্তাব জিজ্ঞেস করলেন, "পূর্ববতী সহীফাগুলোতে কিভাবে আমার বিবরণ এসেছে ?" কাব বললেন, "আপনার সম্পর্কে লিখা রয়েছে - قرنا من حديد উমর বললেন, "এর অর্থ কি ?" কাব বললেন, "তিনি এমন এক শক্তিশালী শাসনকর্তা, যিনি আল্লাহর পথে কারো নিন্দার কোন পরোয়া করেন না।" উমর বললেন, "আর কি লিখা রয়েছে ?" কাব বললেন, "আপনার পর যিনি খলীফা হবেন, গোটা সম্প্রদায় মিলে তাকে শহীদ করে দিবে।" উমর বললেন, "আর কি লেখা রয়েছে ?" কাব বললেন, "এরপর চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।"

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, "চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখের মাধ্যমে উমরের মর্যাদা অনুধাবন করা যেতে পারে।

এক - উমর বদর যুদ্ধ বন্দীদের হত্যা করার অভিমত পেশ করলে এ আয়াত নাযিল হয় -

لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّـهِ سَبَقَ

"যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন ..." (সূরাহ আল- আনফাল, ৮ : ৬৮)

দুই - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণের পর্দার ব্যাপারে উমর নিজের মতামত তুলে ধরলে যয়নব বললেন, "হে উমর বিন খাত্তাব, আপনি আমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন, অথচ আমাদের ঘরেই ওহী নাযিল হয়।" এরপর হযরত উমরের অভিমতের সাথে সঙ্গতি রেখে পর্দার ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয় -

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

"তোমরা তার স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে ......" (সূরাহ আল- আহযাব, ৩৩ : ৫৩)

<u>তিন</u> - রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যক্ষ দুয়ার বরকতে উমর ইসলাম গ্রহণ করেন।

<u>চার</u> - তিনি আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর হাতে সর্বপ্রথম বাইয়াত দেন। (আহমাদ, বায্যার, তাবারানী)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন, "আমরা পরস্পরে এ আলোচনা করতাম। উমরের খিলাফতকালে শয়তান অবরুদ্ধ ছিল। তার (ইন্তেকালের - অনুবাদক) পর শয়তান মুক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।" (ইবনে আসাকির)

<u>দশম পরিচ্ছেদ</u>

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আলীকে আবু বকর আর উমরের চেয়ে খিলাফতের বেশী হকদার মনে করবে, সে আবু বকর, হযরত উমর, সকল মুহাজির আর আনসার সাহাবীদের ত্রুটি চিহ্নিত করবে।"

শারীক বলেছেন, "যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ পুণ্য রয়েছে, সে কখনোই এ কথা বলবে না - আবু বকর সিদ্দীক আর উমর ফারুকের চেয়ে আলী খিলাফতের বেশী প্রাপ্য ছিলেন না।"

আবু উসামা বলেছেন, "হে লোক সকল, তোমরা কি জানো - আবু বকর সিদ্দীক আর উমর ফারুক ইসলামের পিতামাতা ?"

জাফর সাদিক (রহঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আবু বকর আর উমরকে ভালো মনে করে স্মরণ করবে না, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট।"

উমরের অভিমতের সাথে কুরআনের ঐকমত্য

মুজাহিদ থেকে ইবনে মারদুয়া বর্ণনা করেছেন, "উমর যে রায় দিতেন, অনুরূপভাবেই কুরআন শরীফের আয়াত নাযিল হতো।"

আলী (রাঃ) এর অভিমত ইবনে আসাকির নকল করে লিখেছেন, "কুরআন শরীফে অধিকাংশ উমরের রায় উল্লেখ রয়েছে।"

ইবনে উমর কর্তৃক মারফুআন বর্ণিতঃ কিছু বিষয়ে লোকদের মতামতের সাথে উমর ভিন্ন মত পোষণ করলে উমরের অভিমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আয়াত নাযিল হতো।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, উমর (রাঃ) বলেছেন, "আমার প্রতিপালক তিনবার আমার অভিমতের সাথে একমত পোষণ করেছেন -

একঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমি মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাতে চাই। এরপর এ আয়াত নাযিল হয় -

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"আর তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও" (সূরাহ আল- বাকারাহ, ২ : ১২৫)

দুইঃ আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনার পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণের কাছে সব ধরনের লোক যাতায়াত করে। আপনি তাদের পর্দা করার নির্দেশ দিন।" এরপর পর্দার নাযিল অবতীর্ণ হয়।

তিনঃ পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণ লজ্জা দিলে আমি বললাম -

عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ

অতঃপর আমার উল্লিখিত শব্দগুলোই হুবহু নাযিল হয়। (টীকাঃ সূরাহ আত- তাহরিমের ৫ নং আয়াত)

মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, উমার (রাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা আমার সাথে তিন বিষয়ে একমত - একঃ পর্দা, দুইঃ বদরের যুদ্ধবন্দী এবং তিনঃ মাকামে ঈবরাহীম।"

এ হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় নম্বর বিষয়টির মাধ্যমে চারটি (চতুর্থতম) দৃষ্টান্ত জানা গেলো।

ইমাম নব্বী তাহযীব গ্রন্থে চারটি বিষয়ে একমত হওয়ার কথা লিখেছেন - একঃ বদর যুদ্ধবন্দী, দুইঃ পর্দা, তিনঃ মাকামে ঈবরাহীম এবং চারঃ মদের অবৈধতা।

এ হাদীসে উল্লিখিত চতুর্থ নম্বর বিষয়টির মাধ্যমে পাঁচটি (পঞ্চম) দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো।

মদের অবৈধতা সম্পর্কে সুনান ও মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে যে, "একদিন উমর দুয়া করলেন - 'হে আল্লাহ, শরাবের ব্যাপারে আমাদের জন্য কিছু নাযিল করুন।" এরপর শরাব হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়।

ইবনে আবী হাতিমের স্বরচিত তাফসীর গ্রন্থে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা চারটি বিষয়ে আমার সাথে একমত হয়েছেন। যখন এ আয়াত নাযিল হয় -

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।" (সূরাহ আল- মুমিনুন, ২৩ : ১২)

তখন এমনিতেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যায় -

فَتَبَارَكَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

এরপর হুবহু এটিই আয়াত হিসেবে নাযিল হয়। (টীকাঃ দেখুন - সূরাহ আল- মুমিনুনের ১৪ তম আয়াত)

এ হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা উমরের ছয়টি (ষষ্ঠ) অভিমতের সাথে একমত পোষণ করে ওহী নাযিল করেছেন বলে জানা গেলো। গ্রন্থকার এ হাদীসটি ইবনে আব্বাসের সূত্রে তাফসীরে মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মাস্‌নাফ আবু আব্দুল্লাহ শীবানী কর্তৃক প্রণীত কিতাবে ফাজাইলুল উম্মাহ গ্রন্থে রয়েছেঃ উমরের সাথে তার প্রতিপালক একুশ জায়গায় একমত হোন। এর মধ্যে ছয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

সপ্তমটি হলো - আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের জানাযার জন্য সমবেত হতে বললে আমি (অর্থাৎ, উমর) নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে গিয়ে বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), উবাই বিন কাব কঠোর শত্রু ছিল। সে অমুক দিন এই এই কথা বলেছে।" আল্লাহর কসম, কিছুক্ষণ পর এ আয়াত নাযিল হয় -

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا

"আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেন না ..." (সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯ : ৮৪)

অষ্টমঃ এক ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে- কাছেও যেওনা ..." (সূরাহ আন- নিসা, ৪ : ৪৩)

নবমঃ আরেক ঘটনায় এ আয়াত নাযিল হয় -

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে মদ সম্পর্কে ......" (সূরাহ আল- বাকারাহ, ২ : ২১৯)

গ্রন্থকার বলেন, "অষ্টম ও নবম ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত আয়াতদ্বয় সপ্তম হাদীসের সাথে যুক্ত একই ঘটনার ধারাবাহিকতা।

<u>দশমঃ</u> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আমি (অর্থাৎ, উমর) বললাম -

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

তখন হুবহু এ আয়াতটিই নাযিল হলো -

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ

"আপনি তাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান।" (সূরাহ আল- মুনাফিকুন, ৬৩ : ৬)

তাবারানী এ বর্ণনাটি ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

<u>একাদশঃ</u> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবীদের নিয়ে বদর যুদ্ধে যাওয়ার পরামর্শ করছিলেন, তখন উমর যুদ্ধে গমনের পরামর্শ দিলে নাযিল হয় -

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ

"যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য ......" (সূরাহ আল- আনফাল, ৮ : ৫)

<u>দ্বাদশঃ</u> আয়েশা সিদ্দীকার অপবাদের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরামর্শ চাইলে উমর বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনাকে আয়েশার সাথে কে বিয়ে দিয়েছেন?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আল্লাহ।" উমর বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনি কি মনে করেন, আপনার রব আপনাকে ত্রুটিযুক্ত জিনিস দিয়েছেন?" এরপর এ আয়াত নাযিল হয় -

سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

"আল্লাহ অনেক পবিত্র, অনেক মহান। সত্যিই (এ ছিল) এক গুরুতর অপবাদ।" (সূরাহ আন- নূর, ২৪ : ১৬)

ত্রয়োদশঃ ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রমযানের রাতে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হারাম ছিল। উমর এ বিষয়ে মন্তব্য করলে এ আয়াত নাযিল হয় –

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ

"রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"(সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৮৭)

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ মুসনাদ গ্রন্থে সনদসহ উল্লেখ করেছেন।

চতুর্দশঃ এক ইহুদী উমরকে বললো, "তোমাদের নবী যে জীবরাঈলের কথা বলেন, তিনি আমাদের দুশমন।" উমর বললেন -

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّـهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ

এরপর হুবহু এ আয়াতই নাযিল হয়। (টীকাঃ দেখুন - সূরাহ আল-বাকারাহ'র ৯৮ তম আয়াত) এ বর্ণনাটি ইবনে জারীর কয়েকটি সূত্রে আর ইবনে আবী হাতিম আব্দুর রহমান ইবনে আবু ইয়ালা থেকে বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চদশঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ব্যক্তির বিবাদ মিমাংসা করে দিলেন। একজনের তা মনঃপূত না হওয়ায় সে পুনরায় উমরের কাছে বিচার চাইলে তিনি তাকে হত্যা করেন। এ খবর পেয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি উমরের ব্যাপারে এমনটা ধারণা করি না যে, তিনি কোনো মুমিনকে হত্যা করতে পারেন।" এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন -

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

"অতএব, তোমার রবের কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে।" (সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ৬৫)

এ বর্ণনাটি আবুল আসওয়াদ থেকে ইবনে আবু হাতিম আর ইবনে মারদুয়া বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থকার বলেছেন, "আমি তাফসীরে মুসনাদ গ্রন্থে এ বর্ণনাটির বিভিন্ন সূত্র বর্ণিত করেছি।"

ষষ্ঠদশঃ একদিন উমর নিজের ঘরে শুয়ে ছিলেন। তার গোলাম অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তিনি এ দুয়া করলেন, "হে আল্লাহ, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা হারাম করে দিন।" সঙ্গে সঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

সপ্তদশঃ তিনি বলতেন, "ইহুদীরা অভিশপ্ত জাতি।" এ প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়।

<u>অষ্টদশঃ</u> আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ (٤٠)

"তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে, এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে।" (সূরাহ আল-ওয়াকিয়াহ, ৫৬ : ৩৯-৪০)

এ আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাটি জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে ইবনে আসাকির স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাটি উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট।

<u>ঊনবিংশঃ</u> এ আয়াতটি মানসুখে তিলাওয়াত -

الشيخ ولشيخة اذا زنيا

<u>বিংশঃ</u> উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান في القوم فلان বললে এর জবাবে উমর বলেন - الاتحيبنه, আর এ কথার সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমত পোষণ করেন। এ বর্ণনাটি মুসনাদ গ্রন্থে আহমাদ উল্লেখ করেছেন।

উক্ত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত, যা আমরা <u>একবিংশ</u> দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করতে চাই -

উসমান বিন সাঈদ বিন আদ- দারমী কিতাবুর রুহ আলাল জাহীমা গ্রন্থে সালেম বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ একদিন কাব আহবার বললেন, "আসামানের বাদশাহ যমীনের বাদশাহর প্রতি আফসোস করছেন।" একথা শুনে উমর বললেন, "যমীনের বাদশাহর উপর নয়, বরং তার উপর যে তার নফসকে কবজায় নিয়েছে।" এ কথা শুনে কাব আহবার বললেন, "আল্লাহর কসম, তৌরাত গ্রন্থে হুবহু আপনার কথাগুলোই বিধৃত হয়েছে।" এরপর উমর সেজদায় লুটিয়ে পড়েন।

এছাড়াও ইবনে আদী কর্তৃক প্রণীত কামেল গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ প্রথম দিকে বিলাল আযানের মধ্যে اشهد ان لا اله الله এরপর حي علي الصلوة বলতেন। উমর বললেন, اشهد ان لا اله الله এরপর اشهد ان محمد رسول الله বলো। একথা শুনতে পেয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "উমর যেভাবে বলেছে, সেভাবে বলবে।" এ বর্ণনাটির সনদ দুর্বল এবং বিশুদ্ধ বর্ণনার পরিপন্থী (হওয়ার কারণে সম্ভবত গ্রন্থকার তা হিসাবের মধ্যে গণ্য করেন নি - অনুবাদক)।

কারামত (অলৌকিকতা)

ইবনে উমর থেকে বায়হাকী, দালাইলুন নবুওয়্যত গ্রন্থে আবু নাঈম, শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে লাকায়ী, ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে দারী, কারামতে আউলিয়া গ্রন্থে ইবনে আরাবী এবং রাওয়াতু মালিক গ্রন্থে খাতীব বর্ণনা করেছেনঃ সারিয়া নামক এক ব্যক্তিকে উমর সেনাপতি বানিয়ে যুদ্ধ পাঠানোর পর একদিন খুৎবা দেওয়ার সময় হঠাৎ বলে উঠলেন - "হে সারিয়া, পাহাড়ের দিকে।" এভাবে তিনি তিন বার বললেন। কিছুদিন পর সেই রণাঙ্গণ থেকে দূত এলো। উমর যুদ্ধের সংবাদ জানোতে চাইলেন। দূত বললো, "আমিরুল মুমিনীন, আমরা পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম, হঠাৎ তিনবার ' হে সারিয়া, পাহাড়ের দিকে' এ আওয়াজ শুনে সঙ্গে সঙ্গে সেই পাহাড়ের দিকে ছুটেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের দুশমনদের পরাজিত করলেন।" ইবনে উমর বলেন, "তখন সারিয়া অনারাব দেশে ছিলো, আর তিনি এখান থেকে আওয়াজ দেন।" ইসাবা গ্রন্থে ইবনে হাযার আসকালানী এর সনদগুলো সহীহ বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনে উমর থেকে মাইমুন বিন মেহরানের সূত্রে ইবনে মারদুয়া বর্ণনা করেছেনঃ জুমআর দিন খুৎবা দেওয়ার সময় তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "হে সারিয়া, পাহাড়ের দিকে যাও। বাঘের রক্ষকরা অত্যাচার করছে।" লোকেরা এ কথা শুনে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো।

আলী (রাঃ) বলেছেনঃ খুৎবা শেষে লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "সে সময় আমার মনে হলো, মুশরিকরা আমাদের মুসলমান ভাইদের পরাজিত করে পাহাড়ের পাদদেশে অতিক্রম করছিলো। এ মুহূর্তে আক্রমণ করলে তারা সকলেই নিহত আর পরাজিত হবে, এ কারণে আমার মুখ দিয়ে এ শব্দগুলো বেরিয়ে গেছে।" এক মাস পর এক ব্যক্তি বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে এলে সে বললো, "আমরা উমরের আওয়াজ শুনে পাহাড়ের দিকে যেতেই আল্লাহ আমাদের বিজয় দেন।"

দালায়েল গ্রন্থে আমর বিন হারিসের বরাত দিয়ে আবু নাঈম লিখেছেনঃ উমর জুমআর খুৎবা দেওয়ার এক পর্যায়ে দুই অথবা তিনবার বললেন, "হে সারিয়া, পাহাড়ের দিকে যাও।" এরপর আবার খুতবা দিতে লাগলেন। উপস্থিত জনতার মধ্যে কেউ কেউ বললেন, তাকে উন্মাদনায় পেয়েছে। উমরের সাথে আব্দুর রহমান বিন আউফ বিনা সংকোচেই কথা বলতেন। তিনি বললেন, "আজ আপনি এমন কাজ করলেন, যার কারণে লোকেরা আপনার ব্যক্তিত্বকে ভৎসনা করছে।" উমর বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি সে সময় অস্থির হয়ে পড়ছিলাম, যখন দেখলাম মুসলমানরা লড়াই করছে, আর শত্রুরা পাহাড়ের দিক থেকে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। তখন আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি, আপনাতেই বলে ফেললাম - পাহাড়ের দিকে যাও।" এরপর রণাঙ্গন থেকে সারিয়ার চিঠি নিয়ে এক দূত এলো। চিঠিতে লেখা ছিল - "জুমআর দিন দুশমনের সাথে লড়াই চলছিল। এক পর্যায়ে আমরা পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এমন সময় ঠিক জুমআর নামাযের সময় আমরা শুনতে পেলাম - 'সারিয়া, পাহাড়ের দিকে যাও।' এ আওয়াজ পেয়ে আমরা পাহাড়ের দিকে গেলাম আর বিজয় অর্জন করলাম।"আমর বিন হারেস বললেন, "সেদিন যারা 'উমরকে উন্মাদনায় পেয়েছে' বলে মন্তব্য করেছিল, তারা বললো - 'এ সবই উদ্ভট কথা।' "

ইবনে উমর থেকে ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে আবুল কাসিম বিন বুশরান বর্ণনা করেছেনঃ উমর এক ব্যক্তিকে নাম জিজ্ঞেস করলে সে বললো, "জামরাহ (স্ফুলিঙ্গ)।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বাবার নাম ?" সে বললো, "শিহাব (অগ্নিশিখা)।" তিনি প্রশ্ন করলেন, "গোত্রের নাম ?" সে বললো, "হুরকা (আগুন)।" তিনি জানোতে চাইলেন, "কোথায় থাকো ?" সে বললো, "হিররাহ (উত্তপ্ত পাথুরে যমীন)।" তিনি বললেন, "হিররাহ কোথায় ?" সে জবাব দিলো, "নাতী (লেলিহান অগ্নিশিখা)।" তিনি বললেন, "পরিবারের খোঁজ নাও, তারা পুড়ে মরেছে।" সে লোক গিয়ে দেখলো সত্যিই তাই। আগুন লেগে সব পুড়ে গেছে। (ঘটনাটি) মালিক প্রমুখ এভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল- আসমাত গ্রন্থে কায়েস ইবনে হাজ্জাজের বরাত দিয়ে আবুশ শাইখ লিখেছেনঃ উমর বিন আস কর্তৃক (মিসর - অনুবাদক) বিজিত হওয়ার পর মিসরবাসী তার কাছে এসে বললো, "আমাদের চাষাবাদ নীল নদের প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। নীল নদ শুকিয়ে গেলে প্রাচীন নীতি অনুযায়ী নীল নদের প্রবাহ বেগমান করতে হয়।" আমর বিন আস বললেন, "সে প্রাচীন নীতি কি ?" তারা বললো, "চাঁদের একাদশতম রজনীতে এক অবিবাহিত যুবতির বাবাকে রাজী করে তাকে উন্নতমানের পোশাক ও অলংকারাদি পড়িয়ে নীল নদে নিক্ষেপ করি।" আমর বললেন, "ইসলাম পূর্বের প্রথা রহিত করেছে, তাই তোমরা তা করতে পারো না।" কিছুদিন পর নীল নদের প্রবাহ থেমে গেলে কিছু মিসরবাসী আমর বিন আসের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার মনস্থির করলে আমর বিন আস বিষয়টি চিঠি দিয়ে আমিরুল মুমিনীন উমর ফারুক (রাঃ) কে জানালেন। কয়েকদিন পর আমিরুল মুমিনীন উমর (রাঃ) জবাবে এ চিঠি লিখলেন - "তুমি সুন্দর চিঠিই দিয়েছো, এসব প্রথা উৎখাতের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। এ চিঠির সাথে যুক্ত একটি মোড়ানো কাগজের টুকরো দিলাম, যা নীল নদে ফেলে দিবে।" এ চিঠি আমর বিন আসের হাতে পৌঁছলে তিনি সেই মোড়ানো কাগজটি খুললেন। তাতে লিখা ছিল - "আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনীন উমরের পক্ষ হতে নীল নদের অবগতির জন্য প্রশ্ন করছি, তুমি যদি নিজের শক্তিতে প্রবাহিত হও, তবে তুমি আর কখনোই প্রবাহিত হয়ো না; আর যদি আল্লাহ তাআলা প্রবাহিত করেন, তাহলে সেই এক ও অদ্বিতীয় মহাশক্তিধর প্রতিপালকের কাছে আমার আবেদন - তোমাকে প্রবাহিত করুন।" আমর বিন আস কাগজের টুকরোটি শুকতারা উদয়ের কিছুক্ষণ আগে নীল নদে ফেলে দেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে মিসরবাসী দেখলো, আল্লাহ তাআলা এক রাতেই নীল নদে ষোল হাত পানির তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। আর সেদিন থেকে আল্লাহ তাআলা মিসরবাসীর এই প্রথা বন্ধ করে দেন।

তারেক বিন শিহাব থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি উমরকে সত্য মিথ্যার মিশ্রণে কিছু কথা বলছিলেন। উমর কখনো তাকে থামতে বলেন, আবার কখনো বলতে বলেন, অবশেষে সে বললো, "আমি আপনাকে যা বলেছি তা সত্য। তবে যে সব কথার প্রেক্ষিতে আমাকে থামতে বলেন, তা ছিল মিথ্যা।" হাসান বলেছেন, "কথার মধ্যে মিশ্রিত মিথ্যা অংশটুকু উমর চিহ্নিত করতে পারতেন।"

আবু হুদাবা হামসী থেকে দালায়েল গ্রন্থে বায়হাকী বর্ণনা করেছেনঃ ইরাকবাসী তাদের গর্ভনরকে পাথর মেরেছে, এই সংবাদ পেয়ে উমর ক্রোধান্বিত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। সেদিন তার নামায ভুল হওয়ায় নামায পড়ে এ দুআ করলেন – "হে আল্লাহ, তারা নামায গড়মিল করেছে, তাদের প্রতিটি কাজ গড়মিল করে দিন। তাদের প্রতি বনু সাকীফ গোত্রের এক ছোকড়াকে চাপিয়ে দিন, যে জাহেলিয়াতের যুগের অত্যাচারের মত তাদেরকে শাসন করবে এবং সে তাদের ভালো কাজ গ্রহণ করবে না আর খারাপ কাজের শাস্তি ক্ষমা করবে না।" গ্রন্থকার বলেছেন, "ছোকড়া বলতে তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফীকে বুঝিয়েছেন।" ইবনে লাহীআ বলেন, "সে ছোকড়ার তখন জন্মই হয়নি।"

অভ্যাস

আখলিফ বিন কায়েসের বরাত দিয়ে ইবনে সাদ লিখেছেনঃ আমরা আমিরুল মুমিনীন উমরের দরজায় বসা ছিলাম। এমন সময় এক বাঁদীকে পার হতে দেখে আমরা বললাম, "এ আমিরুল মুমিনীনের বাঁদী।" আমিরুল মুমিনীন বললেন, "এ আমিরুল মুমিনীনের বাদী নয়, তার জন্য বাঁদী রাখা বৈধ নয়।"আমরা বললাম, "তাহলে কি রাখা বৈধ ?" তিনি বললেন, হজ্জ আর উমরাহ'র জন্য শীত ও গরমের দুটি কাপড় এবং নিজ পরিবারের খাওয়ার খরচ ছাড়া উমরের কাছে আর কিছু রাখা বৈধ নয়। এটা অতিসাধারণ এক কুরাইশের জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেছেন, "এরপর থেকে আমাদের অবস্থাও ছিল তাই।"

হাযিমা বিন ছাবিত বলেছেন, "তিনি এ শর্তে শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠাতেন যে – তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করবে না, উন্নত খাবার খাবে না, পাতলা কাপড় পরবে না এবং প্রয়োজনে যারা আসবে, তাদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ রাখবে না। এমনটা করলে শাস্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।"

ইকরামা বিন খালিদ বলেছেন যে, উমরকে হাফসা, আব্দুল্লাহ প্রমুখ বললেন, "আপনি উন্নতমানের আহার্য গ্রহণ করলে আল্লাহ তাআলার কাজ করার ক্ষেত্রে শক্তি অর্জন করতে পারবেন।" তিনি বললেন, "এটা কি তোমাদের সকলের অভিমত ?" তারা সকলে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে তিনি বললেন, "তোমাদের সুচিন্তিত অভিমত ?" তারা সকলে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে তিনি বললেন, "তোমাদের সুচিন্তিত মতামতে আমি ধন্য। তবে এ শাহী পথেই আমার দুই বন্ধুকে (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীককে - অনুবাদক) পেয়েছি। আল্লাহ না করুন, যদি এ শাহী পথ বর্জন করি, তাহলে আর আমি দুই বন্ধুর মর্যাদা অর্জন করতে পারবো না।"

কথিত আছে, এক সামান্য দুর্ভিক্ষের বছর থেকে তিনি ঘি এবং তৈল জাতীয় খাবার খাওয়া ছেড়ে দেন।

ইবনে আবী মালীকা বলেছেনঃ উমরকে ভালো খাবার খাওয়ার জন্য উকবা বিন ফিরকদ অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, "আফসোস! আমি এ অল্প দিনের জিন্দেগীর পুণ্যগুলো কি সব খেয়ে ফেলবো ?"

হাসান বলেছেনঃ একদিন উমর তার ছেলে আসেমের কাছে এসে তাকে গোশত খেতে দেখে বললেন, "তুমি কি খাচ্ছো ?" আসেম বললেন, "আজ গোশত খেতে আমার মন চেয়েছিলো।" উমর বললেন, "তোমার মন যা চাইবে, তাই কি খেতে হবে ? যে সবসময় নিজের মনমতো খায়, পরকালে তাকে চোর হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে।"

আসলাম বলেছেনঃ একদিন উমর (রাঃ) বললেন, "আমার মন মাছ খেতে চাইছে।" তার গোলাম ইরফা নামক উটে চড়ে চার মাইল দূরে মাছ আনতে যায়। ঝোলা ভর্তি সে মাছ কিনে। ফেরার পথে উট হাঁকিয়ে দ্রুত আসতে গিয়ে উট ঘামে সিক্ত হয়ে পড়ে। তিনি বললেন, "মাছ রাখো, আগে উট দেখবো।" তিনি উটের কাছে গেলেন আর উটের কানের নিচে বিন্দু বিন্দু জমানো ঘাম দেখে বললেন, "তুমি একে গোসল করাওনি। আমার ইচ্ছার কারণে এ পশুকে অহেতুক কষ্ট দিয়েছো। আল্লাহর কসম, আমি এ মাছ স্পর্শই করবো না।"

কাতাদা (রাঃ) বলেছেনঃ উমর খলীফা থাকাকালে তিনি চামড়ার তালিযুক্ত ফাটা কাপড় পড়ে পথ দিয়ে বাজারে গিয়ে লোকদের শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন আর তাদেরকে সাবধান করতেন। কোনো বোঝা দেখলে তিনি তা নিজ কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিতেন।

আনাস বলেছেনঃ উমরের জামার পেছনে চারটি তালি দেখেছি।

আবু উসমান নাহ্দী বলেছেনঃ উমরের পায়জামায় চামড়ার পট্টি লাগা দেখেছি।

আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রবীআ বলেছেনঃ আমি উমরের সাথে হজ্জ করেছি। সফরের সময় পথিমধ্যে তিনি কোন তাঁবু গাড়তেন না, বরং গাছের ডালে কম্বল অথবা কাপড় টানিয়ে তার ছায়ায় বসতেন।

আব্দুল্লাহ বিন ঈসা বলেছেনঃ কান্নার পানি প্রবাহিত হতে হতে উমরের চেহারায় কালো দাগ পড়ে গিয়েছিলো। কখনও তিনি ওযীফার আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে পড়ে যেতেন। মানুষ অসুস্থ ভেবে দেখতে আসতো।

আনাস বলেছেনঃ আমি এক বাগানে গেলাম। দেয়ালের এ প্রান্ত থেকেই ওপ্রান্তে অবস্থানরত উমরের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি বলেছেন, "হে উমর, কোথায় তুমি, আর কোথায় আমিরুল মুমিনীনের মর্যাদা ও সম্মান। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, নাহলে তিনি শাস্তি দিবেন।"

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন রবীআ বলেছেনঃ আমি উমরকে দেখলাম তিনি মাটি থেকে একটি তৃণখণ্ড উঠিয়ে বললেন, "হায়! আমি যদি এ তৃণখণ্ড হতাম, তাহলে আমি মাতৃগর্ভে আসতাম না এবং আমি আর আমি হতাম না।"

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হাফস বলেছেনঃ একদিন উমর পানির মশক পিঠে নিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকেরা তার এ আচরণে বিস্মিত হলে তিনি বললেন, "আমার মধ্যে গর্ব ও অহংকার এসেছে। ফলে তা খর্ব করছি।"

মুহাম্মদ বিন সিরীন বলেনঃ উমরের শ্বশুর এসে বাইতুল মাল থেকে কিছু চাইলে তিনি ভীতি প্রদর্শন করে বললেন, "আপনি কি চান যে, আমি আল্লাহর কাছে প্রতারক বাদশাহ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকি ?" এরপর তিনি নিজ তহবিল থেকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করলেন।

নাখয়ী বলেছেনঃ উমর নিজ শাসনামলেও ব্যবসা- বাণিজ্য করতেন।

আনাস বলেছেনঃ উমর দুর্ভিক্ষের বছর থেকে ঘি খাওয়া ছেড়ে দেন। একদিন তিনি মাখন আর তৈল জাতীয় খাবার খেলে তার পেটে পীড়া দেখা দেয়। সে সময় তিনি আঙুল উচিয়ে বললেন, "দুর্ভিক্ষের বছর থেকে আমার ঘরে তেমন কিছু নেই।"

সুফয়ান আয়না বলেছেন যে, উমর বলেছেন, "যে আমার ত্রুটি চিহ্নিত করে দেয়, সে ব্যক্তি আমার প্রিয়।"

আসলাম বলেছেন, "আমি উমরকে ঘোড়ার কান ধরে লাফ দিয়ে অশ্বারোহণ করতে দেখেছি।"

ইবনে উমর বলেছেনঃ আমি উমরকে রাগ করতে দেখেনি। আল্লাহর যিকির, আল্লাহর ভয় আর কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া তার রাগ যেতো না।

উমর সম্পর্কে আসলামকে বিলাল জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি উমরকে কেমন দেখেছেন ?" তিনি বললেন, "উমর একজন খাটি মানুষ। কিন্তু রেগে গেলে তাঁকে থামানো মুশকিল হয়ে পড়তো।" বিলাল বললেন, "সে সময় আপনি কুরআনের আয়াত পাঠ করতেন না কেন ? তিলাওয়াত করলে তার রাগ চলে যায়।"

আহওয়াজ বিন হাকীম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেনঃ একদিন উমরের সামনে ঘি দিয়ে রান্না করা গোশত দেয়া হলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করে বলেন, "এ দুটি (ঘি আর গোশত - অনুবাদক) পৃথক পৃথক খাবার। এ দুটিকে একত্রে রান্না করার প্রয়োজন ছিল না।"

এ পর্যন্ত উল্লিখিত ঘটনাগুলো ইবনে সাদ লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাসান থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন যে, উমর বলেছেন, "একজন আমীরকে অন্য আমীরের স্থানে পরিবর্তনের মাধ্যমে লোকদের সংশোধনের পথকে সহজ মনে করি।"

প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

ইবনে সাদ আর হাকিম বর্ণনা করেছেন যে হযরত যর বলেছেনঃ আমি মদীনাবাসীর সাথে ঈদগাহে যাবার সময় উমরকে পায়ে হেঁটে যেতে দেখলাম। তিনি তখন বৃদ্ধ, আর বাম হাতে বেশি কাজ করতেন। তিনি ছিলেন গোধূম বর্ণের, মাথার চুল শিরস্ত্রাণ পড়ার কারণে ঝরে যায়। লম্বা পদযুগল আর সবার চেয়ে উঁচু ছিলেন। সবার মাঝে দাঁড়ালে মনে হতো, তিনি পশুর পিঠে আরোহণ করেছেন।

ওকেদী বলেছেন, "যারা উমরকে গোধূম বর্ণের বলেছেন, তারা দুর্ভিক্ষের বছর থেকে দেখেছেন। তিনি তৈল জাতীয় খাবার খেয়ে পরিবর্তন হয়ে যান।"

ইবনে উমর থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ তিনি লাল সাদা মিশ্রিত বর্ণের অধিকারী ছিলেন। প্রলম্বিত পদযুগল, ঝরা চুল আর বৃদ্ধতার ছাপ তার মাঝে দেখা যেতো।

উবায়েদ বিন উমায়ের বলেছেন, "সকলের চেয়ে তাকে উঁচু মনে হতো।"

আসমা বিন আকওয়া বলেছেন, "তিনি বাম হাতে সকল কাজ করতেন।"

আবু দুজা আতা রদ্দী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ উমর লম্বা পদযুগল আর মোটা তাজা ছিলেন। তার অনেক চুল ঝরে যায়। তিনি লালিমাযুক্ত বড় বড় গোফের অধিকারী ছিলেন।

ইবনে আসাকির স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেনঃ উমরের মা হলেন হানতামা বিনতে হিশাম বিন মুগীরা। অর্থাৎ, তার মা আবু জাহেলের বোন, আর আবু জাহেল তার মামা।

খিলাফত

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর জীবদ্দশায় উমর খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত হোন ১৩ হিজরীর জামাদিউল উখরা মাসে।

যুহরী বলেছেনঃ আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যেদিন ইন্তেকাল করেন ১৩ হিজরীর জামাদিউল উখরা মাসের ২২ তারিখ মঙ্গলবারে উমর খলীফা মনোনীত হোন। (হাকিম)

তার যুগে ইসলামের বড় বড় বিজয় অর্জিত হয়।

১৪ হিজরীতে সন্ধি ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে দামেশক, সন্ধির মাধ্যমে হামস ও বাআলাবাক্কা, প্রভাব বিস্তার করে বসরা ও ইলা বিজয় হয়। ১৪ হিজরীতে তিনি তারাবীর নামাযের জন্য লোকদের সমবেত করেন। (আসকারী)

১৫ হিজরীতে প্রভাবের মাধ্যমে উরওয়ান, আর সন্ধির মাধ্যমে তবরীয়া বিজিত হয়। এ বছরেই ইয়ারমুক আর কাদেসিয়ার ঘটনা ঘটে। (ইবনে জারীর) এ বছর হযরত সাদ কুফা নগরী উন্নত ও সমৃদ্ধ করেন। এ বছর থেকে উমর ভাতা, বৃত্তি ও প্রশাসনিক কাজের জন্য দফতরের প্রবর্তন করেন।

১৬ হিজরীতে আহওয়ায আর মাদায়েন মুসলমানদের করতলগত হয়। কিসারার রাজপ্রসাদে সাদ জুমআর নামায পড়েন, এটা ছিল ইরাকের মাটিতে সর্বপ্রথম জুমআর নামায। এটা ৬ হিজরীর সফর মাসের ঘটনা। এ বছর জালুলার ঘটনা ঘটে আর ইয়াযুজরদ বিন কিসরা পরাজিত হয়ে রায়ের দিকে পালিয়ে যায়। তাকরীতও মুজাহিদদের হস্তগত হয়। উমরের আগমনে বাইতুল মুকাদ্দাসও বিজিত হয়। তিনি জাবায় তার সুপ্রসিদ্ধ ভাষণ দেন। এ বছরেই যুদ্ধের মাধ্যমে কানসিরীন আর সুরুজ এবং সন্ধির মাধ্যমে হিলব, ইনতাকীয়া, মিনাজা আর কারকিসা বিজিত হয়। এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে আলীর পরামর্শে উমর ঐতিহাসিক হিজরতের হিসাব থেকে হিজরী বর্ষের প্রবর্তন করেন।

১৭ হিজরীতে তিনি মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করেন। হিজাজে দুর্ভিক্ষ দেশী দিলে উমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ) কে সাথে নিয়ে ইসতেসকার নামায আদায় করেন। নিয়ারুল আসলামা থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, "উমর সেদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর মুবারাক পড়ে ইসতেসকার নামায পড়েন।" ইবনে উমর বলেছেন, "তিনি আব্বাসের হাত ধরে উর্ধ্বে তুলে দুয়া করেন - 'হে আল্লাহ, আমরা সহায়হীন বান্দা আপনার রাসূলে মাকবুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাচাকে ওসীলা করে আরয করছি, শুষ্কতা উঠিয়ে নিন আর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন।' " এ দুয়া করে ফিরে না আসতেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। এ বছর সন্ধির মাধ্যমে আহওয়ায বিজয় হয়।

১৮ হিজরীতে সন্ধির মাধ্যমে নিশাপুরের কিয়দংশ এবং লড়াইয়ের মাধ্যমে হালওয়ান, বাসসী, সামসাত, হারান, নাসীবীন, মৌসুল, তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আর জাযিয়ায়ে আরবের অধিকাংশ অঞ্চল ইসলামের ছায়াতলে আসে। কিছু ঐতিহাসিকের মতে, জাযিরায়ে আরবের অধিকাংশ অঞ্চল সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়।

১৯ হিজরীতে কিসারিয়া আর ২০ হিজরীতে মিসর যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের হাতে আসে। কারো কারো মতে, ইস্কান্দারিয়া ছাড়া গোটা রাজ্য সন্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয়। আলী বিন রাববাহ বলেছেন, "গোটা পশ্চিমাঞ্চল যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়।" এ বছর তসতর বিজয় হয়, রোম সম্রাট পরলোকগমন করেন, উমর খায়বার ও নাজরান থেকে ইহুদীদের বের করে দেন এবং খায়বার ও ওয়াদিউল কুরা বণ্টন করেন।

২১ হিজরীতে ইস্কান্দারিয়া আর নিহাঅন্দ যুদ্ধ করে অর্জনের পর অনারব বিশ্বে আর কোনো অবাধ্যের দল রইলো না।

২২ হিজরীতে যুদ্ধ বা সন্ধির মাধ্যমে আযারবাইজানো এবং যুদ্ধ করে দিনুর, মাসবাদন ও হামদান জয় হয়। এ বছর আবলাসুল আরব, আসকার আর কুমশ হস্তগত হয়।

২৩ হিজরীতে কারমানে সাজিস্তান, কামরানের পাহাড়ি অঞ্চল, আসবাহান আর এর পার্শ্ববর্তী জনপদ বিজিত হয়। এ বছরের শেষ দিকে হাজ্জ থেকে ফিরে আসার পর উমর শহীদ হোন।

সাঈদ বিন মুসায়্যাব বলেছেন, "উমর মিনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর উট থেকে নেমে আসমানের দিকে হাত তুলে এ দুয়া করলেন - হে আল্লাহ, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, শক্তি হ্রাস পেয়েছে, ইচ্ছাশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। এরপর আমি অকর্মণ্য হয়ে পড়ব আর আমার বিবেক লোপ পাবে। অতএব আমাকে আপনার কাছে আহবান করুন।" অতঃপর যিলহজ্জ মাস শেষ না হতেই তিনি শহীদ হোন । (হাকিম)

আবু সালিহুস সামান বলেছেন যে, উমরকে কাব বিন আহবার বলেছেন, "আমি তৌরাতে দেখেছি, আপনি শহীদ হবেন।" উমর বললেন, "এ কি করে হয়! আমি আরবে থাকবো, অথচ শহীদ হয়ে যাবো ?"

আসলাম বলেছেন যে, উমর দুয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমাকে আপনার পথে, আপনার হাবীবের শহরে শাহাদাত অর্জনের সৌভাগ্য দান করুন।" (বুখারী)

মাদান বিন আবী তালহা বলেছেন যে, উমর তার এক ভাষণে বলেছেন, "আমি স্বপ্নে যা দেখলাম তার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আমার মৃত্যু খুবই নিকটবর্তী। এ পর্যায়ে উম্মতের লোকেরা আমাকে খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত করার কথা বলছে। মনে রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার দ্বীন আর খিলাফতকে নিশ্চিহ্ন করবেন না। মৃত্যু আমার সঙ্গী হলেও দ্বীন আর খিলাফত আমার সাথী নয়। আমার পর (সেই) ছয়জন - যাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতে যাবার সুসংবাদ দিয়েছেন, তাদের পরামর্শক্রমে খলীফা নির্বাচন করবে।" (হাকিম)

যুহরী বলেছেন, "উমরের নীতি ছিল, তিনি মদীনা শরীফে কোনো যুবককে ঢুকতে দিতেন না। একবার কুফার শাসনকর্তা মুগীরা বিন শোবা খলীফা উমরের কাছে চিঠি লিখলেন যে, "আমার নিকট একজন দক্ষ কারিগর যুবক রয়েছে, সে উন্নতমানের নকশা তৈরি করতে পারে। আপনি অনুমতি দিলে আমি তাকে পাঠিয়ে দিবো।" উমর অনুমতি দিলেন। কুফায় হযরত মুগীরা সে যুবকের উপর মাসিক একশ দেরহাম কর নির্ধারণ করে রেখেছিল। সে মদীনায় এসে সেই ব্যাপারে হযরত উমরের কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, "এ কর তো বেশি কিছু নয়।" এ কথা শুনে সে যুবক ক্রোধান্বিত হয়ে দাঁতে দাঁত পিষে চলে গেলো। দুই- তিন দিন পর উমর তাকে ডেকে বললেন, "আমি শুনলাম, তুমি নাকি বলেছো যে, আমি চাইলে এমন এক চাক্কি তৈরি করবে, যা বাতাসে উড়বে ?" সে বললো, "আমি আপনার জন্য এমন এক চাক্কি তৈরি করবো, যা চিরদিন মানুষ মনে রাখবে।" সে চলে গেলে তিনি বললেন, "এ যুবক আমাকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে গেলো।" একদিন সে হীরা কাটা দুই ধারবিশিষ্ট একটি খঞ্জর জামার নিচে লুকিয়ে মসজিদের এক কোণে এসে বসে, আর এদিকে উমর নামাযের জন্য লোকদের জাগিয়ে দিচ্ছিলেন। তার নিকটবর্তী হলে সে তার শরীরে খঞ্জর দিয়ে তিনবার আঘাত করে। (ইবনে সাদ)

আমার বিন মাইমুন আনসারী বলেছেন, "মুগীরার গোলাম আবু যুযুয়াহ এর দুই ধার বিশিষ্ট খঞ্জরের আঘাতে উমর শহীদ হোন, আর তার সাথে ছিলেন এমন বারোজন আহত হোন, যাদের মধ্যে ছয়জন মারা যান।"

আবু রাফে বলেছেনঃ মুগীরার গোলাম আবু যুযুয়াহ চাক্কি তৈরি করতো। তিনি তার কাছ থেকে দৈনিক চার দিরহাম রাজস্ব আদায় করতেন। সে উমরের কাছে এলে এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করে বললো, "আমিরুল মুমিনীন, মুগীরা আমার প্রতি কঠোরতা আরোপ করেছেন। আপনি তাকে সাবধান করুন।" তিনি বললেন, "তুমি তোমার মনিবের সাথে ভালো আচরণ করবে।" উমরের ইচ্ছে ছিল তিনি এর ব্যাপারে মুগীরার নিকট সুপারিশ করবেন। কিন্তু এ কথা তার পছন্দ না হওয়ায় সে রাগত স্বরে বললো, "হে আমিরুল মুমিনীন, আমি ছাড়া সকলেই সুবিচার পেয়েছে।" সে খলীফাকে হত্যা করার ইচ্ছায় বিষ মিশ্রিত খঞ্জর নিজের কাছে রাখতে লাগলো। উমর ফজর নামাযের সময় যখন কাতার সোজা করার কথা বলছিলেন, ঠিক তখন আবু যুযুয়াহ উমরের সামনে এসে গলা ধরে পিঠের উচু অংশে উপর্যুপরি দুটি আঘাত করে। তিনি পড়ে গেলে সে অন্যদের উপর আঘাত করলে তেরোজন আহত হোন, যাদের মধ্যে ছয়জন নিহত হোন। তখন সূর্যোদয়ের সময় সমাগত প্রায়। আব্দুর রহমান বিন আউফ ছোট সূরা দিয়ে নামায শেষ করলেন। উমরকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁকে দুধ পান করানো হলে ক্ষতস্থান দিয়ে তা বেরিয়ে এলো। লোকেরা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কোনো ক্ষতি নেই, আপনি চিন্তা করবেন না।" তিনি বললেন, "যদি হত্যার মধ্যে খারাপিও থাকে, তবুও আমি নিহত হবো।" লোকেরা তার প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, যখন আমি দুনিয়া থেকে চলে যাবো, দুনিয়ার কোনো ভোগবিলাস আমাকে প্রতারিতও করবে না, আনন্দও দিবে না। তবে রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহচর্য আমাকে সঙ্গ দিবে এবং এর সওয়াব পাবো।" এরপর ইবনে আব্বাস তার প্রশংসা করলে তিনি বললেন, "যদি আমার কাছে দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণ থাকতো, তাহলে কিয়ামতের ভয়াবহতার কারণে আমি তা উৎর্স করতাম।" এরপর তিনি আবার বললেন, "উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান বিন আউফ আর সাদের মধ্য থেকে যার ব্যাপারে অধিকাংশ রায় হয়, তাঁকে খলীফা নির্ধারণ করবে।" এরপর তিনি সহীব (রাঃ) কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। এরপর সেই ছয়জন তিনজনের উপর দায়িত্ব অর্পন করেন। (হাকিম)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "সে যুবক ছিল অগ্নি উপাসক।"

আমর বিন মাইমুন বলেছেন যে, উমর বললেন, "আমার মৃত্য এমন লোকের হাতে হচ্ছে, যে ইসলামের দাবী করে না।" এরপর তিনি তার পুত্র আব্দুল্লাহকে বললেন, "আমার কর্জ হিসাব করো।" হিসাব করে প্রায় ৮৬ হাজার দিরহামের কথা বলা হলে তিনি বললেন, "যদি এ কর্জ উমর পরিবারের সম্পদ থেকে পরিশোধ হলে আদায় করবে, না হলে বনু আদীর কাছে চাইবে। তবুও শোধ না হলে কুরাইশদের কাছ থেকে নিবে। আয়েশা সিদ্দীকার কাছে গিয়ে তাঁকে বলবে - দুই বন্ধুর কাছে সমাহিত হওয়ার জন্য উমর অনুমতি চাইছে।" আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তার কাছে গেলে আয়েশা (রাঃ) বললেন, "আমি এ জায়গাটি নিজের জন্য সংরক্ষণ করছিলাম। কিন্তু আজ এ মুহূর্তে আমি উমরের আবেদনকে প্রাধান্য দিচ্ছি।" আব্দুল্লাহ এসে বললেন, "তিনি অনুমতি দিয়েছেন।" এ কথা শুনে উমর আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করলেন। লোকেরা বললেন, "হে

আমিরুল মুমিনীন, আপনার কিছু বলার থাকলে ওসীয়ত করুন। আপনি কাউকে খলীফা নির্ধারণ করে যান।" তিনি বললেন, "ছয়জন ছাড়া আর কাউকে খিলাফতের হকদার মনে করি না।" তিনি ছয়জনের নাম বললেন। "আমার ছেলে আব্দুল্লাহর সাথে খিলাফতের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। সাদ জীবিত থাকলে তিনিই হতেন খিলাফতের হকদার। তিনি যেহেতু নেই, তোমরা যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করবে। আমি সাদকে কোনো খেয়ানাতের কারণে বঞ্চিত করিনি।"

এরপর তিনি বললেন, "আমার পর যে খলীফা হবে, তাঁকে ওসীয়ত করছি - তিনি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবেন। মুহাজির, আনসার আর সকল জনসাধারণের সাথে ভালো আচরণ করবেন।" এভাবে তিনি অনেক নসীহত করার পর মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

আমরা জানাযা নিয়ে গেলাম। আয়েশা (রাঃ) কে সালাম দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, "আপনি দাফন করার অনুমতি দিন।" তিনি অনুমতি দিলে আমরা তাকে তার দুই বন্ধুর পাশে দাফন করলাম। তাকে সমাহিত করার পর লোকেরা খলীফা নির্বাচনের জন্যে সমবেত হলো। আব্দুর রহমান বিন আউফ বললেন, "পরামর্শ করার জন্য প্রথমে তিনজনকে বেছে নেয়া যায়।" সুতরাং (পরামর্শ করার জন্য - অনুবাদক) যুবাইর হযরত আলীকে, সাদ হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফকে এবং তালহা হযরত উসমানকে মনোনীত করায় তারা তিনজন পৃথক হয়ে যান। সেখানে গিয়ে আব্দুর রহমান বিন আউফ বললেন, আমি খলীফা হতে চাই না। সুতরাং আপনাদের মধ্যে থেকে কারো আশা থাকলে দেখে পুনরায় তিনি বললেন, "মনোনীত করার দায়িত্ব আপনারা আমার উপর ছেড়ে দিতে পারেন। আমি সর্বশ্রেষ্ঠকে মনোনীত করবো।" তারা সম্মতি দিলে তিনি আলীকে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং রাসুলুল্লাহ' র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রিয়তম ও নিকটতম। এজন্য আপনি খিলাফতের হকদার। যদি আমি আপনাকে খলীফা মনোনীত করি, তাহলে আপনি তার আনুগত্য করবেন।" আলী সম্মতি দিলেন। তিনি উসমানকে আলাদা ডেকে তারও সম্মতি নিলেন। এ ব্যাপারে উভয়ে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি উসমানের হাতে বাই' আত করলেন, এরপর আলী বাইআত করলেন।

মুসনাদ গ্রন্থে আহমাদ লিখেছেন যে, উমর (রাঃ) বলেছেন, "আবু উবাদা বিন জাররাহ বেঁচে থাকলে আমি তাঁকে খলীফা মনোনীত করতাম আর এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলে বলতাম - আমি রাসুলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, 'প্রত্যেক নবীর একজন বিশ্বস্ত লোক থাকেন, আর আমার বিশ্বস্ত লোক হলেন আবু উবাদা বিন জাররাহ।' তারপর মাআজ বিন জাবাল জীবিত থাকলে তাকে খলীফা নির্বাচিত করতাম, আর তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে বলতাম - আমি রাসুলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, 'মাআজ বিন জাবাল কিয়ামতের দিন ওলামাদের সামনে বড়ই মর্যাদার সাথে আবির্ভূত হবেন।' "

মুসনাদ গ্রন্থে আহমাদ লিখেছেন যে, আবু রাফে বলেছেন, "মৃত্যুর সময় খিলাফতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে উমর বললেন, "আমি আমার সাথীদের মধ্যে ব্যাপক লোভ দেখতে পাচ্ছি।"

সালোম মাওলা আবু হুযায়ফা অথবা আবু উবাদা বিন জাররাহ জীবিত থাকলে তাদের সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের বলে যেতাম।"

উমর (রাঃ) যিলহজ্জ মাসের ২৬ তারিখ বুধবারে আহত হোন এবং মুহাররম মাসে রবিবারে রাতে তাকে সমাহিত করা হয়। তার বয়স নিয়ে মতের ভিন্নতা রয়েছে। ৬৩, ৬৬, ৬১, ৬০, ৫৯, ৫৪ অথবা ৫৫ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। ওয়াকেদীর মতে, তার বয়স ৬০ বছর।

সহীৰ জানাযার নামায পড়ান।

তাহযীব গ্রন্থে রয়েছেঃ তার আংটিতে খোদাই করে লিখা ছিল -

كفي بالموت واعظا

তারেক বিন শিহাব থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে আয়মান বলেছেন, "উমর শহীদ হওয়ার পর থেকে ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়ে।"

আব্দুর রহমান বিন ইয়াসার বলেছেন, "উমরের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল।"

প্রথম প্রবর্তিত বিষয়সমূহ

আসকারী বলেছেনঃ সর্বপ্রথম আমিরুল মুমিনীন বলে উমরকে সম্বোধন করা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম হিজরী বর্ষ, বাইতুল মাল, তারাবীহ, মদ পানকারীকে আশিটি চাবুক মারার বিধান, মুতা বিয়ে হারাম, বাঁদীর সন্তানদের ব্যবসা করা নিষিদ্ধ, জানাযার নামাযে চার তাকবীর দেওয়া, দফতর প্রতিষ্ঠা করা, অনেক বিজয় লাভ করেন, ভূমির পরিমাপ করেন, সামুদ্রিক পথে মিসর থেকে মদীনায় ফলমূল আমদানী করেন, সদকার অর্থ ইসলামের কাজে ব্যবহার না করা, ফারায়েজ শাস্ত্রে পরিত্যক্ত সম্পত্তি অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার সময় কিছ অংশ অতিরিক্ত হয়ে গেলে তা পুনর্বণ্টন করার আইনটি সংযুক্ত করেন, ঘোড়ার যাকাত আদায় করেন এবং হযরত আলীর ব্যাপারে ঘোষণা করেন اطال الله بقائك এবং ايدك ا الله

আসাকারী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম নববী তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেন, "তিনি সর্বপ্রথম চাবুক মারার বিধান প্রবর্তন করেন।"

ইবনে সাদ বলেছেন, "চাবুক মারার বিধান প্রবর্তনের পর থেকে একথা প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে - উমরের চাবুক তোমার তলোয়ারের চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

ইমাম নব্বী বলেছেন, "তিনি সর্বপ্রথম শহরগুলোতে বিচারক নিয়োগ, এবং কুফা, বসরা, শাম, মিসরে রাজস্ব আদায় করেন।"

ইসমাঈল বিন যিয়াদ থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, "আলী বিন আবু তালিব রমযান মাসে এক মসিজদের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখানে প্রদীপ জ্বলতে দেখে বললেন - আল্লাহ তাআলা উমরের কবরকে আলোকিত করেছেন, আর তিনি আমাদের মসজিদ আলোকোজ্জ্বল করেছেন।"

এগারোতম পরিচ্ছেদ

ইবনে সাদ বলেছেন, "উমর একটি গুদাম নির্মাণ করে সেখানে আটা, ছাতু, খেজুর, শুষ্ক কিসমিস ইত্যাদি মুসাফিরদের জন্য সংরক্ষণ করতেন। তিনি এ গুদাম থেকে মক্কা মদীনার পথে যাতায়াতকারীদের সেবাদান করতেন। তিনি মসজিদে পাথরের মাঝে তৈরি করেন। হিজাজের ইহুদীদের শামে আর নজরানের ইহুদীদের কুফায় নির্বাসন দেন। তিনিই মাকামে ইবরাহীমকে বর্তমান স্থানে স্থাপন করেন, পূর্বে তা কাবা সংলগ্ন ছিল।"

কিছু ঘটনাবলী

আওয়ায়েল গ্রন্থে আসকারী, কবীর গ্রন্থে তাবারানী এবং ইবনে শিহাব থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর বিন সুলায়মান বিন আবী হাশামাকে উমর বিন আব্দুল আযীয আমিরুল মুমিনীন শব্দদ্বয়ের উৎস, কারণ ও প্রবর্তণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ আমার কাছে বন্ধক রাখা শিফায়া'র এক রমণী এ ব্যাপারে আমাকে বলেছেন, আবু বকর সিদ্দীকের পক্ষ থেকে খলীফাতুর রাসূল লিখা হতো। উমরের শাসনামলের প্রথম দিকেও তাই লিখা হতো। একদিন উমর ইরাকের শাসনকর্তার কাছে দুইজন চালাক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠানোর সংবাদ দিলে ইরাক শাসনকর্তা খলীফার কাছে লাবীদ বিন রাবীআ আর আদী বিন হাতিমকে পাঠালেন। তারা মদীনায় এলে সর্বপ্রথম আমর বিন আসের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তারা তাকে বললেন, "আমিরুল মুমিনীনের কাছে আমাদের পৌঁছে দিন।" আমর বিন আস বললেন, "আল্লাহর কসম, আপনারা চমৎকার উপাধি চয়ন করেছেন।" এরপর তিনি উমরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আসসালামু আলাইকুম, ইয়া আমিরুল মুমিনীন।" উমর বললেন, "তুমি এ সম্বোধন কোথায় শিখলে ?" তিনি ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন, "সত্যিই তো আপনি আমীর, আর আমরা মুমিন।" সুতরাং সেদিন থেকেই সরকারী কাগজপত্রে আমিরুল মুমিনীন সংযুক্ত হয়।

তাহযীব গ্রন্থে ইমাম নবৰী লিখেছেন, উমরের এ নামটি আদী ইবনে হাতিম আর লাবীদ বিন রাবীআ ইরাক থেকে আসার পর চয়ন করেন। কারো মতে, মুগীরা বিন শোবা এ উপাধি দেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, উমর লোকদের বললেন, "তোমরা মুমিন।" লোকেরা বললেন, "আপনি আমাদের আমীর।" সেদিন থেকে তিনি আমিরুল মুমিনীন নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। এর আগে খলীফাতুর রাসুলুল্লাহ লিখা হতো। এটা অনেক বড় উপাধি হওয়ায় তা বাদ দেয়া হয়।

মুয়াবিয়া বিন কুরাহ থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, "আবু বকর সিদ্দীক 'খলীফাতুর রাসূলুল্লাহ' লিখতেন। উমরের শাসনামলে লোকেরা 'খলীফাতুর রাসূলুল্লাহ' লিখতে চাইলে উমর বললেন, "এটা অনেক বড় ইবরাত।" তখন লোকেরা বললো, "আপনি আমাদের আমীর।" তিনি বললেন, "আমি তোমাদের আমীর, তোমরা মুমিন।" তখন থেকে আমিরুল মুমিনীন লিখা শুরু হয়।

ইমাম বুখারী স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে মাসীব থেকে বর্ণনা করেছেন, আলীর পরামর্শ উমর ১৬ হিজরীতে ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করেন।

তুযুরিয়াত গ্রন্থে ইবনে উমর থেকে সালফী বর্ণনা করেছেনঃ এক শত বিজয়গাঁথা লিখানোর ইচ্ছায় তিনি এক মাস ইসতেখারা করেন। এরপর লিখানোর ইচ্ছা পোষণের পর তিনি বললেন, "পূর্ববর্তী জাতিও গ্রন্থ রচনা করে আল্লাহর কিতাব ছেড়ে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে।"

শাদ্দাদ থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন যে, উমর বাইআতের পর সর্বপ্রথম মিম্বরে আরোহণ করে এ দুয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমি কঠোর, আমাকে নরম করে দিন। হে আল্লাহ, আমি দুর্বল, আমাকে শক্তি দিন; আমি কৃপণ, আমাকে দানশীল বানিয়ে দিন।"

উমর থেকে ইবনে সাদ আর সাঈদ বিন মানসুর বর্ণনা করেছেন, "আমি আল্লাহর সম্পদের রক্ষক। আমি হতদরিদ্র। আমার কাছে কিছু থাকলে আমি বাঁচবো। আমি মুখাপেক্ষী হলে কার্জ করব। যখন সম্পদ আসবে তখন তা শোধ করবো।"

ইবনে উমর থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, "উমরের প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের (বাইতুল মালের) দারোগার কাছ থেকে কার্জ নিতেন। একবার দারোগা তার পাওনা চাইলেন। সে সময় উমর ভীষণ অর্থ সংকটে থাকায় পাওনা পরিশোধ করতে পারছিলেন না। দারোগা পীড়াপীড়ি করায় তিনি কার্জ করে তা শোধ করেন।"

বারা বিন মারুর থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, "একদিন লোকেরা উমরকে তার জন্য বাইতুল মালে রক্ষিত মধুর কথা বললে তিনি বললেন, "তোমরা অনুমতি দিলে আমি তা গ্রহণ করতে পারি, নাহলে সে মধু আমার জন্য হারাম।" লোকেরা অনুমতি দিলো।

সালেম বিন আব্দুল্লাহ বলেছেনঃ একদিন উমর উটের পেটের নিম্নদেশে সৃষ্ট ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে করতে বললেন, "আমার ভীষণ ভয় করছে, আল্লাহ তাআলা যদি কিয়ামতের দিন এর পরিচর্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন!"

ইবনে উমর বলেছেন, "উমর জাতিকে কোনো কাজ নিষেধ করার আগে গৃহস্থ লোকদের বলতেন - তোমরা তা করলে দ্বিগুন শাস্তি পাবে।"

উমর রাতের আঁধারে মদীনার অলিগলি চষে ফিরতেন। এক রাতে তিনি এক মহিলাকে দরজা বন্ধ করে এ কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেন - "রাত প্রলম্বিত হয়েছে, তারকারাজি বাসর সাজিয়েছে, আমাকে জাগ্রত রেখেছে, আমার সাথে কেউ নেই যার সাথে আমি শুতে যাবো - এ তীব্র বাসনা। আল্লাহর কসম, আল্লাহর শাস্তির ভয় না থাকলে পশুদের মত আচরণ ও বিচরণ করতাম। কিন্তু আমি তার পর্যবেক্ষণকে ভয় পাচ্ছি, যার ফেরেশতাদ্বয় কোনো সময় গাফেল নন।" পরদিন তিনি সঙ্গে সঙ্গে রণাঙ্গনগুলোর সিপাহসালারদের এ মর্মে চিঠি লিখলেন যে, কোনো ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে চার মাসের বেশি থাকতে পারবে না।

সালমান থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন যে, সালমানকে উমর জিজ্ঞেস করলেন, "আমি বাদশাহ না খলীফা ?" সালমান জবাবে বললেন, "আপনি যদি মুসলমানদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে অনর্থক খরচ করেন, তাহলে আপনি বাদশাহ; নতুবা আপনি খলীফা।" উমর তার একথা থেকে উপদেশ গ্রহণ করলেন।

সুফিয়ান বিন আবীল আরজা বলেছেন যে, একদিন হযরত উমর বললেন, "আমি জানি না, আমি বাদশাহ না খলীফা। যদি আমি বাদশাহ হই, তবে আমি হলাম সমাজের বোঝা।" উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন বললেন, "আমিরুল মুমিনীন, খলীফা আর বাদশাহর মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে।" তিনি বললেন, "সেটা কি ?" সে বললো, "খলীফা তো তিনি, যিনি অনর্থক রাজস্ব আদায় করেন না, অহেতুক খরচও করেন না। আলহামদুলিল্লাহ, আপনি এমন নন। আর বাদশাহ অত্যাচারের মাধ্যমে করা আদায় করেন।" এ কথা শুনে উমর নীরব হয়ে গেলেন।

ইবনে মাসউদ বলেছেনঃ একদা তিনি ঘোড়ায় আরোহণের সময় নাজরানের ইহুদীরা তার পায়ের এক দিকে কালো চিহ্ন দেখে বললো, "আমাদের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, এ ব্যক্তি আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন।"

সাদ জারী বলেছেন যে, কাবে আহবার হযরত উমরকে বললেন, "আমি পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবগুলোতে দেখেছি, আপনি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে লোকদের এ পথে চলতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনার ইন্তেকালের পর কিয়ামত পর্যন্ত এতে লোক পড়তেই থাকবে।"

আবু মুআশির বলেছেনঃ আমি আমার শিক্ষকের কাছ থেকে শুনেছি যে, উমর বলেছেন, "সংস্কার করা না পর্যন্ত এতটুকু কঠোরতা করা যাবে না, যা অত্যাচারের পর্যায়ে পড়ে, আবার খুব হালকাও করা যাবে না।

মুসান্নাফ গ্রন্থে হাকিম বিন উমাইর থেকে ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন, "শয়তান যেন কুফরির দলে ভিড়াতে না পারে, এমনভাবে লোকদের চাবুকাঘাত করতে উমর অধীনস্থ প্রশাসকদের নিষেধ করেছেন।"

ইবনে আবী হাতিম স্বরচিত তাফসীর গ্রন্থ শাবী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ একদিন রোম সম্রাট উমরের কাছে এ মর্মে চিঠি লিখেন যে, "আমার দূত আপনার কাছে গিয়েছিল। ফিরে এসে সে আমাকে জানালো, আপনার কাছে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার জন্ম অন্য বৃক্ষে থেকে নয়। সে বৃক্ষের আকৃতি গাধার কানের মতো, এর ফল মতির সাদৃশ্য, ফাটলে জমরুদ পাথরের মতো সবুজ আর ইয়াকুত পাথরের মতো লাল বর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। ফলটি পরিপক্ক হয়ে পাক ধরলে তা এক প্রকার জেলি হয়, আর শুষ্ক হলে বিশেষ আহার্যে পরিণত হয়। আমার দূত যদি সত্য বলে, তাহলে স্বর্গীয় বৃক্ষ আমার কাছেও থাকা প্রয়োজন।" উমর এর জবাবে লিখলেন, "আপনার দূত সত্য বলেছে, সে বৃক্ষ আমার কাছে রয়েছে। সে বৃক্ষ থেকে ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, আল্লাহ তাআলা মারইয়াম (আঃ) এর মাধ্যমে তাকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন। ঈসা (আঃ) কে প্রভু মনে করবেন না, কারণ তিনি আদম (আ.) এর মতো মাটির তৈরি।"

ইবনে উমর থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন যে, উমর অধীনস্থ প্রশাসকের স্ব স্ব সম্পত্তির হিসাব চেয়ে পাঠালে সাদ বিন আবী ওয়াক্কাসসহ সকলেই তা প্রদান করেন। তিনি এর অর্ধেকটা রেখে বাকী অর্ধেকটা প্রশাসকদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

শাবী বলেছেন, "উমর প্রশাসক নিয়োগের আগে তার সম্পদের তালিকা জমা দিতেন।"

আবু উমামা বিন সাহল বিন হানীফ লিখেছেনঃ তিনি কিছুদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কোনো ভাতা গ্রহণ না করায় ভীষণ অর্থ সংকটে পতিত হওয়ায় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শে বললেন, "আমি তো খিলাফতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। নিজের রুজি রুটির ব্যবস্থা করতে পারি না।" আলী বললেন, "সকাল সন্ধ্যার খাবার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে গ্রহণ করতে পারেন।" উমর সেটাই করলেন।

ইবনে উমর বলেছেনঃ উমর হজ্জ করতে গিয়ে ষোলো দিনার খরচ করে এসে আমাকে ডেকে বললেন, "আব্দুল্লাহ, আমি অনেক খরচ করে ফেলেছি।"

মুসান্নাফ গ্রন্থে কাতাদা আর শাবী থেকে আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেনঃ উমরের কাছে এক মহিলা এসে বললো, "হে আমিরুল মুমিনীন, আমার স্বামী দিনে রোযা রাখেন আর সাত রাত নামাযে কাটিয়ে দেন।" তিনি বললেন, "তোমার স্বামী প্রশংসাযোগ্য কাজ করেছেন।" সেখানে কাব বিন সওয়ার উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "আমিরুল মুমিনীন, এ মহিলা স্বামীর প্রশংসা করছে না, বরং অভিযোগ পেশ করেছেন।" উমর বললেন, "কেন এ অভিযোগ ?" কাব বললেন, "স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিছু অধিকার রয়েছে, সে জন্য।" উমর বললেন, "এখন বিষয়টি বুঝতে পারলাম। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ইনসাফ করা দরকার।" কাব বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহ তাআলা পুরুষের জন্য চারজন নারী বৈধ করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চতুর্থ একজন নারীর প্রাপ্য।"

ইবনে জারীর বলেছেনঃ আমার বিশ্বস্ত বন্ধু আমাকে বলেছেন, "উমর রাতে এক মহিলাকে কবিতা (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) আবৃত্তি করতে শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি হযেছে ?" মহিলা বললেন, "কয়েক মাস আগে আমার স্বামী যুদ্ধে গেছে। তার প্রেমে এ কবিতা গাঁথা আবৃত্তি করছি।" উমর বললেন, "আপনি অবৈধ কাজে জড়িত নন তো ?" মহিলাটি বললেন, "আল্লাহ ক্ষমা করুন।" তিনি মহিলাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, "সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, আগামীকালই আপনার স্বামীকে এনে দিচ্ছি।" সকালে তিনি ঐ মহিলার স্বামীকে ডেকে আনার জন্য রণাঙ্গনে দূত পাঠান। এরপর তিনি তার মেয়ে হাফসার কাছে গিয়ে বললেন, "আমি দারুণ এক মুসিবতের মধ্যে পড়েছি, আমাকে উদ্ধার করো। একজন নারীর কতদিন পর্যন্ত তার স্বামীর প্রয়োজন হয় না ?" হাফসা লজ্জায় মাথা নিচু করলেন আর নীরব হয়ে যান। উমর বললেন, "আল্লাহর কাজে লজ্জা করতে নেই।" হাফসা হাতের ইশরায় জানিয়ে দিলেন, তিন অথবা চার মাস। এরপর উমর যুদ্ধরত সৈনিকদের চার মাসের বেশি রণাঙ্গনে আটকে রাখতে গভর্নরদের নিষেধ করেন।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেছেনঃ আমি উমরকে স্ত্রীদের ঠাট্টা বিদ্রুপ করার অভিযোগ জানালে তিনি বললেন, "আমিও তো স্ত্রীদের ঠাট্টায় বিব্রত। এমনকি আমি কোথাও গেলে তারা আমাকে বলে, আপনি অমুক গোত্রের যুবতীদের সাথে দেখা করার জন্য যাচ্ছেন। এছাড়া আপনার কোন কাজ নেই।" সেখানে ইবনে মাসউদ বসেছিলেন, তিনি বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনার কি জানা নেই যে, ইবরাহীম (আঃ) সারার দুর্ব্যবহারের অভিযোগ স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নিকট দায়ের করলে তিনি এ উত্তর পান যে, নারীদের পেছনের বাম দিক থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

ইকরামা বিন খালিদ বলেছেনঃ একদিন উমরের মেয়ে চুলে চিরুনী আর সুন্দর পোশাক পরে তার সামনে এলে তিনি এমন জোরে চাবুকাঘাত করেন যে, সে কাঁদতে লাগলো। হাফসা এসে বললেন, "তাকে কোন অপরাধের কারণে মেরেছেন ?" তিনি বললেন, "আমি তার মধ্যে অহংকার জাগতে দেখে তা দূর করলাম মাত্র।"

সুমার লাইস বিন সালিম বর্ণনা করেছেন যে, উমর বলেছেন, "তোমরা কারো নাম হাকীম আর আবুল হাকীম রেখো না, কারণ তা স্বয়ং আল্লাহর নাম।"

শুআবুল ইমান গ্রন্থে যাহহাক থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর সিদ্দীক বলতেন, "আল্লাহর কসম, আমার কাছে এটাই প্রিয় যে, আমি রাস্তার পার্শ্বে একটি বৃক্ষ হতাম, আর উট আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতো, এরপর বিষ্টা হয়ে আমাকে ত্যাগ করত, তবুও যদি মানুষ না হতাম।"

উমর বলতেন, "যদি আমি গৃহপালিত পশু হতাম! আমাকে খাইয়ে মোটাতাজা করতো। লোকেরা আমাকে দেখতে আসতো। এরপর কোন মেহমানের সম্মানার্থে আমাকে যাবোহ করে আমার কিছু গোশত রান্না আর কিছু গোশত কোপ্তা করে খেয়ে ফেলতো। তবুও যদি মানুষ না হতাম!"

আবুল বুখতারী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ একদিন উমর মিম্বরে দাড়িয়ে ভাষণ প্রদানের সময় হুসাইন বিন আলী দাড়িয়ে বললেন, আমার বাবার মিম্বর, আমার বাবার নয়। কিন্তু বলো, এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিয়েছেন ? আলী দাড়িয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম, এটি আমি শিখিয়ে দেইনি।" এরপর হুসাইনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি দিবো।" উমর বললেন, "সত্য কথার প্রেক্ষিতে কেন তুমি তার সাথে ঝগড়া করছো ? নিশ্চয়ই এ মিম্বর তার বাবার।" (এর সূত্রগুলো বিশুদ্ধ)

আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান আর সাঈদ বিন মুসায়্যাব থেকে খতীব বর্ণনা করেছেনঃ একবার উমর আর উসমান মাসয়ালা নিয়ে ভীষণ তর্ক করেন। লোকেরা মনে করলো, তাদের আর বনিবনা হবে না। কিন্তু তারা সেখান থেকে যাবার পর উভয়ের মাঝে এমন সুসম্পর্ক গড়ে উঠে যে, মনে হলো - আর তাদের মধ্যে বিতর্ক হবে না।

হাসান (রাঃ) থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ উমর (রাঃ) সর্বপ্রথম যে খুতবা পাঠ করেন, তাতে হামদ ও সানার পর বলেন, "জেনে রেখো, আমি তোমাদের সাথে একীভূত হয়েছি, তোমরাও আমার সাথে একীভূত হয়ে যাও। আমি আমার দুই বন্ধুর পর খলীফা হয়েছি। যারা উপস্থিত রয়েছো, আমি তাদের সাথে রয়েছি। আর যারা অনুপস্থিত, আমরা তাদের প্রাপ্যকে তাদের জন্যই সংরক্ষণ করবো। যারা সৎকাজ করবে, তাদের জন্য সদাচরণ; আর যারা অসৎ কাজ করবে, আমরা তাদের শাস্তি দিবো। আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করুন।"

জাবের বিন হুয়াইরিস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ উমর (রাঃ) দফতর প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের সাথে পরামর্শে বসলে আলী (রাঃ) বললেন, "প্রতি বছর যে পরিমাণ সম্পদ জমা হবে, তা আপনার কাছে না রেখে ভাগ করে দিবেন।" উসমান (রাঃ) বললেন, "সম্পদের পরিমাণ অতিরিক্ত হলে ভাগ করে দিলেও হিসাব সংরক্ষণ করা মুশকিল হবে।" ওলীদ বিন হিশাম বিন মুগীরা বললেন, "আমি সিরিয়ায় দেখেছি, সেখানে রোম সম্রাট বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৈনিকদের সমবেত করেন।"এ কথাটি তার ভালো লাগলো, আর তিনি সেটাই করলেন।

আকীল বিন আবু তালিব, মুখরিমা বিন নওফেল আর জাবের বিন মুতঈম কুরাইশদের বংশ পরম্পরা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান রাখতেন। উমর তাদেরকে এমনভাবে নসবনামা রচনার নির্দেশ দিলেন, যেন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নসবনামার বিবরণের সাথে সকল বংশ পরম্পরার যুক্ত হয়।

সাঈদ বিন মুসায়্যাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ উমর (রাঃ) প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ২০ হিজরীতে বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা করেন।

হাসান (রাঃ) বলেছেনঃ উমর লোকদের ভাতা বাদেও দান করার জন্য হুযায়ফার কাছে চিঠি পাঠালেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে দান করার পরও বিপুল অর্থ সম্পদ বেঁচে যাওয়ার কথা খলীফাকে জানালে তিনি বললেন, "আবার দান করে দাও, এ সম্পদ উমর অথবা তার সন্তানদের নয়।"

আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেনঃ উমর (রাঃ) উম্মত জননীদের সাথে সর্বশেষ হাজ্জ করেন। আরাফাত থেকে ফেরার পথে আমি শুনলাম যে, একজন অন্যজনকে বলছে, "আমিরুল মুমিনীন কোথায় ?" অন্যজনকে বলতে শুনলাম, "সে বলছে, তিনি এখানেই আছেন।"এরপর লোকটি উটকে বসিয়ে এ কবিতা আবৃত্তি করছে - "হে নেতা, আপনার প্রতি সালাম। হে আল্লাহ, ক্ষত বিক্ষত শরীরে বরকত দিন।" এ কবিতা পাঠান্তে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমরা ধারণা করলাম, সে জ্বিন হবে। হাজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি শহীদ হোন।

আব্দুর রহমান বিন আবযা বলেছেন যে, উমর বলেছেন, "এ খিলাফতের প্রথম হকদার বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, এরপর উহুদ অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, এরপর অন্যান্যরা। মক্কা বিজয়ের পর গ্রহণকারীরা তৎপূর্ব মুসলমানরা জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা খিলাফতের হকদার নন।"

নাখয়ী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি আপনার পুত্র আব্দুল্লাহকে খলীফা মনোনীত করবেন না ?" তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমাকেকে ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম, আমি এমন লোককে খলীফা মনোনীত করার জন্য প্রার্থনা করবো না, যে এখনও সুন্দর পথে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেনি।"

কাব থেকে শাদ্দাদ বিন আউস বর্ণনা করেছেনঃ বনী- ইসরাঈলের এক বাদশাহর সাথে উমরের কার্যক্রমের অনেকটা মিল ছিল। আমরা তাদের একজনের আলোচনা করলে অপরজনের স্মরণ পড়তো। বনী ইসরাঈলের সেই বাদশাহর যুগে এক নবী ছিলেন। তাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হলো - আপনি বাদশাহকে জানিয়ে দিন, তিনি আর মাত্র তিনদিন বেঁচে থাকবেন। সুতরাং তাকে রাষ্ট্রনায়ক মনোনীত করতে বলুন আর ওসীয়ত করতে চাইলে তা করুন। তৃতীয় দিন বাদশাহ খুবই বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ, আমার ছেলে যুবক হওয়া পর্যন্ত আমার হায়াতকে বৃদ্ধি করুন। আপনি জানেন, আমি আপনার আদেশ কিভাবে মান্য করেছি, কিভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছি, আমি কোনো সময় আপনার হুকুমের অবাধ্য হইনি।" আল্লাহ তাআলা নবীকে ওহীর মাধ্যমে বাদশাহর দুয়ার বিবরণ দিয়ে জানিয়ে দিলেন, সে সবগুলোই সত্য বলেছে, ফলে আমি তার হায়াত পনেরো বছর বৃদ্ধি করে দিলাম, যাতে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হতে পারে। উমর বর্শাঘাতে আহত হবার সময় কাবে আহবার এ ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, "উমরও আল্লাহর কাছে এ দুয়া করলে তিনি আরো জীবিত থাকবেন।" তিনি এ ঘটনা জানোতে পেরে এ দুয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমাকে সুস্থ না করেই উঠিয়ে নিন।"

সুলায়মান বিন ইয়াসার বলেছেন, "তার মৃত্যুতে জ্বিন জাতিও বিলাপ করেছে।"

মালিক বিন দিনার (রহঃ) থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ তিনি শহীদ হওয়ার পর ইয়ামানের পাহাড়ের দিক থেকে এ কবিতার আওয়াজ ভেসে আসে - "যারা ইসলামের জন্য কাঁদে, তারা কাঁদতে থাকো, সে দিন বেশী দূরে নয়, যখন মানুষ ধ্বংস হবে, অথচ নবীর যুগ গত হওয়া বেশী দিন হয়নি। পৃথিবী উল্টে গেছে, কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান চলে গেছেন।"

ইয়াহইয়া বিন আবী রাশেদ বসরী থেকে ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন যে, উমর তার ছেলেকে ওসীয়ত করেছেন, "আমার কাফনে অনর্থক খরচ করবে না, কারণ যদি আমি আল্লাহ তাআলার কাছে ভাল হই, তাহলে তিনিই প্রতিদান দিবেন; আর ভাল না হলে তিনি তা ছিনিয়ে নিবেন, তাই এ অতিরিক্তের প্রয়োজন নেই। আমার কবর লম্বা করার প্রয়োজন নেই। কারণ আমি আল্লাহ তাআলার কাছে সুপ্রশস্ত কবরের অধিকারী হলে তিনি সে ব্যবস্থা করে দিবেন, অন্যথায় তিনি আমার কবর সংকুচিত করে দিবেন, এতে আমার সকল হাড়গোড় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আমার জানাযার সাথে কোনো নারী যেতে পারবে না। আমি যা নই তা বলে আমাকে স্মরণ করবে না, কারণ আল্লাহ তাআলা গায়েব জানেন, তিনি আমার সম্পর্কেও জানেন। আমাকে খুব দ্রুত সমাহিত করার ব্যবস্থা করবে।"

বারোতম পরিচ্ছেদ

আব্বাস (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ আমি উমরের ইন্তেকালের এক বছর পর আল্লাহ তাআলার কাছে তাকে স্বপ্নে দেখার জন্য দুয়া করলাম। এক বছর পর স্বপ্নে উমরকে কপালের ঘাম মুছতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কেমন আছেন ?" তিনি বললেন, "আমি হিসাব দিয়ে সবেমাত্র ছাড়া পেলাম, আল্লাহ যদি দয়াশীল না হতেন, তাহলে উমর অপদস্ত হতো।"

যায়েদ বিন আসলাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস স্বপ্নে উমরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন ?" উমর জবাবে প্রশ্ন করলেন, "আমি তোমাদের থেকে কবে পৃথক হয়েছি ?" তিনি উত্তর দিলেন, "বারো বছর আগে।" উমর বললেন, "আমি হিসাব দিয়ে এই মাত্র এলাম।"

সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ আমি এক আনসারের কাছে শুনেছি, তিনি উমরকে স্বপ্নে দেখার দুয়া করায় দশ বছর পর স্বপ্নে তাঁকে কপালের ঘাম মুছতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি কি করছেন ?" তিনি বললেন, "হিসাব দিয়ে এই মাত্র এলাম। আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ আমার সাথে না থাকলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।"

অনেক বিখ্যাত লোকেরা হযরত উমরের শোকগাথা রচনা করেছেন। ছোট পরিসরের কারণে আমরা তা সন্নিবেশীত করলাম না।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর শাসনামলে নিম্নে উল্লেখিত সাহাবাগণ ইন্তেকাল করেন –

উতবা বিন গাযাওয়ান, আলী বিন হাযরামী, কায়েস বিন সুকন, সিদ্দীকে আকবরের সম্মানিত পিতা আবু কুহাফা, সাদ বিন উবাদা, সোহেল বিন উমর, ইবনে উম্মে মাকতুম, আয়শ বিন আবী রাবীআ, আব্দুর রহমান, যুবায়ের বিন আওয়ামের ভাই আবী সআসআ (তিনি কুরআন শরীফ একত্রিতকরণের মহান দায়িত্ব পালন করেন), নওফেল বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব, আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব,

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র হযরত ইবরাহীম (রাঃ) এর সম্মানিত জননী উন্মুল মুমিনীন মারিয়া (রাঃ), আবু উবাদা বিন জাররাহ, মাআয বিন জাবাল, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান, উবাই বিন কাব, বিলাল, উসাইদ বিন হাযীর, শরাহবীল বিন হুসনা, ফজল বিন আব্বাস, আবু জন্দল বিন সোহেল, আবু মালিক আল আশআরী, সাফওয়ান বিন মোতাল, বারা বিন মালিক, হযরত আনাসের ভাই, উম্মত জননী যয়নব বিনতে জাহাশ, আয়য বিন গানাম, আবুল হাইসাম বিন তাইহান, খালিদ বিন ওলীদ, জারুদ, নুমান বিন মুকরিন, কাতাদা বিন নুমান, আকরা বিন হাবেস, সওদা বিনতে যামাআ, আওয়ীম বিন সাআদাহ, গায়লান ছাকাফী, আবু মুহাজিন ছাকাফী প্রমুখ। (রাদিআল্লাহু আনহুম)

উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

তার নাম উসমান বিন আফফান বিন আবুল আস বিন উমাইয়্যা বিন আব্দুশ শামস বিন আব্দে মান্নাফ বিন কুসসী বিন কিলাব বিন মুররা বিন কাব বিন লূয়ী বিন গালীব আল- কারশী আল- উমরী আবু উমর। কারো মতে, আবু আব্দুল্লাহ আবু লায়লা।

তিনি হস্তী বাহিনীর ঘটনার ষষ্ঠ বছরে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি মুসলমান হোন। আবু বকর সিদ্দীকের আহবানে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি দুবার - একবার হাবশায়, দ্বিতীয়বার মদীনা শরীফে হিজরত করেন।

নবুওয়াতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা রুকাইয়্যার সাথে তার বিয়ে হয়। রুকাইয়্যা বদর যুদ্ধের দিন ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকাইয়্যার সেবাযত্নের জন্য উসমানকে মদীনায় রেখে বদর যুদ্ধে যান। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে গনীমাতের ভাগ দিয়েছিলেন। সুতরাং উসমানকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বদর যুদ্ধের বিজয় সংবাদ নিয়ে দূত যখন মদীনায় আসে, লোকেরা তখন রুকাইয়্যার কবরে মাটি দিচ্ছিলো।

রুকাইয়্যা (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরেক কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ) এর সাথে উসমানের বিয়ে দেন। আর হযরত উম্মে কুলসুম ৯ম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

উলামায়ে কেরাম বলেন, উসমান ছাড়া কারো সঙ্গে কোনো নবীর দুই কন্যার বিয়ে হয়নি, আর এজন্য তাঁকে “যিননূরাইন” বলা হয়।

তিনি প্রাথমিক যুগের মুসলমান, দুই স্থানে হিজরতকারী আর আশরায়ে মুবাশশারাদের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি কুরআনের হাফেয ছিলেন। ইবনে উবাদা বলেছেন, “খলীফাগণের মধ্যে উসমান আর মামুন রশীদ ছাড়া কেউ হাফেযে কুরআন নন।”

ইবনে সাদ বলেছেন, “নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাতুর রিকা আর গাতফান যুদ্ধে যাওয়ার সময় উসমানকে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে যান।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উসমান (রাঃ) ১৪৪ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে যায়েদ বিন খালিদ জুহানী, ইবনে যুবায়ের, সায়েব বিন ইয়াযিদ, আনাস বিন মালিক, যায়েদ বিন সাবিত, সালামা বিন আকওয়া, আবু উমামা বাহলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল, আবু কাতাদা, আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম আর অসংখ্য তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেন।

আব্দুর রহমান বিন হাতিব থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, "সকল আসহাবে রসূলের মধ্য থেকে আমি উসমানের চেয়ে সুন্দর করে হাদীস বর্ণনা করতে আর কাউকে দেখিনি। তিনি খুবই যত্ন ও সাবধানতার সাথে হাদীস বর্ণনা করতেন।"

মুহাম্মাদ বিন সিরীন বলেছেন, "তিনি হাজ্জের সবচেয়ে বেশী মাসয়ালা জানোতেন, তার পর ইবনে উমরের স্থান।"

বাইহাকী সুনান গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন আবান জাফী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আমার মামা জাফী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি জানো, উসমানকে কেন যিননূরাইন বলা হয় ?" আমার না জানার কথা বললে তিনি বললেন, "আদম (আঃ) থেকে আজ পর্যন্ত উসমান ছাড়া কেউ কোনো নবীর দুই মেয়েকে বিয়ে করেননি, এজন্য তাঁকে যিননূরাইন বলা হয়।"

হাসান থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, "নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই কন্যাকে বিয়ে করার কারণে তার নাম যিননূরাইন।"

খাইসামা ফাযাইলুস সাহাবা গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি আলীকে উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "তিনি এমন ব্যক্তি, যিনি ফেরেশতাদের মাঝে যিননূরাইন নামে প্রসিদ্ধ এবং নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই কন্যার সাথে তার বিয়ে হয়।"

সহল বিন সাদ দুর্বল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, "জান্নাতে এক ভবন থেকে আরেক ভবনে স্থানান্তর হওয়ার সময় দুবার আলোকিত হওয়ার জন্য তিনি যিননূরাইন নামে প্রসিদ্ধ।"

বর্ণিত রয়েছে, জাহেলিয়াতের যুগে তার উপনাম ছিল আবু উমর। আর হযরত রুকাইয়্যার গর্ভ থেকে তার ঔরসজাত সন্তান আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণের পর তার উপনাম হয় আবু আব্দুল্লাহ।

তার মাতার নাম আরওয়া বিনতে কারীম বিন রাবীআ বিন হাবীব বিন আব্দুশ শামস। নানীর নাম উম্মে হাকীম আল বায়যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম। তার নানী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহ এক গর্ভের সন্তান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার জননী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাতো বোন।

ইবনে ইসহাক বলেছেন, "তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক, আলী আর যায়েদ বিন হারিসার পর ইসলাম গ্রহণ করেন।"

ইবনে আসাকির বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেনঃ উসমানের মাঝারি গঠন ছিল চমৎকার। সাদার সাথে ছিল লালচে বর্ণে মিশ্রিত শরীরের আকৃতি। চেহারায় বসন্তের দাগ ছিল। ঘন দাড়ি প্রশস্ত গ্রীবা, দৃঢ় পদ, লম্বা হাতে পশমের সমাবেশ, মাথায় কালো কেশ, অপূর্ব দন্তরাজি আর বাবরী চুলের অধিকারী ছিলেন। তিনি কেশগুচ্ছে হলদে বর্ণের কলপ করতেন।

আব্দুল্লাহ বিন হাযাম মাযানী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, "আমি উসমানের চেয়ে বেশী সুন্দর কোনো পুরুষ দেখিনি।"

মূসা বিন তালহা বলেছেন, "উসমান কান্তিময় চেহারার অধিকারী ছিলেন।"

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, উসামা বিন যায়েদ বলেছেন, "একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এক বাটি গোশত দিয়ে উসমানের কাছে পাঠালেন। আমি তার বাড়ি গেলাম। রুকাইয়্যা বসেছিলেন। আমি একবার রুকাইয়্যার চেহারার দিকে, আরেকবার উসমানের দিকে তাকাতে লাগলাম। এরপর ফিরে এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছিলে ?" আমি বললাম, "হ্যা।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "এতো লাবণ্যময় দম্পতি তুমি আরও দেখেছো ?" আমি বললাম, "না।"

মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন হারিস আল- তাইমী থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ তিনি ইসলাম গ্রহণ করায় তার চাচা হাকিম বিন আবুল আস বিন উমাইয়্যা ধরে নিয়ে গিয়ে শক্ত করে বেঁধে বললো, "তুমি পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছো। আল্লাহর কসম, আগের ধর্মে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ব না।" তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, কিয়ামত পর্যন্ত আমি এ দ্বীন ত্যাগ করবো না।" তার দৃঢ়তা দেখে অবশেষে তাঁকে ছেড়ে দেয়।

আনাস (রাঃ) বলেছেনঃ তিনিই সর্বপ্রথম স্বপরিবারে হাবশায় হিজরত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আল্লাহ তাআলা উসমানের সাথে রয়েছেন। হযরত লুত (আঃ) এর পর উসমান স্বপরিবারে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করলেন।" (আবু ইয়ালা)

আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেনঃ উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেওয়ার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, "তোমার স্বামী তোমার দাদা ইবরাহীম (আঃ) এবং তোমার পিতা মুহাম্মাদের অনুরূপ।" (ইবনে আদী)

ইবনে উমর থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি উসমানকে আমার পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর মতো মনে করি।"

হাদিসের দৃষ্টিতে উসমান (রাঃ) এর মর্যাদা

ইমাম বুখারী আর ইমাম মুসলিম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ উসমান (রাঃ) ঘরে প্রবেশের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসন সংযত করে বললেন, "যাকে দেখে ফেরেশতাগণ লজ্জা পায়, আমি কেন পাবো না ?"

আব্দুর রহমান বিন সালাম থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেনঃ অবরুদ্ধ অবস্থায় উসমান (রাঃ) অবরোধকারীদের উদ্দেশ্যে আসহাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কসম করে বলেন, “আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বলেছিলেন - ‘কে আছো, যে সংকটময় মুহূর্তে সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করবে, সে জান্নাত পাবে।’ আমি তখন সাহায্য করেছিলাম। তোমরা জানো না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বলেছিলেন, যে রুমার কূপ খনন করবে, সে জান্নাতে যাবে। আমি তখন রুমার কূপ খনন করেছিলাম।” সকল সাহাবা তার কথাকে সত্যায়িত করেন।

আব্দুর রহমান বিন খাবাব থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো এক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সাহাবীদের তাগীদ দিচ্ছিলেন। সে সময় উসমান বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি একশ উটসহ একশ উট বোঝাই রসদের জিম্মা নিচ্ছি।” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তাগাদা দিলেন। উসমান বললেন, “দুইশ উটসহ দুইশ উট বোঝাই রসদের জিম্মা আমার।” নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় তা বললে তিনি বললেন, “তিনশ উট আমার দায়িত্বে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বর থেকে নামতে নামতে বললেন, “উসমানের নফল ইবাদতের আর প্রয়োজন নেই।”

আব্দুর রহমান বিন সামূরা থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেনঃ যুদ্ধের জন্য সামরিক বাহিনী গঠনের সময় উসমান গনী এক হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) নিয়ে এলে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর জামার আঁচলে রেখে বললেন, “উসমান যদি আর কোনো নফল ইবাদত না করে, তবুও কোনো ক্ষতি নেই।”

আনাস (রাঃ) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেনঃ বাইআতে রিদওয়ানের সময় উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইআত করছিলেন। সে সময় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “উসমান আল্লাহ এবং তার নবীর কাজে রত আছেন। আমি তার পক্ষ থেকে নিজের হাতের উপর অপর হাত দিয়ে বাইআত করছি।” সুতরাং এভাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পক্ষ থেকে বাইআত করেন। সে দিন তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি হাত মুবারক উসমানের পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়েছিলো, যা অন্যান্য সাহাবীদের হাতের তুলনায় সে হাত কতই না উত্তম ছিল। আর এতেই উসমানের মর্যাদা প্রকাশ হয়।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেনঃ একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ফিতনার ভবিষ্যদ্বাণী করে উসমানের দিকে ইশারা করে বললেন, “উসমান সে ফিতনায় মজলুমভাবে শহীদ হবে।”

মুররা বিন কাব থেকে তিরমিযী, হাকেম আর ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটবর্তী এক বিশৃঙ্খলার বিবরণ দেওয়ার সময় এক ব্যক্তি চাদর দিয়ে মাথা মুড়িয়ে হেঁটে গেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, “এ ব্যক্তি সে দিন হিদায়াতের উপর অটল থাকবে।” আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম, তিনি হলেন উসমান গনী। তার চেহারা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ফিরালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, "ইনিই কি হিদায়াতের উপর অবিচল থাকবেন ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হ্যাঁ।"

আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেন, "হে উসমান, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে যে খিলাফত দিয়েছেন, সেখান থেকে ষড়যন্ত্রকারীরা তোমাকে উৎখাত করতে চাইলে তুমি সরে পড়বে না, বরং আমার কাছে আসবে।" এজন্য কুচক্রী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন, আমি এখান থেকে বিন্দুমাত্র নড়বো না।" (তিরমিযী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ উসমান দুইবার জান্নাত কিনেছেন - এক, রুমার কূপ খনন করে এবং দুই, সৈন্যদের সাহায্য করে।"

আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার সাহাবীদের মধ্যে অভ্যাসের দিক দিয়ে উসমান আমার মতো।"

আসমাত বিন মালিক থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় মেয়ে উম্মে কুলসুম ইন্তেকাল করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমার তৃতীয় মেয়ে থাকলে উসমানকে তার সাথেও বিয়ে দিতাম। ওহী মোতাবেক তার সাথে আমার কন্যাদ্বয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম।"

আলী (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান সম্পর্কে বলেছেন, "আমার চল্লিশজন মেয়ে থাকলে পরপর আমি তাদেরকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতাম।"

যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "উসমান আমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় এক ফেরেশতা আমার কাছে বসে ছিলো। তিনি আমাকে বললেন - ইনি শহীদ হবেন। স্বজাতি কর্তৃক তার নিহত হবার সংবাদ পেয়ে আমি লজ্জিত হলাম।"

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ এবং তার রাসূলের কাছে ফেরেশতাগণ যেভাবে লজ্জাবোধ করেন, উসমানের সামনেও তারা একইভাবে লজ্জিত হোন।"

হাসান (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি উসমান সম্পর্কে হাসানকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "গোসল করার সময় শরীরের কাপড় নির্জন কক্ষে খুলতেও তিনি ভীষণ লজ্জাবোধ করতেন।"

উসমান (রাঃ) এর খিলাফত

উমর (রাঃ) এর দাফনের তৃতীয় দিন উসমানকে বাইআত দেওয়া হয়।

কথিত আছে, একদিন লোকেরা হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফের সাথে পরামর্শ করেন আর বুদ্ধিমানরাও তার সাথে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাত করে উসমানের ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। অবশেষে আব্দুর রহমান বিন আউফ বায়আতের জন্য সমবেত মজলিসে এসে বসেন এবং হামদ ও সানার পর বলেন, "তোমাদের লোকেরা উসমান (রাঃ) ছাড়া কাউকে বাইআত প্রদানে সন্তুষ্ট নন।" (ইবনে আসাকির)

এক বর্ণনায় রয়েছেঃ আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) হামদ ও সানার পর আলীকে বললেন, "হে আলী, আমি সকলের সাথে কথা বলে জেনেছি তাদের অভিমত উসমানকে ঘিরে।" এ কথা বলে তিনি উসমানের হাত ধরে বললেন, "আল্লাহ, তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং পূর্ববর্তী দুই খলিফার নীতি অনুযায়ী আমি তার কাছে বাইআত করছি, আপনিও বাইআত করুন।" এরপর সকল মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ বাইআত করলেন।

আনাস (রাঃ) বলেছেনঃ উমর ইন্তেকালের এক ঘন্টা আগে আবু তালহা আনসারীকে বলেছেন, "যে ঘরে আসহাবে রাসূল খলীফা নির্ধারণের জন্য তিনদিন সমবেত হবেন, কেউ যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য তুমি পঞ্চাশজনকে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে।" (ইবনে সাদ)

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আবু ওয়ায়েল কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ আমি আব্দুর রহমান বিন আউফকে বললাম, "আলীকে বাদ দিয়ে উসমানকে কেন বাইআত দিলেন ?" তিনি বললেন, "এতে আমার কোনো ক্রুটি নেই। আমি আলীকে বলেছিলাম - আমি কিতাবুল্লাহ, সুন্নতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সীরাতে আবু বকর ও উমর অনুযায়ী আপনাকে বাইআত দিবো।" জবাবে তিনি বললেন, যখন করা তা সম্ভব হবে, অন্যথায় উসমানকে একই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, খুব ভালো (বাইআত করুন - অনুবাদক)।

বর্ণিত রয়েছে, আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) বলেছেনঃ আমি উসমানকে নির্জনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি আপনার কাছে বাইআত না করলে আমাকে কার বাইআত গ্রহণের পরামর্শ দিবেন ?" তিনি বললেন, "আলীর।" আলীকে প্রশ্ন করলে তিনি উসমানের কথা বলেন। যুবায়েকে বললাম, তিনি আলী অথবা উসমানের নাম উল্লেখ করলেন। এরপর সাদের অভিমত জানোতে চাইলাম, তিনি উসমানকে নির্বাচন করেন। এরপর আমি সকল আসহাবে রাসূল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশের মতামত উসমানের পক্ষে পেলাম।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে ইবনে সাদ আর হাকিম বর্ণনা করেছেন যে, উসমানের বাইআতের সময় লোকেরা বলছিলেন, "জীবিতদের মধ্যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনার আনুগত্যে আমরা কোনো ক্রুটি করবো না।"

উসমানের খিলাফত লাভের আগের বছর ২৪ হিজরীতে রায় অঞ্চল বিজিত হলেও হাত থেকে চলে গেলে তার আমলে দ্বিতীয়বার তা পদানত হয়। সে বছর গ্রীষ্মের তাপদাহে নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ জাতীয় রোগ বিশেষের প্রাদুর্ভাবে উসমান আক্রান্ত হয়ে হাজ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি স্থগিত করেন আর রুগ্নতার আশঙ্কায় প্রয়োজনীয়

ওসীয়ত করেন। এজন্য এ বছরকে রক্তক্ষরণের বছর হিসেবে অভিহিত করা হয়। একই বছর রোমান সাম্রাজ্যের সিংহভাগ ভূখণ্ড ইসলামের পতাকাতলে আসে আর উসমান মুগীরাকে অপসারণ করে সাদ বিন আবী ওয়াক্কাসকে কুফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

২৫ হিজরীতে হযরত উসমান সাদকে অপসারণ করে মায়ের দিক থেকে আত্মীয়তার সম্পর্কে ভাই ওলীদ ইবনে উকবা বিন আবী মুইতকে কুফার প্রশাসক নিয়োগ করেন। তার প্রতি জনতার এটাই প্রথম অভিযোগ যে, তিনি আত্মীয়তার চর্চা করেছেন। কথিত আছে, ওলীদ ছিলেন মদ্যপ। একবার নেশা করে ফজরের নামাযের ইমামতি করেন আর চার রাকাত নামায পড়িয়ে সালাম ফিরে মুক্তাদিদের বলেন, তোমরা বললে আরো বেশী পড়িয়ে দিবো।

২৬ হিজরীতে কিছু ঘরবাড়ি কিনে উসমান (রাঃ) মসজিদে নববী সম্প্রসারণ করেন। এ বছর সাবু অঞ্চল বিজিত হয়।

২৭ হিজরীতে মুআবিয়া নৌপথে কবরয আক্রমণ করেন। এ বাহিনীতে উবাদা বিন সামেতের সাথে তার পত্নী উম্মে হারাম বিনতে মিলহান আনসারীও ছিলেন। এ অভিযানে তার স্ত্রী ঘোড়া থেকে পড়ে নিহত হোন আর তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ যুদ্ধে উবাদার স্ত্রীর নিহত হওয়ার ব্যাপারে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এ বছর আরজানো আর দারে বজর্দ করতলগত হয়। এরপর তিনি আমর বিন আসকে অপসারণ করে আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবী সারাহকে মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত হয়ে আফ্রিকা আক্রমণ করে তা দখল করে সকল পর্বত ও বনাঞ্চল পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো ইসলামের ছায়াতলে আনেন। সেখানে প্রচুর সম্পদ গনীমত হিসেবে মুসলমানদের হাতে আসে। ফলে প্রত্যেক মুহাজির এক হাজার, কোনো বর্ণনা অনুযায়ী তিন হাজার দিনার ভাগে পান। এরপর আন্দলস হস্তগত হয়।

উল্লেখ্য, মুআবিয়া (রাঃ) উমর (রাঃ) কে নৌপথে কবরয আক্রমণের জন্য বারবার অনুরোধ করায় উমর (রাঃ) মিসরের শাসনকর্তা আমর বিন আস (রাঃ) কে নৌযান সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা দেবার জন্য নির্দেশ দেন। আমিরুল মুমিনীনের চিঠি পেয়ে আমর বিন আস (রাঃ) লিখলেন, "আমি এ বাহন দেখেছি। সেটি এক প্রকাণ্ড মাখলুক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাখলুকরা এতে আরোহণ করে। যখন এ বাহনটি স্থির হয়ে দাঁড়ায় তখন অন্তর ফেটে যায়, আর যখন চলতে থাকে তখন বিবেক লোপ পায়। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির অংশই বেশী। এতে উপবেশনকারীরা কাষ্ঠ খণ্ডের উপর সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মত আরোহণ করেছে। এটি ছিদ্র হলে নিমজ্জিত হবে।" নৌযান সম্পর্কে এ বিবরণ পড়ে আমিরুল মুমিনীন উমর (রাঃ) মুআবিয়া (রাঃ) কে লিখলেন, "আল্লাহর কসম, এমন বাহনে মুসলমানদের আরোহণ করতে দিবো না।"

ইবনে জারীর বলেনঃ অবশেষে মুআবিয়া (রাঃ) উসমান (রাঃ) এর খিলাফতকালে নৌপথে কবরয আক্রমণ করেন আর কবরযবাসী জিজিয়া কর দেবার জন্য সন্ধি করে।

২৯ হিজরীতে ইসতিখার, কাসা এবং এর পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট রাজ্যগুলো যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়। সে সময় তিনি মসজিদে নববী সম্প্রসারণ করেন। কারুকার্য খচিত পাথর, পাথরের স্তম্ভ আর কাঠ নির্মিত ছাদ তৈরির মাধ্যমে মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৬০ গজ আর প্রস্থ ১৫০ গজ হয়।

৩০ হিজরীতে জুর, নিশাপুর আর খুরাসনের অধিকাংশ শহরগুলো কিছু সন্ধির মাধ্যমে, বাকীগুলো লড়াই করে মুসলমানদের হস্তগত হয়। তখন চারদিক থেকে প্রচুর সম্পদ আদায় করেন, উসমান (রাঃ) কোষাগার নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করেন আর তিনি প্রতিদিন মন খুলে লোকদের দান করতেন। এতে কেউ এক লাখ কেউ চার লাখ দিরহাম পেতেন। ৩৫ হিজরীতে উসমান গনী (রাঃ) শাহাদাত লাভ করেন।

যুহরী বলেছেনঃ উসমানের বারো বছর খিলাফতের প্রথম ছয় বছর তার প্রতি লোকদের কোনো অভিযোগ ছিল না। এমনকি উমর কঠোর হওয়ার কারণে কুরাইশদের মধ্যে তিনি ছিলেন অধিক জনপ্রিয়। ছয় বছর পর উসমান অনেক নরম হয়ে পড়েন। তিনি আত্মীয় ও প্রিয়জনদের প্রশাসক পদে নিয়োগ দিতে আরম্ভ করেন। মারওয়ান আফ্রিকার শাসনকর্তাকে এক- পঞ্চমাংশ যা বাইতুল মালে জমা হবে তা মাফ করে দেন। তিনি আত্মীয়- স্বজনকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা দেন, এ যুক্তির আলোকে যে - আবু বকর আর উমর উভয়ের জন্যই তা বৈধ ছিল, কিন্তু তারা সেটি গ্রহণ করেননি, আমি আল্লাহ তাআলার নির্দেশে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলেছি। এতে করে জনতার মাঝে বিশৃঙ্খলার সৃষ্ট হয়। (ইবনে সাদ)

যুহরী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ আমি সাঈদ বিন মুসায়্যাবকে জিজ্ঞেস করলাম, "উসমানকে কেন শহীদ করা হয় ? সে সময় লোকদের অবস্থা কি ছিল ? তার রীতিনীতি কি ছিল ? আর সাহাবাগণ কেন তার সঙ্গ দেননি ?" তিনি বললেন, "উসমানকে মজলুমভাবে শহীদ করা দেয়া হয়েছে। হত্যাকারীরা ছিল জালেম, আর যারা তার সাহচর্য ত্যাগ করেছিলেন তারা অপারগ ও অক্ষম ছিলেন।" আমি বললাম, "এর বিস্তারিত বিবরণ কি ?" তিনি বললেন, "উসমান নৈকট্যপ্রাপ্তদের বেশী ভালোবাসার কারণে অনেকেই তা ভালো দৃষ্টিতে দেখেননি।"

তার বারো বছর খিলাফতের প্রথমদিকে উমাইয়্যা বংশের মধ্য থেকে আসহাবে রাসূল ছাড়া অন্যদের শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন, আর সাহাবীগণ তাদের অধিকাংশ কাজের সমালোচনা করতেন; কিন্তু উসমান (রাঃ) তাদেরকে অপসারণ না করে ক্ষমা করে দিতেন। ছয় বছর পর চাচার সন্তানদের প্রাধান্য দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করতে থাকেন। তিনি আব্দুল্লাহ বিন আবী সারাহকে মিসরের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণের দুই বছর পর মিসরবাসী তার বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ আনতে থাকার কারণে উসমান মিসর শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিন আবী সারাহের প্রতি একটি চিঠি লিখেন। কিন্তু পত্রে উল্লিখিত আদেশ- নিষেধের কোনো তোয়াক্কা না করে যারা খলীফার কাছে অভিযোগ করতে এসেছিলো, আব্দুল্লাহ বিন আবি সারাহ তাদের হত্যা করেন। এরপর মিসরবাসীর পক্ষে থেকে সাত সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মুসলিম বিশ্বের রাজধানী পবিত্র মদীনা শরীফে এসে নামাযের সময় মসজিদে নববীতে সাহাবীদের কাছে আব্দুল্লাহ বিন সারাহের হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ দায়ের করে। ফলে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে এ বিষয় নিয়ে উসমানের সাথে কঠোরতার সাথে বাদানুবাদ করেন। ওদিকে আয়েশা (রাঃ) ঘটনাটি

জানোতে পেয়ে উসমানের কাছে বলে পাঠান যে, "মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণ আপনার নিকট এমন এক ব্যক্তির অপসারণ চাইছে, যে লোকটি হত্যার দায়ে দোষী, কিন্তু এতে আপনি কর্ণপাত করছেন না, আর তাকে অপসারণ করতে অসম্মতি জানাচ্ছেন। আপনার উচিত তাঁকে শাস্তি দেয়া।" কিছুক্ষণ পর হযরত আলী (রাঃ) এসে বললেন, "এরা হত্যার পরিবর্তে একজন শাসনকর্তার অপসারণ চাইছে। কেন সেখানে আরেকজনকে অধিষ্ঠিত করছেন না ? কেন এ কাজে ইনসাফ করছেন না ?" উসমান বললেন, এরা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিবে। আমি আব্দুল্লাহ বিন আবী সারাহকে অপসারণ করে একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি। লোকেরা মিসরের নতুন শাসনকর্তা হিসেবে মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে সবদিক দিয়ে যোগ্য বিবেচনা করে।

উসমান কর্তৃক আব্দুল্লাহ বিন আবী সারাহের অপসারণের ফরমান নিয়ে মুহাম্মদ বিন আবু বকর মিসরে যাত্রা করেন। আব্দুল্লাহর অবস্থা স্বচক্ষে দেখার করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের একটি দল মুহাম্মাদ বিন বিন আবু বকরের সাথে ছিলেন। তারা তৃতীয় মঞ্জিলে অবস্থানের সময় এক হাবশী গোলামকে উটনীর উপর আরোহণরত অবস্থায় দ্রুততার সাথে পথ চলতে দেখে ভাবলেন যে, হয়তো কারো দূত হবে অথবা পলায়নকারী। সাহাবায়ে কেরাম তার গতিরোধ করে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে ? কার অনুসন্ধানে কোথায় চলেছেন ?" সে বললো, "আমি আমিরুল মুমিনীনের গোলাম, মিসর শাসনকর্তার কাছে যাচ্ছি।" এ কথা শুনে এক ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন আবু বকরের প্রতি ইশারা করে বললেন, "ইনি মিসর শাসনকর্তা।" সে বললো, "উনি আমার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি নন।" এ বলে সে চলে গেলে মুহাম্মাদ বিন আবু বকর দুইজনকে পাঠিয়ে তাকে ধরে এনে জিজ্ঞেস করলেন, "কে আপনি ?" সে বিহ্বল ও হতচকিত হয়ে একবার নিজেকে আমিরুল মুমিনীন ও একবার মারওয়ানের গোলাম বলে পরিচয় দেয়। একজন তাকে চিনতে পেয়ে আমিরুল মুমিনীনের গোলাম হিসেবে সনাক্ত করলে মুহাম্মাদ বিন আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, "আমিরুল মুমিনীন আপনাকে কার কাছে কেন পাঠাচ্ছেন ?" সে বললো, "মিসর শাসনকর্তার কাছে পৌছানোর জন্য একটি চিঠিসহ আমাকে পাঠিয়েছেন।" মুহাম্মাদ বললেন, "আপনার কাছে চিঠি আছে ?" সে বললো, "নেই।" এরপর তালাশ করে তার কাছে চিঠি পাওয়া গেল না। অবশেষে ছোট এক মশকের মধ্যে পাওয়া গেলো আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে ইবনে আবী সারাহের প্রতি লিখিত একটি চিঠি। মুহাম্মাদ সকল সাথীদের একত্রিত করে মোহর খুলে চিঠিটি পড়লেন – "মুহাম্মাদ আর অমুক অমুক ব্যক্তিবর্গ তোমার কাছে গিয়ে পৌছলে ফাঁদে ফেলে তাদের হত্যা করবে। যে তোমার অভিযোগ নিয়ে আসতে চাইবে, তাকে বন্দী করে রাখবে। দ্বিতীয় আদেশ পাওয়া পর্যন্ত স্বপদেই তুমি বহাল থাকবে।" এ পত্র পাঠান্তে সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন আর মদীনায় ফিরে এলেন।

তারা মদীনায় এসে তালহা, আলী, সাদ, যুবায়ের প্রমুখ সাহাবীদের সমবেত করে প্রাপ্ত চিঠিটি দেখালেন আর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। এতে সকলেই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন এবং মাসউদ, আবু যর আর আম্মারের স্মরণ হওয়ায় সে ক্রোধের মাত্রা আর বৃদ্ধি পায়। সেদিনের মত সাহাবায়ে কেরাম নিজ নিজ বাড়ি চলে যান। অবশেষে লোকেরা উসমানের বাড়ি অবরোধ করে। সে সময় আলী, তালহা, যুবায়ের, আম্মার, সাদ প্রমুখ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে উসমানের নিকট পাঠিয়ে তিনি প্রাপ্ত সেই পত্রটি, গোলাম

আর সেই উটনীটি নিয়ে সাদ প্রমুখ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে উসমানের কাছে গিয়ে বললেন, "সে কি আপনার গোলাম ?" উসমান বললেন, "হ্যাঁ।" আলী উটনীটি দেখিয়ে বললেন, "এ উটনী আপনার ?" তিনি বললেন, "আমার।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "এ চিঠি কি আপনি লিখেছেন ?" তিনি বললেন, "আমি খলীফা। আমি এ চিঠি লিখিনি, কাউকে লিখার নির্দেশও দেইনি। এ চিঠি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।" আলী বললেন, "চিঠিতে আপনার মোহর লাগানো ছিল।" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই এটা আমার মোহর।" আলী বললেন, "কি আশ্চর্যের বিষয় ! গোলাম, উটনী, মোহর - সবই আপনার, অথচ আপনি কিছুই জানেন না ?" উসমান বললেন, "আল্লাহর কসম, এ চিঠি আমি লিখিনি, কারো হাতে তা লিখেও নেইনি আর তা মিসর শাসনকর্তার কাছেও পাঠাইনি।" এরপর লোকেরা বুঝলো এটা মারওয়ানের কাজ এবং উসমান কর্তৃক সৃষ্ট এ কাজে লোকদের সন্দেহ হয়। মারওয়ান হযরত উসমান (রাঃ) এর বাড়িতে ছিলেন। লোকেরা বললো, "মারওয়ানকে আমাদের হাতে তুলে দিন।" উসমান এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আসহাবেরা আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশ বলেন, "উসমান কখনই মিথ্যা কসম করেননি।" আর কিছু (ব্যক্তি) বলেন, "মারওয়ানকে আমাদের হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত আর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের হত্যার আদেশ দেওয়ার কারণ তদন্ত করে না জানা পর্যন্ত সন্দেহের উপর (ভিত্তি করে) উসমানকে কিছুতেই খারাপ ভাবা যাবে না। যদি উসমান জড়িত থাকেন, তাহলে আমরা তাঁকে অপসারণ করবো। আর যদি মারওয়ান লিখে থাকেন, তবে আমরা তাকে শাস্তি দিবো।" তারা মারওয়ানকে হত্যা করবেন সন্দেহে তিনি তাকে তুলে দিতে অস্বীকার করায় অবরোধ আরো কঠোর হয় এবং পানির সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়।

উসমান উপর থেকে উঁকি দিয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে আলী রয়েছেন ?" লোকেরা বললো, "না।" তিনি আবার বললেন, "তোমাদের মাঝে কি সাদ আছেন ?" লোকেরা বললো, "না।" তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছো, যে আলীকে আমার পিপাসার কথা জানিয়ে পানি পাঠাতে বলবে ?" এ সংবাদ আলীর কাছে পৌঁছামাত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গে তিন মশক পানি পাঠিয়ে দেন, কিন্তু অবরোধের তীব্রতার কারণে পানির মশক বহনকারী বনূ হাশিম আর বনূ উমাইয়্যার কয়েকজন গোলাম আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মারওয়ানকে তুলে না দিলে উসমানকে হত্যা করা হবে জানোতে পেরে আলী নিজের দুই ছেলে হাসান আর হোসেনকে কঠোরভাবে নির্দেশ দানে বললেন, "নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে উসমানের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যাও, যেন কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে।" তালহা, যুবায়ের আর কিছু সাহাবা নিজ নিজ পুত্রদের একই নির্দেশ দিয়ে উসমানকে পাহাড়া দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। তারা তাঁকে ঘিরে নিশ্ছিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা করেন।

উসমানকে রক্ষা করার জন্য তার সামনে দুর্ভেদ্য মানব প্রাচীর দেখে মুহাম্মদ বিন আবু বকর তীর বর্ষণ আরম্ভ করেন। উসমানকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া তীরটি হাসানকে আঘাত করে, এতে রক্ত প্রবাহিত হয়। মারওয়ানের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত তীরটি গিয়ে বিদ্ধ হয় মুহাম্মাদ বিন তালহার শরীরে। আরেকটি তীরের আঘাতে আলীর গোলাম কানবারের মাথা ক্ষত- বিক্ষত হয়। ইমাম হাসানের রক্ত দেখে মুহাম্মাদ বিন আবু বকর দারুণ ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, ইমাম হাসানের রক্ত দেখে বনূ হাশিম প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এলে আমাদের মিশন ধুলায় লুটাবে। এজন্য মুহাম্মদ বিন আবু বকর তার অপর দুই সাথীকে বললেন, "আমরা

তিনজন অন্য ঘর দিয়ে উসমানের ঘরে গিয়ে তাঁকে হত্যা করবো, তাতে কেউ টের পাবে না।" পরামর্শ অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন আবু বকর তার দুই সাথীসহ এক আনসার সাহাবীর বাড়ি দিয়ে উসমান পর্যন্ত তারা পৌছে যায়, অথচ কেউ তা মোটেও টের পায়নি। কারন তাঁকে রক্ষাকারী দরজাটি দুই তলায় অবস্থান করছিলো, আর তিনি স্ত্রীসহ ছিলেন নীচ তলায়। মুহাম্মাদ বিন আবু বকর সাথীদ্বয়কে বললেন, "আমি আগে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনবো। তারপর তোমরা আক্রমণ করে হত্যা করবে। ছক মোতাবেক মুহাম্মদ বিন আবু বকর ঘরে ঢুকে উসমানের দাড়ি ধরলেন।" উসমান বললেন, "তোমার পিতা জীবিত থাকলে এ কাজের জন্য তিনি তোমাকে কি বলতেন, একবার ভেবেছো ?" একথা শুনে তিনি পেছনে সরে আসেন। এমন সময় তার সাথীদ্বয় এসে তাঁকে হত্যা করে যে পথে এসেছিল সে পথেই ফিরে যায়।

উসমানের স্ত্রী চিৎকার করতে থাকেন। কিন্তু হট্টগোলের কারণে কেউ তার আওয়াজ শুনতে পায়নি। অবশেষে তিনি উপরে গিয়ে বললেন, "আমিরুল মোমেনীন শহীদ হয়ে গেছেন।" তারা দৌড়ে এসে দেখলেন উসমান জবেহ হয়ে পড়ে আছেন। আলী, তালহা, যুবায়ের, সাদ আর মদীনাবাসীসহ সংবাদ পেয়ে সকলে চৈতন্য লোপ পায়। আলী এসে দুই পুত্রকে জিজ্ঞাস করলেন, "তোমরা দরজায় থাকার পরও আমিরুল মুমিনীন কিভাবে নিহত হলেন ?" এ বলে দুই পুত্রকে চড় দিলেন আর মুহাম্মদ বিন তালহা ও আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে বকাবকি করে বাড়ি চলে গেলেন।

এরপর লোকেরা দলে দলে আলীর বাড়িতে এসে বললো, "এ মুহূর্তে একজন খলীফা প্রয়োজন। আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, আমরা আপনার কাছে বাইআত করবো।" তিনি বললেন, "বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ খলিফা মনোনীত করবেন। তারা যাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তিনিই হবে খলীফা।" এরপর সকল বদরী সাহাবা এসে বললেন, "আমরা আপনার চেয়ে খিলাফতের বেশী হকদার আর কাউকে দেখছি না। আপনি হাত প্রসারিত করুন, আমরা বাইআত করবো।" অবশেষে তারা বাইআত করলেন।

ওদিকে মারওয়ান আর তার পুত্র আগেই পালিয়েছিলেন। উসমানের স্ত্রীর কাছে এসে আলী জিজ্ঞেস করলেন, "কে উসমানকে হত্যা করেছে ?" তিনি বললেন, "মুহাম্মাদ বিন আবু বকরের সাথে যে দুজন ছিল, আমি তাদেরকে চিনি না।" আলী সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মাদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "হত্যা করার জন্য আমি ভেতরে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার বাবার কথা বলায় আমি পেছনে সরে আসি আর আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করতে থাকি। আল্লাহর কসম, আমি হত্যা করিনি, তাকে ঘায়েলও করিনি।" উসমানের স্ত্রী বললেন, "সে সত্য বলেছে, তবে সে-ই তাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়েছে।"

সুফিয়ার গোলাম কেনানা থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে যে, লাল নীল মিশ্রিত চোখ বিশিষ্ট হিমার নামক মিসরের এক ব্যক্তি উসমানকে হত্যা করে।

মুগীরা বিন শোবা থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় আমি উসমানের কাছে গিয়ে বললাম, "আপনি আমিরুল মুমিনীন, আপনি দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়েছেন। আমি তিনটি পরামর্শ দিচ্ছি, পছন্দমত একটি গ্রহণ করবেন। এক - আপনি বাইরে গিয়ে লড়াই করুন, আপনার অনেক গুণগ্রাহী রয়েছে,

তাছাড়া আপনি সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, আর তারা বাতিল; দুই - আপনি উটে চড়ে মক্কায় চলে যান, হারাম হওয়ার কারণে এরা সেখানে কোনো লড়াই করতে পারবে না; তিন - আপনি সিরিয়ায় যান, সেখানে মুআবিয়া রয়েছেন, তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।" উসমান (রাঃ) বললেন, "আমি বাইরে গিয়ে সংঘর্ষে জড়াবো না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা হয়ে মুসলমানদের রক্ত ঝরাতে চাই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি - কুরাইশদের মধ্যে যে হারাম শরীফে ফেতনা- ফাসাদ সৃষ্টি করবে, দুনিয়ার অর্ধেক শক্তি তার উপর বর্তাবে; এজন্য আমি মক্কা শরীফেও যাবো না। সিরিয়ায় যাওটাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমরা হিজরতের পবিত্র নগরী আর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুষমাসিক্ত পরশ ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।"

আবু সুরুল ফাহমী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, "অবরোধ চলাকালীন সময় আমি উসমানের কাছে গেলে তিনি বললেন, "আমি নিজের প্রতিপালকের কাছে দশটি আমানত রেখেছি -

(১) আমি ইসলামের চতুর্থ ব্যক্তি,

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন,

(৩) তার ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেন,

(৪) আমি কখনো গান গাইনি,

(৫) কোন সময় খারাপ কাজের ইচ্ছা করিনি,

(৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইআত করার পর থেকে ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।

(৭) প্রত্যেক জুমায় একজন গোলাম আযাদ করেছি, কোনো জুমায় গোলাম না পেলে পরবর্তীতে তা কাযা আদায় করেছি,

(৮) জাহেলিয়াত বা ইসলামের যুগে - কখনোই যিনা করিনি।

(৯) আমি কখনো চুরি করিনি।

(১০) রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগেই কুরআন হিফয করেছি।"

উসমান ৩৫ হিজরীর আইয়্যামে তাশরীকের (ঈদুল আযহার তিন দিন) মধ্যভাগে শাহাদাত লাভ করেন। কারো মতে, তিনি ৩৫ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে ১৮ তারিখ শনিবার মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে শহীদ হোন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। কারো মতে, শনিবারে; কারো মতে ২০ যিলহাজ্জ সোমবারে শহীদ হোন। তার বয়স নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮০, ৮৯, ৯০ - বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

কাতাদা (রাঃ) বলেছেনন, "যুবায়ের তার জানাযা পড়ান আর দাফন করান, কারণ তিনি তাঁকে এ কাজের ওসীয়ত করেছিলেন।"

আনাস (রাঃ) থেকে মারফু সূত্রে ইবনে আসাকির আর ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন, "উসমান জীবিত থাকা পর্যন্ত আল্লাহর তরবারী কোষবদ্ধ ছিল। তিনি শহীদ হওয়ার পর তা খাপমুক্ত হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত খাপমুক্তই থাকবে।" (এ বর্ণনা উমর বিন কায়েদ মাত্র একজনই বর্ণনাকারী, এটি গ্রহণযোগ্য নয়)।

ইয়াযিদ বিন হাবীব থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, "আমি জেনেছি, যারা উসমানের উপর আক্রমণ করেছে তাদের অধিকাংশই পাগল হয়ে গেছে।"

হুযাইফা (রাঃ) বলেছেন, "সর্বপ্রথম ফিতনা হলো উসমানের শাহাদাত, আর সর্বশেষ ফিতনা দাজ্জালের আবির্ভাব। যে তার শাহাদাতে সামান্যতম খুশি হবে, সে দাজ্জালের যুগ পেলে অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে, আর না পেলে তার কবর দাজ্জালের আনুগত্য করবে।" (ইবনে আসাকির)

হাসান (রাঃ) বলেছেন, "তিনি শহীদ হওয়ার সময় আলী (রাঃ) মদীনায় ছিলেন না। সংবাদ পেয়ে তিনি বললেন - 'হে আল্লাহ, আমি এ ঘটনায় সন্তুষ্ট নই, আর কোনোভাবেই এর সাথে সম্পৃক্ত না।' " (ইবনে আসাকির)

কায়েস বিন উবাদ বলেছেনঃ জঙ্গে জামালের দিন আমি আলীকে বলতে শুনেছি - "হে আল্লাহ, আপনি খুব ভালো করেই জানেন যে, আমি উসমানের রক্তের সাথে কোনোভাবেই জড়িত না। তার শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে আমার জ্ঞান হারিয়ে যায়। লোকেরা আমার কাছে বাইআত করতে এলে আমি তাদের ভাল মনে করিনি, আমি তাদের বলেছি - আল্লাহর কসম, উসমানকে যারা হত্যা করেছে তাদের সম্প্রদায়ের নিকট থেকে বাইআত নিতে আমি লজ্জাবোধ করছি। তবুও এরচেয়েও আমি বেশী লজ্জিত আল্লাহ তাআলার কাছে, এরপর আমি তাদের ফিরিয়ে দিলাম। তারা আবার আসে আর বাইআত করে। আমি উসমানের জন্য দুয়া করছি, হে আল্লাহ, উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।" (হাকিম)

আবু খালদাহ হানাফী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, আলী বলেছেন, "বনু উমাইয়্যা মনে করে, উসমানকে আমি হত্যা করিয়েছি। আল্লাহর কসম, আমি হত্যা করিনি, হত্যকারীকে সাহায্যও করিনি। বরং আমি নিষেধ করেছি, কিন্তু কেউ তা শোনেনি।"

সমরাহ বলেছেন, "ইসলাম একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। উসমানের হত্যকারীরা একে ছিদ্র করে দিয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। আর মদীনাবাসীর হাতে খিলাফতের দণ্ড ছিল, ঘাতকের দল তা নিক্ষেপ করায় কিয়ামত পর্যন্ত তা মদীনায় আর ফিরে আসবে না।"

মুহাম্মদ বিন সিরীন বলেছেন, "উসমানকে হত্যা করার পর থেকে ফেরেশতাগণ যুদ্ধের ময়দানে আর সাহায্য করে না। উসমানকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত চাঁদ দেখা নিয়ে কোনো মতভেদ ছিল না। আর হুসেনকে হত্যা করার পর আকাশে রক্তিম প্রভা দেখা দেয়।" (এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়)

তাসনীফ গ্রন্থে হামীদ বিন হিলাল থেকে আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন যে, উসমানের কাছে গিয়ে আব্দুল্লাহ বিন সালাম বললেন, "কেউ তাকে হত্যা করতে পারবে না। যারা করবে, তারা কুষ্ট রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। মনে রাখবে, এক নবীর পরিবর্তে সত্তার হাজার, আর একজন খলীফার পরিবর্তে পয়ত্রিশ হাজার প্রাণ বিসর্জনের পর উম্মতের ঐক্য ও সংহতি ফিরে আসবে।"

আব্দুর রহমান বিন মাহদী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, "উসমানের এমনও বৈশিষ্ট্য ছিল, যা আবু বকর আর উমরের মধ্যে ছিল না। এক - শহীদ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ, এবং দুই - কিরাতের মাধ্যমে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধকরণ।

তেরোতম পরিচ্ছেদ

মূসা বিন তালহা থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, "উসমান জুমআর দিন হলুদ পোশাক পরে মিম্বরে আরোহণ করতেন। মুআজ্জিন আযান দিতেন, আর তিনি লোকদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন।"

আব্দুল্লাহ রুমী থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ উসমান একাই রাতে উঠে অযূ করতেন। একজন বললো, "সহযোগিতার জন্য খাদেমকে ডাকলে হয় না ?" তিনি বললেন, "তার জন্যও রাত বিশ্রামের সময়।"

উমর বিন উসমান বিন আফফান থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ তার আংটিতে খোদাই করে লিখা ছিল –

امنت بالذي خلق فسوي

দালায়েল গ্রন্থে ইবনে উমর থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেনঃ উসমান তার এক ভাষণে বললেন, "একদিন জাহজাহ খিফারী আমার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলার এক বছর পর আল্লাহ তাআলা তাকে এমন রোগ দেন যে, তার শরীর থেকে গোশত খুলে খুলে পড়তো।"

আওয়ায়েল গ্রন্থে আসকারী লিখেছেনঃ উসমান (রাঃ) সর্বপ্রথম বৃত্তির প্রবর্তন, পশু চরানোর জন্য চারণভূমি নির্ধারণ, তাকবীর ধ্বনি মৃদু, মসজিদে সুগন্ধীর ব্যবস্থা, জুমআর দিন দুই আযানের নিয়ম আর মুআযযিনের বেতন নির্ধারণ করেন।" (ইবনে সাদ)

তিনিই সর্বপ্রথম সম্পদ থেকে যাকাত বের করার নিয়ম চালু করেন। পিতার জীবদ্দশায় তিনিই প্রথম খলীফা। তিনি পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। উমরের শাহাদতের কারণে মসজিদে নিজের জন্য মিহরাব তৈরি করেন। তার যুগে ব্যাপক মতানৈক্যের কারণে পরস্পরকে ভ্রান্ত মনে করতো। কিন্তু পূর্বে এ মতানৈক্য মাসায়েল আর ফিকাহ'র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, মতানৈক্যের জন্য একে অপরকে ভ্রান্ত মনে করতো না। তিনি সর্বপ্রথম স্বপরিবারে আল্লাহর পথে হিজরত করেন।

হাকীম বিন উবাদা বিন হানীফ থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, “তার যুগে সম্পদের অফুরন্ততার কারণে অলস প্রকৃতির ধনীরা তীর দিয়ে কবুতর শিকারের প্রথা চালু করায় তিনি তো রোধ করার জন্য তার খিলাফতের অষ্টম বর্ষে লাইস বংশের এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন।”

তার খিলাফতকালে সুরাকা বিন মালিক বিন জাশাম, জাব্বার বিন সখর, হাতিম বিন আবী বলতয়া, আয়াস বিন যুহায়ের, আবু উসাঈদ আস সাদী, আওস বিন সামিত, হরস বিন নওফেল, আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা, যায়েদ বিন হজেযা (তিনি মৃত্যুর পরেও কথা বলেছিলেন), কবি লাবীদ, সাঈদের পিতা মুসায়্যাব, মুআয বিন আমর বিন জুমুহ, মাবাদ বিন আব্বাস, মুতাকীব বিন আবী ফাতেমা আদাদওসী, আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযির, নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ী প্রমুখ সাহাবা তাবেঈ ইন্তেকাল করেন।

আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

তার বংশ পরম্পরা হচ্ছে - আলী বিন আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আব্দে মান্নাফ বিন কুসসী বিন কিলাব বিন মুরাবা বিন কাব বিন লুয়ী বিন গালীব বিন ফিহর বিন মালিক বিন নজর বিন কিনানা।

আবু তালিবের প্রকৃত নাম আব্দে মান্নাফ, আব্দুল মুত্তালিবের নাম শায়বা, হাশিমের নাম আমর, আব্দে মান্নাফের নাম মুগীরা আর কুসসীর নাম যায়েদ।

আলী (রাঃ) এর উপনাম আবুল হাসান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আবু তুরাব উপাধি দেন।

তার সম্মানিত জননীর নাম ফাতেমা বিনতে আসাদ বিন হাশিম।

তিনিই প্রথম হাশিমী যুবক, যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর হিজরত করেছেন।

তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীদের অন্যতম।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ফাতেমা (রাঃ) এর স্বামী।

তিনি উচু মাপের জ্ঞানী, প্রসিদ্ধ বীর, দৃষ্টান্তহীন ধর্মনিষ্ঠ সাধক ব্যক্তি, বিখ্যাত বক্তা এবং কুরআন শরীফ জমাকারী ও হাফেযে কুরআন। আবুল আসাদ দাইলী, আবু আব্দুর রহমান সালমী আর আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা তার কাছ থেকে কুরআন শরীফ শিক্ষা করেন।

তিনি বনু হাশিম গোত্রের প্রথম খলীফা।

প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি প্রাচীন। ইবনে আব্বাস, আনাস, যায়েদ বিন আরকাম, সালমান ফারসীসহ অনেক সাহাবী এ বিষয়ে একমত যে, তিনিই প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে কারো কারো ইজমাও রয়েছে।

আলীর বর্ণনা নকল করে আবু ইয়ালা বলেছেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোমবারে নবুওয়াত প্রাপ্ত হোন, আর আমি মঙ্গলবারে ইসলাম গ্রহণ করি।

মুসলমান হওয়ার সময় তার বয়স ছিল দশ বছর, কারো মতে নয় বছর, কারো মতে আট বছর, কারো মতে এরচেয়েও কম।

হাসান বিন যায়েদ বিন হাসান বলেছেন, “তিনি কখনোই মূর্তিপূজা করেননি।” (ইবনে সাদ)

নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরতের সময় মানুষের আমানতগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে মক্কা শরীফে রেখে গিয়েছিলেন।

তিনি তাবুক ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাবুকের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মদীনায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করে রণাঙ্গনে যাত্রা করেন। সকল যুদ্ধে তার বীরত্ব মানুষের মাঝে কিংবদন্তী হয়ে রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক যুদ্ধে তার হাতে পতাকা তুলে দেন আর তাঁকে সেনাপতি মনোনীত করেন।

সাঈদ বিন মুসায়্যাব বলেছেন, "উহুদ যুদ্ধে তার শরীরে ষোলটি আঘাত লেগেছিলো।"

ইমাম বুখারী আর মুসলিম বিভিন্নভাবে প্রমাণ করেছেন যে, খায়বর যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পতাকা তুলে দেন, আর তাঁকে সেনাপতি মনোনীত করেন। খায়বর তার হাতেই বিজিত হয়।

তিনি স্থূল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি শিরণাস্ত্র পরার কারণে তার মাথার কেশরাজি বাতাশে উড়ত। তার পদযুগল ছিল বেঁটে। ভারী পেট, প্রলম্ববিত শ্বেত দাড়ি আর মাথার মধ্যবর্তী পেছন দিকের কেশগুচ্ছের রঙ ছিল গোর্ধম বর্ণের। গোটা শরীরে ছিল পশমের সমাহার।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেছেন, "খায়বর যুদ্ধে তিনি দুর্গের দরজা কাঁধে তুলে নেন, আর এ পথেই মুসলমানগণ দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। খায়বর হস্তগত হওয়ার পর তিনি দরজাটি যেখানে নিক্ষেপ করেন, পরবর্তীতে সেখান থেকে দরজাটি স্থানান্তর করার জন্য চল্লিশজন লোকের শক্তির প্রয়োজন হয়েছিলো।" (ইবনে আসাকির)

মাগাযী গ্রন্থে ইবনে ইসহাক আর আবু রাফে থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, "আলী (রাঃ) খায়বর যুদ্ধে দূর্গের দরজা হাতে নিয়ে তা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধ জয়ের পর দরজাটি দূরে নিক্ষেপ করেন। যুদ্ধ শেষে আমরা আটজন মিলেও তা উঠাতে পারিনি।"

ইমাম বুখারী আদব গ্রন্থে সহল বিন সাদ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আলী নিজের আবু তুরাব নামটি খুবই পছন্দ করতেন। কেউ তাঁকে এ নামে ডাকলে তিনি খুশি হতেন। হবেন না-ই বা কেন, এ নাম তো তার সর্দার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক প্রদত্ত। একদিন তিনি হযরত ফাতেমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে মসজিদে এসে শুয়ে পড়ায় তার শরীরে মাটি লেগে যায়। এমন সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে আসলেন আর তার শরীরের মাটি ঝরিয়ে দিয়ে বললেন, "হে আবু তুরাব (অর্থাৎ, মৃত্তিকার বাবা), উঠো।"

তিনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ৫৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। আর তার কাছ থেকে তার তিন পুত্র হাসান, হুসাইন, মুহাম্মাদ বিন হানফীয়া, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, আবু মূসা আশআরী, যায়েদ বিন আকরাম, আবু সাঈদ, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আবু উমামা, আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবা আর তাবেঈন হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আলী (রা.) এর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন, “আলী (রাঃ) এর ফযীলত সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস রয়েছে, এর চেয়ে অদিক হাদীস অন্য সাহাবীদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়নি।” (হাকিম)

বুখারী ও মুসলিমে সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ তাবুক যুদ্ধে যাত্রার প্রক্কালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলীকে মদীনায় অবস্থান করার নির্দেশ দিলে তিনি বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এখানে শিশু ও নারীদের সাথে কি আপনি আমাকে রেখে যেতে চান ?” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও যে, মূসা (আঃ) যেমন হারূন (আঃ) কে রেখে গিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি রেখে যেতে চাই ? পার্থক্য শুধু আমার পর আর কোন নবী আসবেন না।” আহমাদ, বাযযার প্রমুখ বিভিন্ন সাহাবী থেকে এ বর্ণনাটি বর্ণিত করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমে সহল বিন সাদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ খায়বর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “আগামীকাল সকালে এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দেয়া হবে, যার হাতে খায়বর বিজিত হবে, এবং আল্লাহ ও তার রসূল তাঁকে ভালোবাসেন আর তিনিও আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসেন।” এ পরম সৌভাগ্য কার প্রতি অর্পিত হয় তা দেখার জন্য সাহাবাগন সারা রাত অপেক্ষায় প্রহর গুনেন। সকালে সকল সাহাবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। সকলের আশা, এ সওগাত যেন আমার ভাগ্যে আসবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “আলী কোথায় ?” লোকেরা বললেন, “চোখ ব্যাথা করায় তিনি উপস্থিত হতে পারেননি।” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “এক্ষুনি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো।” তিনি এলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার চোখে মুখের লালা লাগিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ভালো হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলীকে পতাকা দিলেন। তাবারানী বিভিন্ন সাহাবীর থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ

“আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের আর তোমাদের পুত্রদের ...” (সূরাহ আলি- ইমরান, ৩ : ৬১)

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী, ফাতেমা, হাসান আর হুসাইনকে ডেকে তাঁদের জন্য এ দোয়া করলেন - “হে আল্লাহ, এরা আমার পরিবার।”

তিরমিযী শরীফে আবু সারীহা আর যায়েদ বিন আরকাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু।”

আহমাদ বিভিন্ন পদ্ধতিতে আর তাবারানী বিভিন্ন সাহাবীদের থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিছু বর্ণনাকারী হাদীসের এ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন - "হে আল্লাহ, যে আলীকে ভালোবাসবে, আপনি তাকে ভালোবাসুন; আর যে আলীর বিদ্বেষাচরণ করবে, আপনিও তার সাথে তাই করুন।"

আবু তোফায়েল থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ আলী (রাঃ) জাবার ময়দানে লোকদের সমবেত করে বললেন, "আমি আপনাদের কাছে কসম করে জিজ্ঞেস করতে চাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গদীরে খম- এ আমার ব্যাপারে কি বলেছিলেন ?" ত্রিশজন লোক দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, "আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন - আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ, যে আলীকে ভালোবাসবে, আপনি তাকে ভালোবাসুন, আর যে আলীর সাথে শত্রুতা করবে, আপনিও তার সাথে শত্রুতা করুন।

বুরায়দা থেকে তিরমিযী আর হাকেম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাকে চারজনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমাকে জানানো হয়েছে যে, সে চারজনকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন।" লোকেরা বললো, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাদের নাম বলুন।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আলী, আবু যর, মিকদাদ আর সালমান ফারসী।"

হাবশী বিন জানাদা থেকে তিরমিযী, নাসায়ী আর ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আলী আমার আর আমি আলীর।"

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে তিরমীযী বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলে আলী কাঁদতে কাঁদতে এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, সকল সাহাবী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু আমি বাকী রয়েছি।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতে তুমি আমার ভাই।"

সহীহ মুসলিম শরীফে আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্নিত হয়েছে, "সেই প্রতিপালকের কসম, যিনি ফসল ফলান আর প্রাণের জন্ম দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে শপথ করেছেন - মুমিনরা তোমাকে ভালোবাসবে, আর মুনাফিকরা শত্রুতা করবে।

আবু সাইদ (রাঃ) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, "আমরা মুনাফিকদের আলীর শত্রুতা দ্বারা চিহ্নিত করি।"

আলী থেকে তিরমিযী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি জ্ঞানের নগর, আর আলী সে নগরের দরজা।" হাদীসটি হাসান; ইবনে জাওযী, নববী প্রমুখ একে মওজু বলেছেন; আমার (জালালুদ্দিন সুয়্যুতির) দীর্ঘ গবেষণায় যা সম্পূর্ণ ভুল।

আলী (রাঃ) থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠাতে চাইলে আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমাকে ইয়ামানে পাঠাতে চাইছেন, আমি তো বয়সে তরুণ এবং লেনদেন করতে জানি না।" এ কথা শুনে তিনি (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার বুকে হাত রেখে বললেন, "হে আল্লাহ, এ রসনা সংযত করে দিন।" আল্লাহর কসম, এরপর থেকে লেনদেন করতে আমার কোন সংশয় হয়নি।

আলী (রাঃ) থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ আমি এতো অধিক হাদীস বর্ণনা কিভাবে করলাম লোকেরা তা জানোতে চাইলে আমি বললাম, "আমি কোন কিছু জিজ্ঞেস করলে রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুব ভালো করে বুঝিয়ে আমাকে উত্তর দিতেন। আর আমি চুপ করে থাকলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার বলতেন।"

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন যে, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, "আলী আমাদের মধ্যে উত্তম বিচারক।"

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, "আমরা পরস্পরে এ আলাপ করতাম যে, আলী মদিনা শরীফে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবসা সংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, "আলীর কোন মাসয়ালা নির্ভরযোগ্য সূত্র জানা গেলে সে মাসয়ালা নিয়ে যাচাই করার প্রয়োজন নেই।"

সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রাঃ) বলেছেন, "আলী যে বিচার করতেন না তা যেন করতে না হয়, সে জন্য উমর আল্লহর কাছে দুয়া করতেন।"

সাঈদ বিন মুসায়্যাব বলেছেন, "যা কিছু জানার আমাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবে - মদীনা শরীফে আলী ছাড়া এ কথা কেউ বলার সাহস পেতেন না।"

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, "মদীনায় আলীর চেয়ে অধিক উত্তরাধিকারের আইন ও ব্যবসা সংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ ছিলেন না।"

আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, "সুন্নত সম্পর্কে আলীর জ্ঞান ছিল সবচেয়ে বেশী।"

মাসরুক বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের জ্ঞান উমর, আলী, ইবনে মাসউদ আর আব্দুল্লাহর কাছে এসে শেষ হয়েছে।"

আব্দুল্লাহ বিন আয়স বিন রাবীয়া বলেছেন, "আলীর জ্ঞানের পরিপক্কতা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয়তা, ইসলামের প্রথমিক যুগের মুসলমান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা, হাদীস থেকে নির্গত শরীয়তের আইন, যুদ্ধের ময়দানে অসীম সাহসীকতা আর দানশীলতার কারণে উত্তম।"

আওসাত গ্রন্থে তাবারানী দুর্বল সূত্রে জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সকল মানুষ বিভিন্ন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, আর আমি ও আলী একই বৃক্ষের।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে তাবারানী আর ইবনে আবী হাতিম বর্ণনা করেছেনঃ কুরআন শরীফে উল্লিখিত - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা দরকার যে, আলী আমীর আর সম্ভ্রান্ত। আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফের কয়েক জায়গায় সাহাবীদের প্রতি নিজের ক্রোধের বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে আলীর কল্যাণের বিবরণ বিধৃত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, "কুরআন শরীফে আলীর শানে যতটুকু নাযিল হয়েছে, ততটুকু কারো শানে হয়নি।"

ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, "আলীর শানে তিনশো আয়াত নাযিল হয়েছে।"

উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাগের সময় আলী ছাড়া তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে কথা বলার সাহস কারো ছিল না।"

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা তাবারানী করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আলীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়াই ইবাদত।" এর সূত্রগুলো হাসান।

আওসাত গ্রান্থে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন, "আলীর মধ্যে ১৮টি বিরল বৈশিষ্ট্য ছিল, যা অন্য সাহাবীদের মাঝে ছিল না।"

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন যে, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, "আলীর তিন গুণাবলীর একটি গুণও যদি আমার মধ্যে থাকতো, তবে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।" লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "সেই গুণগুলো কি ?" তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কন্যা ফাতিমাকে আলীর সাথে বিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের দুইজনকে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে রেখেছেন - মসজিদে তারা যা করবেন সবই বৈধ, আর খায়বর যুদ্ধে পতাকা প্রাপ্তি।"

সাদ থেকে বাযযার বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে বললেন, "এ মসজিদে তুমি আর আমি ছাড়া কারো জন্য এমন কাজ করা বৈধ নয়, যে কাজ করলে দেহের পবিত্রতার জন্য গোসল ফরয।"

আলী (রাঃ) থেকে আহমদ আর আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বর যুদ্ধে থুথু লাগিয়ে দেয়ার পর থেকে আমার চোখে আর কোন দিন ব্যথা করেনি।"

সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে আবু ইয়ালা আর বাযযার বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে আলীকে কষ্ট দিবে, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিলো।"

উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে তাবারানী বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে আলীকে ভালোবাসবে, সে আমাকেও ভালোবাসলো; আর যে আমাকে ভালোবাসবে,

সে যেন আল্লাহকেও ভালোবাসলো। আর যে আলীর শত্রুতা করবে, সে আমারও (শত্রুতা) করবে; আর যে আমার দুশমনী করবে, সে যেন আল্লাহর দুশমনী করলো।”

উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে আলীকে কষ্ট দিবে সে যেন আমাকে কষ্ট দিলো।”

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে আহমদ আর হাকিম বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে বললেন, “তোমরা কুরআন সংরক্ষনের ব্যাপারে যত্নবান হও, আল্লহ তাআলার পক্ষ হতে কুরআন নাযিল হওয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে যত্নবান ছিলাম।”

আলী (রাঃ) থেকে বাযযার, আবু ইয়ালা আর হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন, “তোমার দৃষ্টান্ত ঈসা (আঃ) এর মতো। ইহুদীরা তার বিরুদ্ধে এমন বিদ্রোহ করেছিলো যে, তারা তার পবিত্র মাকে পর্যন্ত অপবাদ দিতে ছাড়েনি; আর খ্রিষ্টানরা তাঁকে অতিরিক্ত ভালোবাসা দিতে গিয়ে তিনি যা নন, তাও তাঁকে বানিয়ে ছেড়েছেন। মনে রেখো, মানুষকে দুটি বিষয় ধ্বংস করে দেয়, এক - তিনি যা নন তা ভেবে ভালোবাসা, এবং দুই - এ ধরনের বিপ্লব, যাতে খারাপ ভাবতে ভাবতে তার ব্যাপারে অপবাদ লাগিয়ে দেওয়া।”

তাবারানী আওসাত আর সগীর গ্রন্থে উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, “কুরআনের সাথে আলী রয়েছে, আর আলীর সাথে কুরআন রয়েছে। তারা উভয়ে আমার কাছ থেকে পৃথক হওয়ার পর পুনরায় হাউজে কাওসারে এসে মিলিত হবে।”

আম্মার বিন ইয়াসার থেকে আহমাদ ও হাকেম সহীহ সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে বললেন, “দুইজন সবচেয়ে নিকৃষ্ট, এক - সামুদ বংশের ওই ব্যক্তি, যে সালেহ (আঃ) এর উটনীর পায়ের গোড়ালী কেটে দিয়েছিলো, এবং দুই - যে তোমার মাথায় অসির আঘাত করবে আর রক্তে তোমার দাড়ি ভিজে যাবে।”

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ কিছু লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আলীর ব্যাপারে অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে এক ভাষণ প্রদান করেন, এতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “আলীর ব্যাপারে কখনোই কোন অভিযোগ করবে না।”

চৌদ্দতম পরিচ্ছেদ

ইবনে সাদ বলেছেনঃ উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের দ্বিতীয় দিন মদীনায় তালহা (রাঃ) আর যুবায়ের (রাঃ) ছাড়া সকল সাহাবা সন্তুষ্টচিত্তে আলীর বাইআত গ্রহণ করেন। তারা দুইজন প্রকাশ্যে বাইআত নিলেও সঙ্গে সঙ্গে মক্কায় গিয়ে আয়েশা (রাঃ) কে বিষয়টি অবহিত করে তাঁকে নিয়ে বসরায় এসে উসমানের রক্তের প্রতিশোধ দাবী করেন। সংবাদ পেয়ে আলী (রাঃ) ইরাক যান। এখানেই জঙ্গে জামালের মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে তালহা (রাঃ) আর যুবায়ের (রাঃ) শহীদ হোন। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের তেরো হাজার প্রাণ কেড়ে নেয়। ৩২ হিজরীর জমাদিউল আখির মাসে এ ঘটনা ঘটে।

আলী (রাঃ) বসরায় পনেরো দিন অবস্থানের পর কুফায় গেলে মুয়াবিয়া (রাঃ) কুফা আক্রমন করেন। খবর পেয়ে আলী সামনে অগ্রসর হোন। ৩৭ হিজরীর সফর মাসে কয়েক দিন স্থায়ী হয় এ অসম লড়াই। অবশেষে সিরিয়াবাসী কুরআন শরীফ উঁচু করে শান্তির আহবান জানালে উভয় পক্ষ সন্ধির জন্য সংলাপে বসে। মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে আমর বিন আস (রাঃ) আর আলীর পক্ষ থেকে মূসা আশআরী (রাঃ) দীর্ঘ আলোচনার পর এ মর্মে একটি প্রতিশ্রুতি পত্র প্রস্তুত করেন যে, "আগামী বছর আরযা অঞ্চলে এসে উম্মতের সংশোধনের জন্য আলোচনা হবে।" এরপর সকলেই নিজ নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন।

আলী (রাঃ) কুফা ফিরে এলে খারিজী সম্প্রদায়ের লোকেরা পৃথক হয়ে আলীর খিলাফতকে অস্বীকার করে এবং لاحكم الا الله অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম চলবে না - এ শ্লোগান দিয়ে যুদ্ধের জন্য বাহরুরা অঞ্চলে সমবেত হয়। আলী (রাঃ) আব্বাস (রাঃ) কে বুঝানোর জন্য তাদের কাছে পাঠালে তাদের অনেকেই ফিরে আসে। আর বাকী খারিজীরা নাহরুয়ানে পালিয়ে যায়। সেখানে তারা পথিকদের সম্পদ লুটপাট করতে শুরু করলো। আলী (রাঃ) সেখানে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করেন। সেখানে যাআল সাদিয়াও নিহত হয়। এসব ৩৮ হিজরীর ঘটনা।

গত বছরের কথা অনুযায়ী ৩৮ হিজরীর শাবান মাসে সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), ইবনে উমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ আরযা অঞ্চলে সংলাপ শোনার জন্য সমবেত হোন। এ সংলাপে আমর বিন আস (রাঃ) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) কে পরাজিত করেন। প্রথমে আবু মূসা আশয়ারী তার বক্তৃতায় আলীকে বরখাস্ত করেন, আর আবু মূসা আশয়ারী হযরত মুয়াবিয়ার বিবরণ দিয়ে তার জন্য খিলাফতের বাইয়াত প্রদান করেন। সংলাপের প্রেক্ষিতে খিলাফতে আলীর অবস্থানের বার্তা নিয়ে লোকেরা তার কাছে গেলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, "আমার খিলাফত আর মুয়াবিয়ার আনুগত্য ?"

আবদুর রহমান বিন বালহাম আল মুরাদী, বারাক বিন আব্দুল্লাহ তামিমী আর উমর বিন বাকের তামিমী - এ তিনজন খারেজী আলী (রাঃ), মুয়াবিয়া (রাঃ) আর আমর বিন আস (রাঃ) কে হত্যা করে বিবদমান পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য একমত হয়। আব্দুর রহমান হযরত আলীকে, বারাক হযরত মুয়াবিয়াকে আর উমর হযরত আমর বিন আসকে ১১ অথবা ১৭ রমযানের রাতে সকলকে শহীদ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলো। কথা

মোতাবেক তারা তাদের তিন শহরে যাত্রা করলো। আব্দুর রহমান কুফায় পৌছে অন্যান্য খারেজীদের কাছে তার আসার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে।

প্রতিদিনের মত আলী প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে তার পুত্র হাসানকে বললেন, "আজ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি, আর তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে অভিযোগ করেছি যে, আপনার উম্মত আমাকে কষ্ট দিচ্ছে আর আমার সাথে বিবাদ ও বিতন্ডায় লিপ্ত রয়েছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আল্লাহর কাছে বদদুয়া করো।" আমি দুয়া করলাম, "হে আল্লাহ, এ লোকদের ভালো লোকে পরিবর্তন করে দিন।"

তিনি বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ইবনে নাবাহ মুয়াজ্জিন এসে নামাজের জন্য 'সালাত' 'সালাত' বলে আওয়াজ দিলে আলী বাড়ির সকলকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন। আগে থেকেই পথে ওঁত পেতে ছিল ঘাতক আব্দুর রহমান। সুযোগ বুঝে আলী (রাঃ) এর চেহারা বরাবর তলোয়ার চালিয়ে দেয়। চারদিক থেকে লোক দৌড়ে এসে ঘাতককে ধরে ফেলে। আলী গুরুতর আহত অবস্থায় জুমা পর্যন্ত এক সপ্তাহ জীবিত ছিলেন। তিনি শনিবার রাতে ইন্তেকাল করেন।

হাসান, হুসাইন আর আব্দুল্লাহ বিন জাফর তাঁকে গোসল দেন। হাসান জানাযার নামায পড়ান আর কুফায় দারুল ইমারতে তাঁকে রাতের বেলায় সমাহিত করা হয়।

কাফন- দাফন শেষে আব্দুর রহমান বিন বালহামের হাত- পা কেটে একটি বড় পাত্রে নিক্ষেপ করা হয় আর আগুন দিয়ে তাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত যা উল্লেখ করা হলো, তা ইবনে সাদ কর্তৃক তালখীস গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার সাহাবীদের আলোচনার সময় তোমরা নীরব থাকবে। তিনি বলেছেন, সাহাবীদের হত্যা করার অপরাধ জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

মুসতাদরাক গ্রন্থে আল্লামা সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিতঃ আব্দুর রহমান বিন বালহাম খারেজী সম্প্রদায়ের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে। পরিশেষে উভয়ের মধ্যে বিয়ের সময় মোহর হিসেবে নির্ধারিত হয় তিন হাজার দিরহাম আর আলীর হত্যা।

আবু বকর বিন আয়স বলেছেন, "কুফার দারুল ইমারতে আলী (রা.) কে দাফন করার কারণ হচ্ছে, খারেজীরা যেন তার অমর্যাদা করতে না পারে।"

শরীক বলেছেন, "হাসান লাশ স্থানান্তর করে মদীনায় নিয়ে যান।"

মুহাম্মাদ বিন হাবীব বর্ণনা করেছেন, "সর্বপ্রথম আলীর সমাধিস্থ লাশ স্থানান্তর করা হয়।"

সাঈদ বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, শহীদ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পার্শ্বে সমাহিত করার জন্য উটে করে আলীর লাশ নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে

যাত্রা করা হয়। পথিমধ্যে লাশ বহনকারী উটটি হারিয়ে যায় আর অনেক খোঁজাখুঁজির পরও উটের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। কারো মতে, অনুসন্ধানে উটটি যে শহরে পাওয়া যায়, সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আলীর বয়স নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তার বয়স ছিল - ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৯৭ অথবা ৯৮ বছর। তার ১৯ জন দাসী- বাঁদী ছিল।

বিভিন্ন ঘটনাবলী

সাঈদ বিন মানসুর (রহঃ) স্বরচিত সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন, "ঐ আল্লাহর কসম, যিনি আমার দুশমনদের আমার কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার তৌফিক দিয়েছেন। মুয়াবিয়া হিজড়ার মিরাস সম্পর্কে আমার কাছে জানোতে চেয়েছিলেন; আমি লিখেছিলাম - তাদের লজ্জাস্থানের আকৃতির উপর উত্তরাধিকারের আইন প্রযোজ্য হবে।" শাবী থেকে হাশেম এ ধরনের বর্ণনাই বর্ণিত করেছেন।

হাসান (রাঃ) থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ আলী (রাঃ) বসরা যাবার প্রাক্কালে ইবনুল কাওয়া আর কায়েস বিন উবাদ (রাঃ) আলীকে বললেন, বলুন, আপনি উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার কর্ণধার হয়ে লোকদের হত্যা করতে চলেছেন ? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি বলেছেন, তার পর আপনি খলীফা হবেন ? এ কাজের জন্য আপনার চেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্থ আর কে রয়েছেন ? এমন কথা কি আপনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছ থেকে শুনেছেন ?

আলী (রাঃ) বললেন, তুমি ভুল বলেছো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে কোন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন। আমি সর্বপ্রথম তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যায়িত করেছি। যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতেন, তবে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বরে আবু বকর আর উমরকে দাঁড়াতে দিবো কেন ? আমার সাথে কেউ না থাকলেও আমি তাঁদেরকে হত্যা করে ফেলতাম। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ নিহত হননি আবার সহসা ইন্তেকালও করেননি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুমূর্ষু অবস্থায় কয়েকদিন জীবিত ছিলেন, তখন নামাযের সময় আবু বকরকে ইমামতি করার নির্দেশ দেন। আয়েশা (রাঃ) এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের পর আমরা চিন্তা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীনের জন্য কাকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকরকে নামাযের ইমাম মনোনীত করেছিলেন, আর নামায হলো দ্বীনের শিকড়; অতএব আমরা তার হাতে বাইয়াত করলাম। সঠিক কথা হচ্ছে, তিনি খিলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন বলে তাঁকে আর তার খিলাফতকে নিয়ে কোন মতবিরোধ হয় নি, কেউ কাউকে কষ্ট দেয়নি আর তার খিলাফতের প্রতি কেউ অসন্তুষ্টও ছিল না। এজন্য আমি তার অনুগত্য করেছি, তার সৈন্যদের সাথে মিলে কাফরদের সাথে প্রাণ খুলে যুদ্ধ করেছি।

মৃত্যুর সময় তিনি উমরকে খলীফা মনোনীত করে যাওয়ায় আমরা তার সাথেও আবু বকরের মতোই আচরণ করেছি।

উমরের মৃত্যুর প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)সাথে আমার নিকটাত্মীয়তা, ইসলামে আমার প্রাচীনত্ব, আমার আমল ইত্যাদি গুণাবলীর বিষয় চিন্তা করে আমি ভাবলাম, অবশ্যই হযরত উমর তার পর আমার খিলাফত প্রাপ্তির বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ করবেন না। কিন্তু সর্বজনস্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য খলীফা মনোনীত করতে না পারলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কায় উমর খলীফা নির্বাচন না করেই ইন্তেকাল করেন।

এরপর (একজন খলীফা) নির্বাচনের জন্য কুরাইশ গোত্রের ছয়জন ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাদের মধ্যে আমি ছিলাম অন্যতম। একজনকে মনোনীত করার জন্য আমরা ছয়জন সমবেত হলে আমি ভাবলাম, এরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। আলোচনার এক পর্যায়ে আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) আমাদের সকলের কাছ থেকে এ শপথ নিলেন যে, আমাদের মধ্য থেকে যাঁকে খলীফা মনোনীত করা হবে, আমরা তার আনুগত্য করবো। এরপর আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) উসমান বিন আফফান (রাঃ) এর হাত ধরে বাইয়াত দেন। তখন আমি চিন্তা করলাম, আমার বাইয়াত আমার আনুগত্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, আর আমার কাছ থেকে অন্যের আনুগত্যের জন্য শপথ নেয়া হয়েছে। অতএব আমরা সবাই উসমানের হাতে বাইয়াত দেই। আমি আবু বকর আর উমরের মতোই উসমানের সাথে কাজ করেছি।

উসমানের শাহাদাতের পর ভাবলাম, খিলাফতের জন্য নামায পড়ানোর নির্দেশ দানের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দুইজনের ব্যাপারে আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন আর তাঁদের পর যাঁর জন্য আমার কাছ থেকে শপথ নেয়া হয়েছিলো তারা আজ গত হয়েছেন। এ চিন্তা করে আমি বাইয়াত নিতে শুরু করেছি। আমার কাছে হারামাইন শরীফাইনবাসী (মক্কা ও মদীনাবাসী) আর ঐ দুই শহরবাসী (বসরা ও কুফাবাসী - অনুবাদক) বাইয়াত করেন। এ অবস্থায় খিলাফতে একজন (মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাঃ - অনুবাদক) আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকটাত্মীয়তা, ইলম, ইসলাম গ্রহণের প্রাচীনত্ব কোনো দিক দিয়েই আমার সমকক্ষ নন। প্রত্যেক দিক থেকে আমি তার চেয়ে বেশী খিলাফতের হকদার।

দালায়েল গ্রন্থে জাফর বিন মুহাম্মাদ থেকে আবু নুয়াঈম বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আলীর সমীপে একটি বিচার প্রার্থনা করা হয়। তিনি অভিযোগ শোনার জন্য দেয়ালের নিচে বসে পড়লে এক ব্যক্তি বললো, "দেওয়ালটি ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।" তিনি বললেন, "তুমি নিজের কাজ করো। আমাকে আল্লাহ তাআলা হিফাজত করবেন।" বিচারের রায় ঘোষণা করে তিনি স্থান ত্যাগ করলে দেওয়ালটি ভেঙে পড়ে।

তৌরিয়াত গ্রন্থে জাফর বিন মুহাম্মাদ তার পিতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি অধিকাংশ ভাষণে বলেছেন - হে আল্লাহ, আমাকে খুলাফায়ে রাশেদীন আল-মাহদিয়ীনদের মতো গ্রহণযোগ্যতা দান করুন; খোলাফায়ে রাশেদীন কারা ?" আলীর চোখ দুটো সিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, "আমার বন্ধু আবু বকর আর উমর হলেন ইমামুল মাহদী আর শায়খুল ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর তারা কুরাইশদের পথপ্রদর্শক। যারা তাদের আনুগত্য করেছে, তারা হিদায়াত ও পরিত্রাণ পেয়েছে; আর যারা তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলেছে, তারা আল্লাহর সৈনিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।"

হজর আল মাদরী থেকে আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আলী আমাকে বললেন, "কেউ যদি আমার প্রতি অভিশাপ দেওয়ার জন্য তোমাকে নির্দেশ দেয়, তাহলে তুমি কি করবে ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এমনটা কি হতে পারে ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এমনও হবে!" আমি বললাম, "তাহলে এ অবস্থায় আমি কি করবো ?" তিনি বললেন, "তুমি অভিশাপ দিবে আর আমাকে ছেড়ে যাবে না।"

বর্ণনাকারী বলেছেন, "কয়েক বছর পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাই ইয়ামানের শাসনকর্তা মুহাম্মাদ হযরত আলীর প্রতি অভিশাপ করার নির্দেশ দিলে আমি বললাম, 'ইয়ামানের শাসনকর্তা আলীর উপর অভিশাপ করার আদেশ দিয়েছেন, অতএব আপনারাও অভিশাপ করুন।' কিন্তু একজন ছাড়া কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করেনি।"

তাবারানী আওসাত গ্রন্থে আর আবু সাঈদ দালায়েল গ্রন্থে যাযান থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আলীর একটি বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এক ব্যক্তি তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিলে তিনি বললেন, "তুমি অসত্য বললে তোমাকে বদদুয়া করবো।" সে বললো, "করুন।" তিনি তার জন্য বদদুয়া করলেন, ফলে লোকটি স্থানচ্যুত হওয়ার আগেই অন্ধ হয়ে যায়।

যারিয়েন বিন জায়েশ বলেছেনঃ এক ভ্রমণে দুইজন লোক খাবার খেতে বসে। একজনের নিকট পাঁচটি আর অপর জনের কাছে ছিল তিনটি রুটি। এমন সময় সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটে। তারা আগন্তুককেও নিজেদের সাথে শরীক করে নেয়। তারা তিনজন মিলে আটটি রুটি ভাগাভাগি করে খায়। আহার্য গ্রহণ শেষে আগন্তুক বিদায়ের প্রাক্কালে আট দিরহাম দিয়ে বললো, "আমি যা খেয়েছি, এটা তার প্রতিদান।" তারা দুইজন এ আট দিরহাম ভাগাভাগির ক্ষেত্রে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। পাঁচ রুটিওয়ালার বক্তব্য হলো, "আমি পাঁচ দিরহাম নিবো, আর তোমাকে দিবো তিন দিরহাম।" আর তিন রুটিওয়ালা বললো, "আট দিরহাম সমান করে ভাগ করতে হবে।" অবশেষে এ ঘটনা খলীফার দরবার পর্যন্ত পৌছায়।

আলী (রাঃ) তিন রুটিওয়ালাকে বললেন, "সে যা দিতে চায়, তুমি তা-ই গ্রহণ করো। কারণ তোমার রুটির পরিমাণ কম ছিলো।" সে বললো, "আল্লাহ'র কসম, আমার প্রাপ্য যথাযথভাবে বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত আমি মানবো না।" আলী বললেন, "যদি বলি, তুমি পাবে এক দিরহাম, আর সে পাবে অবশিষ্ট সাত দিরহাম, তাহলে কি মানবে ?" সে বললো, "সুবহান-আল্লাহ! এটা কি করে হতে পারে ? আমাকে বুঝিয়ে দিন, আমি মেনে নিবো।" আলী বললেন, "আটটি রুটি তিনজনে খেয়েছে। সমানভাগে আট কে তিন ভাগে ভাগ করা যায় না। এজন্য আট কে তিন দিয়ে গুন করলে আটটি রুটির চব্বিশটি টুকরো হবে। এটা বলা মুশকিল যে, কে কয় টুকরো খেয়েছে। এ কারণে ধরে নিতে হবে, সকলে সমান খেয়েছে। তোমার তিনটি রুটির নয়টি টুকরোর মধ্যে তুমি খেয়েছো আট টুকরো, বাকী থাকে এক টুকরো। আর সে তার পাঁচটি রুটির পনেরোটি টুকরোর

মধ্যে আট টুকরো খেলে অবশিষ্ট থাকে সাত টুকরো। আগন্তুক ব্যক্তি তোমার এক টুকরো আর তার সাত টুকরো রুটি খেয়েছে। তাই তুমি পাবে এক দিরহাম, আর সে পাবে সাত দিরহাম।" এবার লোকটি বললো, "এবার মেনে নিলাম।"

ইবনে আবি শায়বা মুসান্নিফ গ্রন্থে আতা থেকে বর্ণনা করেছেনঃ দুজন লোক একজনের চুরির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ায় আলী (রাঃ) বিষয়টি তদন্ত করে বললেন, "আমি মিথ্যা সাক্ষীর কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকি।" এরপর তিনি সাক্ষীদ্বয়ের খোঁজ নিয়ে জানোতে পারলেন, তারা আগেই পালিয়ে গিয়েছে। ফলে তিনি চোরকে ছেড়ে দিলেন।

আলীর বরাত দিয়ে মুসান্নিফ গ্রন্থে আব্দুর রাজ্জাক লিখেছেনঃ জনৈক ব্যক্তি তার কাছে এসে বললো, "অমুক ব্যক্তি স্বপ্নে আমার মায়ের সাথে যিনা করেছে, (এজন্য আমি অমুক ব্যক্তির বিচার কামনা করছি – অনুবাদক)।" আলী (রাঃ) বললেন, "সেই ব্যক্তিকে রোদে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার ছায়াকে প্রহার করো।"

জাফার বিন মুহাম্মাদের পিতার বরাত দিয়ে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ আলীর আংটিতে নকশা করা এ কথাগুলো লেখা ছিল –

نعم القادر الله

আমর বিন উসমান বিন আফফান বলেছেনঃ তার মোহরে লিখা ছিল –

الملك لله

মাদায়েনী বলেনঃ আলী (রাঃ) কুফা গমনের প্রাক্কালে আরবের জনৈক গভর্নর বললেন, "ইয়া আমিরুল মুমিনীন, আপনি খিলাফতের পদকে আলোকিত করেছেন, খিলাফত আপনাকে আলোকিত করেনি। মসনদ আপনার পদপ্রার্থী ছিল।"

মাজমা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ তিনি বাইতুল মালের সম্পদ দান করে নামায পড়তে যাওয়ার কারণে বাইতুল মাল আল্লহর কাছে সাক্ষ্য দিবে, তিনি মুসলমানদের সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখতেন না।

আমালীয়া গ্রন্থে আবুল কাসিম যাজাজী লিখেছেন যে, আবুল আসওয়াদ দুয়ালী বলেছেনঃ একদিন আমি আলীকে চিন্তামগ্ন দেখে কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, "আমি শুনেছি তোমাদের শহরে ভাষা পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। এজন্য শব্দপতন রোধকল্পে আরবী সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের নীতিরীতি প্রণয়নের কথা ভাবছি।" আমি বললাম, "এমনটা করলে আমাদের প্রতি দারুন করুণা করা হবে, আমরা স্থায়ীভাবে প্রাণ ফিরে পাবো আর আপনার পরও এ রীতি অটুট থাকবে।" তিনদিন পর আমি পুনরায় উপস্থিত হলে তিনি আমার সামনে এক ফালি কাগজ তুলে ধরলেন। এতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের পর লেখা ছিল – "বাক্য তিন প্রকার – ইসম, ফিল আর হরফ। ইসম বলা হয়, যে তার মুসাম্মার খবর বহন করে ; ফিল বলা হয়, যে স্বীয় মুসাম্মার হরকত দেয়; আর বর্ণিত দুই গুণ শূন্যকে হরফ বলে।" আমি লিখাগুলো মনোযগসহ

পড়ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, “এ ব্যাপারে আরো কিছু জানা থাকলে বিষয়টি তুমি আরেকটু সম্প্রসারিত করতে পারো।” অতঃপর তিনি বললেন, “আশিয়া তিন প্রকার - যাহের, মাযহার আর তৃতীয়টি যাহেরও না মাযহারও না।” আবুল আসওয়াদ বলেন, “ ان -ان -ليت -لعل -كان এ হরুফে নাসেবাগুলো লিখে কয়েকদিন পর দিয়ে তার সামনে পেশ করলাম। তিনি বললেন, ‘ لكن এটাও হরফে নাসেবা, কেন এখানে তার উল্লেখ করোনি ?’ আমি বললাম, ‘আমি এ শব্দকে হরুফে নাসেবা মনে করি না।’ তিনি বললেন, ‘না, এটাও হরুফে নাসেবা, এ শব্দটিও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে নাও।’ ”

রাবিয়া বিন নাজাদ থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, আলী বলেছেন, “লোক সকল, তোমরা মৌমাছির মতো হয়ে যাও। সে অতিশয় ক্ষুদ্রতম পক্ষীর মতো আকৃতির হলেও সে কিন্তু পক্ষী নয়। সে জানে না তার মধ্যে কত গুনের সমাহার রয়েছে। হে জনমন্ডলী, তোমরা লোকদের সাথে মৌখিক ও আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করো, কারণ কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান পাওয়া যাবে, আর দুনিয়ায় যে যাকে ভালোবাসবে, তার সাথে উত্থিত হবে।” তিনি আরো বলেছেন, “আমল কবুল হওয়ার জন্য বেশী বেশী চেষ্টা করো, আর তাকওয়া ছাড়া আমল কবুল হয় না।”

ইয়াহয়া বিন জাআদা বলেছেন যে, আলী বিন আবু তালিব বলেছেন, “হে কুরআন বহনকারীগণ, কুরআনের উপর আমল করো। যে কুরআনের উপর আমল করবে, সে- ই আলেম। ইলম অনুযায়ী আমল করবে। অচিরেই এমন লোকের জন্ম হবে, যে ইলম অর্জন করবে, কিন্তু তার ইলম গলা থেকে বের হবে না। তার অভ্যন্তররূপ বাইরের দৃশ্যের বিপরীত হবে। তার আমল তার ইলমের বিপরীত হবে। দলবদ্ধভাবে বসে নিজেরা গর্ব করবে - এ ধরনের লোকদের আমল আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌছবে না।” তিনি বলেছেন, “বলদের কাজ আকর্ষণীয়, সুন্দর অভ্যাস হলো অনন্য বন্ধু, বিবেক হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সহচর, শিষ্ঠাচার হলো উত্তরাধিকার আর ভীরুতা গর্ব ও অহংকারের চেয়েও জঘন্য।”

হারিস বলেছেনঃ এক ব্যক্তি আলীর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, “ভাগ্য কি ? আমাকে বুঝিয়ে বলুন।” তিনি বললেন, “এটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ, এ পথে চলো না।” সে আবার জানোতে চাইলো। তিনি বললেন, “এটা গভীর সমুদ্র, এতে সাঁতার দিয়ো না।” সে আবার প্রশ্ন করলো। তিনি বললেন, “এটা আল্লাহর এক গোপন রহস্য, যা তোমাদের থেকে আড়াল করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করো না।” কিন্তু সে পুনরায় একই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, “হে প্রশ্নকারী, বলো তো, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা তোমার, নাকি তার মর্জী মতো তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ?” সে বললো, “তার।” তিনি বললেন, “তার ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি তোমাকে ব্যবহার করেন (এটাই ভাগ্য - অনুবাদক)।”

তিনি আরো বলেছেন, “প্রত্যেক দুঃখ- কষ্টের একটি সীমা রয়েছে। কারো উপর দুঃখ আসলে তা নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত গড়াবে। এজন্য খেয়াল করা আবশ্যক যে, কোনো মুসিবত আসলে তাকে নিরসনের চেষ্টা না করা, এমন অবস্থায় তার মুসিবত তার সময়- সীমা অতিক্রম করবে। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এর অবসান হলে দুঃখ- কষ্ট বাড়বে।”

এক ব্যক্তি আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, "দানশীলতা কি ?" তিনি বললেন, "প্রার্থনা করার পূর্বে যা প্রদান করা হয়, তা হলো দানশীলতা। আর প্রার্থনার পর প্রদত্ত দানকে বলা হয় বখশিশ ও উপহার।"

এক ব্যক্তি আলীর সমালোচনা করে। আলীর কাছে সংবাদটি পৌছে যায়। একদিন সেই ব্যক্তি আলীর কাছে উপস্থিত হয়ে তার প্রশংসা করলে তিনি বললেন, "তুমি যা বলেছো, তা এমন নয়। তোমার অন্তরে যা আছে, আমি তার চেয়েও বেশী কিছু।"

তিনি বলেন, "আদেশ অমান্যকরনের শাস্তি হলো ইবাদতে অলসতা, জীবিকা নির্বাহের জন্য দৈনন্দিন খাদ্যে সংকীর্ণতা আর স্বাদে গন্ধে স্বল্পতা আসবে।"

আলী বিন রাবীয়া বলেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, "আল্লাহ আপনাকে আটল রাখুন।" কিন্তু সে মনে মনে তার শত্রুতা পোষণ করতো। তিনি বললেন, "আমি যেন তোমার বক্ষস্থলের উপর দৃঢ়পদ থাকতে পারি।"

শাবী বলেছেনঃ আবু বকর (রাঃ) কবিতা আবৃতি করতেন, উমর (রাঃ) কবি ছিলেন, উসমান (রাঃ) কাব্য রচনা করতেন, তবে আলী (রাঃ) এর কবিত্বের প্রতিভা ছিল সবচেয়ে বেশী প্রকার। নাবীত আশজায়ী থেকে বর্ণিত তার কাব্যগুলোর বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো -

"অন্তরে যখন নৈরাশ্যের সৃষ্টি হবে, বদান্যতা যখন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, সমাজের কুসংস্কার যখন প্রাধান্য পাবে, উদ্যোমতা যখন বাধাগ্রস্ত হয় আর এগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় হ্রাস পায়, তখন নিজেই নিজেকে বলবে, একদিন গ্রহণযোগ্য পথের সন্ধান মিলবেই; কারণ প্রতিটি ঘটনাবলীর শেষে সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।"

শাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ এক ব্যক্তি আলীকে নিজের কাছে বসানোর উপযুক্ত মনে না করায় তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন - "অজ্ঞ ও অশিক্ষিতদের সহচরত্ব গ্রহণ করবে না আর তাদের থেকে দূরে থাকবে, কারন তারা সুসভ্য ও জ্ঞানবান ব্যক্তিদের ধ্বংস করে ফেলে।"

মুবাররদ বলেছেনঃ আলীর তলোয়ারে তার স্বরচিত এ কবিতাটি খোদাই করে লেখা ছিল - "দুনিয়া লোভ ও লালসার মোড়কে মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়, একে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলে সে তোমাকে বিষন্ন করে তুলবে। পৃথিবীতে অনেক ঝগড়াটে লোক রয়েছে, পৃথিবী যাদেরকে কোন দিন ছেড়ে যাবে না। আর এমন হতদরিদ্র লোক রয়েছে, দুনিয়া যাদেরকে সংকীর্ণতায় ভরে দিয়েছে। আকল দ্বারা রিযিক অর্জিত হয় না, রিযিক না দিলেও রুজির সন্ধান দেয়া হয়। আর যদি রুজি পেশীশক্তি দ্বারা অর্জিত হতো, তাহলে পক্ষীকুল রুজি- রোজগার করে আকাশেই উড়তো।"

আরেক কবিতায় তিনি উল্লেখ করেন, "নিজের গোপন রহস্য কারো কাছে ফাঁস করতে নেই, কারণ প্রতিটি ভালো ইচ্ছার জন্য রয়েছে উচ্চাভিলাষ, আর আমি অনেক পথভ্রষ্টকে দেখেছি যারা চামড়া যথাযথ রাখে না।"

উকবা বিন আবী সবহা বর্ণনা করেছেনঃ ইবনে বালহাম কর্তৃক আলী (রাঃ) গুরুতর আহত হলে খবর পেয়ে হাসান (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে এলে তিনি বললেন, "বৎস, আটটি বিষয় খুব ভালো করে মনে রাখবে।" হাসান (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "বিষয়গুলো কি ?" তিনি বললেন, "(১) তুমি সবচেয়ে বড় বিজ্ঞ, (২) তুমি সবচেয়ে বড় হতদরিদ্র, (৩) তুমি সবচেয়ে বেশী কঠোর, (৪) তুমি সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী।"

হাসান (রাঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "আর চারটি বিষয় কি ?" তিনি বললেন, "(১) নির্বোধ থেকে দূরে থাকবে, কারণ তার কাছ থেকে লাভের আসা করলে সে তোমার অনিষ্ট করবে, (২) মিথ্যা বর্জন করবে, কারণ মিথ্যা শত্রুকে মিত্রে আর মিত্রকে শত্রুতে পরিনত করে, (৩) কৃপণতা থেকে পালাবে, কারণ প্রয়োজনের সময় সে তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। (৪) অসৎ লোকদের থেকে বেঁচে থাকবে, কারণ সে তোমার সর্বস্ব বিক্রি করে দিবে।"

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ "আমাদের প্রতিপালক কখন থেকে আছেন" - এক ইহুদীর এ প্রশ্ন শুনে ক্রোধে আলীর চেহারা রক্তিম হয়ে যায়। তিনি বললেন, "আমাদের প্রতিপালক এমন সত্তা নন, যিনি পূর্বে ছিলেন না, অথচ আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এমন এক পবিত্র সত্তা, যিনি সর্বদা বিরাজমান। তিনি অদৃশ্য ও নিরাকার। তার কোন শুরু নেই, শেষও নেই। সকল শেষ তার পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। তিনি সকল সমাপ্তির পরিসমাপ্তি।" এ কথা শুনে ইহুদী মুসলমান হয়ে যায়।

দারাজ শুরাইহ কাজী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ জঙ্গে সিফফিনের যাত্রার সময় আলীর বর্শাটি হারিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে কুফায় এসে এক ইহুদির হাতে হারিয়ে যাওয়া বর্শাটি দেখে তিনি বললেন, "এ বর্শাটি আমার। আমি এটি বিক্রি করিনি আর কাউকে দানও করিনি। তাহলে বর্শাটি তোমার হস্তগত হল কিভাবে ?" ইহুদী বললো, "এটি আমার, আর আমার হিফাজতেই আছে।" তিনি বললেন, "আমি বিচারপতির কাছে এর বিচার প্রার্থনা করবো।" এজন্য আলী বিচারপতি শুরাইহ এর কাছে গিয়ে বসলেন আর বললেন, "যদি আমার বিরোধী ইহুদী না হতো, তবে আমি তার মতোই আদালতে গিয়ে দাঁড়াতাম। আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি - আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের নিকৃষ্ট মনে করেন। অতএব তোমরাও তাদের জঘন্য মনে করবে।" বিচারপতি বললেন, "আপনার অভিযোগ কি ?" তিনি বিষয়টি বললেন, বিচারপতি আলী (রাঃ) কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়টির প্রেক্ষিতে ইহুদীকে তার বক্তব্য তুলে ধরতে বললেন। ইহুদী পূর্বের কথাই পুনর্ব্যক্ত করলো। বিচারপতি বললেন, "আমিরুল মুমিনীন, আপনার সাক্ষী কে ?" তিনি নিজের গোলাম কীনবার আর পুত্র হাসানকে পেশ করলেন। বিচারপতি বললেন, "পিতার জন্য ছেলের সাক্ষ্য বৈধ নয়।" আলী (রাঃ) বললেন, "জান্নাতবাসীর সাক্ষ্যও কি অবৈধ ? অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন - হাসান আর হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার।" এ পর্যন্ত ন্যায় বিচারের অনুপম দৃষ্টান্ত দেখে চিৎকার করে ইহুদী বলে উঠলো, "হে আমিরুল মুমিনীন, নিশ্চয়ই আপনি মুসলিম সমাজের সাম্রাজ্যের অধিপতি। এরপরও আপনি আমাকে বিচারকের কাছে এনেছেন। বিচার চলাকালে বিচারপতিকে সাধারণ জনগনের মতোই আপনার সাথে অভিন্ন আচরণ করতে দেখে আমি বিমোহিত। আপনার ইসলাম সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এটা আপনার বর্শা। আমি মুসলমান হয়ে যাবো।"

কুরআনের তাফসীর

ইবনে সাদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আলী (রাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ'র কসম, প্রতিটি আয়াতের শানে নুযুল (আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট), আয়াতটি কোথায় ও কার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে তা আমার জানা রয়েছে। আমার প্রতিপালক আমাকে প্রজ্ঞা আর ভাষা দান করেছেন।"

ইবনে সাদ প্রমুখ আবু তোফায়েলের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন, "কুরআন শরীফ সম্পর্কে জানোতে চাইলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। আমার অবগতির বাইরে এমন কোন আয়াত নেই। আমি বলতে পারবো যে, আয়াতটি রাতে না দিনে, ময়দানে না পাহাড়ে নাযিল হয়েছে।"

মুহাম্মদ বিন সিরীন থেকে ইবনে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের পর আলী (রাঃ) আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর বাইয়াত প্রদানে বিলম্ব করায় আবু বকর সিদ্দীক তার কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি কি আমার বাইয়াত সম্পর্কে সংশয়ের মধ্যে আছো ?" আলী বললেন, "না, তবে কুরআন শরীফকে জমা না করা পর্যন্ত নামায ছাড়া কোন সময় চাদর পড়বো না বলে কসম করেছি। কুরআন শরীফ যে ক্রমধারায় নাযিল হয়েছে, সে ধারাবাহিকতায় আপনি কুরআন শরীফের বিন্যাস করবেন বলে লোকদের ধারণা।"

বিজ্ঞচিত উক্তি ও বানী

"বেশী হুশিয়ারী খারাপ ধারণার জন্ম দেয়।" (ইবনে হাব্বান)

"ভালোবাসা দূরের মানুষকে কাছে টেনে নেয়, আর শত্রুতা আপনকে পর করে দেয়। হাত শরীরের সবচেয়ে নিকটবর্তী অঙ্গ, তবে হাতে পচন ধরলে তা কেটে শরীর থেকে পৃথক করে দিতে হয়।" (আবু নুয়াঈম)

"আমার পাঁচটি কথা মনে রাখবে -(১) মানুষকে গুনাহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভয় দেখাবে না, (২) আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কোন প্রত্যাশা করবে না, (৩) অজানা বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য লজ্জাবোধ করবে না, (৪) কোনো আলেম ব্যক্তি তার অজানা মাসয়ালা জেনে নিতে ইতস্তত করবে না, আর কেউ যদি অজ্ঞাত মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবে - এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশী জানেন, (৫) ধৈর্য আর বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত হলো যথাক্রমে মাথা ও শরীরের অনুরূপ; যখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে, তখন বিশ্বাসের মধ্যে কমতি আসবে, আর মাথা চলে গেলে শরীরের কি মূল্য ?" (ইবনে মানসুর)

"ফকীহে কামেল (শরীয়তের আইন বিশেষজ্ঞ) তো সে- ই, যিনি লোকদের আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করেন না, লোকদের গুনাহ করার অবকাশ দেন না, আল্লাহর শাস্তির কথা ভুলে যান না এবং কুরআন শরীফের প্রতি লোকদের বিরক্তি জন্ম দেন না। যে জ্ঞানকে ভালোভাবে অনুধাবন করবে না, সে জ্ঞানের

বাতায়ন উন্মোচিত করতে পারবে না; আর যে চিন্তার জগতে বিচরণ করে না, তার সামনে লেখাপড়ার তোরণ অবারিত হয় না।" (আবুস সারীস)

"সেই ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয়তম, যে আমাকে ঐ প্রশ্ন করবে যা আমার জানা নেই; আর সে প্রেক্ষিতে আমি বলবো - আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।" (ইবনে আসাকির)

"যে লোকদের সাথে ন্যায় ও সততাপুর্ণ আচরণ করতে চায়, সে যেন নিজের জন্য যা কল্যাণকর তা অপরের জন্য ভালো মনে করে।" (ইবনে আসাকির)

"সাতটি বিষয় শয়তানের পক্ষ থেকে সৃষ্ট -(১) অত্যাধিক ক্রোধ, (২) বেশী বেশী হাঁচি দেওয়া, (৩) ঘনঘন হাই তোলা, (৪) অতিরিক্ত বমন করা, (৫) গ্রীস্মকালে নাক দিয়ে রক্ত ক্ষরণ, (৬) অতিরিক্ত প্রস্রাব- পায়খানা হওয়া, (৭) আল্লাহ তাআলাকে স্বরণের সময় নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়া।"

"ডালিমের ভেতরের দানার সাথে যুক্ত জালীটি খেয়ে ফেলবে, কারন তা পাকস্থলির জন্য শক্তিদায়ক।" (আবদুল্লাহ বিন আহমাদ)

"এমন যুগ আসবে, যখন গোলামের চেয়েও মুমিনের মর্যাদা কম হবে।" (সাদ ইবনে মানসুর)

"তুমি আলেমকে শোনাবে অথবা শুনবে - উভয়টি সমান।" (হাকিম, তারীখ)

আলী (রাঃ) এর খিলাফতকালে হুযাইফা বিন ইয়ামান, যুবায়ের বিন আওয়াম, তালহা, যায়েদ বিন সুহান, সালমান ফারফী, হিন্দ বিন আবু হালা, ওয়াইস ক্বারনী, জনাব বিন আল আরত, আম্মার বিন ইয়াসার, সহল বিন হানীফ, তামীম দারমী, খাওয়াত বিন জাবীর, শারজীল বিন আস–সমত, আবু মায়াসারা আল বদরী, সাওফান বিন উসাল, আমর বিন আবনাস, হিশাম বিন হাকীম, রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুক্তদাস আবু রাফে প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ইন্তেকাল করেন।

হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

হাসান বিন আলী বিন আবু তালিব, আবু মুহাম্মাদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতি আর নয়নমণি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস অনুযায়ী তিনি শেষ খলীফা।

ইমরান বিন সালমান থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, হাসান আর হুসাইন জান্নাতী। অন্ধকার যুগে কেউ এ দুটি নাম রাখেনি।

হাসান ৩য় হিজরীর রমযান মাসের মাঝামাঝিতে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) আর তার পুত্র আদাহ, আবুল হাওরা, রাবীয়া বিন শিবান, শাবী প্রমুখ তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি দেখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতোই ছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নাম হাসান রেখেছিলেন। সপ্তম দিনে আকীকা করেন আর মাথা ন্যাড়া করে চুলের পরিমাণ রুপা সদকা করার নির্দেশ দেন। হাসান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পঞ্চম ব্যক্তি।

আসাকির বলেছেন, "জাহেলিয়াতের যুগে এ নামের ব্যবহার ছিল না।"

মুফাসসাল বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা হাসান আর হুসাইন - এ দুটি নাম পছন্দ করায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুটি নাম নাতিদ্বয়ের জন্য নির্বাচন করেন।"

আনাস (রাঃ) থেকে বুখারী বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার সাথে অধিক মিল হযরত হাসান (রাঃ) ছাড়া আর কারো ছিল না।"

বারা (রাঃ) থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসানকে কাঁধে নিয়ে বলছেন, "হে আল্লাহ, আমি একে ভালোবাসি, আপনিও ভালোবাসুন।"

বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেছেনঃ একদিন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বর অলংকৃত করে উপবেশন করেছিলেন। তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাশে হাসান (রাঃ) বসেছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার লোকদের প্রতি, আর একবার হাসানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলছিলেন, "এ আমার নাতি নেতা আর মুসলমানদের দুটি দলের মধ্য সন্ধি করিয়ে দিবে।"

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "হাসান আর হুসাইন আমার দুনিয়ার ফুল।"

আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে তিরমিযী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "হাসান আর হুসাইন জান্নাতে যুবকদের সর্দার।"

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসান আর হুসাইনকে কাঁধে নিয়ে বলেছেন, "হে আল্লাহ, এরা উভয়ে আমার নাতি আর ঐশ্বর্য। আমি তাদেরকে ভালোবাসি, আপনিও তাদের ভালোবাসুন। উপরন্তু যারা তাকে ভালোবাসে, আপনিও তাদের ভালোবাসুন।"

আনাস (রাঃ) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলো, "আহলে বাইতদের মধ্যে আপনি কাকে বেশী ভালোবাসেন ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হাসান আর হুসাইন।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসানকে কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এ দৃশ্য দেখে এক লোক বললো, "হে ছেলে, তুমি কতোই না সুন্দর বাহন পেয়েছো!" নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আরোহীও দারুন চমৎকার।"

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ হাসান (রাঃ) আহলে বাইতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুরূপ দেখতে। তিনি তাঁকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেজদায় গেলে হাসান তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিঠে উঠে বসলেন। নিজে না নামা পর্যন্ত তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেজদাতেই ছিলেন।

আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান (রাঃ) থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসানের সামনে নিজের জিহ্বা বের করতেন, আর হাসান জিহ্বার লাল অংশ দেখে হাসতেন আর খুশি হতেন।

যহীর বিন আরকাম থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ একদিন হাসান (রাঃ) বক্তৃতা দানকালে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, "আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, একদিন হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত হাসানকে কোলে নিয়ে বললেন – 'যে আমাকে ভালোবাসবে, সে হাসানকেও ভালোবাসবে। যারা উপস্থিত আছো, তারা যারা উপস্থিত নেই তাদেরকে এ সংবাদ পৌছে দিবে।' যদি রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মর্যাদার সাথে এর সংযুক্তি না থাকতো, তবে এটি বর্ণনা করতাম না।"

ইমাম হাসান (রাঃ) এর অনুপম প্রশংসা ও মর্যাদার বিবরণ অনেক ও অপার। মোটকথা, তিনি সহনশীল, পদমর্যাদাশীল, শান্ত, মহৎ আর উঁচু মাপের দানশীল। তিনি সংঘাত ও সংঘর্ষকে খারাপ মনে করতেন। তিনি

একাধিক বিয়ে করেছিলেন। তিনি মানুষকে এমনভাবে দান করতেন যে, একেক জনকে লাখ লাখ দিরহাম দিতেন।

আব্দুল্লাহ বিন উবায়েদ বিন উমায়ের থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেন, "তিনি ভৃত্য- অনুচর পরিবেষ্টিত হয়ে উটের বহর নিয়ে পঁচিশ বার হাজ্জ করেন।"

উমায়ের বিন ইসহাক থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ আমি হাসানের কথায় যে মিষ্টতা রয়েছে, তা অন্যের কথায় কোনোদিন খুঁজে পাইনি। তার আলাপচয়ারিতার সময় মন চাইতো এ কথোপকথন যেন শেষ না হয়। আমি তার মুখে কোনোদিন কোনো কটু কথা শুনিনি। একবার তার সাথে আমর বিন উসমানের জমি সংক্রান্ত বিরোধ দেখা দিলে তিন তাকে জমি ভাগাভাগির প্রস্তাব দেন, কিন্তু আমর বিন উসমান তা প্রত্যাখ্যান করায় তিনি বললেন, "তার চেহারা ধুলাময় হবে" - এটাই ছিল হাসানের মুখনিঃসৃত কঠোর ভাষা।

উমায়ের বিন ইসহাক থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ মারওয়ান গভর্নর হওয়ার পর প্রতি জুমআর পর প্রতি জুমআর খুতবায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে আলী (রাঃ) এর সমালোচনা করতেন। হাসান শুনেও এর কোন জবাব দিতেন না। একদিন মারওয়ান তার নিকট বলে পাঠালেন যে, আলী এমন, তেমন ইত্যাদি। তিনি বার্তাবাহককে বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি তাকে গালি দিয়ে তার গুনাহ লাঘব করবো না। একদিন আমরা উভয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হবো। যদি তিনি সত্যবাদী হোন, তাহলে আল্লাহ তাআলা সত্য বলার কারণে তাকে পুরস্কৃত করবেন; আর কথা মিথ্যা হলে তিনিই শক্তিধর প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"

বাযীক বিন সাওয়ার থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ একদিন মারওয়ান হযরত হাসানের সামনে তাকে গালি দেন। কিন্তু তিনি একেবারেই নীরব ছিলেন। ঠিক সে সময় মারওয়ানকে ডান হাতে নাক পরিস্কার করতে দেখে হাসান (রাঃ) বললেন, "আফসোস, আপনার এ সাধারণ বোধটুকুও নেই যে, ডান হাত মুখের জন্য, আর বাম হাত অপবিত্রতার জন্য।" এ কথা শুনে মারওয়ান নিশ্চুপ হয়ে যায়।

আশাআস বিন সাওয়ার থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি হাসানের কাছে এসে বসলে পর তিনি তাকে বললেন, "আপনি এমন মুহূর্তে এলেন, যখন আমার যাবার সময় হয়েছে। যদি অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে আমি প্রস্থান করবো।"

আলী বিন যায়েদ বিন জিদআন থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ ইমাম হাসান (রাঃ) দুইবার তার সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করেন, আর তিনবার অর্ধেক সম্পদ দান করেন। এমনকি দান করার সময় দুটি জুতার মধ্যে একটি আর দুটি মুজার মধ্যে একটিও দান করেন।

জুয়াইরিয়া বিন আসমা থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ ইমাম হাসান (রাঃ) ইন্তেকাল করার পর মারওয়ান তার জানাযায় এসে কাঁদতে আরম্ব করায় ইমাম হুসাইন তাকে বললেন, "আপনি আজ কাঁদছেন, কিন্তু তার জীবদ্দশায় আপনি কি- না করেছেন।" মারওয়ান বললেন, "আপনিও জানেন আমি তার সাথে কিরূপ আচরণ করেছি। কিন্তু তিনি ছিলেন ধৈর্যের দিক থেকে পাহাড়ের চেয়েও বেশী অবিচল।"

মুবারদ থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তাকে বললেন, "আবু যর (রাঃ) এ কথা বলেছেন যে – 'দরিদ্রতাকে প্রাচুর্যতা থেকে আর রুগ্নতাকে সুস্থতা থেকে ভালো মনে করি।' " তিনি বললেন, "আবু যরের উপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন। আর আমি বলবো, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মনোনীত প্রতিটি অবস্থায়ই আমার কাম্য। এতে তার প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত হয়।"

ইমাম হাসানের সম্মানিত পিতা আলী (রাঃ) এর শাহাদাত লাভের পর তিনি ছয় মাস খিলাফতের তখত অলংকৃত করেন। তার কাছে কুফাবাসী বাইয়াত করেছিলো। এরপর মুয়াবিয়া (রাঃ) লড়াই করতে এলে তিনি এ শর্তে খিলাফতের দায়িত্ব তার উপর অর্পন করেন যে - আপনার পর খিলাফত আমার অধীনে থাকবে। মুয়াবিয়া (রাঃ) এ শর্ত গ্রহণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী সূত্রে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, "আমার এ নাতি (হাসান বিন আলী) মুসলমানদের দুটি দলের মধ্যে সন্ধি করবে।"

তিনি রবিউল আউয়াল মাসে, আবার কারো মতে ৪১ হিজরীর রবিউস সানী মাসে খিলাফতের মসনদ বর্জন করেন। বন্ধুমহল তাঁকে غار المؤ منين (মুমিনদের মধ্যে লজ্জাশীল ব্যক্তি) বলে সম্বোধন করতো। তিনি বলেন, " 'আর' (লজ্জা) শব্দটি 'নার' (অগ্নি) শব্দ থেকে শ্রেয়।"

একদিন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন, " السلام عليكم يا مذل المؤ منين (হে মুসলমানদের আপমানকারী, আপনার প্রতি সালাম)।" এ প্রেক্ষিতে তিনি বললেন, "আমি মুসলমানদের অপমানকারী নই। আমি তোমাদের রাজত্বের জন্য যুদ্ধ আর হত্যার দিকে ঠেলে দেওয়াকে জঘন্য কাজ মনে করি।" অতঃপর তিনি কুফা ছেড়ে মদীনা শরীফে চলে আসেন আর এখানেই বসবাস করেন।

জাবের বিন নাযীর থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেনঃ হাসানকে জিজ্ঞেস করা হয়, "আপনি কেন আবার খিলাফত কামনা করছেন ?" তিনি বললেন, "যখন আরবের লোকদের মাথাগুলো আমার হাতের মুঠোয় ছিল, আমি চাইলে তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারতাম, তখন আমি শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য খিলাফত ত্যাগ করেছি আর লোকদের রক্তের প্লাবন সৃষ্টি করানো থেকে পৃথক হয়ে গেছি। তো আজ হিজাযবাসীর বিষন্নতা ও মুসিবতগ্রস্ততার কারণে কেন তা গ্রহণ করতে যাবো ?"

হাসানের স্ত্রী জাআদ বিনতে আশয়াস বিন কায়েসকে মদীনায় ইয়াযিদ গোপনে এ প্রস্তাব দেয় যে, হাসানকে বিষ প্রয়োগ করতে পারলে আমি তোমাকে বিয়ে করবো। সে ধোঁকায় পড়ে তাঁকে বিষ খাওয়ায়। ফলে তিনি ৪৯ হিজরী, কারো মতে ৫০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের পাঁচ তারিখে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত লাভ করেন। তিনি শহীদ হওয়ার পর ঘাতক ইয়াযিদকে তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দিলো, "যে নারী ইমাম হাসানের সংসার ভেঙ্গেছে, আমি তাকে নিজের জন্য কিভাবে গ্রহণ করবো ?"

তার ইন্তেকালের সময় হযরত ইমাম হুসাইন বারবার বিষ প্রয়োগকারীর নাম জানোতে চাইলে তিনি বললেন, "হত্যাকারীকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আমার সন্দেহ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আর সে যদি হত্যাকারী না হয়, তাহলে কেন আমি তাকে হত্যা করাবো ?"

ইমরান বিন আব্দুল্লাহ বিন তালহা থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেনঃ একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, তার দু' চোখের মাঝে লিখা রয়েছে - قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ তিনি এ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলে পরিবারের সদস্যরা আনন্দিত হোন। কিন্তু সাঈদ বিন মুসায়েব (রাঃ) স্বপ্নের বিবরণ শুনে বললেন, "স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে আপনি আর অল্প দিন জীবিত থাকবেন।" পরবর্তীতে সেটাই ঘটেছিলো।

হিশামের পিতার বরাত দিয়ে বায়হাকী আর ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ আমির মুয়াবিয়া (রাঃ) ইমাম হাসান (রাঃ) কে বার্ষিক ভাতা হিসেবে এক লাখ দিরহাম দিতেন। এক বছর তিনি তা বন্ধ করে দেন। ফলে তিনি অর্থ- সংকটে পড়লে তার কাছে পত্র লেখার জন্য কাগজ- কলম চাইলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি আর পত্র লিখলেন না। সে রাতেই রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বপ্নে দেখেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসান (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছো ?" তিনি ভালো আছি বলে অর্থনৈতিক দৈন্যতার অভিযোগ পেশ করলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দুয়া পাঠ করতে বললেন -

اللهم اقذف في قلبى رجاء ك واقطع رجا ءنى عمن سواك حتى لا ارجو ا احد ا غيرك

اللهم وما ضعفت عنه توتى وقصو عنه عملى ولم تنته اليه رغبتى ولم تبلغه مسألتى ولم يجر على لسانى
مما اعطيت احدا من الاولين والاخرين من اليقين فخصنى به يا رب العالمين

হিশামের পিতা বলেছেনঃ তিনি এ দুয়া পড়তে আরম্ভ করলে এক সপ্তাহের মধ্যে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) পনেরো লাখ দিরহাম তার নিকটে পাঠিয়ে দেন আর তিনি বলেন - "সেই প্রতিপালকের শোকর, যিনি তার স্মরণকারীকে ভুলে যান না আর প্রার্থনাকারীকে নিরাশ করেন না।" অতঃপর তিনি আবার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন। নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, "হাসান, এখন কেমন আছো ?" তিনি বললেন, "ভালো। আমীর মুয়াবিয়া পনেরো লাখ দিরহাম পাঠিয়েছেন।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করা আর মানুষের কাছে ভিক্ষা না করার প্রতিফল এটি।"

তৌরিয়াত গ্রন্থে সালীম বিন ঈসা কারী কুফী থেকে বর্ণিত রয়েছেঃ মৃত্যুর সময় হাসান (রাঃ) বিচলিত হয়ে পড়লে হুসাইন (রাঃ) বললেন, "ভাই, আপনি কেন বিচলিত হবেন! আপনি তো নানা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), পিতা আলী (রাঃ), নানী খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ), মা ফাতেমাতুয যোহরা (রাঃ), মামা কাসেম (রাঃ) আর তাহের (রাঃ), চাচা হামযা (রাঃ) আর জাফর (রাঃ) এর কাছে যাচ্ছেন।" হাসান (রাঃ) বললেন, "ভাই হুসাইন, আমি এমন স্থানে যাচ্ছি, এর আগে যেখানে যাইনি। আর আমি এমন মানুষদের দেখেছি, যাদেরকে এর আগে দেখিনি।"

আব্দুল্লাহ বিভিন্ন সূত্রে কয়েকটি বর্ণনা বর্ণিত করেছেনঃ হাসান (রাঃ) মৃত্যুর প্রাক্কালে হুসাইন (রাঃ) কে বলেন, "রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর তোমার পিতা খিলাফত কামনা করেছিলেন। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) খিলাফত প্রাপ্ত হোন। এরপর হযরত উমর (রাঃ) খলীফা হোন। তারপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আলোচকগণ এবার আলী (রাঃ) কে বাদ দিবেন না। কিন্তু উসমান (রাঃ) খলীফা হয়ে যান। তার শাহাদাতের পর আলী (রাঃ) খলীফা হলে উভয় পক্ষ থেকে তলোয়ার নিষ্কোশিত হয়। এতে আমি বুঝে গেছি, আমাদের বংশে খিলাফত আর নবুওয়াত একত্রে জমা হবে না। সুতরাং খিলাফতের জন্য কুফার নির্বোধ লোকেরা তোমাকে যেন বের না করতে পারে। রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাশে আমাকে দাফন করার জায়গা দেওয়ার জন্য আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর কাছে আবেদন করলে তিনি তা মঞ্জুর করে বললেন, আপনার মৃত্যুর সময় আমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিবেন, কিন্তু আমার মন বলছে তাঁকে পূর্বের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলে অন্যরা সেই জায়গা দানে বাধা দিবে। যদি তারা সেখানে আমাকে কবর দিতে বাধা দেয়, তাহলে জেদাজেদি করবে না।"

ইমাম হাসান (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর কাছে যান আর তিনি অনুমতি দেন, কিন্তু মারওয়ান বাধা দেয়। ফলে ইমাম হুসাইন আর তার সহচরবৃন্দ তলোয়ার উত্তোলন করলে আবু হুরায়রা (রাঃ) ইমাম হাসানের ওসীয়ত স্মরণ করিয়ে দিয়ে সংঘাতে যেতে নিষেধ করেন। অবশেষে ইমাম হাসানকে হযরত ফাতেমার পাশে দাফন করা হয়।

মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান সখর বিন হরব বিন উমাইয়া বিন আব্দুশ শামস বিন আব্দে মানাফ বিন কুতসী আল উমুরী আবু আব্দুর রহমান। তার পিতা আবু সুফিয়ান আর তিনি মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হোন এবং হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রাথমিক অবস্থায় মুয়াল্লাফাতুল কুলুব ছিলেন, পরবর্তীতে খাঁটি মুসলমানে পরিণত হোন। তিনি রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেরানী ছিলেন।

তিনি ১৬৩টি হাদীস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। অনেক সাহাবী, যেমন - ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবাইর, আবুদ দারদা, জারীরুল বিজলী, নুমান বিন বশীর প্রমুখ এবং তাবেঈদের মধ্যে যেমন ইবনুল মুসায়েব, হুমায়েদ বিন আব্দুর রহমান প্রমুখ তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি সমসাময়িক যুগে বুদ্ধিমান, আলিম আর বীরত্বে খ্যাতি অর্জন করেন। তার মর্যাদা সম্বলিত অনেক হাদীস রয়েছে।

তিরমিযী শরীফে আব্দুর রহমান বিন আবু উমাই(রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীর মুয়াবিয়ার ক্ষেত্রে বলেছেন, "হে আল্লাহ, মুয়াবিয়াকে হিদায়াতপ্রাপ্তকারী আর হিদায়াতদানকারী হিসেবে বানিয়ে দিন।" ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি হাসান বলে অভিহিত করেছেন।

ইমাম আহমাদ 'মুসনাদ' গ্রন্থে আরবাস বিন সারিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, "হে আল্লাহ, মুয়াবিয়াকে হিসাব- কিতাব শিক্ষা দিন আর তাকে আযাব থেকে হেফাযত করুন।"

আবু শায়বা 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে এবং তাবারানী 'কবীর' গ্রন্থে আব্দুল মালিক বিন উমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেছেন, "আমি সে সময় থেকে খিলাফতের আশা পোষণ করে আসছি, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন - 'মুয়াবিয়া, তুমি বাদশাহ হলে লোকদের কাছে খুব ভালোভাবে উপস্থাপিত হবে।' "

আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) শারীরিক উচ্চতাসম্পন্ন আর সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। উমর (রাঃ) তাঁকে দেখে বলতেন, "এ আরবের কিসরা (পারস্য সম্রাট)।"

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, "মুয়াবিয়াকে খারাপ ভেবো না। তার অন্তর্ধানে দেখবে অনেক মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"

মুকবিরী বলেছেন, "আশ্চর্য! লোকেরা কিসরা আর কায়সাররে আলোচনায় মগ্ন, কিন্তু তারা মুয়াবিয়ার কথা ভুলে গেছে!"

আমীর মুয়াবিয়ার দয়াদ্রতা ছিল উপমাহীন, তার নম্রতাও ছিল উপমাহীন। ইবনে আবীদ দুনিয়া আর আবু বকর বিন আবু আসেম তার নম্রতার উপর পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইবনে আউফ (রাঃ) বলেছেন যে, এক ব্যক্তি আমীর মুয়াবিয়াকে বললো, "মুয়াবিয়া, আপনি সোজা হয়ে যান, নাহলে আমি আপনাকে সোজা করবো।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কিভাবে সোজা করতে পারো ?" সে বললো, "কাঠের আঘাতে।" তিনি বললেন, "সে সময় ঠিকই সোজা হয়ে যাবো।"

কাবিসা বিন জাবের বলেছেন, "আমি অনেক দিন তার সাহচর্যে থেকে দেখেছি, তার চেয়ে বেশী জ্ঞানী, ধৈর্যশীল আর বুদ্ধিমান দেখিনি।"

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সিরিয়ায় সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) নিজের ভাই ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানের সাথে সিরিয়ায় যান। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তার স্থানে মুয়াবিয়ার নাম ঘোষনা করেন। এরপর উমর ফারুক (রাঃ) তাঁকে অপরিবর্তিত রাখেন। উসমান গনী (রাঃ) এর যুগে তিনি গোটা সিরিয়ার গভর্নরের পদ অংকৃত করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিশ বছর আমীর আর বিশ বছর খলীফার তখত শোভিত করেন।

কাবে আহবার (রহঃ) বলেছেন, "এ উম্মত আমীর মুয়াবিয়ার চেয়ে দীর্ঘ শাসন প্রত্যক্ষ করেনি।"

যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, আমীর মুয়াবিয়ার খিলাফতের আগেই কাব আহবারের মৃত্যু হয়। কাব স্বীকার করেছেন, তার একাধারে বিশ বছর খিলাফতকালে কোথাও কোন গভর্নর অথবা স্থানীয় প্রশাসক বিদ্রোহ করেননি, যেমন তার পরবর্তীতে অন্য খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিলো, আর এতে করে অনেক জনপদ তাদের হাতছাড়া হয়েছে।

আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) আলী (রাঃ) এর উপর নিজের নাম খলীফা রাখেন। এভাবে ইমাম হাসান (রাঃ) এর উপরও প্রস্থান করেন। এজন্য ইমাম হাসান (রাঃ) পৃথক হয়ে যান, ফলে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ৪১ হিজরীর রবিউস সানী অথবা জমাদিউল আউয়াল মাসে মসনদে আরোহণ করেন। একজন খলীফার ব্যাপারে উম্মতের ইজমার কারণে এ বছরকে 'সালে জামায়াত' নামে অভিহিত করা হয়।

৪১ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) মারওয়ান বিন হাকামকে মদীনা শরীফের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

৪৩ হিজরীতে রাহাজ শহর সিজিসতান থেকে, দাওয়ান বারাকা থেকে আর কুযী শহর সুদান থেকে বিজয় লাভ করে। এ বছর তিনি স্বীয় ভ্রাতা যিয়াদকে নিজের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করলে সর্বপ্রথম বিবাদের সূচনা হয়, যা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশের বৈপরিত্য সৃষ্টি করে।

৪৫ হিজরীতে কায়কাহন আর ৫০ হিজরীতে কুহিস্তান যুদ্ধের মাধ্যমে জয় হয়। সে বছরেই আমীর মুয়াবিয়া নিজের ছেলে ইয়াযিদের জন্য পরবর্তী খলীফা হিসেবে সিরিয়াবাসীর কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের ইতিহাসে তিনি প্রথম সেই ব্যক্তি, বেঁচে থাকা অবস্থায় (যিনি) নিজের ছেলের জন্য

বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। এরপর আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) মদীনাবাসীর কাছ থেকে ইয়াযিদের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করতে মারওয়ানের প্রতি লিখিত ফরমান পাঠালেন। সুতরাং মারওয়ান খুতবার মধ্যে বললেন, "খলীফার পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে আমি তার ছেলে ইয়াযিদের জন্য আপনাদের কাছ থেকে আবু বকর আর উমরের রীতিনীতি অনুযায়ী বাইয়াত নিবো।" সঙ্গে সঙ্গে আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) প্রতিবাদ করে বললেন, "না, না, বরং তা কিসরা ও কায়সারের রীতিনীতি। কারণ আবু বকর আর উমর নিজের সন্তানাদি ও পরিবার- পরিজনের জন্য কখনো কারো কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেননি।"

৫১ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া হাজ্জ পালন করেন আর ইয়াযিদের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেন। তিনি ইবনে উমর (রাঃ) কে ডেকে বললেন, "একদিন তুমি আমার নেতৃত্বের প্রশংসা করেছিলে, কিন্তু আজ আমার খিলাফত সম্পর্কে জনসাধারণ্যে সংশয়ের বীজ বপন করছো।" ইবনে উমর (রাঃ) হামদ ও সানার পর বললেন, "আপনার আগের খলীফারবৃন্দের পুত্র সন্তন ছিলো, যাঁদের থেকে আপনার ছেলে কোন দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ নয়। তবুও পুর্ববর্তী খলীফাগণ নিজ সন্তানদের কখনো ক্ষমতার উত্তরাধিকার করেননি; বরং তারা বিষয়টি জনসাধারণের উপর ন্যস্ত করেছেন। আপনিও সেভাবে ইজমা করুন, আমি ইজমাকারীদের একজন। আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন যে, আমি মানুষদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছি, অথচ আমি তা করিনি।" এ বলে তিনি চলে গেলেন।

এরপর তিনি ইবনে আবু বকর (রাঃ) কে ডেকে একই বিষয় উত্থাপন করলে ইবনে আবু বকর (রাঃ) মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "আপনি কি মনে করেছেন এ কাজের জন্য আমরা আপনাকে প্রতিনিধি বানিয়েছি ?" আল্লাহর কসম, আমরা এ কাজের জন্য আপনাকে নেতা মনোনীত করিনি। আল্লাহর কসম, আমরা চাই এ বিষয়টি সকল মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ শূরার (কমিটি) কাছে ন্যস্ত করতে, নাহলে আমরা প্রতারিত হয়ে বিষয়টি খারাপ করে দিবো।" এ বলে তিনি চলে গেলেন।

ইবনে আবু বকর (রাঃ) যাওয়ার সময় আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) প্রথমে এ বলে দুয়া করলেন, "হে আল্লাহ, এ লোকের অনিষ্ট থেকে আপনি যেভাবেই হোক আমাকে রক্ষা করুন।" এরপর আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) বললেন, "তুমি কাজের মধ্যে কঠোরতা অবলম্বন করে এ সংবাদ সিরিয়াবাসীকে জানিয়ে দিয়ো না। তারা যেন তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে কিছু না করতে পারে। আমি চাই তোমরা ইয়াযিদের জন্য বাইয়াত করেছো - এ খবর সিরিয়ায় পৌছে দিতে।"

এরপর আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ইবনে যুবায়ের (রাঃ) কে ডেকে বললেন, "হে যুবায়েরের ছেলে, তুমি তো খেঁকশিয়ালের মতো এক ক্ষেত থেকে বের হয়ে আরেক ক্ষেতে গিয়ে লুকাও। তুমি ওদের কানে (ইবনে উমর রাঃ আর ইবনে আবু বকর রাঃ) কোন বাতাস ছড়িয়ে দিয়েছো, যা তাঁদেরকে বাইয়াত গ্রহণে বিরত রেখেছে ?" ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বললেন, "আপনি খিলাফত সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হলে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। আমরা আপনার ছেলের হাতেই বাইয়াত দিবো। আপনিই বলুন, আমরা আপনার বাইয়াত না আপনার বাইয়াতের আনুগত্য করবো ? একই যুগে দুই বাদশাহর বাইয়াত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।" এ বলে তিনি চলে গেলেন।

তারপর আমীর মুয়াবিয়া মিম্বরে আরোহণ করে হামদ ও নাতের পর বললেন, "আমি অপরিপক্ক লোকদের বলতে শুনেছি, ইবনে উমর, ইবনে আবু বকর আর ইবনে যুবায়ের কখনো ইয়াযিদকে বাইয়াত দিবে না। বস্তুত, তারা ইয়াযিদের ইতাআত ও বাইয়াত সবই করেছে।" এ কথা শুনে সিরিয়াবাসী বললো, "আল্লাহর কসম, তারা আমাদের সামনে বাইয়াত না করলে আমরাও বাইয়াত করবো না। আর তারা বাইয়াত করতে অস্বীকার করলে আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবো।" আমীর মুয়াবিয়া বললেন, "সুবহান-আল্লাহ! আল্লাহর কসম, এর আগে তোমাদের মুখে কুরাইশদের শানে দৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি আর কখনো শুনিনি।" এ বলে তিনি নিচে নেমে এলেন। এরপর লোকেরা ইবনে উমর, ইবনে আবু বকর আর ইবনে যুবায়ের কর্তৃক ইয়াযিদের বাইয়াত গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করছিলো, অথচ তারা তার বাইয়াতের বিষয়টি সবসময় প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। আমীর মুয়াবিয়া হাজ্জ শেষে সিরিয়ায় ফিরে যান।

ইবনে মানকাদর বলেছেন, "ইয়াযিদকে বাইয়াত দেওয়ার সময় ইবনে উমর বলেছিলেন, তিনি যদি ভালো মানুষ হোন, তবে তার প্রতি সন্তুষ্ট, নতুবা বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করবো।"

হাওয়াতিফ গ্রন্থে হুমায়েদ বিন ওহাবের বরাত দিয়ে খারায়েতী লিখেছেনঃ আমীর মুয়াবিয়ার মা হিন্দা বিনতে উতবা বিন রবীয়ার প্রথমে ফাকা বিন মুগীরার সাথে বিয়ে হয়। ফাকার একটি বৈঠকখানা ছিল, এখানে অবাধে লোক যাতায়াত করতো। একদিন হিন্দা আর ফাকা বৈঠকখানায় বসে ছিল। কিছুক্ষণ পর কোনো এক কাজে ফাকা উঠে যায়। এমন সময় এক ব্যক্তি বৈঠকখানায় এসে একাকী নারীর উপস্থিতি দেখে চলে যেতে উদ্যোত হয়। ঠিক এ মুহূর্তে ফাকা এসে বৈঠকখানা থেকে অপরিচিত লোক বের হতে দেখে হিন্দাকে আক্রমণ করে জানোতে চায় ওর সাথে তার কি সম্পর্ক। হিন্দা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইলে ফাকা বললো, আমার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাও। সংবাদটি দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর তা নিয়ে মানুষের মাঝে ব্যাপক কানাঘুষা আরম্ভ হয়। ফলে হিন্দার বাবা উতবা মেয়েকে বললো, "আলোচনা সমালোচনায় লোকেরা কান ভারি করে ফেলেছে। তুমি আমাকে সত্য করে বলো, যদি তোমার স্বামী সঠিক হয় তবে লোক নিয়োগ করে তার গর্দান উড়িয়ে দিবো। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে ইয়ামানের কোন যাদুকরের কাছে বিষয়টি পেশ করবো।"

এরপর হিন্দা নিজেকে সতী প্রমাণ করার জন্য জাহেলি যুগে যত কসম ছিল সব কসম করতে শুরু করলো। এতে করে উতবার বিশ্বাস হয় যে, হিন্দা সতী। আর ফাকা তার মেয়ের প্রতি অপবাদ দিয়েছে। এজন্য উতবা নিজ গোত্রীয় লোকদের নিয়ে ইয়ামানে যায়। এদিকে ফাকাও বনু মাখযুম আর উকবা বিন আব্দে মান্নাফ গোত্রের লোকদের ইয়ামান যাত্রা করে। ইয়ামানের কাছাকাছি গিয়ে হিন্দার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলে উতবা বললো, "এটাই প্রমাণ করে যে, তুমি অপরাধী।" হিন্দা উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে বললো, "আপনি আমাকে এমন লোকের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, যার কথা সত্যও হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে। যদি সে আমাকে কুলটা বলে দেয়, তবে আমি আর আরবে মুখ দেখাতে পারবো না।" উতবা বললো, "তোমার বিষয় উত্থাপন করার আগে আমি তার পরীক্ষা নিবো। উত্তীর্ণ হলে তবেই তোমার বিষয়টি পেশ করবো, নতুবা নয়।"

উতবা ঘোড়ার কানে গমের একটি দানা দিয়ে কানের ছিদ্র বন্ধ করে দিলো। ইয়ামানে পৌছার পর পশু যবেহ করে সম্মানের সাথে যাদুকরকে খাওয়ানোর পর উতবা বললো, "আমি একটি গোপন বিষয় নিয়ে এসেছি; এর আগে বলুন, আমি কি করেছি ?" সে ঘোড়ার কানে গম দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি বলার পর উতবা বললো, "আপনি সঠিক বলেছেন।" এরপর হিন্দার ব্যাপারে জানোতে চাইলে সে অন্য এক রমনীর কাছে গিয়ে তার মাথার চুল ধরে বললো, "দাঁড়িয়ে যা।" এভাবে তিনিবার করার পর হিন্দার কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে বললো, "তুমি সতী ও পবিত্রা রমণী। তুমি যিনা করোনি। মুয়াবিয়া নামে তোমার গর্ভে এক বাদশাহ জন্মগ্রহণ করবেন।"

এ কথা শুনে ফাকা হিন্দার হাত চেপে ধরে, কিন্তু সে তা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, "তুমি চলে যাও। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো আমার গর্ভের সম্ভাব্য বাদশাহ যেন তোমার ঔরস থেকে না হয়।" এরপর হিন্দার সাথে আবু সুফিয়ানের বিয়ে হয় আর আমীর মুয়াবিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ৬০ হিজরীর রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। বাবে জাবীয়া আর বাবে সগীরের মধ্যবর্তীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কথিত আছে, তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তার কাছে রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেশ আর নখ ছিল। মৃত্যুর সময় তিনি ওসীয়ত করেছিলেন, সেগুলো যেন তার চোখে আর মুখে দিয়ে তাঁকে দাফন করা হয়।

আমীর মুয়াবিয়ার জীবনের কিছু খন্ডচিত্র

ইবনে আবি শাইবা 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে সাঈদ বিন জুমহানের বরাত দিয়ে লিখেছেনঃ আমি সাফীনাকে বললাম, বনূ উমাইয়া বলেছে, খিলাফত তাদের বংশীয়। তিনি বললেন, সে সঠিক বলেনি। তিনি বাদশাহ, কঠোর বাদশাহ। আর সর্বপ্রথম বদশাহ হলেন মুয়াবিয়া।

বায়হাকী আর ইবনে আসাকির ইবরাহীম বিন সুওয়াইদুল আরমানীর বরাত দিয়ে বলেছেনঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হলো, "খলীফা কে কে ?" তিনি বললেন, "আবু বকর, উমর, উসমান আর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।" আমি বললাম, "আর মুয়াবিয়া ?" তিনি বললেন, "হযরত আলী (রাঃ) এর যুগে খিলাফতের যোগ্য আলী ছাড়া আর কেউ ছিল না।"

সালাফী 'তৌরিয়াত' গ্রন্থে লিখেছেনঃ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ) আর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "আলীর অনেক শত্রু ছিল। তারা সর্বদা তার ভুল ত্রুটির অনুসন্ধান করতো। তার কোন দোষ- ত্রুটি না পেয়ে তারা এমন লোকের কাছে সমবেত হয়, যে আগে থেকেই হযরত আলীর ব্যাপারে শত্রুতা পোষণ করতো।"

ইবনে আসাকির আব্দুল মালিক বিন উমায়ের (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ একদিন জারিয়া বিন কুদামা সাদী আমীর মুয়ায়বিয়ার কাছে গেলে তিনি বললেন, "তুমি কে ?" জারীয়া বললেন, "আমি জারীয়া বিন কুদামা।" তিনি বললেন, "তুমি কি সৃষ্টি করতে চাও ? তুমি তো মূল্যহীন মধুওয়ালা মাছি।" জারীয়া বললেন, "আপনি এমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, সেই মাছির হুল অত্যন্ত শক্ত আর মজবুত।"

ফজল বিন সুওয়ায়েদ বলেছেনঃ জারীয়া বিন কুদামা আমীর মুয়াবিয়ার কাছে গেলে তিনি বললেন, "তোমাদের (হযরত আলী) পক্ষ হতে এমন অগ্নি প্রজ্বলিত হবে, যা আরবের সকল জনপদকে ভস্মীভূত করে ফেলবে আর রক্তের নদী প্রবাহিত করে দিবে।" জারীয়া বললেন, "হে মুয়াবিয়া, আপনি হযরত আলীর পিছু ছেড়ে দিন। আমরা যেদিন থেকে তাঁকে ভালোবেসেছি, সেদিন থেকে আর তাঁকে অসন্তুষ্ট করিনি। যেদিন থেকে তার মঙ্গল কামনা করেছি, সেদিন থেকে তাঁকে ধোঁকা দেইনি।" মুয়াবিয়া (রাঃ) বললেন, "জারীয়া, তোমার ব্যাপারে দুঃখ হয়। তুমি তোমার বংশের বোঝা। যে তোমার জারীয়া (বাঁদী) রেখেছে, সে সার্থক।" জারীয়া বললেন, "হে মুয়াবিয়া, আপনিই সমাজের বোঝা। যে আপনার নাম মুয়াবিয়া (ঘেউ ঘেউকারী) রেখেছে, সে ধন্য।" তিনি বললেন, "তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছো।" জারীয়া বললেন, "আপনি তলোয়ারের শক্তি দিয়েও আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারেননি। আমরা যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি। কিন্তু সন্ধির মাধ্যমে আপনি জেঁকে বসেছেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে আমরাও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো। শর্ত ভঙ্গ করলে আমরা বিকল্প পথ খুঁজবো। আমাদের সাথে অনেক সাহায্যকারী রয়েছে যাদের বর্ম খুব মজবুত আর লোহার চেয়েও পরিপক্ক। আমাদের সাথে বিশ্বাসঘতকতা করলে আমরা বিদ্রোহ করবো। এরপর আমাদের বিদ্রোহের স্বাদ আস্বাদন করবেন।" মুয়াবিয়া (রাঃ) বললেন, "আল্লাহ তাআলা তোমার মতো আর কাউকে যেন সৃষ্টি না করেন।"

আবু তোফায়েল আমের বিন ওয়াতালা সাহাবী বলেছেনঃ একদিন আমি মুয়াবিয়ার কাছে গেলে তিনি বললেন, "তুমি কি উসমান (রাঃ) এর হত্যাকারীদের একজন ?" আমি বললাম, "না, আমি উপস্থিত ছিলাম, তবে সাহায্য করিনি।" তিনি বললেন, "কে সাহায্য করতে তোমাকে নিবৃত্ত করেছে ?" আমি বললাম, "মুহাজির আর আনসারদের মধ্যে কেউ নয়।" তিনি বললেন, "লোকেরা সে প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার সংরক্ষন করে।" আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি কেন সেদিন তাঁকে সাহায্য করেননি ? অথচ সিরিয়াবাসী আপনার সাথে ছিল।" তিনি বললেন, "আমি তার রক্তের প্রতিশোধ নিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছি।" আমি তার কথা শুনে হাসলামে আর বললাম, "উসমান (রাঃ) আর আপনার দৃষ্টান্ত এ রকম, যেরূপ কবি বলেছেন - এমনটা যেন না হয় যে, মৃত্যুর পর আমার জন্য বিলাপ করবে; আর জীবিত থাকা অবস্থায় আমার যা পাওনা ছিল তা বুঝিয়ে দিয়ো না।"

শাবী (রাঃ) বলেছেনঃ আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) সর্বপ্রথম বসে খুতবা পাঠের প্রবর্তন করেন। কারণ সে সময় তিনি অনেক মোটা আর পেট বড় হয়েছিলো। (ইবনে আবী শায়বা)

যুহরী বলেছেনঃ তিনি ঈদের খুৎবা নামাযের আগে পাঠ করার নিয়ম চালু করেন। (আব্দুর রাজ্জাক)

সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রাঃ) বলেছেনঃ তার যুগে ঈদের নামাযের আযান দেয়ার মতো বিদয়াত কাজটি করা হতো। (ইবনে আবী শায়বা) তিনি এও বলেন যে, মুয়াবিয়া (রাঃ) নামাযের তাকবীর কম করে বলতেন।

আওয়ায়েল গ্রন্থে আল্লামা আসকারী লিখেছেনঃ তিনি প্রথম ডাক বিভাগের প্রবর্তন করেন। তার সাথে জনগন প্রথম গোস্তাখী করে।

তিনি এ পদ্ধতিতে সালামের রীতি প্রবর্তন করেন -

السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة الله وبر كاة الصلوة ير حمك الله

তিনি সর্বপ্রথম দাপ্তরিক কাজে আব্দুল্লাহ বিন আউস গাসসানীর তত্ত্বাবধানে لكل عمل سواب খোদিত মোহর ব্যবহার করেন। আব্বসীয়া বংশের সকল খলীফা এ মোহর ব্যবহার করেছেন। আমীর মুয়াবিয়ার ফরমানে এক লক্ষ দিরহামের স্থানে এক কর্মচারী কর্তৃক দুই লক্ষ লিখিত হওয়ার প্রেক্ষিতে মোহরের প্রবর্তন করা হয়। তিনি জামে মসজিদের মেহরাব তৈরি করেন। তিনি সর্বপ্রথম কাবার গিলাফ নামানোর নির্দেশ জারি করেন।

মুকাযিয়াত গ্রন্থে যুহরীর ভাতিজার বরাত দিয়ে যুবায়ের বিন বাকার লিখেছেনঃ আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) সর্বপ্রথম বাইয়াতের সময় কসম খাওয়ার প্রথা চালু করেন। তিনি খিলাফতের বিষয়ে কসম করেছিলেন। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান গোলাম আযাদ করার ক্ষেত্রেও কসম নিতেন।

আওয়ায়েল গ্রন্থে সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুআম্মারের বরাত দিয়ে আসকারী লিখেছেনঃ একদিন আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) মক্কা অথবা মদীনার মসজিদে গেলেন। সেখানে ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস আর ইবনে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বসেছিলেন। মুয়াবিয়া (রাঃ) তাদের কাছে এসে বসলে ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমীর মুয়াবিয়া বললেন, “হে মুখ ঘুরিয়ে লেনেওয়ালা, আমি তোমার চাচাতো ভাইয়ের চেয়ে বেশী খিলাফতের হকদার।” ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, “প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণের জন্য ? রাসূলুল্লাহ’র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে সর্বপ্রথম সহাচার্য দানের জন্য ? না রাসুলুল্লাহ’র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকটত্মীয় হওয়ার কারণে আপনি তার চেয়ে বেশী খিলাফতের হকদার ?” আমীর মুয়াবিয়া বললেন, “তোমার চাচার ছেলে নিহত হওয়ার কারণে।” ইবনে আব্বাস বললেন, “এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইবনে আবু বকর বেশী হকদার।” মুয়াবিয়া বললেন, “আবু বকর (রাঃ) তো স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন।” ইবনে আব্বাস বললেন, “তাহলে ইবনে উমর হকদার।” মুয়াবিয়া বললেন, “এদিক থেকে তোমার যুক্তি পরিত্যাজ্য। কারণ তোমার চাচার ছেলের উপর যারা আক্রমণ করে শহীদ করেছে তারা মুসলমান।”

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল বলেছেনঃ আমি একবার মদীনা শরীফে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এর কাছে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আবু কাতাদা (রাঃ) আনসারীও এলেন। আমীর মুয়াবিয়া তাকে বললেন, “আমার নিকট সকলেই আসলেও আনসারগণ এলেন না।” তিনি জবাব দিলেন, “আমাদের আনসারদের কাছে কোনো বাহন নেই।” আমীর মুয়াবিয়া বললেন, “তোমাদের উটগুলো কি হয়েছে ?” তিনি বললেন, “বদর যুদ্ধে আপনাদের

আর আপনার বাবার পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে সবগুলো মারা গিয়েছে।" এরপর তিনি আবার বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন - আমার পর অন্যরা হকদারদের উপর প্রাধান্য পাবে।" মুয়াবিয়া বললেন, "তুমি এ পরিস্থিতিতে কি করবে ?" তিনি বললেন, "সহনশীল হবো, ধৈর্যধারণ করবো।" মুয়াবিয়া বললেন, "তবে ধৈর্যধারণ করে থাকো।"

এ প্রেক্ষিতে আব্দুর রহমান বিন হাসসান এ কবিতাটি রচনা করেন - "আমিরুল মুমিনীন মুয়াবিয়া বিন হরবের কাছে অবশ্যই এ সংবাদ পৌছে দিবে যে, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আপনাকে সুযোগ দেয়া হয়েছে আর আমরা সেই ইনসাফের দিন পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবো।"

জাবালা বিন সাহীম থেকে ইবনে আবীদ দুনিয়া আর ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ আমি আমীর মুয়াবিয়ার কাছে গিয়ে মুয়াবিয়ার গলায় দড়ি লাগিয়ে এক বাচ্চাকে টানতে দেখে বললাম, "এ বাচ্চা কি করছে ?" তিনি বললেন, "চুপ করো। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, বাচ্চার সাথে মিশলে নিজেকে বাচ্চা হয়ে যেতে হয়।" ইবনে আসাকিরের মতে হাদীসটি গারীব।

মুসান্নাফ গ্রন্থে ইবনে আবী শায়বা লিখেছেনঃ এক কুরাইশ ব্যক্তি আমীর মুয়াবিয়ার কাছে গিয়ে অনেক নরম-গরম মন্তব্য শুনানোর পর মুয়াবিয়া বললেন, "ভাতিজা, এ ধরনের মন্তব্য থেকে ফিরে আসো। বাদশাহর রাগ বাচ্চার রাগের মতো। আর বাদশাহর আক্রমণ বাঘের মতো ক্ষিপ্র ও দুর্ধর্ষ।"

যিয়াদের বরাত দিয়ে শাবী বলেছেনঃ আমি খারাজ আদায় করার জন্য এক লোককে পাঠালাম। সে ফিরে এসে সন্তোষজনক হিসাব দিতে না পারায় আমার ভয়ে আমীর মুয়াবিয়ার কাছে আশ্রয় নেয়। আমি বিষয়টি তাঁকে জানালে তিনি চিঠি লিখে জানালেন, আমাদের একই পদ্ধতিতে রাজনীতি করা সম্ভব নয়। আমরা উভয়ে নমনীয় হলে জাতি পাপকার্যে নিমজ্জিত হবে। আবার উভয়ে কঠোর হলে আমজনতা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তুমি নমনীয় হলে আমার অবস্থান শক্ত হবে, আর তুমি কঠোর হলে আমি মমতার আশীর্বাদ নিয়ে জাতির সামনে এসে দাঁড়াবো।

শাবী বলেছেনঃ আমি মুয়াবিয়াকে বলতে শুনেছি, যে জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও মতভেদ থাকবে, সে জাতির উপর ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী সম্প্রদায় প্রাধান্য পাবে; তবে এ উম্মতের উপর এমনটা হবে না।

তৌরিয়াত গ্রন্থে সুলায়মান আল-মাখযুমী কর্তৃক বর্ণিতঃ একদিন আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) জনসাধারণের এক উন্মুক্ত সমাবেশে নিজের জন্য প্রযোজ্য এমন অর্থবোধক তিনিটি আরবী কবিতা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) তিন লক্ষ্য দিরহামের বিনিময়ে তা শোনাতে সক্ষম হোন। পরিশেষে মুয়াবিয়ার রাজি হওয়ার প্রেক্ষিতে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের আবৃত্তি করেন; প্রথম কবিতা - "আমি জনতাকে পালন করে থাকি, আমি তোমাকে ছাড়া লোকদের মধ্যে কাউকে শত্রুতা পোষণ করতে দেখিনি।" দ্বিতীয় কবিতা - "আমি তোমার যুগে বেদনায় বিধ্বস্ত জনতার দলকে শত্রুতা ছাড়া আর কিছু করতে দেখিনি।" তৃতীয় কবিতা - "আমি সকল দুঃখ ও লজ্জার স্বাদ পেয়েছি, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে বড় লজ্জাকর কাজ আর দেখিনি।" মুয়াবিয়া বললেন, "তুমি যথার্থই বলেছো।" এরপর তিনি কবিকে তিনি লক্ষ দিরহার দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম বুখারী, ইমাম নাসাঈ আর ইবনে হাতিম (রহঃ) কর্তৃক স্বরচিত তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেনঃ মারওয়ান যখন আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) কর্তৃক মদীনার গভর্নর, সে সময় একদিন তিনি খুতবার মধ্যে বলেছিলেন, "আমিরুল মুমিনীন মুয়াবিয়া (রাঃ) তার ছেলেকে খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে যে অভিমত পেশ করেছেন তা যথাযথ। কারণ এটাই ছিল আবু বকর আর উমরের নীতি।" এটা শুনে আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রাঃ) বললেন, "এটা আবু বকর (রাঃ) আর উমর (রাঃ) এর নীতি নয়, বরং তা কিসরা ও কায়সারের নীতি। কারণ আবু বকর আর উমর নিজের সন্তানাদি আর পরিবারের মধ্য থেকে কারো জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেননি। আর মুয়াবিয়া (রাঃ) দয়ার্দ্র পিতা হিসেবেই ছেলের জন্য এমনটা করেছেন।" মারওয়ান বললেন, "তোমরা তো সেই ব্যক্তি নও, যাদের কথা কুরআনে বিধৃত রয়েছে। তোমাদের পিতার মৃত্যুতে তোমরা তো আহ শব্দটুকুও বলোনি। তোমরা তো নিজ পিতাদের প্রতিরোধ করেছিলে।" ইবনে আবু বকর (রাঃ) বললেন, "তুমি কি অভিশপ্তের পুত্র নও ? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমার বাবাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।" বিষয়টি আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) পর্যন্ত পৌছে গেলে তিনি বললেন, মারওয়ান মিথ্যা বলেছে। আয়াতটি অমুক লোকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আর মারওয়ান তার পিতার ঔরসে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মারওয়ানের পিতাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। এ দিক থেকে মারওয়ান অভিশাপের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে।

মুসান্নাফ গ্রন্থে ওরওয়ার বরাত দিয়ে ইবনে আবি শায়বা লিখেছেন যে, মুয়ারিয়া বলেছেন, "মানুষের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ছাড়া ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি হয় না।"

শাবী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ মুয়াবিয়া, আমর বিন আস, মুগীরা বিন শোবা আর যিয়াদ হলেন আরবের শ্রেষ্ঠ চার বুদ্ধিমান। মুয়াবিয়া (রাঃ) ভদ্রতা, বিনয় আর বিচক্ষণতায়; আমর বিন আস কষ্ট সহিষ্ণুতায়, মুগীরা বিন শোবা স্বাধীনতা হাত ছাড়া না হওয়ার জন্য যত্নশীল হওয়ায় এবং যিয়াদ বল্গাহীন কথা বলার জন্য বিখ্যাত।

ইবনে আসাকির এটাও বর্ণনা করেছেনঃ উমর (রাঃ), আলী (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ) আর যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ চার বিচারক।

কুবায়সা বিন জাবির বলেছেনঃ আমি উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর সাহচর্যে থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, তার চেয়ে বেশী কুরআন শরীফ আর আইনের জ্ঞান কারো ছিল না। আমি তালহা বিন উবায়দুল্লাহর সাথেও ছিলাম, না চাইতে দান করার প্রবণতা তার চেয়ে বেশী কারো মধ্যে দেখিনি। আমি মুয়াবিয়ার সাথেও ছিলাম, মুয়াবিয়ার চেয়ে ধৈর্যশীল আর বিচক্ষণ আলেম আমার চোখে পড়েনি। আমর বিন আসের চেয়ে নিরাপদ সহকর্মী এবং বিশ্বস্ত বন্ধু আর কেউ নেই।

জাফর বিন মুহাম্মদের পিতার বরাত দিয়ে ইবনে আসাকির উল্লেখ করেনঃ একদিন আকীল (রাঃ) আমীর মুয়াবিয়ার কাছে গেলে তিনি বললেন, "এ তো সেই আকীল, যার চাচা আবু লাহাব।" আকীল বললেন, "এ তো সেই মুয়াবিয়া যার ফুফু হামালাতুল হতব (আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম - অনুবাদক)

আওযায়ী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ একদিন হুযায়েম বিন ফাতাক আমীর মুয়াবিয়ার কাছে গেলেন। হুয়ায়েমের পায়ের গোছা ছিল খুবই সুদর্শন; তা দেখে মুয়াবিয়া বললেন, “এ পায়ের গোছা কোন নারীর ?” হুযায়েম বললেন, “হে আমিরুল মুমিনীন, আপনার পত্নীর।”

তার খিলাফতকালে যেসব প্রখ্যাত আলেম বুযুর্গ ইন্তেকাল করেছেন তারা হলেন - সাফওয়ান বিন উমাইয়া, হাফসা, উম্মে হাবীবা, সুফিয়া, মাইমূনা, সাওদা, জুয়াইরিয়া, আয়েশা সিদ্দীকা, লাবীদ কবি, উমরান বিন হাসীন, উসমান বিন তালহা, আমর বিন আস, আব্দুল্লাহ নিন সালাম, মুহাম্মদ বিন মাসলামা, আবু মূসা আশয়ারী, যায়েদ বিন সাবিত, আবু বকর, কাব বিন মালিক, মুগীরা বিন শোবা, জারিরুল বিজলি, আবু আউয়ুব আনসারী, সাঈদ বিন যায়েদ, আবু কাতাদা আনসারী, ফুজালা বিন উবায়েদ, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর, যুবায়ের বিন মুতঈম, উসামা বিন যায়েদ, সওবান, আমর বিন হাজম, হাসসান বিন সাবিত, হাকিম বিন হাযাম, সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস, আবু লাইসাম, কসম বিন আস, তার ভাই উবায়দুল্লাহ এবং উকবা বিন আমের (রাঃ)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) ৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি এ মর্মে প্রার্থনা করেছিলেন যে, “হে আল্লাহ, আমাকে ৬০ হিজরী আর বাঁদীদের রাজত্ব থেকে রক্ষা করুন।” তার দোয়া কবুল হয়েছিলো।

ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া

ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া আবু খালিদ আল উমুয়ী ২৫ অথবা ২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

স্থুল শরীরের অধিকারী ইয়াযিদের গোটা শরীরে পশম ছিল। তার মা মাইসুন বিনতে বহদে কালবীয়া। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তার রেওয়ায়েতগুলো (বর্ণনাগুলো) তার ছেলে খালিদ আর আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বর্ণনা করেছেন।

তিনি আগে থেকেই উত্তরাধিকার নিযুক্ত হয়েছিলেন আর লোকদের বাধ্য করে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, "ইয়াযিদ আগেই উত্তরাধিকার মনোনীত হওয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত এ প্রথা অব্যাহত থাকবে, নতুবা পরামর্শ সাপেক্ষে মুসলমানগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই থাকতেন।"

ইবনে সিরীন (রহঃ) বলেছেনঃ মুয়াবিয়ার কাছে গিয়ে আমর বিন হাযাম বললেনঃ আমি আপনাকে আল্লাহর ভয়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আপনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্য থেকে কাকে খলীফা মনোনীত করতে চাইছেন ?" মুয়াবিয়া (রাঃ) বললেন, "তোমার উপদেশে আমি কৃতজ্ঞ। বর্তমানে অনেকের অনেক ছেলে রয়েছে, তাদের মধ্যে আমার ছেলে বেশী হকদার। এজন্য তাকে উত্তরাধিকার বানাতে চাইছি।"

আতীয়া বিন কায়েস বলেছেনঃ একদিন মুয়াবিয়া (রাঃ) খুতবার সময় বললেন, "হে আল্লাহ, যদি ইয়াযিদকে তার মর্যাদার কারণে উত্তরাধিকার মনোনীত করি, তবে আপনি তাকে সাহায্য ও রক্ষা করুন। আর যদি দয়ার্দ্র পিতা হিসেবে করে থাকি এবং যদি সে খিলাফতের যোগ্য না হয়, তাহলে সে যেন মসনদে আরোহণের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে।"

মুয়াবিয়ার ইন্তেকালের পর সিরিয়াবাসী ইয়াযিদের কাছে বাইয়াত দেয়। এরপর তিনি মদীনাবাসীর বাইয়াত গ্রহণের ফরমান জারি করলে ইমাম হুসাইন (রাঃ) আর ইবনে যুবায়ের (রাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করে সে রাতেই তারা মক্কা শরীফে চলে যান। ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ইয়াযিদকে বাইয়াত দেননি আর নিজের জন্যও বাইয়াত করাতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রাঃ) কে কুফাবাসী মুয়াবিয়ার আমল থেকেই বলে রেখেছিলো আর তারা ইমাম হুসাইনকে বাইয়াত দিতে প্রস্তুত ছিল। তবে তিনি কোনো সময়েই রাজী হননি। যখন ইয়াযিদ বাইয়াত করিয়ে নিলো, তখন প্রথমে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকার চেষ্টা করেন। এরপর কুফা যাওয়ার ইচ্ছা করেন; ইবনে যুবায়ের তাঁকে এ পরামর্শই দেন, কিন্তু ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁকে নিষেধ করেন। ইবনে উমর (রাঃ) বের হতে নিষেধ করে বললেন, "আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাত দুটির মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আপনি তো রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কলিজা। আপনি আখিরাতকে কবুল করুন, দুনিয়া আপনার জন্য নয়।" ইমাম হুসাইন (রা.) নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকায় ইবনে উমর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন, গলায় জড়িয়ে ধরে অবশেষে বিদায় দেন।

ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, "ইমাম হুসাইন (রাঃ) আমার নিষেধ উপেক্ষা করে যাত্রা করলেন, ফলে তার পিতা আর ভাইয়ের মতোই পরীক্ষিত কুফাবাসীর কাছে তাঁকে একই পরিণাম ভোগ করতে হয়।"

জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আবু সাঈদ আর আবু ওয়াকেদী আল লাইসীও ইমাম হুসাইনকে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে ইরাক গমনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন। যাত্রার প্রক্কালে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, "আমার মন বলছে, বিবি- বাচ্চাদের সামনে উসমান গনী (রাঃ) এর মতো আপনাকেও শহীদ করে দেবে।" এরপর তিনি নিজেই কেঁদে ফেললেন আর বললেন, "আপনি ইবনে যুবায়েরের চক্ষুযুগল শীতল করেছেন।" এরপর তিনি ইবনে যুবায়ের (রাঃ) কে বললেন, "তুমি যা চাইছো, তা- ই হতে চলেছে। ইমাম হুসাইন (রাঃ) যাত্রা করছেন। আর তুমিও হিজায ছেড়ে যাত্রা করছো।" এরপর তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করলেন, "হে উড়ন্ত প্রাণী, শূণ্য চারণভূমির যেখানে খুশি চড়বে, যেখানে খুশি ডিম দিবে।"

ইরাকবাসীর দূত আর পত্রসম্বলিত আহবানের প্রেক্ষিতে ইমাম হোসাইন (রাঃ) যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে পরিবার- পরিজন যাঁদের মধ্যে নারী ও শিশু ছিল মক্কা থেকে ইরাক গমন করেন। এদিকে ইয়াযিদ ইরাক শাসনকর্তা উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে ইমাম হুসাইনের সাথে যুদ্ধ করার লিখিত আদেশ দেন আর আমর বিন সাদ বিন আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ইমাম হুসাইনের গতিপথ রুদ্ধ করতে চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। কুফাবাসী নিজেদের পুরনো অভ্যাস অনুযায়ী আলী (রাঃ) প্রমুখদের সাথে যেমন আচরণ করেছিলো, তেমনি ইমাম হুসাইন (রাঃ) কে একা ফেলে তারা চলে যায়। ইয়াযিদ বাহিনী বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলে ইমাম হুসাইন (রাঃ) সন্ধি, প্রত্যাবর্তন অথবা ইয়াযিদের কাছে যাওয়া - এ তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। অথচ তারা সবগুলোই প্রত্যাখ্যান করে আর ইমাম হুসাইন (রাঃ) কে শহীদ করে তার মাথা মুবারাক এক ট্রেতে করে ইবনে যিয়াদের সামনে পেশ করা হয়। আল্লাহ তাআলা ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর হত্যাকারী ইবনে যিয়াদ আর ইয়াযিদের প্রতি অভিশাপ বর্ষন করুন।

ইমাম হুসাইন (রাঃ) ইয়াওমে আশুরায় শাহাদাত বরণ করেন। তার শহীদ হওয়ার ঘটনাটি অনেক দীর্ঘ আর খুবই বেদনাদায়ক। তার সাথে পরিবারের ষোলজন শহীদ হোন। তিনি শহীদ হওয়ার মুহূর্তে সাতদিন পর্যন্ত দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সূর্যের রং বিকৃত হয়ে যায়, তারকারাজি ভেঙে ভেঙে নিচে পতিত হয়, সেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিলো আর ছয় মাস পর্যন্ত আকাশের এক কোণে সর্বদা একটি লাল রেখা উদ্ভাসিত ছিল, যা এ মর্মান্তিক ঘটনার পূর্বে আর কোনদিন দেখা যায়নি।

এ বর্ণনাটিও বর্ণিত রয়েছে যে, সেদিন বাইতুল মুকাদ্দাসের যে পাথর উঠানো হয়েছে, তার নিচ দিয়েই রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। বিরোধী শিবিরে সেদিনের হর্ষ কেন যেন বিষাদে পরিণত হয়েছিলো। তাদের যবেহকৃত উটের গোশত আগুনের মতো জ্বলছিলো, পাকানোর সময় তা কয়লার মতো কালো হয়ে যায় আর এর স্বাদ আলকাম বৃক্ষের মতো তিক্ত হয়। এক ব্যক্তি ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শানে কটুক্তি করায় আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে তারা নিক্ষেপ করে তার চোখ দুটো নষ্ট করে দেন।

সালাবী আব্দুল মালিক বিন উমায়ের আল লাইসী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আমি এ প্রাসাদে (কুফার প্রশাসনিক ভবন) হুসাইন বিন আলীর ছিন্ন মাথা উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে ঢালের উপর প্রতিস্থাপিত অবস্থায় দেখেছি। এর কিছুদিন পর এ প্রাসাদেই উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাটা মাথা মুখতার বিন আবু উবায়েদের সামনে দেখেছি। এরপর মুখতার বিন আবু উবায়েদের মাথা মুসয়াব বিন যুবায়েরের সামনে, আবার এর কিছুদিন পর মুসয়াব বিন যুবায়েরের বিচ্ছিন্ন মাথা আব্দুল মালিকের সামনে রাখা অবস্থায় দেখেছি। আমি এ ঘটনা আব্দুল মালিকের কাছে বিবৃত করলে তিনি এ প্রাসাদকে অমঙ্গলজনক ভেবে তা বর্জন করেন।

সালামা থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেনঃ আমি উম্মে সালমা (রাঃ) এর কাছে গিয়ে তাঁকে কাঁদতে দেখে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাথা ও দাড়ি ধুলায় ধূসরিত দেখে বললাম - আমি আল্লাহর রাসূলের এ কি অবস্থা দেখছি ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমি এ মুহূর্তে শহীদ হুসাইনকে দেখে ফিরছি।"

'দায়ায়েল' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দুপুরের সময় স্বপ্নে দেখলাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধূলাময় অবস্থায় হেঁটে চলছেন। তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতে এক বোতল রক্ত। আমি বললাম, "আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনার হাতে এটা কি ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এগুলো হুসাইন আর তার সাথীদের রক্ত। আমি আজ সারাদিন এগুলো সঞ্চয় করেছি।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "সে দিনটি হুসাইনের শাহাদাতের দিন ছিল।"

আবু নুয়াইম দালায়েল গ্রন্থে উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমি হুসাইনের মর্মান্তিক ঘটনার জন্য প্রাণিকুলের বিলাপ শুনেছি।

সাআলাবা স্বরচিত আমালী গ্রন্থে লিখেছেন যে, জনাব কালবী বলেছেনঃ আমি কারবালার প্রান্তে আরবের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি পশুদের বিলাপ শুনেছেন ?" তিনি বললেন, "তুমি এ ব্যাপারে যাকেই জিজ্ঞেস করবে তিনিই বলবেন - শুনেছি।" আমি বললাম, "আপনি নিজের কানে শুনেছেন কি ?" তিনি বললেন, "আমি এ কবিতা শুনেছি (অর্থ) - "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার চেহারার উপর হাত সঞ্চালন করেছেন, তার গন্ডদেশ দীপ্তি ছড়াতো, তার পিতামাতা কুরাইশদের অভিজাত গোত্রের সন্তান, তার দাদা সকল দাদা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।"

ইবনে যিয়াদ ইমাম হোসাইন (রাঃ) সহ তার সাথীদের শহীদ করে তাদের ছিন্ন মাথাগুলো ইয়াযিদদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ইয়াযিদ প্রাথমিক অবস্থায় এ মর্মান্তিক ঘটনায় আনন্দিত হয়, কিন্তু মুসলমানগণ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় আর এ কাজকে ঘৃণ্য বলে অভিহিত করায় সে অনুতপ্ত হয়।

আবু ইয়ালা মুসনাদ গ্রন্থে দুর্বল সূত্রে আবু উবায়দের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমার উম্মত সর্বদা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু বনূ উমাইয়্যার ইয়াযিদ নামক এক ব্যক্তি ইনসাফের পথে বাধা সৃষ্টি করবে।"

রুয়ানী মুসনাদ গ্রন্থে আবুদ দারদাহ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, "যে প্রথম আমার সুন্নতের মধ্যে পরিবর্তন করবে, সে বনূ উমাইয়্যার ইয়াযিদ।"

নওফেল বিন আবুল ফারাত বলেছেনঃ একদিন আমি খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে বসেছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে ইয়াযিদের বিষয় এসে গেলে এক ব্যক্তি 'আমিরুল মুমিনীন ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া' বলে তার নাম নিলে খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বললেন, "তুমি একে আমিরুল মুমেনীন বলছো ?" এ বলে তিনি এ অপরাধের জন্য তাকে বিশটি বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন।

৬৩ হিজরীতে মদীনাবাসীর বিদ্রোহের সংবাদ জেনে ইয়াযিদ বিশাল সৈন্য বাহিনী পাঠালো। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র মদীনা নগরী ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করে ইয়াযিদ মক্কা শরীফে ইবনে যুবায়েরকে অবরুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীকে পরবর্তী নির্দেশ দেন।

হাসান বসরী ইয়াযিদ বাহিনীর বর্বরতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, সেদিন ইয়াযিদ বাহিনীর নির্যাতন থেকে মদীনাবাসীর একজনও পরিত্রাণ পায়নি। সহস্রাধিক সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হোন। মদীনা শরীফ লুণ্ঠিত হয়। হাজার হাজার তরুণী ধর্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে মদীনাবাসীকে ভীতসন্ত্রস্ত করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রকম্পিত করে রাখবেন এবং আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা ও লোকেরা তাকে অভিশাপ দিবে। (মুসলিম)

ইয়াযিদ পাপাচারে নিমগ্ন হয়ে পড়ায় মদীনাবাসী তার বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিলো। ওয়াকেদী আব্দুল্লাহ বিন হানযালা আল গাসীল থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কসম, যতক্ষন পর্যন্ত আমি ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ হতেই থাকবে, এ আমার বিশ্বাস। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সে সময় লোকেরা (শিয়ারা –অনুবাদক) মা, মেয়ে আর বোনদের বিয়ে করতো এবং তারা প্রকাশ্যে শরাব পান করতো, আর নামায ছেড়ে দিয়েছিলো।

যাহাবী (রহঃ) বলেছেনঃ মদীনাবাসীর সাথে এহেন আচরণ, মদ পান ইত্যাদি মন্দ কাজের সাথে জড়িত থাকার কারণে ইয়াযিদের প্রতি জনগন ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এদিকে আল্লাহ তাআলা তার জীবনকে দীর্ঘ করে দিলেন। সে ইবনে যুবায়ের (রাঃ) আর মক্কাবাসীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠালো। পথিমধ্যে সেনাপতি মারা গেলে তদস্থলে আরেকজনকে নিয়োগ দেয়া হয়। ইয়াযিদ বাহিনীর সাথে ইবনে যুবায়েরের যুদ্ধ হয়। তারা ইবনে যুবায়েরকে অবরোধ করে আর অবরোধ চলাকালীন সময়ে ইয়াযীদ বাহিনী মিনযানিক থেকে আগুন ও পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে আগুনের গোলায় কাবা শরীফের দেওয়াল, ছাদ আর ইসমাঈল (আঃ) এর নিকট ফিদয়া হিসেবে প্রেরিত সেই দুম্বার ঐতিহাসিক শিং যা আজ পর্যন্ত কাবার ছাদে লটকানো আছে - সব ভস্মীভূত হয়ে যায়। ৬৪ হিজরীর সফর মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। লড়াইরত অবস্থায় তার মৃত্যু সংবাদ মক্কায় পৌছলে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) ঘোষণা দিয়ে বললেন, "হে সিরিয়াবাসী, তোমাদের পথভ্রষ্টকারী সেই লোকটির মৃত্যু হয়েছে।" এ কথা শুনে সৈন্যগণ চলে যায় আর লোকেরা তাদের পশ্চাদ্বাবন করে।

অতঃপর ইবনে যুবায়ের (রাঃ) লোকদের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন আর খলীফা বলে নিজেকে ঘোষণা দেন।

ওদিকে সিরিয়াবাসীর মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদের আসক্তি ছিল। তার অনেক কবিতার চারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

ইবনে আসাকির ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেনঃ তোমরা আবু বকর আর উমরের নাম ঠিক রেখেছো। উসমান বিন আফফান (রাঃ) শহীদ হয়েছেন। মুয়াবিয়া তার ছেলে ইয়াযিদ, সাফাহ, সালাম, মানসুর, জাবের আর মাহদী হলেন বাদশাহ। অভিশপ্ত শাসনকর্তা সকলেই কাব বিন লুয়াইয়ের বংশধর।

যাহাবী বলেছেনঃ ইবনে উমরের এ বর্ণনাটি কয়েক কয়েক পদ্ধতিতে বর্ণিত। কিন্তু কেউ একে মারফু বলেননি।

ওয়াকেদী আবু জাফর আল বাকের থেকে বর্ণনা করেনঃ ইয়াযিদ সর্বপ্রথম কাবা শরীফকে রেশমী গিলাফে আচ্ছাদিত করে।

কারবালা ও মদীনার হত্যাযজ্ঞ ছাড়া ইয়াযিদের আমলে যেসব উলামা ইন্তেকাল করেছেন তারা হলেন - উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা, খালিদ বিন আরফাত, জরহদ আল আসলামী, জাবের বিন আতীক, বুরায়দা বিন হাসীব, মাসলামা বিন মুখাল্লাদ, আলকামা বিন কায়েস, মাসরুক, মাসুর বিন মুখরিমা প্রমুখ। আর মদীনার হত্যাযজ্ঞে তিনশত কুরাইশ মুহাজির আর আনসার শাহাদাত বরণ করেন।

মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদ

মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া আবু আব্দুর রহমান, আবু ইয়াযিদ আবু ইয়লালা পিতার শাসনামলে উত্তরাধিকার মনোনীত হোন। ৬৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে পিতার পর খিলাফতের তখতে আসীন হোন। তিনি যুবক ছিলেন। এ অসুখেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

তিনি কোথাও সৈন্য বাহিনী পরিচালনা করেননি আর কোন শাসনকার্যও পরিচালনা করেননি এবং লোকদের নামাযও পড়াননি।

তার খিলাফত চল্লিশ দিন স্থায়ী হয়েছিল। কারো মতে দুই সপ্তাহ, আবার কারো মতে তিন মাস।

মৃত্যুর সময় তাকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যাওয়ার কথা বলা হলে তিনি বলেন, "আমি নিজেই যখন খিলাফতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারলাম না, তখন তিক্ততা কেন ছড়াবো ?"

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের বিন আওয়াম বিন খুয়াইলিদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জা বিন কুসসী আল-আসাদীর উপনাম আবু বকর আর আবু খুবায়ের। তিনি নিজে সাহাবী আর সাহাবীর পুত্র। তার পিতা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মধ্যে অন্যতম। মা আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। তার দাদী সুফিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু।

তিনি মদীনা শরীফে হিজরতের বিশ মাস পর জন্মগ্রহণ করেন। কেউ বলেন, হিজরতের বছর তার জন্ম। হিজরতের পর মুহাজিরদের প্রথম সন্তান তিনি। তার জন্মে মুসলমানগণ আনন্দিত হয়েছিলেন, কারণ ইহুদীরা প্রচার করেছিলো তারা যাদু করে মুসলমানদের সন্তান হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

জন্মের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁকে পেশ করা হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর চিবিয়ে তাঁকে চাটিয়ে দেন আর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নানা আবু বকর সিদ্দীকের নামে নাম ও উপনাম রাখলেন।

তিনি বেশী বেশী রোযা রাখতেন, দীর্ঘ ক্বিরাত দিয়ে নামায পড়তেন। তিনি ছিলেন দয়ার্দ্র, অসীম সাহসী ও যুগশ্রেষ্ঠ বীর। তিনি কোনো কোনো রাতকে নামাযের মধ্যে দাঁড়িয়েই শেষ করে দিতেন, রুকুর মধ্যেই কোনো রাত সকাল হয়ে যেতো, আবার কোনো রাত তিনি সেজদায় কাটিয়ে দিতেন।

তিনি ৩৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার কাছ থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন - তার ভাই উরওয়া, ইবনে আবী মালীকা, আব্বাস বিন সহল, সাবিত আল-বানানী আত, উবায়দা আল-সালমানী প্রমুখ।

তিনি ইয়াযিদ বিন মুআবিয়ার বাইআত প্রত্যাখ্যান করে মক্কায় গিয়ে নিকে কাউকে বাইআত দেননি আর নিজের জন্যও অন্যের কাছ থেকে বাইয়াত নেননি। এজন্য ইয়াযিদ তার প্রতি রুষ্ট ছিল। ইয়াযিদের মৃত্যুতে হিজাযবাসী, ইয়ামানবাসী, ইরাকবাসী, খুরাসানবাসী তার কাছে বাইয়াত করে। তিনি কাবা শরীফ পুনর্নিমাণ করেন। ইবরাহীম (আঃ) এর যুগে কাবা শরীফ যেমন ছিল, তেমনিভাবে তিনি কাবা শরীফের দুটি দরজা নির্মাণ করেন। তার খালা আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছা ছিলো আরো ছয় গজ জায়গা কাবা শরীফের অন্তর্ভুক্ত করা। এজন্য তিনি সেটাই করেন।

মিসর আর সিরিয়াবাসী ইয়াযীদের পর ইয়াযিদের ছেলে মুআবিয়ার কাছে বাইআত দেয়। মুআবিয়ার পর তারা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে বাইআত দেয়। এতে মারওয়ান বিন হাকাম বিদ্রোহ করে মিসর ও সিরিয়া যায়। তার মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ ৬৫ হিজরী অবধি মিসর ও সিরিয়া তার অধীনেই ছিল। তার শাসনকালে মারওয়ার তার ছেলে আব্দুল মালিককে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।

যাহাবী বলেছেনঃ মারওয়ার খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তিনি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। এ দিন থেকে তিনি বিদ্রোহী। তার ছেলে আব্দুল মালিককে উত্তরাধিকার মনোনীত করাও সঠিক ছিলো না। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে শহীদ করার পর তার খিলাফত সহীহ হয়েছে।

সে সময় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) মক্কায় খিলাফতের মসনদে সমাসীন। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ইবনে যুবায়েরকে হত্যার জন্য চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে হাজ্জাজকে পাঠালেন। হাজ্জাজ এসে এক মাস মক্কা শরীফ অবরোধ করে রাখে আর শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মিনযানিক (কামান) স্থাপন করে এবং তাঁকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে ফেলে। ইবনে যুবায়েরের সহচরবৃন্দ তাঁকে ছেড়ে দুশমনের শিবিরে যোগ দেয়ায় তিনি মর্মাহত হোন। কিছুদিন পর হাজ্জাজ বিজয় অর্জন করে আর ৭৩ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের সতেরো তারিখ সোমবারে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) কে শূলে চড়ানো হয়।

মুহাম্মাদ বিন যায়েদ বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর বলেছেনঃ হাজ্জাজ মিনযানিক (কামান) স্থাপনের সময় আমি আবু কুবায়েস পাহাড় থেকে দেখলাম, আগুনের এক বিশাল লেলিহান শিখা আকাশ থেকে পড়ে মিনযানিকের নিকটবর্তী পঁচিশজন সৈন্য নিহত হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) অভিজাত কুরাইশ বংশীয় ছিলেন আর তার অনেক ঘটনা ও জনশ্রুতি জনতার মুখে মুখে প্রসিদ্ধ।

মুসনাদ গ্রন্থে ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কিছু রক্ত দিলেন আর তা মানুষের দৃষ্টির বাইরে ফেলে আসতে বললেন। আমি অন্তরালে গিয়ে তা পান করে ফেললাম। আমি ফিরে এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি রক্তগুলো কি করলে ?" আমি বললাম, "আমি সেগুলো এমন এক স্থানে গোপন করে ফেলেছি, যা কেউ দেখতে পাবে না।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "মনে হয় তুমি তা পান করেছো।" আমি হ্যা সূচক উত্তর দিলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমার থেকে লোকেরা আর লোকদের থেকে তুমি কষ্ট পাবে।" কথিত আছে, ইবনে যুবায়েরের এ শক্তি সামর্থ্যই ছিল সেই রক্তের অদৃশ্য প্রতিক্রিয়া।

নাওফুল বাকালী বলেছেনঃ আসমানী কিতাবে আমি দেখেছি যে, সেখানে লিখা রয়েছে - ইবনে যুবায়ের হলেন খলীফাদের বাহন।

আমর বিন দিনার বলেছেন, "আমি তার মতো অত্যন্ত যত্নের সাথে নামায পড়তে আর কাউকে দেখিনি। মিনযানিক থেকে গোলা বর্ষণের মুহূর্তেও তিনি হারাম শরীফে নামায পড়ছিলেন। সে সময় তার কাপড়ে আগুন লেগে গিয়েছিল, কিন্তু সেদিকে তার মোটেও ভ্রূক্ষেপ ছিল না।"

মুজাহিদ বলেছেন, "তিনি যেভাবে ইবাদত করেন, তার স্থানে অন্য কেউ হলে বিরক্ত হয়ে যেতো। একবার কাবা শরীফ বন্যা প্লাবিত হয়ে পড়লে তিনি সাঁতরিয়ে তাওয়াফ করেন।"

উসমান বিন তালহা বলেছেন, "তিনটি বিষয়ে ইবনে যুবায়েরের সমকক্ষ কেউ নেই - এক, বীরত্ব ও সাহসীকতা; দুই, ইবাদতবন্দেগী এবং তিন, বাগ্মিতা ও বাকপটুতা। তিনি এমন এক উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী যে, খুৎবা দেওয়ার সময় তার কণ্ঠ পাহাড়ে ধাক্কা লাগতো।"

উরওয়া বলেছেনঃ নাবাগা জাআদী আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের শানে যে কবিতা রচনা করেছেন তার অর্থ হলো - "তিনি শাসনকর্তা হয়ে আবু বকর, উমর আর উসমানের মতো দুস্থের সেবা করবেন। সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিমিরের মাঝে আরো প্রদীপ জ্বালাবেন।"

হিশাম বিন উরওয়া আর খুবায়ের বলেছেন, "তিনিই সর্বপ্রথম কাবা শরীফকে রেশমী চাদরে আচ্ছাদন করেন। এর পূর্বে কাবাঘর চট আর চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকতো।"

আমর বিন কায়েস বলেছেন, "ইবনে যুবায়েরের বিভিন্ন ভাষাভাষীর একশো গোলাম ছিল। তিনি তাদের ভাষাতেই গোলামদের সাথে কথা বলতেন। আমি তাঁকে পার্থিব জগতের কাজে এমনভাবে মশগুল হতে দেখে ভাবতাম মনে হয় তিনি আর আখিরাতের কাজের সাথে জড়িত হবেন না। আর যখন তাঁকে আখেরাতের কাজে সম্পৃক্ত দেখতাম, মনে হতো পার্থিব কাজে আর নিজেকে জড়াবেন না।"

হিশাম বিন উরওয়া বলেছেনঃ আমার চাচা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের শিশুকালে সর্বপ্রথম "তলোয়ার" শব্দ উচ্চারণ করেছেন। এরপর তা মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তার পিতা ছেলের এ শব্দ শুনে বললেন, "তোমাকে তলোয়ার দিয়ে অনেক মধ্যস্ততা করতে হবে।"

আবু উবায়দা বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের আল-আসাদী ইবনে যুবায়েরের কাছে গিয়ে বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, ওমুক দিক দিয়ে আমি আপনার আত্মীয়।" ইবনে যুবায়ের বললেন, "হ্যাঁ, সঠিক বলেছো। তবে তুমি যদি চিন্তা করে দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে যে, সকল মানুষ একই মা আর বাবা থেকে নির্গত।" আল-আসাদী বললেন, "আমার অর্থকড়ি শেষ হয়ে গেছে।" তিনি বললেন, "আমি এর জিম্মাদার নই। তুমি বাড়ি ফিরে যাও।" আসাদী বললেন, "আমার উট ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত।" তিনি বললেন, "কোনো এক চারণ ভূমিতে তোমার উট ছাড়িয়ে দাও।" আসাদী বললেন, "আমি কিছু পাবার আশায় আপনার কাছে এসেছি, অভিমত জিজ্ঞেস করার জন্য নয়। অভিশাপ ক্ষুধার্ত সেই উটনীর প্রতি, যে আমাকে আপনার কাছে এনেছে।" তিনি বললেন, "তার বাহনের উপরও।"

মুসান্নাফ গ্রন্থে যুহরী থেকে আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে কখনোই দুশমনের কাটা মাথা পেশ করা হয়নি। আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর সামনে এক ব্যক্তির ছিন্ন মাথা পেশ করা হলে তিনি দারুণ অসন্তুষ্ট হোন। ইবনে যুবায়েরের দরবারে দুশমনের কাটা মাথা পেশ করা হয়েছে।

ইবনে যুবায়েরের যুগে মুখতার কাযযাব নামে ভন্ড নবীর আবির্ভাব হয়। সে নবুওয়াত দাবী আর খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ইবনে যুবায়ের ৬৭ হিজরীতে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন।

তার খিলাফতকালে উসাঈদ বিন যুহরি, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস, নুমান বিন বসীর, সুলাইমান বিন সরদ, জাবের বিন সমরা, যায়েদ বিন আরকাম, আল লাইছী, যায়েদ বিন খালিদ আল জাহনী, আবুল আসওয়াদ ওয়ায়েল প্রমুখ আলেমে দ্বীন ইন্তেকাল করেন।

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বিন হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়্যা বিন আব্দুশ শামস বিন আব্দে মান্নাফ বিন কুসসী বিন কেলাব আবুল ওয়ালীদ ২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

ইবনে যুবায়েরের খিলাফতকালে মারওয়ান আব্দুল মালিককে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। আর এজন্যেই ইবনে যুবায়ের জীবিত থাকাকালে আব্দুল মালিকের খিলাফত সঠিক ছিল না।

মিসর আর সিরিয়া নির্যাতনের মাধ্যমে প্রথম থেকেই তার অধীনে ছিল। এরপর ইরাক ইত্যাদি তার পদানত হয়।

৭৩ হিজরীতে ইবনে যুবায়েরের শাহাদাতের পর তার খিলাফত বিশুদ্ধ হয়। এ বছর হাজ্জাজ কাবা শরীফ বর্তমানে যে মডেলে আছে সেভাবে পুনর্নির্মাণ করে। হাজ্জাজের ইশারায় এক ব্যক্তি কর্তৃক বিষ মিশ্রিত বর্শার আঘাতে ইবনে উমর (রাঃ) গুরুতর আহত হোন আর এ কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭৪ হিজরীতে হাজ্জাজ মদীনা শরীফে গিয়ে মদীনাবাসী আর যে সকল আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় জীবিত ছিলেন তাদের উপর অমানবিক নির্যাতন করতে আরম্ভ করে। আনাস (রাঃ), জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ), সহল বিন সাদী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদের গলা আর হাতে মোহর এঁটে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের চরম অপমানিত করা হয়।

৭৫ হিজরীতে আব্দুল মালিক হজ্জ করেন আর হাজ্জাজ ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হোন।

৭৭ হিজরীতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি দুর্গ বিজিত হয় আর মিসরের ঐতিহাসিক জামে মসজিদ ভেঙে আব্দুল আযীয বিন মারওয়ান চারিদিকে সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করেন।

৮২ হিজরীতে সিনানা দুর্গ হস্তগত হয় আর আর্মেনিয়া ও সানহাযার যুদ্ধ হয়।

৮৩ হিজরীতে হাজ্জাজ একটি শহরের গোড়া পত্তন করে।

৮৪ হিজরীতে মাসীসা আর আওদীয়ায়ে মাগরিব হাতে আসে।

৮৫ হিজরীতে আব্দুল আযীয বিন আবু হাতিম বিন তাগমান আল বাহলী নগর প্রাচীর নির্মাণ করেন।

৮৬ হিজরীতে তাওলিক আর ইহজাম নামক দুটি দুর্গ হস্তগত হয়। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে এ দুটি দুর্গের অধিকাংশ মহিলা মারা যায়। এজন্য দুর্গদ্বয়কে প্লেগের সমাধি নামে অভিহিত করা হয়। এ বছরের শাওয়াল মাসে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ইন্তেকাল করেন।

আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল আজলী বলেন, “আব্দুল মালিকের মেধা পচনের অসুখ ছিল। ১৭ জন পুত্র সন্তান রেখে সে পরলোক গমন করে।”

ইবনে সাদ বলেনঃ আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান উম্মে দারদা সাহাবীর কাছে যাতায়াত করতো। একদিন উম্মে দারদা বললেন, “হে আমিরুল মুমিনীন, আমি শুনেছি আপনি ইবাদত করার পরও মাদ পান করেন।” সে বললো, “হ্যাঁ, আমি মদ পানের সাথে সাথে কাপালিকে পরিণত হয়েছি।”

নাফে বলেছেন, “আমি মদীনায় আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের চেয়ে অধিক কূটবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক, চালাক, ইবাদতকারী, আইনবিদ, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ ব্যক্তি আর দেখিনি।”

আবুয যানাদ বলেছেন, “মদীনার ফকীহগণ হলেন - সাঈদ বিন মুসায়্যাব, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান, উরওয়া বিন যুবায়ের আর ফাবিযা বিন ওযীব।”

ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, “সকলে ছেলের জন্ম দেয়। আর মারওয়ান দিয়েছেন পিতার জন্ম।”

উবাদা বিন লাবনী বলেছেনঃ এক ব্যক্তি ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কুরাইশদের মধ্যে বয়ঃবৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আপনার ইন্তেকালে পর আমরা মাসয়ালা মাসায়েল কাকে জিজ্ঞেস করবো ?” তিনি বললেন, “মারওয়ানের ছেলে ফকীহ, তাঁকে তোমরা জিজ্ঞেস করবে।”

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর গোলাম সুহায়েম বলেছেন, “তরুণ আব্দুল মালিক আবু হুরায়রার কাছে এলে তিনি বললেন, এ যুবক একদিন আরবের বাদশাহ হবেন।”

উবায়দা বিন রাব্বাহ আল গাসসানী বলেছেনঃ আব্দুল মালিক খলীফা হওয়ার পর উম্মে দারদা তাঁকে বললেন, “আমি তোমাকে দেখেই বুঝেছিলাম তুমি একদিন বাদশাহ হবে।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কিভাবে বুঝেছিলেন ?” তিনি বললেন, “তোমার চেয়ে বাগ্মী আর চিন্তাশীল আর দেখিনি।”

শাবী (রহঃ) বলেছেন, “যে আমার সাহচর্য লাভ করেছে, সে- ই আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কাছে লা জওয়াব হয়েছে। আর আমি আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের পান্ডিত্য ও প্রখর মেধার কাছে লা জওয়াব হয়েছি। কারণ আমি তার সামনে কোনো হাদীস পেশ করলে তিনি অবশ্যই সে হাদীসের ব্যাখ্যা করতেন। আর কোনো বিষয়ে কবিতা আবৃত্তি করলে একই বিষয়ে তিনি আরো অধিক কবিতা পাঠ করতেন।”

যাহাবী বলেছেন, “তিনি যাঁদের কাছে হাদীস শুনেছেন তারা হলেন - উসমান, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, উম্মে সালমা, বুরায়দা, ইবনে উমর আর মুআবিয়া (রাঃ) প্রমুখ। আর যারা তার থেকে বর্ণনা করেছেন তারা হলেন - উরওয়া, খালিদ বিন মিদাদ, রাজা বিন হায়া, যহুরী, ইউনুস বিন মায়সারা, রবীআ বিন ইয়াযিদ, ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ, জারীর বিন উসমান প্রমুখ।

বাকার বিন আব্দুল্লাহ মাযানী বলেছেনঃ ইউসুফ নামের এক ইহুদী মুসলমান হোন। কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তার মধ্যে প্রবল আগ্রহ সর্বদা বিদ্যমান থাকতো। একদিন তিনি আবদুল মালিকের

বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উচ্চ কণ্ঠে বললেন, "এ বাড়ির মালিকের কাছ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া প্রবল অত্যাচারের শিকার হবে।" এ কথা শুনে আমি বললাম, "কতদিন পর্যন্ত তা চলবে ?" তিনি বললেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত খুরাসান থেকে কালো পতাকাধারী না আসবে।"

ইউনুস আব্দুল মালিকের বন্ধু ছিলেন। একদিন তিনি আব্দুল মালিকের মাথায় হাত রেখে বললেন, "আমি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করবো না।"

কথিত আছে যে, ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া মক্কা শরীফে সৈন্য পাঠালে আবুল মালিক মন্তব্য করেছিলেন, "আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এ লোকটি তো পবিত্র নগরীতে সৈন্য পাঠিয়েছে।" ইউসুফ বললেন, "তোমার সেনারা ইয়াযিদ বাহিনীর চেয়ে নিষ্ঠুর হবে।"

ইয়াহইয়া গাসসানী বললেন, "মুসলিম বিন উকবা মদীনায় প্রবেশ করলে আমি মসজিদে নববীতে আব্দুল মালিকের সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "দুর্ভাগা, তুমি কি জানো না, তোম্রা এমন এক জাতির সঙ্গে লড়াই করতে এসেছো যারা ইসলামের প্রথম সন্তান, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। যদি দিনে তাদের কাছে যাও তবে তারা রোযাদার, রাতে গেলে দেখবে তাহাজ্জুদের নামাযে মশগুল। মনে রেখো, পৃথিবীর সবাই মিলে যদি তাদের হত্যা করতে চায়, আল্লাহ তাআলা তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" আব্দুল মালিক খিলাফতে তখতে আসীন হয়ে হাজ্জাজের নেতৃত্বে তাদের প্রতি সেনাবাহিনী পাঠায় আর ইবনে যুবায়েরকে হত্যা করা হয়।

আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, "যখন খিলাফত আব্দুল মালিকের হাতে গিয়ে পৌছে, ঠিক তখন কুরআন শরীফ তার কোলে ছিল। সে তা বন্ধ করে বললো - এটাই হলো তোমার শেষ সাক্ষাত।"

ইমাম মালিক বলেছেনঃ আমি ইয়াহইয়া বিন সাঈদের কাছে শুনেছি, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান যোহর আর আসরের মধ্যবর্তী সময় থেকে আসর পর্যন্ত আরো দুইজনকে নিয়ে মসজিদে নামায আদায় করেন। সাঈদ বিন মুসায়্যাবকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, "এরা তিনজন তো নামায পড়ছে, আমরাও যদি উক্ত সময়ে নামায পড়ি তবে কোনো ক্ষতি হবে না তো ?" তিনি বললেন, "বেশী বেশী নামায পড়া আর অধিক রোযা রাখার নাম ইবাদত নয়। দ্বীন নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাশীলতা এবং গুনাহ'র কাজ থেকে বেঁচে থাকার নাম ইবাদত।"

মুসআব বিন আব্দুল্লাহ বলেছেন, "ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম তার নাম আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান রাখা হয়েছে।"

ইয়াহইয়া বিন বাকীর বলেছেনঃ আমি ইমাম মালিক থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, "দিনারের উপর সর্বপ্রথম আব্দুল মালিক ছাপ দেয় আর কুরআনের আয়াত অঙ্কিত করে।"

মুসআব বলেছেনঃ দিনারের উপর আব্দুল মালিক একদিকে قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ খোদাই করে আর অপর দিকে لا اله الا الله নকশা করে। দিনারের চারদিকে চান্দীর একটি গোল বৃত্ত ছিল। এ বৃত্তের উপর ভাগে মুদ্রা প্রস্তুতকারী সরকারী কারখানা ও শহরের নাম এবং বহিরাংশে অর্থাৎ বৃত্তের চতুর্দিকে محمد الرسول الله ارسله بالهدى ودين الحق লিখা ছিল।

আসকারী কর্তৃক রচিত আওয়ায়েল গ্রন্থে রয়েছেঃ প্রথমে মুদ্রার হস্তাক্ষরে قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ , অপর দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম, আর তারিখ লিখা থাকতো। এ প্রথা মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানই চালু করেন। তবে তার সাম্রাজ্যে কোনো মুদ্রার প্রচলন ছিল না; বরং খ্রিস্টানদের মুদ্রাই তার রাজ্যে চলতো। খ্রিস্ট মুদ্রায় তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী লিখার কারণে একদিন রোম সম্রাট এ মর্মে চিঠি লিখলেন যে, আপনি মুদ্রায় হস্তাক্ষরে আপনার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম লিখার প্রথা বর্জন করুন, অন্যথায় দিনারে আমি এমন কিছু লিখবো যা দ্বারা আপনারা মর্ম পীড়নে ভুগবেন। কারণ আপনাদের কাজে আমরা কষ্ট পাচ্ছি। খালিক বিন ইয়াযিদ বিন মুআবিয়াকে আব্দুল মালিক পরামর্শের জন্য ডাকলো। সে সব শুনে বললো, আপনার সাম্রাজ্যে খ্রিস্ট মুদ্রা প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিন, নিজে মুদ্রার প্রবর্তন করুন আর মুদ্রায় হস্তাক্ষরের পরিবর্তে লিখাগুলো খোদাই করে দিন। তিনি এ পরামর্শ মোতাবেক ৭৫ হিজরীতে নিজস্ব দিনার তৈরি করেন।

আসকারী বলেছেনঃ খলীফাদের মধ্যে কৃপণতা করার জন্য আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নাম রাশহুল হুজারা আর মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার জন্য আবুল যবান নামে প্রসিদ্ধ। যে খলীফা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, যে খলীফার সামনে কথা বলা নিষেধ ছিল আর যে যুগে প্রচলিত কোনো বচন উত্থাপন করা যেতো না, সে হলো আব্দুল মালিক।

কালবী থেকে আসকারী বর্ণনা করেছেনঃ মারওয়ান বিন হাকাম নিজ সন্তান আব্দুল মালিকের পর আমর বিন সাঈদ বিন আসকে উত্তরাধিকার মনোনিত করেছিলেন। কিন্তু আব্দুল মালিক তাঁকে হত্যা করে। ইসলামের মধ্যে এটাই ছিল প্রথম ওজর।

ইবনে জারীর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে শহীদ করার পর ৭৫ হিজরীতে আব্দুল মালিক মদীনায় এক বক্তৃতায় বলেছে, "(হামদ ও সানার পর) আমি দুর্বল খলীফা উসমান নই, আমি শক্তিহীন খলীফা মুআবিয়া আর ক্ষীণ মনের খলীফা ইয়াযিদও নই। আমার পূর্ববর্তী খলীফাগণ এ সম্পদ ভোগ করতেন। খবরদার! এ ব্যাপারে আমার তলোয়ার খুব তীক্ষ্ণ। তোমাদের বর্শাগুলো আমার সাহায্যে উঁচিয়ে ধরো। আমরা মুহাজিরদের প্রচলিত রীতিনীতি সংরক্ষণ করবো, তবে এর উপর আমল না করলে আমি তোমাদের ধ্বংস করে দিবো। আমর বিন সাঈদের আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাসহ আরো অন্যান্য গুণাবলী থাকলেও প্রশাসন আর খিলাফত ভিন্ন বিষয়। তিনি সামান্য মাথাচাড়া দিলে তাকে শেষ করে দিবো। মনে রেখো, আমি তোমাদের সকল আবেদন রক্ষা করবো, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে আমি কিছুতেই তা মেনে নিবো না। সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এটাই, যে আমর বিন সাঈদের দলে গিয়ে ভিড়বে আর যে মাথাচাড়া দিবে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। আর এরপরে যদি কেউ আমাকে আল্লাহর' ভয় দেখায় তবে তার

গর্দানও উড়িয়ে দিবো।" এ বলে সে মিম্বর থেকে নামলো। (এ বর্ণনার প্রথম রাবী করীমী মুসতাহাম মিথ্যাবাদী)

আসকারী বলেছেন, "আব্দুল মালিক সর্বপ্রথম সরকারী অনেক নথিপত্র ফার্সী থেকে আরবী ভাষায় স্থানান্তর করে। সে সর্বপ্রথম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে।"

আমি (জালালুদ্দিন সুয়ূতি) বলছি, "আব্দুল মালিক দশটি বিষয়ের প্রবর্তক, এর মধ্যে পাঁচটি ভালো আর পাঁচটি মন্দ।"

ইবনে আবী শায়বা মুসান্নাফ গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন, "মারওয়ানের সন্তানদের মধ্য থেকে আব্দুল মালিক বা অন্য কেউ ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার আযানের প্রথা চালু করেছিলো।"

ইবনে জারীর থেকে আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেনঃ আব্দুল মালিক বিন মারওয়ার সর্বপ্রথম কাবা শরীফে রেশমী কাপড়ের গিলাফ চড়িয়ে দেয়। মুফতীগণকে রেশমী কাপড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে কাবা শরীফের জন্য রেশমী কাপড়ই সঠিক বলে অভিমত পেশ করেন।

ইউসুফ বিন মাজশু বলেছেন, "বিচার করার সময় আব্দুল মালিকের মাথার উপর তলোয়ারের দেওয়া হতো।"

আসমায়ী বলেছেনঃ এক ব্যক্তি আব্দুল মালিককে জিজ্ঞেস করলো, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি খুবই দ্রুত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন।" সে বললো, "কেন হবো না, বল। প্রতি জুমআয় নিজের মেধা যেভাবে জনতার কাছে বিলিয়ে দিচ্ছি।"

মুহাম্মাদ বিন হরব যিয়াদী বলেছেনঃ এক ব্যক্তি আব্দুল মালিককে জিজ্ঞেস করলো, "কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম ?" তিনি বললেন, "যিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, বিনয়ী আর সর্বাবস্থায় ইনসাফ করে।"

ইবনে আয়শা বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি শহর, নগর অথবা গ্রাম থেকে আব্দুল মালিকের কাছে আসলে সে তাদের চারটি বিষয়ে সাবধান করে দিতো। এক - মিথ্যা বলবে না, কারণ মিথ্যার কোনো মূল্য নেই; দুই - আমি যে প্রশ্ন করবো শুধু তারই উত্তর দিবে; তিন - আমার প্রশংসায় অহেতুক কল্পনার রং ছড়িয়ে দিবে না; চার - আমাকে আমার প্রজাবৃন্দের উপর উত্তেজিত করতে পারবে না।"

মাদায়েনী বলেছেন, "জীবনের অন্তিম মুহূর্ত আব্দুল মালিক তার ছেলেকে এ উপদেশ দেয় - সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে, মতভেদ থেকে অনেক দূরে থাকবে, যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করবে, পুণ্যে দৃষ্টান্ত হবে, যুদ্ধের পূর্বে মৃত্যুকে আহবান করা হয় না, আর পুণ্যের পূর্ণতা ও আলোচনা যুগ যুগ ধরে থেকে যায়, তিক্ততার মধ্যে মিষ্টি আর প্রভাবশালীতার মাঝে নমনীয় হয়ে যাও।"

ইবনে আবুল আলা আশ শায়বানী কবিতার মাধ্যমে আব্দুল মালিকের নসীহতগুলো তুলে ধরেছেন এভাবে - "অনেকগুলো তীর একত্রিত করে ভাঙা অসম্ভব, তবে একটি তীর যে কারো পক্ষে ভেঙে ফেলা সম্ভব। হে ওয়ালীদ, খিলাফতের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো। হাজ্জাজের প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখবে, তাকে সম্মান করবে,

কারণ সে- ই তোমাকে খিলাফত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। হে ওয়ালীদ, হাজ্জাজ তোমার বাহু আর তলোয়ার। তার ব্যাপারে কারো অভিযোগ গ্রহণ করবে না। সবসময় তার প্রয়োজন হবে। আমার মৃত্যুর পর নিজের জন্য বাইআত করে নিবে। যদি বাইআত গ্রহনে কেউ অস্বীকার করে তবে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।”

আব্দুল মালিক যখন মৃতপ্রায়, সে সময় ওয়ালীদ পিতাকে দেখার জন্য এলে তিনি তৎক্ষণাৎ এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন - “রোগীর শুশ্রুষাকারী আসছে। শুশ্রুষা করার জন্য নয়, বরং মরেছি কিনা তা দেখার জন্য।” এ কথা শুনে ওয়ালীদ কেঁদে উঠলে আব্দুল মালিক বললো, “মেয়েদের মত কেঁদে কি লাভ হবে। আমার মৃত্যুর পর নিজ পায়ে ভর করে দাঁড়াবে, বীরত্বকে কাজে লাগাবে, সিংহের পোশাক পড়বে, নিজের তলোয়ার কাঁধে রাখবে, যে অবাধ্য হবে তার মাথা ছিন্ন করে দেবে, আর যে নীরব থাকবে তাকে ছেড়ে দিবে।”

আব্দুল মালিকের মন্দ কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী জঘন্য কাজটি হলো হাজ্জাজকে মুসলমান ও সাহাবীদের শাসনকর্তা নিয়োগ করা। কারণ এ হতভাগ্য লোকটি অনেক আকাবেরে আসহাবে রাসূল আর তাবেঈকে শহীদ করে দিয়েছে, আর আনাসসহ প্রমুখ সাহাবীদের গলায় ও হাতে মোহর এঁটে দিয়ে নির্যাতনের চরম দৃষ্টান্ত রেখেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন না।

ইবনে আসাকির স্বরচিত ‘ইতিহাস’ গ্রন্থে ইবরাহীম বিন আদীর বরাত দিয়ে লিখেছেন, “উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের হত্যাকান্ড, জায়েশ বিন দালজার হিজাযে নিহত হওয়া, রোম সম্রাট কর্তৃক মুসলিম বিশ্বে উত্তেজনা ছড়ানোর অপকৌশল আর আমর বিন সাঈদের দামেশক গমন থেকে এ চারটি বিপদ একই রাতে হলেও আব্দুল মালিকের চেহারায় কোনো বিষাদের ছাপ পড়েনি।”

আসমায়ী বলেছেন, “শাবী, আব্দুল মালিক, হাজ্জাজ আর ইবনুল কারীয়া - এ চারজন হাসি- তামাশার সময়ও সাধারণত ভুল করতেন না।”

তৌরিয়াত গ্রন্থে সালাফী লিখেছেনঃ আব্দুল মালিক একবার বাইরে গেলে এক মহিলা এসে বললো, “হে আমিরুল মুমিনীন, আমার ভাই ছয়শো দিনার রেখে ইন্তেকাল করেছে। পরিবারের লোকেরা একটি দিনার দিয়ে আমাকে বলেছে, এটা তোমার মিরাস।” এ মাসয়ালাটি আব্দুল মালিকের বুঝে না আসায় শাবীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, “বিষয়টি যথার্থ। মৃত ব্যক্তির দুই মেয়ে দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চারশো দিনার পাবে। মা পাবে একশো, স্ত্রী পাবে পঁচাত্তর আর বারোজন ভাই পাবে চব্বিশটি দিনার, এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার ভাগে একটি দিনারই পড়বে।”

ইবনে আবী শায়বা মুসান্নাফ গ্রন্থে লিখেছেন যে, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বলেছেন, “আনন্দ উপভোগের জন্য বারবার বাঁদি, সন্তানের জন্য ফার্সী বাঁদি আর সেবার জন্য হলে রোমান দাসী কিনবে।”

ছালাবা বলেছেনঃ আব্দুল মালিক বলতো, “আমি রমযানে জন্মগ্রহণ করেছি, রমযানে মায়ের দুধ ছেড়েছি, রমযানে কুরআন মাজীদ শেষ করেছি, রমযানে বালেগ হয়েছি, রমযানে উত্তরাধিকার মনোনীত হয়েছি, রমযানে খিলাফত পেয়েছি আর রমযানেই মৃত্যুবরণ করবো।”

রমযান এলে সে খুব ভয় পেতো আর রমযান চলে গেলে সে নিশ্চিত হতো। কিন্তু সে শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করে।

তার শাসনামলে যেসব সাহাবী ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - ইবনে উমর, আসমা বিনতে আবু বকর, আবু সাঈদ বিন মাআলা, আবু সাঈদ খুদরী, রাফে বিন খুদায়েজ, সালমা বিন আবু আকওয়া, আরবাস বিন সারিয়া, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন জাফর বিন আবু তালিব, সায়িব বিন ইয়াযীদ, উমরের গোলাম আসলাম, আবু ইদরীস আল খাওলানী, শুরাইহ কাযী, আবান বিন উসমান বিন আফফান, আশা শায়ের, এবং অলংকার শাস্ত্রের নক্ষত্র আউয়ুব বিন কারিয়া, খালিদ বিন ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া, যাররা বিন জায়েশ, সিনান বিন সালামা বিন মুহব্বিক, সুয়াইদ বিন গাফলা, আবু ওয়ায়েল তারেক বিন শিহাব, মুহাম্মদ বিন হানাফীয়া, আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বিন হাদ, আবু উবায়দা বিন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আমর বিন হারীস, আমর বিন সালামা, জরমী (রহঃ)।

ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক

তার নাম ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক আবুল আব্বাস।

শাবী বলেছেন, "ওয়ালীদকে তার পিতামাতা খুবই আদর- যত্নে লালিত পালিত করার কারণে তিনি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হোন।"

রুহ বিন যানবাহ বলেছেন, "আমি একদিন আব্দুল মালিকের কাছে গিয়ে তাকে খুবই চিন্তিত দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলাম।" সে বললো, "কাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করবো এ চিন্তা আমাকে কাতর করে দিয়েছে।" আমি ওয়ালীদের নাম প্রস্তাব করলে সে বললো, "সে তো অশিক্ষিত।" আমাদের কথাগুলো শুনতে পেয়ে ওয়ালীদ বিজ্ঞ পন্ডিতদের কাছে সেদিন থেকে লাগাতার ছয় মাস শিক্ষা অর্জন করেও কোনো জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেনি। আব্দুল মালিক বলতো, "এ বেচারা (ওয়ালীদ) খিলাফতের দন্ড ধারণে অক্ষম।"

আবুয যানাদ বলেছেনঃ ওয়ালীদের আরবী ভাষায় অনেক ভুল- ভ্রান্তি দেখা যায়। সে একবার মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে মদীনাবাসীকে এভাবে সম্বোধন করছিলো - يا اهل المدينة

আবু ইকরামা যাবী বলেছেনঃ একবার সে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এভাবে তিলাওয়াত করলো - يا ليتها كانت القاضية সেদিন মিম্বারের পাশে উমর বিন আব্দুল আযীয আর সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের মতো মনীষীরা বসেছিলেন। অবশেষে সুলাইমান বললেন, "দারুণ পড়েছেন!"

ওয়ালীদ ছিল পরাক্রমশালী আর উৎপীড়ক। আবু নায়ায়েম হালীয়া গ্রন্থে ইবনে শওযবের বরাত দিয়ে লিখেছেনঃ উমর বিন আব্দুল আযীয বলেছেন, "ওয়ালীদ সিরিয়ায়, হাজ্জাজ ইরাকে, উসমান বিন জাবারাহ হিজাযে আর কুররা বিন শারীক মিসরে - আল্লাহর কসম, গোটা পৃথিবী অত্যাচারের কালো আবরণে ছেয়ে গেছে।"

ইবনে আবী হাতিম স্বরচিত তাফসীর গ্রন্থে ইবরাহীম যারআর বরাত দিয়ে লিখেছেনঃ ইবরাহীম বলেছেন, "ওয়ালীদ আমাকে বললেন - খলীফাদের কোনো হিসাব নিকাশ হবে কি ?" আমি বললান, আপনি, না দাউদ (আঃ) - কে বেশী মর্যাদাশীল ? আল্লাহ তাআলা দাউদ (আঃ) কে খিলাফত আর নবুওয়াত উভয়ই দান করেছিলেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে -

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً

"হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল- খুশীর অনুসরণ করো না। ....." (সূরাহ সাদ, ৩৮ : ২৬)

এরপরও ওয়ালীদ ভয় করেছে, জিহাদ করেছে। নিজ খিলাফতকালে অনেক জটিল ফতোয়া সংকলন করিয়েছে। এতিমদের খতনা করাতো আর শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করতো। প্রতিবন্ধীদের জন্য সেবক আর অন্ধদের জন্য পথপ্রদর্শক নিয়োগ করেছিলো। সে মসজিদে নববী পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করে। সে মুফতী আর ভিক্ষুকদের ভাতা দিতো।

ইবনে আবী আইলা বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা ওয়ালিদের প্রতি করুণা করুন। ওয়ালীদের শাসনামলে ভারতবর্ষ আর স্পেন হস্তগত হয়। তিনি দামেশকের মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আর বাইতুল মুকাদ্দাসের ভিক্ষুকদের চান্দীর পেয়ালা দান করেন।"

ওয়ালীদকে আব্দুল মালিক ৮৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে উত্তরাধিকার মনোনীত করে।

৮৭ হিজরীতে তিনি দামেশকের জামে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং মসজিদে নববী পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। এ বছর বীকন্দ বুখারা, সরওয়ানিয়া, মাতুমুরা, কামীম আর বাহিতুল ফুরসান প্রভৃতি শহর যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়। একই বছর উমর বিন আব্দুল আযীয (সে সময় তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন) হাজ্জ করেন আর কুরবানীর দিন ভুল করে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের ফলে দারুণ মর্মাহত হোন।

৮৮ হিজরীতে জরসুমা আর তাওয়ানা; ৮৯ হিজরীতে জারীরা, মুতারাকা আর মৌরাকা; ৯১ হিজরীতে নসফ, কাশ, শআরবান, মাদায়েন, বাহরে আযার বায়জানো; ৯২ হিজরীতে গোটা স্পেন, আরমাবিল শহর, কাতারবুন; ৯৩ হিজরীতে দেবল, দাবাজা, বায়বা, খারেজম, সমরকন্দ, সাদ; ৯৪ হিজরীতে কাবুল, ফারগানা, শাশ, সান্দারাহ; ৯৫ হিজরীতে মুকান, মদীনাতুল বাবা; ৯৬ হিজরীতে তাউ হস্তগত হয়, এ বছর জমাদিউল আখির মাসের মাঝামাঝিতে ওয়ালীদ ইন্তেকাল করেন।

যাহাবী বলেছেন, "ওয়ালীদের যুগে জিহাদ অব্যাহত ছিল আর উমর ফারুকের যুগের মতো আইনশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়।"

উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেছেন, "কবরে নামানোর সময় ওয়ালিদকে কাফনের মধ্য থেকে মাটিতে পা মারতে দেখেছি।"

ওয়ালীদ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে লূত সম্প্রদায়ের উল্লেখ না করলে অন্যায় করলে শাস্তি পেতে হয় তা আমার খেয়াল থাকতো না।"

ওয়ালীদের শাসনামলে যেসব প্রসিদ্ধ ওলামা ইন্তেকাল করেছেন তারা হলেন - উতবা বিন আব্দুস সালামা, মুকাদ্দাস বিন মাআদি করব, আব্দ বিন বশরুল মাযনী, আবদুল্লাহ বিন আবী আওনী আবুল আলীয়া, জাবের বিন যায়েদ, আনাস বিন মালিক, সহল বিন সাদ, সায়েব বিন ইয়াযিদ, সায়ের ইবনে খালাত, খাবীব বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, বিলাল বিন আবী দারদা, সাইদ বিন মুসায়্যাব, আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান, আবু

বকর বিন আব্দুর রহমান, সাঈদ বিন যুবায়ের - যাকে হাজ্জাজ শহীদ করেছে, ইবরাহীম নাখয়ী, মুতাররফ, ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ, কবি উজাজ প্রমুখ।

সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক

সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক আবু আইয়ুবকে বনু উমাইয়্যাদের মধ্যে সর্বোত্তম বাদশাহ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তার পিতা ওয়ালিদের পর তাঁকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। তিনি ৯৬ হিজরীর জমাদিউল আখির মাসে ভাইয়ের পর মসনদে আরোহণ করেন।

তিনি পিতা আব্দুল মালিক আর আব্দুর রহমান বিন হুরায়রাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, এবং তার ছেলে আব্দুল ওয়াহিদ আর যুহরী হাদীস বর্ণনা করেন।

তিনি সুমিষ্টভাষী, বাগ্মী, ন্যায়পরায়ণ আর জিহাদের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি ৬০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক পুণ্যময় কাজ করেছিলেন। উমর বিন আব্দুল আযীযের মতো মহান নেতা ছিলেন তার মন্ত্রী, যিনি সর্বদা তাঁকে সৎ উপদেশ দিতেন আর কল্যাণকর কাজের দিকে আহবান করতেন। তিনি হাজ্জাজ কর্তৃক প্রশাসনের নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাকে একসঙ্গে চাকরিচ্যুত করেন আর ইরাকের জেলখানায় আটক সকলকে মুক্তি দেন। বনু উমাইয়্যার খলীফাগণ সবসময় শেষ ওয়াক্তে (বিলম্বে) নামায আদায় করতেন, উমর বিন আব্দুল আযীযের পরামর্শে তিনি আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়তে শুরু করেন।

ইবনে সিরীন (রহঃ) বলেছেন, “পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা সুলায়মানের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। তিনি তার খিলাফতকালে দুটি চমৎকার কাজ করেছেন - এক, আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ার প্রবর্তন এবং দুই, উমর বিন আব্দুল আযীযকে খলীফা মনোনীত করে যাওয়া।

সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক নাচ- গান নিষিদ্ধ করেন। তার খোরাক ছিল বেশী। কোনো এক ভোজসভায় সত্তরটি আনার, ছয় মাসের একটি ছাগল, ছয়টি মোরগ আর চার কেজি কিশমিশ একাই খেয়ে ফেলেন।

ইয়াহইয়া গাসসানী বলেছেনঃ একদিন তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের তারুণ্যদীপ্ত অবয়ব দেখে বললেন, “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী ছিলেন, আবু বকর (রাঃ) সিদ্দীক (সত্যবাদী) ছিলেন, উমর (রাঃ) ফারুক (পৃথককারী) ছিলেন, উসমান (রাঃ) লজ্জাশীল, মুয়াবিয়া (রাঃ) বীর, ইয়াযিদ ধৈর্যশীল, আব্দুল মালিক রাজনীতিবিদ, ওয়ালীদ অত্যাচারী আর আমি নওজোয়ান বাদশাহ।” তার এ বক্তব্যের এক মাসের মধ্যেই ৯৯ হিজরীর সফর মাসের দশ তারিখ জুমআর দিন তিনি ইন্তেকাল করেন।

তার যুগে যুরযান, হাদীদ দুর্গ, সরদা, শাকা, তবরিসতান আর সুফালিয়া শহর বিজিত হয়।

আর যে সব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - কায়েস বিন আবু হাযিম, মাহমুদ বিন লাবীদ, হাসান বিন হোসাইন বিন আলী, ইবনে আব্বাসের মুক্তদাস কারীব, আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ, নাখআ প্রমুখ।

আব্দুর রহমান বিন হাসসান কিনানী বলেছেনঃ সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক যুদ্ধের ময়দানে ওয়াবেক নামক জনপদে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি রাজা বিন হায়াকে জিজ্ঞেস করেন, "আমার পর খিলাফতের তখতে কে আসীন হবেন ? আমি কি আমার ছেলেকে উত্তরাধিকার মনোনীত করবো ?" রাজা বললেন, "আপনার ছেলে এখানে নেই।" সুলায়মান বললেন, "অন্য ছেলেকে করতে পারি ?" রাজা বললেন, "তিনি বয়সে ছোট।" সুলায়মান পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "তবে আপনার মতে সর্বোত্তম কে ?" রাজা বললেন, "উমর বিন আব্দুল আযীযের চেয়ে সর্বোত্তম আর কেউ নেই। আপনি তাকেই পরবর্তী খলীফা মনোনীত করতে পারেন।" সুলায়মান বললেন, "আমার ভাই তো উমর বিন আব্দুল আযীযের খিলাফত মেনে নেবে না বলেই আমার ধারণা।" রাজা বললেন, "এর পদ্ধতি হলো, আপনি মোহর অঙ্কিত ওসীয়তনামা লিখে দিন যে, উমর বিন আব্দুল আযীযের পর ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক উত্তরাধিকার মনোনীত হবেন। এরপর দেশবাসীকে ডেকে বলুন - এ ওসীয়তনামায় যার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার নামে বাইআত করুন।"

সুলায়মান এ অভিমতকে পছন্দ করে কাগজ, কলম ও কালি চেয়ে এক ওসীয়তনামা প্রস্তুত করে রাজাকে তা দিয়ে বললেন, "এ ওসীয়ত নামায় যার নাম উল্লেখ রয়েছে তার ব্যাপারে এক্ষুণি বাইরে গিয়ে লোকদের কাছে বাইআত গ্রহণ করুন।" রাজা বাইরে এসে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমিরুল মুমিনীনের নির্দেশে আমি এর মধ্যে উল্লেখিত ব্যক্তির নামে আপনাদের কাছ থেকে বাইআত নিচ্ছি।" লোকেরা বললো, "এর মধ্যে কার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে ?" রাজা বললেন, "এতে মোহর লাগানো রয়েছে। খলীফার মৃত্যুর পর তার নাম জানা যাবে।" লোকেরা বললো, "আমরা এভাবে বাইআত করবো না।" রাজা বিষয়টি খলীফার কানে দিলে খলীফা বললেন, "জল্লাদ আর পুলিশদের সাথে নিয়ে জনতাকে একত্রিত করে বাইআত নিন। যারা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবেন।" অবশেষে এভাবেই বাইয়াতের কাজ সম্পন্ন হয়।

রাজা বলেন, বাইআত গ্রহণের পর ফেরার পথে হঠাৎ হিশামের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন, "রাজা, আমার ব্যাপারে আমিরুল মুমিনীনের সিদ্ধান্ত কি ? যদি বঞ্চিত হই তবে নিজের জন্য ব্যবস্থা করবো।" আমি বললাম, "আমিরুল মুমিনীন বিষয়টি গোপন রেখেছেন, আমি কিভাবে বলবো!" এরপর উমর বিন আব্দুল আযীযের সাথে দেখা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "রাজা, সুলায়মানের ক্ষেত্রে সংশয় রয়েছে। আমার মন বলছে, তিনি যেন আমাকে খলীফা মনোনীত না করেন। আমার মধ্যে খিলাফতের দক্ষতা ও যোগ্যতা নেই। তাই যদি আপনি এ ব্যাপারে জেনে থাকেন তাহলে বলুন, আমি যে কোন পদ্ধতিতে চেষ্টার মাধ্যমে এ আপদ মাথা থেকে নামিয়ে দিবো।" আমি হিশামের মতো তাকেও একই জবাব দিলাম।

সুলায়মানের ইন্তেকালের পর ওসীয়তনামায় উমর বিন আব্দুল আযীযের নাম দেখে আব্দুল মালিকের সন্তানদের চেহারা বিবর্ণ ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু যখন তারা পরবর্তী খলিফা হিসেবে ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকে নাম শুনলেন, তখন তারা আশ্বস্ত হোন আর উময় বিন আব্দুল আযীযের কাছে এসে খিলাফতের দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করেন; আর উমর বিন আব্দুল আযীয কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেখানেই বসে পড়লেন। সে মুহূর্তে দাঁড়ানোর মতো কোনো শক্তি তার ছিল না। অবশেষে লোকের তার বাহু ধরে মিম্বরে উঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানেও অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। রাজা বললেন, "কেন আপনারা দাঁড়িয়ে আমিরুল

মুমিনীনকে বাইআত দিচ্ছেন না ?" এরপর তারা বাইআত করলেন আর উমর বিন আব্দুল আযীযের হাত ধরে রাজা লোকদের প্রতি বাড়িয়ে দিলেন।

এরপর তিনি দাঁড়িয়ে হামদ ও সানার পর বললেন, "আমি এ বিষয়ের মিমাংসাকারী নই, বরং বহনকারী। আমি কোনো বিষয়ের প্রবর্তক নই, বরং পূর্ববর্তীদের অনুগামী। অন্যান্য জনপদের লোকেরাও যদি আপনাদের মতো আমার আনুগত্য মেনে নেয়, তবেই আমি আমি আপনাদের খলীফা হবো, নতুবা নয়।"

এ বলে তিনি মিম্বর থেকে নামলে সামরিক আস্তাবল থেকে চমৎকার একটি ঘোড়া নিয়ে আসা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি ?" লোকেরা বললো, "এটা খলীফার বাহন, রাজকীয় ঘোড়া।" তিনি বললেন, "এটা আমার প্রয়োজন নেই। আমার ঘোড়াই যথেষ্ট।" অবশেষে তার নিজস্ব ঘোড়া নিয়ে আসা হলো আর এতে চড়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। এরপর তিনি কালির দোয়াত নিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল শাসনকর্তার কাছে নিজ হাতে একটি ফরমান লিখলেন। রাজা বলেছেন, "আমার মনে আছে, তিনি কোথাও নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা লিখেননি। তিনি যখন ফরমান লিখছিলেন তখন আমি দেখলাম, তার কলমের অগ্রভাগ খিলাফলের শাসনকার্য পরিচালনার দক্ষতা ও বিজ্ঞাত প্রকাশ পাচ্ছে।"

বর্ণিত রয়েছেঃ একবার মারওয়ান বিন আব্দুল মালিক আর সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের মধ্যে খিলাফত নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সুলায়মান তাঁকে গালি দিলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু উমর বিন আব্দুল আযীয তার মুখে হাত রেখে বললেন, "তিনি ভালো মানুষ, খলীফা, আপনার বড় ভাই, আপনি চুপ করুন।" মারওয়ান চুপ করলেন, তবে উমর বিন আব্দুল আযীযকে বললেন, "আপনি আমাকে হত্যা করে ফেললেন, আমার শরীরে আগুন ধরে গেছে।" সে রাতেই মারওয়ান ইন্তেকাল করেন।

যিয়াদ বিন উসমান থেকে ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেনঃ সুলায়মানের ছেলে আইয়ুব মারা গেলে আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, "আমিরুল মুমিনীন, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিপদ আপদের সময় ধৈর্যধারণ করবে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"

উমর বিন আব্দুল আযীয (রহিমাহুল্লাহ)

উমর বিন আব্দুল আযীয বিন মারওয়ান নেককার আর খুলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম খলীফা।

সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, "আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক, উসমান গনী, আলী মুর্তজা আর উমর বিন আব্দুল আযীয - এরা পাঁচজন খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত।" এ বর্ণনাটি আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত।

তিনি ৬১ হিজরী অথবা ৬৫ হিজরীতে মিসরের প্রখ্যাত হুলওয়ানে মুসাফাত নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন, মায়ের নাম উম্মে আসেম বিনতে আসেম বিন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)। পঞ্চান্ন বছর বয়সে ঘোড়ার পদাঘাতে তার মুখে একটি ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সে সময় তার পিতা তার রক্তাক্ত চেহারা মুছে দিতে দিতে বলেন, "ক্ষতচিহ্নবিশিষ্ট বনূ উমাইয়্যাগণ ভাগ্যবান।" (ইবনে আসাকির)

উমর বিন ক্ষাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, "আমার বংশে এমন একজন লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যার চেহারায় ক্ষতচিহ্ন থাকবে। তার শাসনে পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে।" (তিরমিযী)

পরবর্তীতে তার কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, "হায়! আমি যদি আমার সেই বংশধরের যুগ পেতাম, যিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন।" (ইবনে সাদ)

ইবনে উমর বলেছেনঃ আমরা পরস্পরে এ আলোচনা করতাম যে, উমর বিন খাত্তাবের বংশ থেকে তার মতো ন্যায়পরায়ণ খলীফা আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কোনো দিন কিয়ামত হবে না।

বিলাল বিন আব্দুল্লাহ বিন উমরের চেহারায় ক্ষতচিহ্ন থাকায় লোকেরা মনে করতো উমর বিন খাত্তাবের উক্তিতে উল্লিখিত এই সেই ব্যক্তি। কিন্তু এরই মধ্যে আল্লাহ তাআলা উমর বিন আব্দুল আযীযকে প্রেরণ করেন।

উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) যাঁদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন - তার পিতা আব্দুল আযীয, আনাস, আব্দুল্লাহ বিন জাফর বিন আবু তালিব, ইবনে কারিয, ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ বিন সালাম, আমের বিন সাদ, সাঈদ বিন মুসায়্যেব, উরওয়া বিন যুবায়ের, আবু বকর বিন আব্দুর রহমান, রাবীআ বিন সমরা প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। আর তার থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেন তারা হলেন - যুহরী, মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারী, মাসলামা বিন আব্দুল মালিক, রাজা বিন হায়া প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

তিনি কৈশোরে কুরআন শরীফ হিফয করার পর তার পিতা জ্ঞান অর্জনের জন্য মদীনার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহর কাছে পাঠান। ছাত্রজীবনে পিতার মৃত্যু হওয়ায় আব্দুল মালিক তাঁকে দামেশকে ডেকে নেন আর নিজ কন্যা ফাতেমার সঙ্গে বিয়ে দেন। তিনি খলীফা মনোনীত হওয়ার আগে থেকেই খুবই

ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তবে তার পরিচ্ছন্ন পোশাক আর রুচিসম্মত আহার্য গ্রহণের জন্য লোকেরা বিষয়টিকে অতিশয়োক্তি বলে অভিহিত করতো।

ওয়ালীদ তার শাসনামলে উমর বিন আব্দুল আযীযকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ৮৬ হিজরী থেকে ৯৩ হিজরী পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনার পর তাঁকে অপসারণ করা হলে তিনি সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ওয়ালীদ নিজের ভাই সুলায়মানকে উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তার স্থানে নিজ পুত্রকে উত্তরাধিকার মনোনীত করতে চাইলে আরবের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক খলীফার অভিমতকে সমর্থন করলেও উমর বিন আব্দুল আযীয বিরোধিতা করে বলেছিলেন, "সুলায়মানের বাইআত আমার শিরোধার্য আর আমি এ বিষয়ে অটল।" এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওয়ালীদ তাঁকে তিন বছত বন্দী করে রাখেন। অবশেষে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। সুলায়মান তার এ বদান্যতার কথা স্মরণ রেখেছিলেন আর সুলায়মান তার পর উমর বিন আব্দুল আযীযকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।

আনাস (রাঃ) থেকে যায়েদ বিন আসলাম বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের মতো উমর বিন আব্দুল আযিয ছাড়া কারো পিছনে পড়িনি। সে সময় তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন আর মদীনা শরীফে নামায পড়াতেন। যায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, তিনি রুকু আর সেজদাগুলো দীর্ঘ করতেন, এবং দাঁড়ানো ও বসানোগুলো সংক্ষিপ্ত করতেন। (বাইহাকী)

এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসাইন বলেছেন, "উমর বিন আব্দুল আযীয উমাইয়্যা বংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা। তিনি কিয়ামতের দিন ঐক্যবদ্ধ একটি জাতির মহান নেতা হিসেবে উত্থিত হবেন।"

মাইমুন বিন মিহরান বলেছেন, "উমর বিন আব্দুল আযীযের অনেক সহচর ছিলেন, যারা শরীয়ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী।"

আবু নঈম সহীহ সনদে রিবার বিন উবায়দাহ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ একদিন উমর বিন আব্দুল আযীয নামায পড়ার জন্য যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এক অপরিচিত বৃদ্ধ মানুষ তার হাত ধরলেন আর পাশাপাশি চলতে শুরু করলেন। নামায শেষে কোনো প্রশ্নকারী বৃদ্ধের পরিচয় জানোতে চাইলে উমর বিন আব্দুল আযীয বললেন, "তুমি তাঁকে দেখেছো ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তুমি পুণ্যবান ব্যক্তি। তিনি হলেন খিযির (আঃ)। তিনি আমাকে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার খলীফা হওয়ার সংবাদ এবং সুবিচার, সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপদেশ দিতে এসেছিলেন।"

আবু হাশিম বলেছেনঃ এক ব্যক্তি উমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে তার স্বপ্নের বিবরণ এভাবে পেশ করেন যে - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন, তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডান দিকে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আর বাম দিকে উমর ফারুক (রাঃ)। সামনে দুই বিচারপ্রার্থী। এমন সময় রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে (উমর বিন আব্দুল আযীয) ইশারা করে বললেন, "তুমি খলীফা হলে এদের (আবু বকর এবং উমর) পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে।" এ কথা শুনে উমর বিন আব্দুল আযীয বর্ণনাকারীকে কসম করতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ঠিক এমনটাই দেখেছো ?" বর্ণনাকারী কসম খেলে উমর বিন আব্দুল আযীয কেঁদে ফেললেন।

৯৯ হিজরীর সফর মাসে উমর বিন আব্দুল আযীযের ব্যাপারে লোকদের থেকে সুলায়মান বাইআত নেন। তার খিলাফতের সময়সীমা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর সমরসীমার সমান দুই বছর পাঁচ মাস ছিল। এ সময়ের মধ্যে তিনি অত্যাচার ও অবিচারের অবসাদ ঘটিয়ে ইনসাফের রাজ্য কায়েম করেছিলেন।

হাকিম বিন উমর বলেছেনঃ একদা খলীফাতুল মুসলিমীন উমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে (তার নিজস্ব- অনুবাদক) আস্তাবলের প্রহরী এসে ঘোড়ার পরিচর্যার খরচাদি চাইলে তিনি বললেন, "এসব ঘোড়া সিরিয়ায় নিয়ে বিক্রি করে দাও আর বিক্রির প্রাপ্ত অর্থ বাইতুল মালে জমা করো। আমার জন্য সাদা খচ্চরই যথেষ্ট।"

উমর বিন যর বলেছেনঃ সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের জানাযা থেকে ফিরে আসার পর উমর বিন আব্দুল আযীযের গোলাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "জনাব, আজ আপনি এ মর্মাহত কেন ?" উমর বিন আব্দুল আযীয বললেন, "পৃথিবীর মধ্যে আজ আমি সর্বাপেক্ষা মর্মাহত ও ধ্যানমগ্ন। আমার মন চাইছে ক্ষমতা ধারণের আগে ক্ষমতার দাবীদার বের হলে ক্ষমতা তাঁকে দিয়ে দিতাম।"

উরওয়া বিন মুহাজির কর্তৃক বর্ণিতঃ উমর বিন আব্দুল আযীয খলীফা মনোনীত হওয়ার পর দাঁড়িয়ে হামদ ও সানার বললেন, "আমি বিচারক নই, বিচারকের রায় পঠনকারী। আমি অনুসরণীয় নই, অনুসরণকারী। আমি আপনাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই; বরং আমার বোঝা অনেক বেশী। যে অত্যাচারী নেতা থেকে দূরে সরে যায়, সে অত্যাচারী নয়। সৃষ্টিকর্তার নাফরমানির মধ্যে মানুষের আনুগত্য নেই।"

যুহরী কর্তৃক বর্ণিত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর সদকা আদায়ের সর্বজন স্বীকৃত নীতি মোতাবেক উমর বিন আব্দুল আযীয সালেম বিন আব্দুল্লাহর কাছে চিঠি লিখলে তিনি জবাবে রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করার পর চিঠির শেষাংশে লিখেন, "আপনি যদি লোকদের সাথে উমর বিন খাত্তাবের মতো আচরণ করতে পারেন, তবে আপনার মর্যাদা তার চেয়েও বেশী হবে। কারণ এ যুগের লোকেরা সাহাবী নয়।"

হাম্মাদ (রাঃ) বলেনঃ উমর বিন আব্দুল আযীয খলীফা হওয়ার পর কেঁদে কেঁদে আমাকে বললেন, "হাম্মাদ, আমার প্রচন্ড ভয় লাগছে।" আমি বললাম, "আপনি দিনার- দিরহাম কতটুকু ভালোবাসেন ?" তিনি বললেন, "মোটেও না।" আমি বললাম, "তাহলে আপনার ভয় কিসের ? আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন।"

মুগীরা কর্তৃক বর্ণিতঃ তিনি খলীফা হয়ে তার ভাইদের সমবেত করে বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিদকের বাগান ছিল, এর আয় দিয়ে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনূ হাশিমের শিশুদের লালনপালন করতেন আর বিধবাদের বিয়ে দিতেন। ফাতেমা (রাঃ) এ বাগান নিতে চাইলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে বাগানটি আবু বকর সিদ্দীক, উমর

ফারুক আর মারওয়ানের হাত বদল হয়ে আজ আমার হস্তগত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বস্তু নিজের মেয়েকে দেননি, তা আমার জন্য কিভাবে হালাল হতে পারে! তাই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আয় যেভাবে ব্যয় করেছেন, আমিও তাই করব ইন শা আল্লাহ।

লাবীস বলেছেনঃ উমর বিন আব্দুল আযীয খলীফা হওয়ার পর নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে রাষ্ট্রের হিসাব নেন আর এতে করে রাষ্ট্রের যে সম্পদ উদ্ধার হয় তা তিনি অত্যাচারের মাল হিসেবে সেগুলো বাজেয়াপ্ত করেন।

আসমা ইবনে উবায়েদ বলেছেনঃ একদিন উকাশা বিন সাঈদ বিন আস তার কাছে এসে এ অভিযোগ করেন যে, "আমিরুল মুমিনীন, আপনার পূর্ববর্তী খলীফাগণ আমাকে উপঢৌকন দিতেন, যা আপনি আজ বন্ধ করে দিয়েছেন, ফলে আমি অর্থ সংকটে পড়েছি। আমার কাছে রাষ্ট্র কর্তৃক নিষ্কর জমিদারী রয়েছে। আপনি হুকুম দিলে আমি নিজ পরিবারের জন্য এখান থেকে কিছু নিবো।" তিনি বললেন, "আমার মতে, নিজের কষ্টার্জিত সম্পদই সবচেয়ে উত্তম।" এরপর তিনি আবার বললেন, "তুমি মৃত্যুকে বেশী করে স্মরণ করো, যদি তুমি সংকটে থাকো, তাহলে প্রাচুর্যতা অনুভব করবে। আর যদি আভিজাত্যের মোড়কে আবদ্ধ থাকো, তবে দরিদ্রতার কথা মনে পড়বে।"

ফারাত বিন সায়েব বলেছেনঃ উমর বিন আব্দুল আযীযের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিককে তার পিতা অনেক মূল্যবান অলংকারাদি দিয়েছিলেন। একদিন তিনি স্ত্রীকে বললেন, "তোমার অলংকারগুলো বাইতুল মালে জমা দাও, নতুবা আমাকে পছন্দ না হলে তোমাকে পৃথক করে দিবো। কারণ আমি, তুমি আর তোমার অলংকারাদি এক ঘরে থাকাটা আমি মোটেও সহ্য করতে পারছি না।" ফাতেমা বললন, "আমি আপনাকেই প্রাধান্য দিবো। আপনি আমার অলংকারগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে দিন।" তিনি সেটাই করলেন। তার ইন্তেকালের পর ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক খলীফা হলে তিনি তার অলংকারগুলো ফেরত দিতে চাইলে ফাতেমা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "স্বামীর মহত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ তার জীবদ্দশায় যে জিনিস আমি দিয়েছি, তার ইন্তেকালের পর তা ফেরত নেবো না।"

কথিত আছে, এক প্রাদেশিক শাসনকর্তা খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে এ মর্মে চিঠি লিখলো যে, "আমাদের শহরের রাস্তা-ঘাটগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে। আমিরুল মুমিনীনের নির্দেশ হলে কিছু অর্থ খরচ করে সেগুলো পুনর্নির্মাণ করবো।" জবাবে তিনি লিখলেন, "আমার পত্র হস্তগত হওয়ার সাথে সাথে তোমার শহরের দুর্গগুলোতে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করো, আর শহরের রাস্তাগুলো অত্যাচার মুক্ত করো, এটাই হবে সেগুলোর মেরামত।"

ইবরাহীম সকুফী বলেছেন যে, তিনি বলেছেন, "যে মুহূর্তে আমি জেনেছি মিথ্যা বলা নিন্দনীয় তখন থেকে আর কখনো মিথ্যা বলিনি।"

কায়েস বিন জাবের বলেছেন, "বনূ উমাইয়্যার মধ্যে উমর বিন আব্দুল আযীযের দৃষ্টান্ত হলো ফিরাউনের বংশের মধ্যে একজন মুমিনের মত।"

মাইমুন বিন মিহরান বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা যেমন এক নবীর জন্য অন্য নবীর শপথ নিয়েছেন, অনুরূপ উমর বিন আব্দুল আযীযের জন্য তিনি লোকদের থেকে শপথ নিয়েছেন।”

ওহাব বিন মানবাহ বলেন, “এ উম্মতের হিদায়াতপ্রাপ্ত হলেন উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)।”

মুহাম্মদ বিন ফুযালা বলেছেন, “একদিন উমর বিন আব্দুল আযীযের ছেলে আব্দুল্লাহ মরুভূমির মধ্যে এক সন্যাসীর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে সন্যাসী তাঁকে দেখে কাছে এলেন। অথচ এ সন্ন্যাসী এর আগে কারো কাছে যায়নি। সন্ন্যাসী বললেন, “আপনি কি জানেন, আমি কেন আপনার কাছে এসেছি ?” আব্দুল্লাহ বললেন, “এ ব্যাপারে আমি জানি না।” তিনি বললেন, “আপনি এক ন্যায়পরায়ণ নেতার ছেলে হওয়ার কারণে আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি, যার বিবরণ আমি পূর্ববর্তী কিতাবে পড়েছি।”

হাসান কাযাব বলেছেনঃ তার খিলাফতকালে বাঘ ও ছাগল এক সাথে চরতে দেখে বললাম, “সুবহানাল্লাহ! বাঘ- বকরী একত্রে থেকেও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না!” এ কথা শুনে রাখাল বললো, “মাথা বিশুদ্ধ হলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না।”

মালিক বিন দিনার বলেছেনঃ তিনি খলীফা হওয়ার পর এক রাখাল বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, “এমন কোন ব্যক্তি খলীফা মনোনীত হয়েছেন যে, বাঘ আমার ছাগলের ক্ষতি করেনা ?”

মূসা বিন আয়েন বলেছেন, “তার শাসনামলে আমি কারমানের ছাগল চরাতাম। সে সময় বাঘ ও বকরী একত্রে থাকতো। কিন্তু বাঘ বকরীর উপর আক্রমণ করতো না। একদিন বাঘকে বকরীর উপর হামলা করতে দেখে বললাম - মনে হয় আজ সেই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিটি পরপারে যাত্রা করেছেন। বস্তুত অনুসন্ধানে জানা গেলো, তিনি সে দিনই ইন্তেকাল করেছেন।”

ওলীদ বিন মুসলিম বলেছেনঃ আমি জানোতাম স্বপ্নে খুরাসানের এক লোককে এক ব্যক্তি বললো, “বনূ উমাইয়্যার মধ্যে ক্ষতচিহ্নবিশিষ্ট একজন খলীফার আবির্ভাব হলে তুমি গিয়ে তাঁকে বাইআত দিবে, কারণ তিনি হলেন নিষ্ঠাবান নেতা।” লোকটি বনূ উমাইয়্যার প্রতিটি খলীফার বিবরণ সংগ্রহ করতো। অবশেষে উমর বিন আব্দুল আযীয খিলাফতের তখত অলংকৃত করলে লোকটি পুনরায় পরপর তিন তিদ একই স্বপ্ন দেখায় খুরাসান থেকে এসে উমর বিন আব্দুল আযীযকে বাইআত দেন।

হাবীব বিন হিন্দাল আসলামী বলেছেনঃ সাঈদ বিন মুসায়্যেব আমাকে বললেন, “আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক আর উমর বিন আব্দুল আযীয - এ তিনজন হলেন খলীফা।” আমি বললাম, “আমি আবু বকর আর উমরকে চিনি, কিন্তু উমর বিন আব্দুল আযীয আবার কে ?” তিনি বললেন, “যদি তার শাসনামলে তুমি জীবিত থাকো, তাহলে জানোতে পারবে।” গ্রন্থকার বলেন, সাঈদ বিন মুসায়্যেব তার খিলাফতের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

ইবনে আউফ বলেছেনঃ ইবনে সিরীনকে মদ্যপ অবস্থায় কসম করা সংক্রান্ত মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, “ইমাম মাহদী অর্থাৎ উমর বিন আব্দুল আযীয মদ্যপ অবস্থায় কসম করতে নিষেধ করেছেন।”

হাসান বলেছেন, "উমর বিন আব্দুল আযীয হলেন হিদায়াতপ্রাপ্ত, নতুবা ঈসা বিন মারইয়াম (আঃ) ছাড়া কোনো হিদায়াতপ্রাপ্ত নেই।" (টীকাঃ ঈসা বিন মারইয়াম দুনিয়াতে ফিরে এসে যার ইমামতিতে সালাত আদায় করবেন, তিনি হলেন হাদিসে বর্ণিত "আল- মাহদি", হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম – এটা হচ্ছে উপাধি, আর নাম হল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ)

মালিক বিন দিনার বলেছেন, "লোকেরা মালিককে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বলে থাকে। আসলে উমর বিন আব্দুল আযীয হলেন ধর্মনিষ্ঠ সাধক ব্যক্তি। কারণ দুনিয়ার ঐশ্বর্য পেয়েও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

ইউনুস বিন আবু শাবীব বলেন, "তিনি সুস্বাস্থের অধিকারী ছিলেন। খিলাফত লাভের পর তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়।"

উমর বিন আব্দুল আযীযের পুত্র বলেছেনঃ আবু জাফর মানসুর আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনার পিতা খলীফা হওয়ার সময় আপনার আয় কত ছিল ?" আমি বললাম, "চল্লিশ হাজার দিনার।" তিনি বললেন, "পরবর্তীতে এর পরিমাণ কত হয়েছে ?" বললাম, "চারশো দিনার।"

মাসলামা বিন আব্দুল মালিক বলেছেনঃ আমি রুগ্ন উমর বিন আব্দুল আযীযকে দেখতে গিয়ে তার পোশাক অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন দেখে তার স্ত্রী ফাতেমাকে বললাম, "তুমি কেন তার পোশাক পরিস্কার করে দাও না ?" তিনি বললেন, "এ ছাড়া তার কোনো দ্বিতীয় পোশাক নেই যে, এ পোশাক পরিষ্কারের সময় অন্য পোশাক পড়তে পারবেন।"

তার মুক্ত দাস আবু উমাইয়্যা খাসমী বলেছেনঃ আমি একদিন আমার মুনিবকে বললাম, "প্রতিদিন মসুর ডাল খাবেন না।" জবাবে তিনি বললেন, "বৎস, তোমার মনিবের আহার্য তো এটাই।"

আউন বিন মুআম্মার বলেছেনঃ একদা তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, "ফাতেমা, আজ আঙুর খেতে মন চাইছে, তোমার কাছে এক দিরহাম হবে ?" ফাতেমা বললেন, "আমি কোথায় পাবো ? আপনি তো আমিরুল মুমিনীন, অথচ আপনার কাছে একটিমাত্র দিরহাম নেই যা দিয়ে আঙুর কিনতে পারেন ?" তিনি বললেন, "তুমি যে অর্থের কথা বলছো, তা দিয়ে আঙুর খেতে না পাওয়া আমার প্রতি আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ করুণা। সে অর্থের অপব্যয় করলে জাহান্নামের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতাম না।"

ফাতেমা বলেন, "খলিফা হওয়ার পর থেকে মৃত্যু অবধি তার গোসল ফরয হতে দেখিনি।"

সহল বিন সদকা বলেছেনঃ তিনি খলীফা হওয়ার পর তার বাসভবান থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। অনুসন্ধানে জানা যায়, তিনি তার বাঁদিদের বলেছেন, "আমার উপর অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় আমি তোমাদের ব্যাপারে দারুণ উদাসীন হয়ে গেছি। তাই যারা মুক্ত হতে চাও তারা চলে যাও, আর যার থাকবে তাদের প্রতি শর্ত হলো, আমি তাদের আর কোনো সহযোগিরা করতে পারবো না।" এ কথা শুনে বাঁদিরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

তার স্ত্রী ফাতেমা বলেছেন, "তিনি বাড়িতে এসে সেজদায় নিজের মাথাকে লুটিয়ে দিতেন, অঝোর ধারায় কেঁদে চলতেন আর মুনাজাত করতেন। এভাবে এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। যখন ঘুম ভাঙতো তখন থেকে সারা রাত আবার এভাবেই কাটিয়ে দিতেন।"

ওলীদ বিন সায়েব বলেছেন, "আমি তার চেয়ে বেশী আল্লাহভীরু লোক কাউকে দেখিনি।"

সাঈদ বিন সুয়ায়েদ বলেছেনঃ একদিন তিনি তালিযুক্ত পোশাক পড়ে জুমআর নামায পড়াতে যাচ্ছিলেন। তা দেখে এক ব্যক্তি বললেন, "আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহ আপনাকে সব কিছু দেওয়ার পরও আপনি কেন পোশাক তৈরি করছেন না ?" তিনি দীর্ঘক্ষণ মাথা নীচু করে থাকলেন। এরপর মাথা তুলে বললেন, "তুমি শহরের মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর লোক, আর ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষের ত্রুটি মার্জনা করা সর্বোত্তম।"

মাইমুন বিন মিহরান বলেছেন যে, উমর বিন আব্দুল আযীয বলেছেন, "আমি পঞ্চাশ বছর খলীফা হয়ে থাকলেও পরিপূর্ণভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবো না। আমি শুধু তোমাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার লালসা বের করে দিয়ে চাই, কিন্তু আমার ভয় হয় তোমাদের মন যেন বিষিয়ে না উঠে।"

ইবরাহীম বিন মায়সারা বলেছেনঃ আমি তাউসকে জিজ্ঞেস করলাম, "উমর বিন আব্দুল আযীয কি হিদায়াতপ্রাপ্ত ?" তিনি বললেন, "শুধু হিদায়াতপ্রাপ্তই নন, তিনি একজন সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ সৎ শাসক।"

উমর বিন আসাদ বলেছেন, "লোকেরা খলীফার কাছে প্রচুর ধন- দৌলত নিয়ে আসতো, আর তিনি তা গ্রহণ না করে তাদেরকে সেগুলো ইচ্ছেমত খরচ করতে বলতেন। আর এভাবে তিনি লোকদের ঐশ্বর্যশালী করেন।"

জোরিয়া বলেছেনঃ একদিন আমি ফাতেমা বিনতে আলী বিন আবু তালিবের কাছে গেলে তিনি উমর বিন আব্দুল আযীযের প্রশংসা করে বললেন, "তিনি জীবিত থাকলে আমার আর কারো প্রয়োজন হতো না।"

আতা বিন আবু রিবাহ বলেছেনঃ উমর বিন আব্দুল আযীযের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক আমাকে বলেছেন - তিনি খিলাফতপ্রাপ্ত হওয়ার পর ঘরে এসে জায়নামাযে বসে এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, তার দাড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। আমি বললাম, "আমিরুল মুমিনীন, আপনি এত কাঁদছেন কেন ?" তিনি বললেন, "ফাতেমা, আমার কাঁধে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বোঝা চাপানো হয়েছে। আমি সকল ক্ষুধার্ত, দরিদ্র, মুমূর্ষু, বস্ত্রহীন, উৎপীড়িত, বন্দী, মুসাফির, বৃদ্ধ, এতিমসহ পৃথিবীর সকল দুর্ভাগ্য লোকদের ভাগ্য নিয়ে ভাবছি। আর এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার প্রশ্নের জবাব যদি দিতে না পারি – সে জন্য কাঁদছি।"

হামীদ বলেছেন, "একদিন উমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে হাসান আমার মারফত চিঠি লিখেন। এতে আমার বড় পরিবারে দারুণ অর্থ সংকটের উল্লেখ করলে তিনি পরিতোষ প্রেরণের নির্দেশ দেন।"

ইমাম আওযায়ী বলেছেন, "নিজের ব্যক্তিগত ক্রোধ যেন প্রকাশ না পায় সে জন্য অপরাধীকে প্রথমে তিনদিন বন্দি করে রাখতেন তিনি।"

জোয়াইরিয়া বিন আসমা বলেছেন যে, উমর বিন আব্দুল আযীয বলেছেন, "আমার অন্তর বড়ই প্রাচুর্যময়। মনের একটি ইচ্ছে পূরণ করলে এর চেয়ে বড় ইচ্ছে জাগ্রত হয়।"

আমর বিন মুহাজির বলেছেন, "বাইতুল মাল থেকে প্রতিদিন তাঁকে দুই দিরহাম দেওয়া হতো।"

ইউসুফ বিন ইয়াকুব কাবলী বলেছেন, "তিনি রাতে চামড়া উড়তেন।"

আতা খুরাসানী বলেছেন, "তিনি পানি গরম করে আনতে বললে তার গোলাম শাহী রন্ধনশালা থেকে পানি গরম করে আনে, এ কথা জানোতে পেরে তিনি শাহী রন্ধনশালার জ্বালানি বাবদ এক দিরহার প্রদান করেন।"

আমর বিন মুহাজির বলেছেন, "তিনি খিলাফতের কাজেই শুধু রাষ্ট্রীয় প্রদীপ ব্যবহার করতেন। কাজ শেষে তা নিভিয়ে দিতেন আর নিজস্ব বাতি জ্বালাতেন।"

হাকিম বিন উমর বলেছেন, "উমাইয়্যা বংশের খলীফাদের নীতি ছিল, পদের নিরাপত্তার জন্য সর্বদা তিনশো চৌকিদার আর চারশ পুলিশ মোতায়েন থাকতো। কিন্তু তিনি খলীফা হওয়ার পর বললেন, "আমার নিরাপত্তার জন্য এদের কোনো প্রয়োজন নেই। তাই যারা আমার সাথে থাকতে চাও তাদের প্রত্যেককে দশ দিনার দিবো, আর যারা থাকতে চাও না তারা নিজ বাড়িতে ফিরে যাও।"

উমর বিন মুহাজির বলেছেনঃ একবার তিনি আপেল খাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তার এক নিকটাত্মীয় হাদিয়া হিসেবে কিছু আপেল পাঠিয়ে দেন। এতে করে তিনি হাদীয়া দানকারীর প্রশংসা করেন আর দারুণ আনন্দিত হোন। অবশেষে গোলামকে ডেকে বললেন, "হাদীয়া প্রেরণকারীকে আমার সালাম জানাবে আর বলবে - তার হাদিয়া আমার মাথা ও চোখের মধ্যে রইলো। তিনি আমাদের সম্ভ্রান্ত বন্ধু।" এরপর তিনি আপেলগুলো ফেরত দিলেন। আমি বললাম, "আমিরুল মুমিনীন, এ হাদিয়া আপনার চাচাতো ভাই পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিয়া গ্রহণ করেছেন।" তিনি বললেন, "হাদিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হাদিয়াই ছিল, কিন্তু আমাদের জন্য তা উৎকোচ।"

ইবরাহীম বিন মায়সারা বলেছেন, "মুআবিয়া (রাঃ) এর শানে বেয়াদবীপূর্ণ উক্তি উচ্চারণকারী ব্যক্তি ছাড়া তিনি আর কাউকে বেত্রাঘাত করেননি।"

ইমাম আওযায়ী বলেছেন, "তিনি তার পরিবারের খরচাদি হ্রাস করায় তার পরিবারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি তাদেরকে বললেন - এরচেয়ে বেশী ব্যয় নির্বাহ করার ক্ষমতা আমার নেই। আর দূর দেশের একজন সাধারণ মানুষের যতটুকু অধিকার বাইতুল মালে রয়েছে, তোমাদেরও ততটুকু রয়েছে।"

আবু উমর বলেছেন, "তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিপরীত লিখিত ফরমান প্রেরণ করেন।"

ইয়াহইয়া গাসসানী বলেছেন, "উমর বিন আব্দুল আযীয মুসুলের শাসনকর্তা করে আমাকে প্রেরণ করেন। আমি সেখানে গেলে এক চোর ধরা পড়ে আর এ ব্যাপারে বহুজনের বহুমত হওয়ার কারণে বিষয়টি কিভাবে ফায়সালা করবো তা আমিরুল মুমিনীনের কাছে পরামর্শ চাইলাম। তিনি সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচার করার নির্দেশ দিলেন।"

রাজা বিন হায়া বলেছেনঃ এক রাতে জরুরি কথা বলার জন্য উমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে গেলাম। এমন সময় বাতির তেল শেষ হয়ে তা নিভে গেলো। তখন গোলাম ঘুমিয়ে পড়েছিলো। আমি বললাম, "গোলামকে জাগিয়ে দেই ?" তিনি বললেন, "প্রয়োজন নেই।" আমি বললাম, "তাহলে আমি বাতিটি জ্বালিয়ে দেই।" তিনি বললেন, "মেহমানের কাছ থেকে কাজ নেয়া ভদ্রতার পরিপন্থী।" অতঃপর তিনি নিজেই উঠে গিয়ে প্রদীপের তেল ঢেলে তা জ্বালিয়ে আমার কাছে এসে বললেন, "আমি নিজে সব কিছু করার পরও আমি সেই উমরই রয়ে গেছি।"

মাকহুল বলেছেন, "আমি যদি কসম করে বলি যে, তিনি সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু ও ধর্মনিষ্ঠ সাধক ব্যক্তি, তাহলে আমার কসম ভাঙবে না।"

সাঈদ বিন আবু উরওয়াবা বলেছেন, "মৃত্যুর বিবরণ দেওয়ার সময় তার শরীর কাঁদতে কাঁদতে বাঁকা হয়ে যেতো।"

আতা বলেছেন, "উমর বিন আব্দুল আযীয প্রতি রাতে রাজ্যের মুফতীদের একত্রিত করে মৃত্যু ও কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করতেন আর এমনভাবে কাঁদতেন, লাশ সামনে রেখে মানুষ যেভাবে কাঁদে।"

উবায়দুল্লাহ বিন আয়যার বলেছেনঃ একদা তিনি সিরিয়ায় এক মাটির মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে লোকসকল, নিজের অভ্যন্তর সংশোধন করো, বাহিরটা এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে; আর আখিরাতের জন্য অর্জন করো, দুনিয়া এমনিতেই এসে যাবে। মনে রেখো, মৃত্যু তোমাদের মা-বাবাকে পরপারে নিয়ে গেছে।"

ওহীব বিন ওরদ বলেছেনঃ একদিন মারওয়ানের বংশধররা তার দরজায় এসে সমবেত হোন আর তার ছেলে আব্দুল মালিককে বলেন, "তোমার পিতাকে গিয়ে বলো - পূর্ববর্তী সকল খলীফা আমাদের ভাতা দিতেন, আর আপনি তা বন্ধ করে দিয়েছেন।" আব্দুল মালিক বিষয়টি খলীফাকে জনালে তিনি তিলাওয়াত করলেন -

انی اخاف ان عصیت ربي عذاب یوم عظیم

"আমি আমার রবের অবাধ্য হতে ভয় পাই; কেননা, আমি এক মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি।" (সূরাহ আল-আনআম, ৬ : ১৫)

ইমাম আওযায়ী বলেছেন যে, উমর বিন আব্দুল আযীয বলেছেন, "পূর্ববর্তীদের অভিমত অনুযায়ী কাজ করবে। তাঁদের সাথে মতভেদ করবে না, কারণ তারা তোমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী আর ধর্মনিষ্ঠ।"

একবার জারীর অনেকক্ষণ ধরে দরজার দাঁড়িয়ে থাকার পরও তিনি তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করায় অবশেষে জারীর তার সচিব আউন বিন আব্দুল্লাহর কাছে গিয়ে এ কবিতা আবৃত্তি করেন - "হে পাগড়িধারী, আমার যুগ শেষ হয়েছে। খলীফার সাক্ষাৎ হলে বলে দিও, আমি বন্দীদের মতো এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

জোয়াইরিয়া বিন আসমা বলেছেনঃ তিনি খলীফা হওয়ার পর তার কাছে বেলাল বিন আবু বারদা এসে তাঁকে মোবারকবাদ জানিয়ে বললেন, "খিলাফত অন্যান্য খলীফাদের মর্যাদাশীল করেছে, আর আপনি খিলাফতকে মর্যাদা দান করেছেন। খিলাফত খলীফাদের অলংকার, আপনি খিলাফতের অলংকার।" এরপর তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেন - "আপনার আগমনে সুরভি আরো সুগন্ধময় হয়েছে, কারণ আপনার উপমা আপনি নিজেই। যদিও মুক্তা অলংকারকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে, কিন্তু আপনি অলংকারের মুক্তাকে নয়নাভিরাম করেছেন।"

জুয়ুনা বলেছেনঃ তার ছেলে আব্দুল মালিকের ইন্তেকাল হলে তিনি ছেলের ভুয়সী প্রশংসা করেন। মুসলিমা বললেন, "আমিরুল মুমিনীন, তিনি জীবিত থাকলে কি তাঁকে উত্তরাধিকার মনোনীত করতেন ?" তিনি বললেন, "কখনোই না।" মুসলিমা বললেন, "তাহলে এতো প্রশংসার অর্থ কি ?" তিনি বললেন, "অপরের কাছে সে প্রশংসিত হওয়ায় আমার দৃষ্টিতেও সে প্রশংসনীয়। কারণ পিতার দৃষ্টিতে ছেলে প্রশংসার যোগ্য।"

গাসসান বলেছেনঃ এক ব্যক্তির উপদেশ প্রার্থনার প্রেক্ষিতে তিনি বললেন, "আল্লাহকে ভয় করো আর তার আদেশ মেনে চলো। তিনিই তোমার মুসিবত দূর করে দিবেন।"

আবু উমর বলেছেন, "তার কাছে উসামা বিন যায়েদের কন্যা এলে তিনি সম্মানার্থে তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে নিজের আসনে বসতে দিয়ে তার সামনে গিয়ে বসেন আর তিনি যা চান তাই তাকে দিয়ে দেন।"

হাজ্জাজ বিন আনয়াসা বলেছেনঃ মারওয়ান বংশের কিছু লোক একত্রিত হয়ে খলীফার সাথে কৌতুক করার সিদ্ধান্ত নিলো। খলীফার কাছে এসে একজন রঙ্গরসের কথা বললে খলীফা তার দিকে তাকালেন। আরেকজন অনুরূপ রসাত্মক কথা বলায় তিনি বললেন, "তোমরা জঘন্য বিষয়ে একমত হয়েছো, যা অন্তরে হিংসা ও ঘৃণার জন্ম দিবে। ভালো হবে যদি তোমরা সমবেত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করো, তিলাওয়াত শেষে হাদীস শরীফ পাঠ করো, এরপর হাদীস নিয়ে গবেষণা করো।"

আয়াস বিন মুআবিয়া বিন কুররা বলেছেন, "তিনি এক অনন্য সচেতন কারিগর। তার নিকট কোন মেশিন ছিল না, মেশিন ছাড়াই তিনি নিপুণ কারিগরীর কারিশমা দেখিয়েছেন।"

আমর বিন হাফজ বলেছেন, "কোন মুসলমানের কথায় বিন্দু পরিমাণ কল্যাণ নিহিত থাকলে তা উড়িয়ে দিতে তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন।"

ইয়াহইয়া গাসসানী বলেছেনঃ একবার আমিরুল মুমিনীন সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মত্যাগীর প্রতি আরোপিত শাস্তি উমর বিন আব্দুল আযীয এভাবে স্থগিত করেন যে, সে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা হবে। সুলায়মানের কাছে ধর্মত্যাগী লোকটিকে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন,

"তোমার বক্তব্য কি ?" লোকটি উত্তরে বললো, "হে পাপীর ছেলে পাপী, কি জানোতে চাও তুমি ?" এ কথা শুনে উমর বিন আবদুল আযীযকে সুলায়মান বললেন, "এর ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ?" তিনি বিষয়টি নিরীক্ষণ করলে লোকটি আবার ভ্রষ্ট কথা বললো। এবার উমর বিন আব্দুল আযীয নীরব হয়ে গেলেন। সুলায়মান বললেন, "আপনি বলুন, আমি আপনার উপর নির্ভর করছি।" তিনি বললেন, "আমার অভিমত হলো, আপনিও তাকে গালি দিন।" সুলায়মান বললেন, "এটা হয় না।" এরপর সুলায়মান লোকটিকে হত্যার আদেশ দিলেন।

উমর বিন আব্দুল আযীয সেখান থেকে বেরিয়ে এলে পথিমধ্যে খালিদ নামক শহরের প্রধান পুলিশ কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত হয়। খালিদ বললো, "আপনি খলীফাকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাতে আমার ভয় হয়েছিলো যে, তিনি মনে হয় আপনাকেই হত্যার আদেশ দিবেন।" উমর বিন আব্দুল আযীয বললেন, "আমাকে হত্যার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হলে তুমি কি করতে ?" খালিদ বললো, "সঙ্গে সঙ্গে গর্দান উড়িয়ে দিতাম।"

উমর বিন আব্দুল আযীয খলীফা মনোনীত হওয়ার পর প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা খালিদ তার সামনে এসে দাঁড়ালে তিনি বললেন, "খালিদ, তোমার তলোয়ার রেখে দাও।" এরপর তিনি তাঁকে অব্যহিত দিলেন আর তার জন্য দুয়া করলেন। এরপর তিনি পুলিশ অফিসারদের মধ্য থেকে আমর বিন মুহাজির আনসারীকে ডেকে বললেন, "হে আমর, আল্লাহর কসম, ইসলাম ছাড়া তোমার সাথে আমার আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। আমি শুনেছি তুমি অধিক পরিমাণে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করো। আমি তোমাকে এমনভাবে নামায পড়তে দেখেছি যে, মনে হয় তুমি কোন মানুষ নও। তার উপর তুমি আনসার, তুমি এ তলোয়ার তুলে নাও। আজ থেকে আমি তোমাকে প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা মনোনীত করলাম।"

শোয়ায়েব বলেছেন, তার ছেলে আব্দুল মালিক উমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে গিয়ে বললেন, "আমিরুল মুমিনীন, আপনি আপনার প্রতিপালকের একান্ত অনুগত। তিনি যদি আপনাকের প্রশ্ন করেন যে, তুমি লোকদের বিদআত করতে দেখে বিদআত প্রতিরোধ আর সুন্নত প্রতিষ্ঠার জন্য কি পদক্ষেপ নিয়েছিলে, তাহলে আপনি কি জবাব দিবেন ?" তিনি এ প্রশ্ন শুনে খুব খুশি হয়ে বললেন, "আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহম করুন আর উত্তম প্রতিদান দিন। বৎস, সমাজে বিদআত ছড়িয়ে পড়ায় সুন্নত তলিয়ে গেছে। এ অবস্থায় বিদআত প্রতিরোধে মরু প্রান্তরে খুনের নহর বয়ে দিতে চাই না। আল্লাহর কসম, এক বিন্দু রক্ত ঝরাতেও আমি প্রস্তুত নই। বিদআত প্রতিহত আর সুন্নত প্রতিষ্ঠার পরিস্থিতি আমার জীবনে যেন না আসে।"

আদী বিইন ফজল বলেছেনঃ আমি উমর বিন আব্দুল আযীযকে এক ভাষণে বলতে শুনেছি, "হে লোকসকল, আল্লাহকে ভয় করো আর হালাল পথে রিযিকের অনুসন্ধান করো, তোমাদের ভাগ্যে রিযিক থাককে পাহাড়ের চূড়া কিংবা ভুগর্ভ থেকে হলে তা সরবরাহ করা হবেই।"

আযহার বলেছেন, "আমি একবার তাঁকে সেলাই করা জামা পরে খুৎবা দিতে দেখেছি।"

আব্দুল্লাহ বিন আলা বলেছেনঃ তিনি অধিকাংশ জুমআর খুৎবা শুরুর আগে এ বাক্যগুলো পাঠ করতেন –

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعما لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لاسريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله من يطع الله ورسو له فقد رشد ومن يعص الله

আর এ আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে খুৎবা শেষ করতেন -

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ

"হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।"
(সূরাহ আয-যুমার, ৩৯ : ৫৩)

হাজিব বিন খলীফা বরজামী বলেনঃ উমর বিন আব্দুল আযীযের খিলাফতকালে তার এক ভাষণে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই সহচর কর্তৃক প্রবর্তিত পন্থাই একমাত্র একমাত্র সঠিক পথ, এ পথে জীবন পরিচালনা করতে হবে, আর এর বিপরীত সকল পথ ও মত পরিত্যাজ্য।" (আবু নাঈম)

ইবরাহীম বিন আবু আয়লায় বরাত দিয়ে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ ঈদের দিন লোকের তার কাছে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে বলতো, "আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।" জবাবে তিনিও তাই বলতেন।

জুয়ূনা বলেছেনঃ আমর বিন কায়েস সুকুনীকে সেনাপতি করে প্রেরণের প্রাক্কালে তিনি তাকে এই বলে নসীহত করলেন যে, সে নগরীর ভালো লোকদের পরামর্শ নিবে আর দুশ্চরিত্রদের থেকে মুক্ত থাকবে, তাঁদের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিবে। আর যদি প্রথমেই তাদের প্রতি শাসনের খড়্গ উত্তোলন করো, তবে তারা অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যাবে, তোমার দাওয়াতের আহবান তাদের কানে পৌঁছবে না। এজন্য মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করবে, যাতে তারা তোমার বৈশিষ্ট্য বুঝতে সক্ষম হয় আর তোমার কথা শোনে।

সায়েব বিন মুহাম্মদ বলেছেনঃ একবার খোরাসানের শাসনকর্তা জারাহ বিন আব্দুল্লাহ খলীফার কাছে এ মর্মে চিঠি লিখলেন - "আমিরুল মুমিনীন, খুরাসানবাসী লাইনচ্যুত হয়েছে। তলোয়ার ছাড়া তাঁদের সঠিক পথে আনা সম্ভব নয়। খলীফার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম।" উমর বিন আব্দুল আযীয প্রাপ্ত পত্রের জবাবে লিখলেন, "তুমি সঠিক বিষয় উপলব্ধি করোনি। তলোয়ার ছাড়া খোরাসানবাসী সৎপথে আসবে না - এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ন্যায়পরায়ণতা আর সত্যবাদিতা এমন একটি বিষয়, যার সংস্পর্শে আসলে এমনিতেই তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে। তাই তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা, সততা আর সত্যবাদিতার মহিমা প্রচার করো।"

উমাইয়্যা বিন যায়েদ করশী বলেচেহন, "তিনি আমার থেকে চিঠি লিখে নেবার সময় এ দুয়া পড়তেন - হে আল্লাহ, আপনি রসনার অপরাধ মাফ করুন।"

সালিহ বিন জাবের বলেছেনঃ ঘটনাক্রমে তিনি আমার প্রতি রাগ করলে আমি বললাম, “আমি কোন এক গ্রন্থে দেখেছি, তরুণ বাদশাহদের রাগ থেকে মুক্ত থাকতে বলা হয়েছে।” এরপর তার রাগ ঠান্ডা হলে আমি তার নিকট ক্ষমা চাইলাম। তিনি বললেন, “হে সালিহ, রেগে গেলে তোমার এ কথা অবশ্যই আমাকে মনে করিয়ে দিবে।”

আব্দুল হাকীম বিন মুহাম্মদ মাখযুমী বলেছেনঃ একদিন জারীর বিন খাতফী সাক্ষাতের জন্য উমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে এসে সাক্ষাতের অনুমতি না পেয়ে বললেন, “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলেছি।” এরপর অনুমতি পেয়ে জারীর এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন - “সেই পবিত্র সত্ত্বা - যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পাঠিয়েছেন আর খিলাফতের মসনদে ন্যায়পরায়ণ নেতাকে সমাসীন করেছেন, তিনি অত্যাচারের প্রতিরোধক আর সাম্যের সুরভি ছড়ানোকারী। আমি আপনার কাছে তাড়াতাড়ি কিছু সম্পদ প্রার্থনা করছি।” তিনি বললেন, “কুরআন শরীফে দেখেছি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তোমার কোন হক নেই।” জারীর বললেন, “আমিরুল মুমিনীন, কুরআন শরীফে আমার হকের কথা উল্লেখ রয়েছে, কারণ আমি মুসাফির।” অবশেষে তিনি নিজ তহবিল থেকে পঞ্চাশ দিনার দান করলেন।

তৌরিয়াত গ্রন্থে রয়েছেঃ হারীয বিন উসমান রাজী পিতার সাথে উমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে গেলে তিনি তার পিতাকে বললেন, “তোমার ছেলেকে ফুকাহায়ে আকবরের (বিচারপতির) শিক্ষা দান করবে। আর অল্পে তুষ্টি ও মুসলমানদের কষ্ট না দেয়া বিচারপতির প্রধান শিক্ষা।”

ইবনে আবী হাতিম স্বরচিত তাফসীর গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন কাব কারতীর বরাত দিয়ে লিখেছেনঃ একদিন উমর বিন আব্দুল আযীয আমাকে ডেকে ন্যায়পরায়ণতার সংজ্ঞা জানোতে চাইলে আমি বললাম, “আপনি মহান এক বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞেস করেছেন। বয়সে বড় মহিলার সাথে বাবার মতো, ছোট মেয়েদের সাথে মতো আর সমবয়সী মেয়েদের সাথে নিজের ভাইয়ের মতো আচরণ করা, শরীর ভেদে অপরাধীর শাস্তি দেয়া আর ব্যক্তিগত ক্রোধে অন্যকে কষ্ট না দেয়াই হলো ন্যায়পরায়ণতা। আর এ সীমা অতিক্রম করাটা হলো জুলুম।”

মুসান্নাফি গ্রন্থে যুহরীর বরাত দিয়ে আব্দুর রাজ্জাক লিখেছেন, “তিনি পাক করা খাবার খেলে অযু করে শুকরিয়া আদায় করতেন।”

ওহীব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, উমর বিন আব্দুল আযীয বলেছেন, “যে কথাকে আমল হিসেবে গণ্য করে সে কম কথা বলে।”

যাহাবী বলেছেনঃ তার খিলাফতকালে ভাগ্যকে অস্বীকারকারী একটি দলের আবির্ভাব হলে তিনি তাদের তওবা করতে বললেন। তারা বললো, “আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম, আমাদের হিদায়াত করেছেন আপনি।” তিনি দুয়া করলেন, “হে আল্লাহ, যদি তাদের কথা সত্য হয় তবে ভালো, নতুবা তাদের হাত পা কেটে শুলে চড়িয়ে দিন।” তারা নিজেদের বিশ্বাসে অটল রইলো। পরবর্তীতে হিশাম বিন আব্দুল মালিক তখতে আসীন হয়ে তাদের হাত পা কেটে শুলে চড়ান।

বনূ উমাইয়্যার খলীফাগণ তাদের অভিভাষণে আলী (রাঃ) এর শানে ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি করতেন। উমর বিন আব্দুল আযীয কঠোরভাবে এ প্রথা নিষিদ্ধ করেন আর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে কটুক্তির পরিবর্তে তাদের অভিভাষণে এ আয়াত তিলাওয়াতের জন্য লিখিত ফরমান পাঠান -

إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ আর আত্নীয়- স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ আর অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।" (সূরাহ আন- নাহল, ১৬ : ৯০)

তিনি খলীফা হওয়ার আগে অনেক কবিতা রচনা করেন। তার বহু কাব্য ও চরণপুঞ্জ জনশ্রুতির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

সালাবা বলেছেন, "উমর বিন খাত্তাব (রাঃ), উসমান গনী (রাঃ), আলী (রাঃ), মারওয়ান বিন হাকাম আর উমর বিন আব্দুল আযীযের মাথায় চুল ছিল না।"

যুবায়ের বিন বাকার বলেছেনঃ এক কবি ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিকের শানে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন - "আপনি খলীফার কন্যা, খলীফার ফুফু, খলীফাদের বোন আর খলীফার পত্নী।"

যুবায়ের বলেছেন, "উমর বিন আব্দুল আযীযের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিকের পৃথিবীর আর কোন নারী এমন ছিলেন না।" গ্রন্থকার বলেন, "আমার যুগ পর্যন্ত এমন কাউকে দেখিনি।"

ইন্তেকাল

আইয়ুব বলেছেনঃ এক ব্যক্তি উমর বিন আব্দুল আযীযকে বললেন, "আপনি মদীনায় চলে আসলে সেখানে আপনার মৃত্যু হবে, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে রওজা আতহারে চতুর্থ স্থানে আপনাকে সমাহিত করা হবে।" তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, সেখানকার হকদার মনে করাটাই হবে নিজের জন্য বড় শাস্তি।"

ওয়ালীদ বিন হিশাম বলেছেন, তিনি অসুস্থতার জন্য কোন ঔষধ সেবন করতেন না। তিনি বলেন, বিষ খাওয়ানোর সময় যদি আমাকে বলা হতো, আপনি নিজের কানের লতি স্পর্শ করুন, অথবা এ সুগন্ধীর ঘ্রাণ নিন, আর এটা হলো আপনার রোগের ঔষধ - তবুও আমি তা করতাম না।

উবায়েদ বিন হাসসান বলেছেন, মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তিনি সকলকে চলে যেতে বললেন। সকলেই চলে গেলেও শ্যালক মুসলিমা আর স্ত্রী ফাতেমা দরজায় বসে রইলেন। তারা শুনলেন যে, তিনি বলেছেন -

"সুস্বাগতম, আল্লাহর নামে আসুন।" তারা বলেন, আগন্তুকগণ মানুষও নন, জীনও নন। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন -

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ

"এটা হলো আখিরাতের (চিরশান্তির) ঘর ..." (সূরাহ আল- কাসাস, ২৮ : ৮৩)

এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন।

হিশাম বলেছেনঃ তার ইন্তিকালের সংবাদ শুনে হাসান বসরী বললেন, "পৃথিবীর সর্বোত্তম লোকটির ইন্তিকাল হলো।"

খালিদ রবয়ী বলেছেনঃ আমি তৌরাত গ্রন্থে পড়েছি, উমর বিন আব্দুল আযীযের জন্য নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল চল্লিশ দিন কাঁদবে।

ইউসুফ বিন মালিক বলেছেনঃ আমরা তার কবরের মাটি সমান করার সময় আকাশ থেকে এক টুকরো কাগজ পড়ে, যাতে লিখা ছিল – "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উমর বিন আব্দুল আযীযকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেয়া হয়েছে।"

কাতাদা বলেছেনঃ উমর বিন আব্দুল আযীয খিলাফতের উত্তরাধিকারী ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকের কাছে একটি পত্র লিখেন, পত্রটি নিম্নরূপ -

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম,

এ পত্র আল্লাহর বান্দা উমরের পক্ষ থেকে ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকের প্রতি। তোমার উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সেই প্রতিপালকের প্রশংসা করছি, যার কোন প্রতিপালক নেই। এরপর, আমি আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ চিঠি লিখছি। আমি জানি যে, দুনিয়া আর আখিরাতের মালিক কর্তৃক আমার খিলাফত সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসিত হবো। আর এমন কোন কাজ নেই যা তার অগোচরে করেছি। তিনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তবে সুখ ও কল্যাণের সন্ধান পাবো এবং অপমান ও অসম্মান থেকে মুক্তি পাবো। আর তিনি যদি রুষ্ট থাকেন, তবে আমি ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হবো। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি - তিনি নিজ করুণা দিয়ে আমাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দিন আর আমার প্রতি দয়াপ্রবণ হয়ে জান্নাত দান করুন। তুমি আল্লাহকে ভয় করবে, প্রজাকুলের বশ্যতা মানবে আর আমার পর অল্প কিছু দিন তুমি জীবিত থাকবে। (আবু নাঈম)

১০১ হিজরীর রযব মাসের বিশ অথবা পঁচিশ তারিখে উনচল্লিশ বছর ছয় মাস বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। বনূ উমাইয়্যা তাঁকে বিষ খাইয়ে শহীদ করে দেয়। তিনি অত্যাচারের মাধ্যমে অর্জিত সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে বনূ উমাইয়্যার উপর করারোপ করেছিলেন। তবে বিষয়টি সহজতর করার জন্য বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদের উপরই ছিল।

মুজাহিদ বলেছেনঃ আমাকে ডেকে তিনি বললেন, "আমার সম্পর্কে লোকদের ধারণা কি ?" আমি বললাম, "আপনাকে জাদু করা হয়েছে।" তিনি বললেন, "না, এ কথা মিথ্যা। আমাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে, আর আমাকে যে সময় বিষ পান করানো হয়, সে সময় সম্পর্কেও আমি জানি।" তিনি তখনই গোলামকে (যে তাঁকে বিষ খাইয়েছিলো) ডেকে বললেন, "তোমার প্রতি আফসোস, তোমাকে এ কাজ করতে কে প্ররোচিত করেছে ? কেন আমাকে বিষ পান করালে ?" সে বললো, "আমাকে সহস্র দিনার দেয়া হয়েছে আর আযাদ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।" তিনি দিনারগুলো আনতে বললেন, এরপর সেগুলো নিয়ে তিনি বাইতুল মালে জমা করে দিয়ে গোলামকে বললেন, "এখান থেকে এমনভাবে পালিয়ে যাও যেন কেউ তোমাকে দেখতে না পায়।"

তার খিলাফতকালে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেছেন তারা হলেন - আবু উমামা বিন সহল বিন হানীফ, খারেজা বিন যায়েদ বিন সাবেত, সালিম বিন আবুল জুআদ, বসর বিন সাঈদ, আবু উসমান নাহদী, আবুল যহা প্রমুখ।

ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান

ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বিন হাকাম আবু খালিদ উমুয়ী দামেশকী ৭১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার ভাই সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের ওসীয়ত অনুযায়ী উমর বিন আব্দুল আযীযের পর তিনি মসনদে আসীন হোন।

আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, "তিনি খলীফা হওয়ার পর উমর বিন আব্দুল আযীযের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার ঘোষণা দেন। কিছুদিন এভাবে চলার পর চল্লিশ জন বৃদ্ধ লোক এসে সাক্ষ্য দিয়ে বললো, খলীফার যা ইচ্ছে তা করতে পারবেন। তার প্রতি কোন শাস্তি নেই, তাঁকে কোন জবাবদিহিও করতে হবে না।"

ইবনে মাজশুন বলেছেন, "উমর বিন আব্দুল আযীযের মৃত্যুর সময় ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক কসম করে বলেন - 'আল্লাহ তাআলার প্রতি উমর বিন আব্দুল আযীযের যে মুখাপেক্ষিতা ছিল, আমার তার চেয়ে বেশী থাকবে।' তিনি চল্লিশ দিন তাঁকে পূর্ণ অনুসরণ করেন, এরপর তার পথ থেকে সরে দাঁড়ান।"

সালীম বিন বশীর বলেছেন, "উমর বিন আব্দুল আযীয জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকের প্রতি এ ওসীয়তনামা লিখে যান -

"আসসালামু আলাইকুম। এরপর, আমার অবস্থা সম্পর্কে আমি জানি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। তুমি পৃথিবীতে এমন লোক পাবে, যারা তোমার প্রশংসা করবে না; আর এমন লোক তোমার প্রতি অর্পিত হবে, যারা তোমাকে ক্ষমা করবে না। তোমার প্রতি সালাম।"

১০২ হিজরীতে ইয়াযিদ বিন মোহলাব খিলাফত দখলের ষড়যন্ত্র করলে মাসলামা বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তাকে প্রতিহত ও পরাজিত করে কারবালার নিকটবর্তী আকীর অঞ্চলে হত্যা করেন।

ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক ১০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তার খিলাফতকালে যেসব ওলামা মাশায়েখ ইন্তেকাল তারা হলেন - যহাক বিন মাযাহিম, আদী বিন রতাত, আবুল মুতাওয়াক্কীল নাজী, আতা বিন ইয়াসার, মুজাহিদ, ইয়াহইয়া বিন ওতাব (কুফার বিখ্যাত শিক্ষক), খালিদ বিন মাআদান, শাআবী (ইরাকের প্রখ্যাত আলেম), আব্দুর রহমান বিন হাসসান বিন সাবিত, আবু কালাবাতুলজারমী, আবু বারদা বিন আবু মূসা আশআরী প্রমুখ।

হিশাম বিন আব্দুল মালিক

হিশাম বিন আব্দুল মালিক আবুল ওলীদ ৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার ভাই ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকের পর খিলাফতের তখতে আসীন হন।

মুসআব যুবায়রী বলেছেন, "একদিন আব্দুল মালিক স্বপ্নে দেখেন, তিনি মসজিদের মিহরাবে চারবার প্রস্রাব করছেন। সাঈদ বিন মুসায়্যেবকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন - আপনার চার পুত্র বাদশাহ হবেন। আর হিশাম হলেন তাদের মধ্যে সর্বশেষ বাদশাহ।"

তিনি খুবই সচেতন আর জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন। সম্পদটি বৈধ পন্থায় উপার্জিত কিনা - এ বিষয়ে চল্লিশ সাক্ষী ছাড়া তিনি তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অন্তর্ভুক্ত করতেন না।

আসমায়ী বলেছেন, "আমি এক লোককে হিশামের সাথে বিতর্ক করতে দেখলাম। হিশাম তাঁকে বলছেন - 'নিজের খলীফাকে এ কথা বলার জন্য তুমি উপযুক্ত নও।' "

একদিন এক ব্যক্তির প্রতি রেগে গিয়ে তিনি কসম করে বললেন, "তোমকে বেত্রাঘাত করতে আমার মন চাইছে।"

সাহবাল বিন মুহাম্মাদ বলেছেন, "খলীফাদের মধ্যে হিশাম অবৈধ রক্তপাত ঘটানোকে অধিক ঘৃণা করতেন।"

শাফী বলেছেনঃ সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত অবস্থায় তিনি তার নবনির্মিত প্রাসাদে একটি দিন অতিবাহিত করার অভিপ্রায় পোষণ করলেন। দুপুরে সীমান্ত এলাকা থেকে এক ভীতিপ্রদ সংবাদ এলে "এমন একটি ধনও পেলাম না"- এ মন্তব্য করে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। উল্লেখ্য, তার এ কবিতা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উক্তি সংরক্ষিত নেই।

(কবিতার অর্থ) "কামনার দাসত্ব করতে না চাইলেও কামনার স্থল তোমাকে বিদ্ধ করবে।"

তিনি ১২৫ হিজরীর রবিউল আখির মাসে ইন্তেকাল করেন।

তার খিলাফতের সপ্তম বর্ষে রোম, অষ্টম বর্ষে হানজারা আর দশম বর্ষে হিরসানা হস্তগত হয়।

তার শাসনামলে সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর, তাউস, সুলায়মান বিন ইয়াসার, ইবনে আব্বাসের গোলাম ইকরামা, কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর সিদ্দীক, সামরিক কবি কাসীর, মুহাম্মদ বিন কাব আল-কারযী, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ বিন সিরীন, আবুল তোফায়েল, আমর বিন ওয়াসালা (তিনি সর্বশেষ সাহাবী হিসেবে সকলের পর ইন্তেকাল করেন), জারীর, ফিরজোক, মুআবিয়া বিন কিরতা, মাকহুল, আতার বিন আবু রিবাহ, আবু জাফর, ওহাব ইবনে মানবাহ, সাকীনা বিনতে হুসাইন, কাতাদা, ইবনে উমরের গোলাম নাফে,

সিরিয়ার বিখ্যাত শিক্ষক ইবনে আমের, মক্কা শরীফের সম্মানিত শিক্ষক ইবনে কাসীর, সাবেত আল- বানানী, মালিক বিন দিনার, ইবনে মুহিস, ইবনে শিহাব যহরী প্রমুখ মণীষীগণ ইন্তেকাল করেন।

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ ইবরাহীম বিন আবু আয়লা বলেছেন, "হিশাম আমাকে শহরের রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব দিলে আমি তা প্রত্যাখান করায় তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। আমার প্রতি রক্তিম চক্ষুদ্বয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'তোমার যা খুশি করবে।' আমি তৎক্ষণাৎ আর কোন উত্তর দিলাম না। ক্রোধ প্রশমিত হলে অনুমতি নিয়ে বললাম, 'আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন - আমি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল আর পর্বতমালাকে নেতৃত্ব দানের নির্দেশ দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। এতে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রুষ্ট, অসন্তুষ্ট (হোননি) আর তাদের উপর বল প্রয়োগও করেননি। আর আমি তা প্রত্যাখান করায় আপনি কেন আমার প্রতি বিরক্ত ও মনঃক্ষুণ্ন হবেন ?" এ কথা শুনে তিনি হেসে উঠলেন আর আমাকে ক্ষমা করে দিলেন।

খালিদ বিন সাফওয়ান বলেছেনঃ একদিন আমি হিশামের অতিথি হলাম। তিনি আমার কাছে গল্প শুনতে চাইলেন। আমি বললাম, "এক বাদশাহ নগর ভ্রমণের সময় এক প্রাসাদের প্রতি আঙুল উঁচিয়ে বললেন, 'এটা কার ?' বাদশাহর সহচরগণ বললেন, 'সুলতানের।' তিনি আবার বললেন, 'আমার কাছে যতটুকু সম্পদ আছে, পৃথিবীর কোন বাদশাহর কাছে কোন সময় কি তা ছিল ?' এক প্রাচীন যুগের বয়োঃবৃদ্ধ আলেমে দ্বীন বললেন, 'আগে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলে আমি এর জবাব দিবো।' বাদশাহ বললেন, 'বলুন।' তিনি বললেন, 'আপনার কাছে যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তা কি আগের চেয়ে কমে যায়নি ? এ সম্পদ কি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নন ? আপনার স্থলাভিষিক্ত কি এ সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে না ?' বাদশাহ বললেন, 'আপনার তিনটি প্রশ্নই যথার্থ।' তিনি বললেন, 'এ সম্পদের মোহই আপনাকে অন্ধ করে দিয়েছে। যে সম্পদ ক্ষয়শীল, যে সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অন্যের হস্তগত হবে, আর যে সম্পদ ব্যয় করেছেন তার হিসাব হবে।' এ কথা শুনে বাদশাহ শিহরিত হয়ে উঠলেন আর বললেন, 'আমি উত্তর পেয়ে গেছি।' বৃদ্ধ আলেম বললেন, 'বাদশাহী করতে চাইলে আল্লাহ তাআলার অনুসরণ করুন, নাহলে তা বর্জন করতে হবে।' বাদশাহ এ বিষয়ে সারা রাত চিন্তা-ভাবনা করে সকালে বললেন, 'আমি বাদশাহী ছেড়ে মরু বিয়াবানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনি আমার সঙ্গে থাকলে খুশি হবো।' এরপর তারা মৃত্যু অবধি এক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করেন।"

এই ঘটনা শুনে হিশাম এতই কাঁদলেন যে, তার চোখের পানি দ্বারা দাড়ি সিক্ত হয়ে গেলো। দুই ছেলেকে প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে তিনি ঘরের এক কোণে বসে ইবাদত করতে লাগলেন। তিনি বাইরে যাতায়াত ছেড়ে দিলেন। খলীফার এ অবস্থা দেখে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ খালিদ বিন সাফওয়ানকে বললেন, "আপনি আমিরুল মুমিনীনকে এমন কি করলেন যার প্রভাবে তার বিলাসিতা বিদূরিত হয়েছে ?" খালিদ বিন সাফওয়ান বললেন, "আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এ মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আমি কোন বাদশাহর কাছে গেলে তাঁকে আল্লাহর ভয়ের কথা মনে করিয়ে দিবো।"

ওলীদ বিন ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক

ওলীদ বিন ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বিন হাকাম আবুল আব্বাস ৯০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে।

সে ছিলো ফাসিক। ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যুর সময় অল্পবয়স্ক হওয়ায় হিশাম খলীফা মনোনীত হোন। তবে হিশামের পর তাকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করায় হিশামের ইন্তেকালের পর ১২৫ হিজরীর রবিউল আখির মাসে সে খিলাফতের তখতে আসীন হয়।

ওলীদ বিন ইয়াযিদ অসৎ, পাপাসক্ত আর মদ্যপ ছিল। পবিত্র কাবা গৃহের ছাদে বসে মদ পানের মানসে হজ্ব করার ইচ্ছা করে। পাপাচারের জন্য জনতা তাকে অবরুদ্ধ করে আর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ১২৬ হিজরীর জমাদিউল আখির মাসে তাকে হত্যা করা হয়।

তাকে অবরোধের সময় সে জনতার উদ্দেশ্যে বলে, "আমি কি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিনি ? আমি তো তোমাদের উপর কঠোরতা করিনি। আমি কি দরিদ্রের কল্যাণ করিনি ? তবে কেন আমার প্রতি এ অত্যাচার ?" জনতা জবাব দিলো, "আপনি সবই করেছেন। কিন্তু আপনাকে হত্যা করার কারণ হলো, আপনি মদ্যপায়ী আর আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন আপনি তা হালাল বলে অনুমোদন দিয়েছেন।"

তাকে হত্যা করার পর তার ছিন্ন মাথা ইয়াযিদ বিন ওলীদ বিন আব্দুল মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইয়াযিদ বিন ওলীদ বিন আব্দুল মালিক তার কাটা মাথা বর্শায় ঝুলিয়ে রাখেন। তা দেখে ওলীদ বিন ইয়াযিদের ভাই সুলায়মান বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ লোকটি খুবই বেশরম, মদখোর আর ব্যভিচারী। সে আমার সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হতে চাইতো।"

মাআফী জারীরী বলেছেন, "আমি ওলীদের কিছু জীবন বৃত্তান্ত আর তার কবিতা সংগ্রহ করেছি - যা অবিশ্বাস, পাপাচার আর ব্যভিচারে ভরা।"

যাহাবী বলেছেন, ওলীদের অবিশ্বাস আর ধর্মচ্যুতির বিষয়টি বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়নি। তবে সে মদ পান করতো আর সমকামিতায় প্রসিদ্ধ ছিল। এজন্য জনতা বিদ্রোহ করে আর তাকে হত্যা করে। একদিন মাহদীর সামনে এক ব্যক্তি ওলীদকে ধর্মচ্যুত হিসেবে অভিহিত করলে মাহদী ধমক দিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা কোন ধর্মচ্যুত ব্যক্তিকে কোনোদিন খিলাফতের মর্যাদা দান করেন না।

মারওয়ান বিন আবু হাফজ বলেছেন, "ওলীদ ছিল উঁচু মাপের একজন কবি।"

আবুল যানাদ বলেছেন, "যুহরী সবসময় হিশামের কাছে ওলীদের দোষ- ত্রুটিগুলো তুলে ধরে ওলীদকে উত্তরাধিকার মনোনীত না করার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু হিশাম তার উপদেশ গ্রহণ করেননি। যুহরী ওলীদের খিলাফতপ্রাপ্তির পূর্বেই ইন্তেকাল করেন, নতুবা ওলীদ খলীফা হওয়ার পর তাকে অত্যাচার করতো।"

যহাক বিন উসমান বলেছেন, “হিশাম ওলীদের উত্তরাধিকারের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিজ পুত্রকে উত্তরাধিকার মনোনীত করতে চাইলে ওলীদ এ কবিতাটি লিখে হিশামের কাছে পাঠালো – ‘আপনি আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেননি, যদি তা করেন তবে তার প্রতিদান পাবেন। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করছি, আপনি আমার অভিভাবকত্বের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চান। আপনি সচেতন হলে এমনটা করতেন না। আপনি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে এ কাজ করেছেন। আফসোস, আপনি তাদেরই একজন, যারা আমার দোষ- ত্রুটির অনুসন্ধান করে ইতোপূর্বে ইন্তেকাল করেছেন।’ ”

হাম্মাদ এক বর্ণনায় বলেছেনঃ একদিন ওলীদের কাছে দুইজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এসে বললো, “আমরা নক্ষত্রসূচী দেখে জেনেছি, আপনি আরো সাত বছর জীবিত থাকবেন।” হাম্মাদ বলেন, আমি মনে মনে বললাম, ওলীদকে ধোঁকা দিতে পারলে ভালোই হবে। আমি বললাম, “এরা দুইজন অসত্য প্রলাপ বকছে। আমি জ্যোতির্বিদ্যায় তাদের চেয়ে অধিক বিজ্ঞ। আমি নক্ষত্রসূচি দেখে জেনেছি, আপনি আরো চল্লিশ বছর বেঁচে থাকবেন।” এ কথা শুনে ওলীদ মাথা নীচু করলো আর বললো, “তাদের কথায় আমি বিমর্ষ হইনি আর তোমার বক্তব্যেও উদ্বেলিত হইনি। আল্লাহর কসম, আমি জীবন প্রিয় মানুষের মত সম্পদ সঞ্চয় করতে চাই। আর ব্যয় করতে চাই অন্তিম জীবনে উপনীত হয়ে যারা ব্যয় করে তাদের মতো।”

মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে রয়েছে, এ উম্মতের মধ্যে ওলীদ নামে এক জনের আবির্ভাব হবে, যে এ উম্মতের উপর ফিরাউনের চেয়েও অধিক কঠোরতা অবলম্বন করবে।

মাসালিক গ্রন্থে ফাযলুল্লাহ বলেছেন, “ওলীদ বিন ইয়াযিদ হলো অত্যাচারী, উদ্ধত, পথভ্রষ্ট, মিথ্যা শপথকারী, তৎকালীন যুগের ফিরাউন, যুগশ্রেষ্ঠ মন্দ মানব, কিয়ামতের দিন স্বজাতিকে জাহান্নামের পথ প্রদর্শনকারী, কুরআন শরীফ নিক্ষেপকারী, পাপী আর দুশ্চরিত্রবান।”

সাঈদ বিন সুলায়েম বলেছেন যে, ইবনে মুআবিয়া ওলীদকে বললেন, “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার ছাড়া কুরাইশদের আর সম্মানিত ব্যক্তিদের ছাড়া মারওয়ান পরিবারকে মর্যাদা দিতে চেয়েছেন।” এ কথা শুনে ওলীদ বললো, “তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়দের আমার উপর মর্যাদা দিতে চাও ?” তিনি বললেন, “আমি এটাকেই সঠিক জ্ঞান করি।” এরপর তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন - “আমি দুশমনদের সামনেও সত্য কথা বলতে চাই। আমি ওলীদের অভিজাত সেনাদের দেখেছি, যারা রাষ্ট্রের কাজে খুবই অলস।”

ইয়াযিদ বিন ওলীদ

ইয়াযিদ আবু খালিদ বিন ওলীদ বিন আব্দুল মালিক সৈন্যদের ভাতা কমিয়ে দেওয়ায় তাকে নাকেস (অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। চাচাত ভাই ওলীদকে হত্যা করে তিনি খিলাফতের তখত অধিকার করেন।

ইয়াযিদের মা হলেন ফরান্দ বিনতে ফিরোজ, ফিরোজের মা হলেন শিরাওয়া বিন কিসরার মেয়ে, শিরাওয়ার মা হলেন খাকান বাদশাহর মেয়ে, আর ফিরোজের নানী হলেন কায়সারের মেয়ে। এ জন্য তিনি গর্ব করে এ কবিতাটি আবৃত্তি করতেন, "আমি কিসরার নাতি, মারওয়ানের ছেলে, আর আমার নানা কায়সার ও খাকান।"

সালাবী বলেছেন, "ইয়াযিদের দাদা আর নানা উভয় দিক দিক থেকে শাহজাদা ছিলেন।"

ওলীদের হত্যাকান্ডের পর তিনি এক ভাষণে বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি গর্বিত ও উদ্ধত হয়ে আপনাদের সামনে আসিনি। দুনিয়ার মোহ আর সাম্রাজ্যের লোভ আমার নেই। আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি করুণা না করলে আমি গুনাহগার হবো। আমি আপনাদের আল্লাহ তাআলার কিতাব আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের প্রতি আহবান করছি। যখন হালালকে হারামকারীদের আর বিদআতের রক্ষকদের আবির্ভাব হয়েছে, তখন হিদায়াতের নিশান পুরনো হয়ে পড়েছে আর আল্লাহভীরুদের দীপ্তি নির্বাপিত হয়েছে। সমাজের এ চিত্র দেখে আমি আজ ভীতসন্ত্রস্ত। অন্তরের কঠোরতা আর চরিত্রের তিমিরাচ্ছন্নতা দূর করুন। আমি আপনাদের সঠিক ও সোজা পথে ফিরিয়ে নিতে চাই। আমি এ বিষয়ে ইসতেখারা করেছি। আমি আমার আত্মীয় আর বন্ধুদের বলবো, আল্লাহ তাআলা পৃথিবী আর তার বান্দাদের ভ্রষ্টাচার থেকে নিরাপদ রাখবেন। আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোন শক্তি নেই। জনতা, আমি আপনাদের একটি ইট বা একটি পাথরও অর্থহীন হতে দিবো না - এ মানসিকতা নিয়েই আমি আপনাদের নেতা হয়েছি। সংগৃহীত রাজস্ব সংশ্লিষ্ট শহর- নগরেই ব্যয় করবো, যাতে আপনারা সমানভাবে উপকৃত হতে পারেন। যদি এ শর্তে আপনার আমকে বাইআত দেন, তবে আমি আপনাদের, আর আপনাদের সেবা করা আমার জন্য ফরয, আর এ শর্ত থেকে সরে দাঁড়ালে আমার কোনো বাইআত নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমার চেয়ে কোন যোগ্য ও সাহসী ব্যক্তি থাকলে আপনারা তাকে বাইআত দিন। আর আমি আপনাদের আগে তাকে বাইআত করবো আর তার আনুগত্য করবো। আমি আল্লাহর কাছে আমার আর আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

উসমান বিন আবুল আতিকা বলেছেন, "ইয়াযিদ হলেন প্রথম খলীফা, যিনি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ঈদগাহে যান। তার খিলাফুতকালে দুর্গের দরজা থেকে ঈদগাহ পর্যন্ত অস্ত্র সজ্জিত অশ্বারোহীর দল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতো।"

আবু উসমান লাইসী কর্তৃক বর্ণিতঃ বনু উমাইয়্যাদের উদ্দেশ্যে ইয়াযিদ বললেন, "তোমরা গান- বাজনা বর্জন করো। গান মানুষের লজ্জা কমিয়ে দেয়, মনের কামনা বাড়িয়ে দেয়, মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে ফেলে, সুরা

পানের প্রবল ইচ্ছা জাগিয়ে দেয় আর যিনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কারণ গান যিনার অগ্রস্তম্ভ। পারপক্ষে নারীর কণ্ঠে গান শ্রবণ থেকে বিরত থাকো।”

ইবনে আব্দুল হাকিম বলেছেনঃ আমি ইমাম শাফীকে বলতে শুনেছি, “খলীফা হওয়ার পর ইয়াযিদ কাদিরীয়া বিশ্বাসের প্রতি মানুষদের আহবান করেন।”

তিনি বেশী দিন খিলাফত পরিচালনা করেননি। খিলাফত লাভের বর্ষেই জিলহাজ্জ মাসের সাত তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি ছয় মাস খিলাফত পরিচালনা করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৩৫ অথবা ৪৬ বছর। কথিত আছে যে, তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

ইবরাহীম বিন ওলীদ বিন আব্দুল মালিক

ইবরাহীম বিন ওলীদ বিন আব্দুল মালিক আবু ইসহাক নিজ ভাই ইয়াযিদের মৃত্যুর পর খিলাফতে তখতে আরোহণ করেন। তিনি উত্তরাধিকার মনোনীত হওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে।

বুরদা বিন সিনান বলেছেনঃ মৃত্যুর প্রাক্কালে আমি ইয়াযিদের কাছে গেলাম। কিছুক্ষণ পর প্রখ্যাত আলেম কাতান এসে ইয়াযিদকে বললেন, "আপনার প্রাসাদ তোরণে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাদের দূত হিসেবে আপনার কাছে এসেছি। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আপনি নিজ ভাই ইবরাহীমকে কেন উত্তরাধিকার মনোনীত করছেন না ?" এ কথা শুনে ইয়াযিদ রেগে গিয়ে বললেন, "আমি ইবরাহীমকে উত্তরাধিকার মনোনীত করবো ? হে আবুল উলামা, আপনিই বলুন আমি কাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করতে পারি ? আমি এ বিষয়ে কাউকে ইশারাও করবো না।" পরবর্তীতে কাতান বলেন, এরপর খলীফা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। আমি খলীফার ইন্তেকাল হয়েছে ভেবে তার কাছে বসে পড়লাম আর তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করে এর উপর সাক্ষ্যপ্রদান সাপেক্ষে লোকদের বাইআত নিলাম। বর্ণনাকারী (বুরদা বিন সিনান) বলেন, "আল্লাহর কসম, খলীফা ইয়াযিদ কাউকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেননি।"

ইবরাহীম সত্তর দিন খিলাফতেরা তখতে আসীন ছিলেন। এরপর মারওয়ান বিন মুহাম্মাদের আক্রমণের ফলে ইবরাহীম পালিয়ে যায় আর মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ লোকদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর ইবরাহীম ফিরে এসে তার বাইআত প্রত্যাহার করে রাষ্ট্রের সকল দায়িত্ব মারওয়ান বিন মুহাম্মাদের উপর অর্পণ করত তিনি নিজেও তাকে বাইয়াত দেন।

ইবরাহীম এ ঘটনার পর ১৩২ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। উমাইয়্যা বংশের পতনের সময় সিফ্‌ফাহ এর গোলযোগে তাকে হত্যা করা হয়।

তারীখে ইবনে আসাকির গ্রন্থে রয়েছে, ইবরাহীম যুহরীর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন, তার চাচা হিশামের কাছে তা বর্ণনা করেছেন আর পুত্র ইয়াকুব তার কাছ থেকে রেওয়ায়েত (বর্ণনা) করেছেন।

এক দাসী তার জননী। তিনি ১২৭ হিজরীর সফর মাসের ২৪ তারিখ সোমবারে বাইআত প্রত্যাহার করেন ।

মাদায়েনী বলেছেন, "আশ্চর্যের বিষয় হলো, অনেকেই উত্তরাধিকারের মনোনয়ন নিয়ে খলীফা ভেবে ইবরাহীমকে সালাম দিতো। অনেকই আবার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত আমীর ভেবে তাকে শ্রদ্ধা করতো, আবার কেউ তার ব্যাপারে উভয় বিষয় প্রত্যাখ্যান করতো।"

এক কবি বলেছেন, "আমরা প্রত্যেক জুমআয় ইবরাহীমের জন্য বাইআত করতাম। কিন্তু তিনি এমন এক নেতা, যিনি ধ্বংস হয়েছেন।"

কথিত আছে যে, ইবরাহীমের আংটিতে খোদাই করে লিখা ছিল- يثق با الله

মারওয়ানুল হিমার

আবু আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান বিন হাকাম হলেন উমাইয়্যা বংশের সর্বশেষ খলীফা। তিনি জদ বিন দিরহামের সহচর হওয়ার কারণে তাকে জদী বলেও ডাকা হতো।

তার হিমার বা গাধা উপাধির দুটি কারণ রয়েছে -

এক, তার ঘোড়ার পিঠে গদি লাগানোই থাকতো, দুশমনদের সাথে লড়াই করার জন্য তিনি কখনই তা খুলতেন না। যুদ্ধের জন্য তিনি অবিরাম যাত্রা করতেন। সমর গ্লানি তার সংকল্পকে ম্লান করতে পারতো না। তিনি যুদ্ধের কষ্টগুলো ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতেন। এ জন্য আরব বিশ্বে এ কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, অমুক ব্যক্তি লড়াই করার ক্ষেত্রে গাধার চেয়েও বেশী নীরবে আক্রমণ করেন - এ কারণে তিনি হিমার বা গাধা উপাধিতে ভূষিত হোন;

দুই, আরবের প্রথা ছিল, প্রত্যেক শতাব্দীর শেষ বাদশাহকে হিমার বলা হতো। উমাইয়্যা বংশের খিলাফত এক শতাব্দীর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তাকে হিমার বলা হতো।

মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ ৭২ হিজরীতে জারীরা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জারীরা শাসন করতেন। তার মা দাসী।

তিনি খিলাফত লাভের পূর্বে বড় বড় শহর, নগর ও জনপদের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১০৫ হিজরীতে কাওনিয়া দখল করেন। তিনি শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে সাহসিকতা, কঠোরতা আর সচেতনতা প্রদর্শনের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ।

ওলীদ নিহত হওয়ার সময় তিনি আর্মেনিয়া ছিলেন। সেখানে ওলীদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে তিনি তার প্রতি অনুগত মুসলমানদের বাইআত করান। এরপর ইয়াযিদের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি তার কোষাগার উন্মুক্ত করে দেন। এরপর ইবরাহীমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে পরাজিত করে নিজের বাইআত করান আর ১২৭ হিজরীর সফর মাসের মাঝামাঝিতে নিজের জন্য খিলাফতের তখত পাকাপোক্ত করেন।

খলীফা হওয়ার পর তিনি সর্বপ্রথম কবর থেকে ইয়াযিদের লাশ উত্তোলন করেন আর ওলীদকে হত্যার অপরাধে তার লাশটি শূলে ঝুলিয়ে রাখেন। এরপর চতুর্দিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ আসতে থাকে। ১৩২ হিজরী পর্যন্ত এ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। এরপর বনূ আব্বাসীয়া গোত্র তার উপর আক্রমণ করে। আব্দুল্লাহ বিন আলী সাফ্ফাহ'র চাচা আব্বাসীয়া বংশের সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন। মৌসুলের নিকটবর্তী উভয় পক্ষের লড়াইয়ে আব্দুল্লাহ তাকে পরাজিত করেন। মারওয়ান সিরিয়ায় পালিয়ে গেলে আব্দুল্লাহ তার পশ্চাৎধাবন করেন। অবশেষে তিনি মিসরে পালিয়ে গেলে আব্দুল্লাহর ভাই সালিহ এর সাথে বসীর অঞ্চলে লড়াই হয় আর ১৩২ হিজরীর যিলহাজ মাসে সালিহ তাকে হত্যা করেন।

তার শাসনামলে সাদী আল- কাবীর, মালিক বিন দিনার আল- যাহাদ, আসেম বিন আবু নুজুদ আল- মকরী, ইয়াযিদী বিন আবু হাবীব, শায়বা বিন নাসাহ আল- মাকরী, মুহাম্মদ বিন মিনকাদার, আবু জাফর, ইয়াযিদ বিন কাকা আল- মাকরী, আল- মাদানী আবু আইয়ূব সাখতিয়ানী, আবুল যানাদ, হাম্মাম বিন মানবাহ, ওয়াসেল বিন আতা প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন।

মুহাম্মাদ বিন সালিহ থেকে সূলী বর্ণনা করেছেনঃ মারওয়ানকে হত্যা করে তার ছিন্ন মাথা আব্দুল্লাহ বিন আলীর কাছে পাঠানো হলে তিনি তা এক জায়গায় রাখতে বললেন। তার কাটা মাথা এক স্থানে রাখা হলে একটি বিড়াল এসে জিহ্বা টেনে বের করে তা চাবাতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে আব্দুল্লাহ বিন আলী বললেন, "এ শিক্ষাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।"

সাফফাহঃ বনু আব্বাসের প্রথম খলীফা

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব। উপাধি আবুল আব্বাস। সাফফাহ বনূ আব্বাসের প্রথম বাদশাহ। তিনি ১০৮ হিজরী, ভিন্ন মতে ১০৪ হিজরীতে বলকার উত্তপ্ত রণাঙ্গনে জন্মগ্রহণ করেন আর সেখানেই প্রতিপালিত হোন।

কুফায় তার বাইআত গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। মাতার নাম রায়েলাতুল হারিসা। তিনি নিজ ভাই ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। চাচা ঈসা বিন আলী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বয়সে নিজ ভাই মানসুরের ছোট।

ইমাম আহমাদ মুসনাদ গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “একটি বিশৃঙ্খল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হলে আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে সাফফাহ নামক একজনের আবির্ভাব হবে। তিনি প্রচুর পরিমাণে সম্পদ লোকদের দান করবেন।”

উবাইদুল্লাহ আয়শী বলেনঃ আমার বাবা বলেছেন, “বনু আকবাসের শাসনামল যখন এলো, তখন আমার শিক্ষক বললেন - আল্লাহর কসম, বনু আব্বাসের পরিবার অপেক্ষা বড় ক্বারী, ইবাদতকারী আর দানশীল এ ভুবনে আর কেউ নেই।”

ইবনে জারীর তাবারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চাচা আব্বাস (রাঃ) কে “আপনার বংশে খিলাফত স্থানান্তর হবে” এ কথা বলার পর থেকে আব্বাসের বংশধররা খিলাফত প্রাপ্তির কামনা করতে থাকেন।

রাশিদীন বিন কুরায়েব কর্তৃক বর্ণিতঃ আবু হাশিম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন হানীফ সিরিয়া যাবার পথে মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের সাথে সাক্ষাত হলে বললেন, “হে চাচাতো ভাই, একথা কাউকে বলবেন না, আমার মন বলছে অচিরেই খিলাফত আপনাদের হাতে এসে পড়বে।” মুহাম্মাদ বললেন, “আমারও তাই মনে হচ্ছে, এ কথা আর কাউকে জানাবেন না।”

মাদায়েনী বলেনঃ আমি অনেক লোকের কাছে শুনেছি, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস তিন বার অর্থাৎ, প্রথমবার ইয়াযিদ বিন মুআবিয়ার মৃত্যুর সময়, দ্বিতীয়বার এ শতাব্দীর শুরুর দিকে আর তৃতীয়বার আফ্রিকায় বিশৃঙ্খলার সময় বলেছিলেন, আমার মনে হয় পূর্ব দিক থেকে দলে দলে লোকেরা আমাদের সাহায্য নিতে ছুটে আসবে আর তাদের সাহায্যে বনূ আব্বাসের ঘোড়াগুলো পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যাবে। ইয়াযিদ বিন আবু মুসলিম আফ্রিকায় শহীদ হওয়ার পর বারবার জাতি বিদ্রোহ করলে ইমাম মুহাম্মাদ আবু মুসলিম খুরাসানীকে একটি চিঠি দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের প্রতি লোকদের আহবান করার জন্য পাঠান। লোকেরা প্রস্তুত ছিল। এমন সময় ইমাম মুহাম্মাদ ইন্তেকাল করেন। লোকেরা তার ছেলে ইবরাহীমের কাছে বাইআত করে। এ সংবাদ পেয়ে মারওয়ান ইবরাহীমকে উঠিয়ে নিয়ে

যায় আর হত্যা করে। এরপর ইবরাহীমের ভাই সাফফার কাছে দলে দলে আমজনতা আসতে থাকে। অবশেষে ১৩২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ৩ তারিখে কুফায় সাফফাকে লোকেরা বাইআত দেয়। তিনি এসব লোকের জুমুআর নামায পড়ান আর খুৎবার মধ্যে বলেন, "সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের যিনি বিধান হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন।" এরপর তিনি কুরআন শরীফের আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে নিজ পরিবারের বিবরণ দিয়ে বললেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর ইসলামের সকল কার্যাদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের উপর বার্তায় । কিন্তু বনু হারব আর মারওয়ান তা কুক্ষিগত করে অত্যাচার শুরু করে। তারা অনেক অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। আমাদের প্রাপ্য আমাদের দেওয়া হলে আমরা সে যুগের হতদরিদ্রদের সেবা করতে পারতাম। যারা আমাদের বংশের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রেখেছে তাদেরকেও সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সে সময় আমাদের আর আহলে বাইতের কোন প্রকার ক্ষমতাই ছিল না। হে কুফাবাসী, আপনারা আমার ভালোবাসার প্রাসাদ আর বন্ধুত্বের মারকায। আপনারা কখনোই আমার ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যাবেন না। অত্যাচারীর নির্মম অত্যাচারও আমাদের পৃথক করে রাখতে পারবে না।"

ঈসা বিন আলী (বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হাশেমী, হিজাযী, বাগদাদী) হুমায়মা থেকে কুফা আসার সময় সাফফাহর সাথে চৌদ্দজন বীর সাহসী লোককে নিতে বলেন। সংবাদ পেয়ে মারওয়ান প্রতিরোধ করতে এলে তিনি নির্মমভাবে পরাজিত হোন আর তিনিসহ বনূ উমাইয়্যার অসংখ্য মানুষ আর অগনন সৈনিক নিহত হয়। এভাবে সাফফাহ গোটা পশ্চিমাঞ্চল পদানত করেন ।

যাহাবী বলেছেনঃ সাফফাহর শাসনামলে ঐক্যের ফাটল ধরায় তাহেরা থেকে সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড, গোটা স্পেন আর কিছু শহর বেদখল হয়ে যায়। এরপর সেগুলো আর হাতে আসেনি।

সাফফাহ ১৩৬ হিজরীর যিলহজ মাসে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তিনি ভাই আবু জাফরকে খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। তিনি ১৩৪ হিজরীতে খিলাফতের রাজধানী কুফা থেকে আনবারে স্থানান্তর করেন।

সূলী বলেছেনঃ সাফফাহ বিভিন্ন সময় এ কথাগুলো বলেছেন - "কুদরত বাড়লে প্রবৃত্তি হ্রাস পায়। পরহেযগারী কমে গেলে সত্য ম্লান হয়। অসভ্য সেই ব্যক্তি, যে কৃপণতা গ্রহণ আর ধৈর্যকে অসম্মান জ্ঞান করে। ধৈর্য ও নম্রতা ক্ষতির কারণ হলে ক্ষমা করে দিবে। ধৈর্য এক মহৎ গুণ। শরীয়তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত বাদশাহ কোন প্রকার বিশ্রাম নিবে না, চিন্তাভাবনা করে অবিশ্রান্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে।"

সূলী বলেছেনঃ সাফফাহ খুবই দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ওয়াদা করলে তা পূরণ না করা পর্যন্ত স্থানচ্যুত হতেন না। একবার আব্দুল্লাহ বিন হাসান তাকে বললেন, "আমি কোন দিন এক লাখ দিরহাম দেখিনি।" সঙ্গে সঙ্গে সাফফাহ এক লাখ দিরহাম নিয়ে এসে তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন। তার আংটিতে খোদাই করে লিখা ছিল - الله سقة عبد الله به يؤ من

সাঈদ বিন মুসলিম বাহালী বলেছেনঃ একদিন তিনি বনূ হাশিমসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মজলিসে বসেছিলেন। তার হাতে ছিল পবিত্র কুরআন শরীফ। এমন সময় আব্দুল্লাহ বিন হাসান এসে বললেন, "আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে আমাদের যে প্রাপ্যের কথা বলেছেন, তা আমাদের বুঝিয়ে দিন।" সাফফাহ বললেন, "তোমার পূর্বপুরুষ আলী (রাঃ) আমার চেয়ে অনেক উত্তম আর ন্যায়পরায়ণ খলীফা ছিলেন। আর তোমার পিতামহ হাসান ও হুসাইন তোমার চেয়ে অনেক উত্তম ছিলেন। তাই আমার উপর কর্তব্য আলী (রাঃ) নিজ সন্তানদের যতটুকু দিয়েছেন, আমিও তোমাকে ততটুকু দিবো - এটাই ইনসাফ। এর অতিরিক্ত প্রাপ্তির যোগ্য তুমি নও।" এ কথা শুনে তিনি নিরুত্তর রইলেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেনঃ বনু আব্বাসের শাসনামলে প্রশাসনিক দফতরগুলো থেকে আরবদের নাম বাদ পড়ে আর তদস্থলে তুর্কীরা আসে। আস্তে আস্তে সবই তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় আর পরবর্তীতে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এ সাম্রাজ্য বহু ভাগে বিভক্ত হয় আর তারা পৃথক পৃথক গভর্নরের মাধ্যমে অত্যাচারের সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

কথিত আছে, তিনি রক্ত ঝরিয়ে সকল গভর্নরের আনুগত্য অর্জন করেন। তবে তার বদ্যান্যতা ছিল অপার।

তার খিলাফতকালে যায়েদ বিন আসলাম, আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর বিন হাজাম, মদীনা শরীফের বিচারপতি রাবীআ, আব্দুল মালিক বিন উমায়ের, ইয়াহইয়া বিন আবু ইসহাক হাযরামী, সুপ্রসিদ্ধ লেখক আব্দুল হামিদ (তিনি মারওয়ানের সাথে বুসির নামক স্থানে নিহত হোন), মানসুর বিন মুতামার, হাম্মাম বিন মানবাহ প্রমুখ ওলামা ইন্তেকাল করেন।

মানসুর আবু জাফর আব্দুল্লাহ

আল- মানসুর আবু জাফর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস। তিনি ৯৫ হিজরীতে সালামা নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি দাদাকে দেখলেও তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি, বরং পিতা ও আতা বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন আর তার ছেলে মাহদীও তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তার ভাইয়ের শাসনামলে লোকেরা খিলাফতের উত্তরাধিকার হিসেবে তাকে বাইআত দেয়।

তিনি আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভীতিকর, সাহসী, দৃঢ় মেজাজের আর ধৈর্যশীল খলীফা হিসেবে পরিচিত। তিনি অঢেল সম্পদ জমা করার ক্ষেত্রে খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি খেলাধুলা, সাহিত্য ও আইনবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। তিনি অনেক বনী আদম হত্যা করার মধ্য দিয়ে নিজের একচ্ছত্র শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বিচারকের পদ প্রত্যাখ্যান করায় তিনিই তাকে বন্দী করে অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠ নিক্ষেপ করেন আর সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়। কারো মতে, ইমাম আবু হানীফা মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফতোয়া দেয়ায় তাকে বিষ পানে শহীদ করা হয়।

মানসুর স্পষ্টভাষী, কৃপণ ও লোভী ছিলেন। তিনি কর্মচারীদের থেকে এক পয়সার অষ্টমাংশেরও হিসাব নিতেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি এক- অষ্টমাংশ পয়সার প্রবর্তন করায় তাকে আবুদ দাওয়ানীক উপাধি প্রদান করা হয়।

খতীব যহাক থেকে আর তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাদের মধ্যে সাফফাহ, মানসুর আর মাহদী।" যাহাবী বলেন, "এ হাদীসটি মুনকীর মুনকাতে।" খতীব আর ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে সাফফাহ, মানসুর আর মাহদী। যাহাবী বলেন, এ হাদীসের সনদ সঠিক।

ইবনে আসাকির আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, "আমাদের মধ্যে কায়েম, মানসুর, মাহদী আর সাফফাহ। কায়েমের খিলাফত হবে রক্তপাতহীন, মানসুরের শাসন হবে কঠোর, সাফফাহ হবেন দানশীল আর মাহদী পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন।"

খলীফা মানসুর বলেছেনঃ স্বপ্নে দেখলাম আমি হারাম শরীফে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফে। কাবা শরীফের দরজা খোলা। একজন নকীব "আব্দুল্লাহ কোথায়" বলে আওয়াজ দিলো। আমার ভাই আবুল আব্বাস (সাফফাহ) সিঁড়ি বেয়ে কাবা শরীফে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর কালো পতাকা বাঁধা বর্শা হাতে তিনি বেরিয়ে এলেন। এরপর আবার "আব্দুল্লাহ কোথায়" আওয়াজ শুনলাম। এবার

আমি কাবা অভ্যন্তরে গিয়ে দেখলাম, সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর সিদীক (রাঃ), উমর ফারুক (রাঃ) আর বিলাল (রাঃ) বসা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছ থেকে ওয়াদা নেন, উম্মতের ব্যাপারে ওসীয়ত করেন, আমার মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেন, যার প্রান্ত আমার গ্রীবা পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। এরপর বললেন, "হে খলীফাদের পিতা, একে কিয়ামত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাও।"

১৩৭ হিজরীর সূচনা লগ্নে মানসুর খিলাফতের মসনদে আসীন হয়ে সর্বপ্রথম আবু মুসলিম খুরাসানী যিনি সর্বপ্রথম বনূ আব্বাসের প্রতি লোকদের আহবান করেন আর আব্বাসীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম নকীব তাকে হত্যা করেন।

১৩৮ হিজরীতে আব্দুর রহমান বিন মুআবিয়া বিন হিশাম বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান স্পেন পদানত করেন আর চারশো বছর পর্যন্ত তার বংশধর স্পেন শাসন করেন। তিনি আলেম আর ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তার জননী বারবার বংশীয় মহিলা। এজন্য লোকেরা বলতো, ইসলামের রাজত্ব দুই বারবার মহিলার সন্তানদ্বয় মানসুর আর আব্দুর রহমানের মধ্যে বন্টন হয়ে গেছে।

১৪১ হিজরীতে মৃত্যুর পর দুনিয়ায় পুনর্গমনের বিশ্বাস নিয়ে একটি ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব হলে তিনি তাদের হত্যা করেন। এ বছর তবরস্তান বিজিত হয়।

যাহাবী বলেছেনঃ ১৪৩ হিজরীতে মানসুর যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের সমবেত করে হাদীস, ফিকহ আর তাফসীর চর্চার প্রতি আহবান জানালে ইবনে জারীর মক্কায় হাদীসের কিতাব, মদীনায় ইমাম মালেক মুয়াত্তা নামক কিতাব, ইমাম আওযায়ী সিরিয়ায়, হাম্মাদ বিন সালামা বসরায়, মুআম্মার ইয়ামানে, সুফিয়ান সাওরী কুফায়, ইবনে ইসহাক মাগাযী, ইমাম আযম আবু হানীফা ফিকহ ও কিয়াস নিয়ে বিশাল গবেষণা লব্ধ ও প্রনিধানযোগ্য গ্রন্থাদি রচনা করেন। এর কিছুদিন পর হাশিম, লায়স ইবনে লাহীআ, ইবনে মুবারাক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইবনে ওহাব প্রমুখ প্রচুর সৃজনশীল রচনা সৃষ্টি করেন। অল্প দিনের মধ্যেই আরবী অভিধান, ইতিহাস, রাবীদের বর্ণনা, সীরাত ইত্যাদি বিষয়ের উপর লিখিত বই- এর ভাণ্ডার গড়ে উঠে। এর আগে ইমাম আর ওলামাগণ মুখস্থ পড়িয়ে ছাত্রদের মুখস্থ করিয়ে দিতেন, তবে কিছু কিছু লোকদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তিকা ছিল।

১৪৫ হিজরীতে মুহাম্মাদ, ইবরাহীম আর আব্দুল্লাহ বিন হাসান বিন আবু তালিবের গোটা পরিবার মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি দুই ভাইকে (মুহাম্মাদ আর ইবরাহীম) পরাজিত করে হত্যা করেন। তাদের সাথে অনেক আহলে বাইতকেও শহীদ করে দেওয়া হয়। এটা ছিল প্রথম বিশৃঙ্খলা, যা বনু আব্বাস আর আলেমদের মধ্যে সংঘটিত হয়। এর আগে উভয়ে এক ও অভিন্ন ছিল।

এরপর মানসুর মুহাম্মাদ আর ইবরাহীমকে যারা সঙ্গ দিয়েছেন অথবা সঙ্গ দেওয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন, সে সব আলেমদের কাউকে হত্যা, আবার কাউকে ভীষণ প্রহার করেন। এসব আলেমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), আব্দুল হামীদ বিন জাফর (রহঃ), ইবনে আজলান (রহঃ), ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) প্রমুখ। লোকেরা ইমাম মালেক বিন আনাসকে বলেছিলো, "আমরা যেখানে মানসুরের

বাইআতের অধীনে, সেখানে কিভাবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবো ?" ইমাম মালেক বলেছিলেন, "তোমরা স্বেচ্ছায় বাইআত করোনি, বলপূর্বক করানো হয়েছে, তাই এ বাইআত কার্যকরী নয়।"

১৪৬ হিজরীতে কবরসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

১৪৭ হিজরীতে মানসুর তার চাচা ঈসা বিন মূসা, যাকে সাফফাহ মানসুরের পর খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত করেছিলেন, তিনি তাকে বাদ দিয়ে পুত্র মাহদীকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। অথচ ঈসা বিন মূসা মানসুরের পক্ষ হয়ে ইবরাহীমের সাথে যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনেন। আর তিনি তার সাথে এ আচরণ করেন।

১৪৮ হিজরীতে স্পেন ছাড়া গোটা সাম্রাজ্য মানসুরের পদানত হয় আর তার ভয়ে কাঁপতে থাকে। তখন স্পেনে আমিরুল মুমিনীনের পরিবর্তে শুধু আমীর উপাধি ধারণ করে উমাইয়া বংশীয় আব্দুর রহমান বিন মুআবিয়া খুবই প্রতাপের সাথে শাসঙ্কার্য পরিচালনা করছিলেন, পরবর্তীতে তার ছেলেরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

১৪৯ হিজরীতে বাগদাদ নগরী পুনর্গঠনের কাজ সুসম্পন্ন হয়।

১৫০ হিজরীতে খুরাসানের সৈন্যরা আসনাদসীসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে খুরাসানের অধিকাংশ জনপদ দখল করে নিলে মানসুর চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি তিন লাখ পদাতিক আর অশ্বারোহী সৈনিকের এক সুবিশাল বাহিনী পাঠান। আজছাম নামক মানসুরের বিশেষ এলিট বাহিনী প্রাণপণে লড়াই করেও এলিট বাহিনীসহ অনেক সাধারণ সৈনিক নিহত হয়। মানসুর এ সংবাদ পেয়ে হাযেম বিন খুযাইমাকে সিপাহসালার করে তার নেতৃত্বে আবার তিনি এক লাখ সৈন্য পাঠান। উন্মুক্ত ময়দানে লড়াই শুরু হয়। আফ্রিকানরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করতে থাকে। এ যুদ্ধে সত্তর হাজার প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অবশেষে আসনাদসীস পরাজিত হয়ে স্বসৈন্যে এক পাহাড়ে আত্মগোপন করে। হাযেম তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে চৌদ্দ হাজার সৈন্য বন্দী করে আর এক বছর পর তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। আসনাদসীস দীর্ঘদিন এক দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার পর তার পিতাসহ ত্রিশ হাজার সৈন্য মানসুরের হাতে তুলে দেয়। তবে সিপাহসালার তাকে বন্দী করে সকলকে আযাদ করে দেয়।

১৫১ হিজরীতে রিসাফা শহরকে চুনা- পাথর দিয়ে দেয়াল তৈরির মাধ্যমে সুরক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়।

১৫৩ হিজরীতে বাঁশ আর পাতা দ্বারা তৈরি উঁচু এক ধরনের বিশেষ টুপি ব্যবহারের আদেশ জারি করেন।

১৫৭ হিজরীতে মানসুর সুফিয়ান ছাওরী আর উবাদা বিন কাসীরকে বন্দী করার জন্য মক্কার গভর্ণরকে নির্দেশ দেন। তিনি তাদের বন্দী করেন। তাদেরকে হত্যার আশঙ্কায় জনতা ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। এমন সময় হাজ্জের মৌসুম সমাগত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থ সবল হয়ে মক্কায় পৌছাননি। তিনি অসুস্থ হয়ে মক্কায় আসেন আর সেখানেই মারা যান। তিনি যিলহজ মাসে বতন অঞ্চলে ইন্তেকাল করেন আর তাকে হুজুন ও বিরে মাইমুনের মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করা হয়।

তার মৃত্যুকে উপজীব্য করে কবি সালিম বলেছেন, "মুহাম্মাদের পুত্রকে কবরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্তে রেখে হাজীগণ ফিরে আসেন। তাকে মক্কায় বন্ধক রাখা হয়েছে। লোকেরা আসবে, হাজ্জ পালন করবে আর জানাবে, তাদের নেতা ইহরাম অবস্থায় পাথরের নিচে শুয়ে আছে।"

ইবনে আসাকির স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেনঃ মানসুর খিলাফত লাভের পূর্বে শিক্ষা অর্জনের জন্য সফর করছিলেন। এক মনজিলে গিয়ে থামলে এক চৌকিদার বললো, "দুই দিরহাম না দিলে আমি এখানে থাকতে দিবো না।" মানসুর বললেন, "আমাকে ক্ষমা করুন, আমি বনু হাশিমের সন্তান।" সে বললো, "দুই দিরহাম দিলে থাকতে পারবেন।" তিনি বললেন, "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার বংশধর।" চৌকিদার নিজের কথায় অনড়। তিনি বললেন, আমি কুরআনের ক্বারী। চৌকিদারের দু' দিরহাম চাই। তিনি বললেন, "আমি ফকীহ, আর ইলমুল ফারায়েজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখি।" কিন্তু সে কিছুতেই তার কথা না মানায় তিনি অপারক হয়ে তার হাতে দুই দিরহাম তুলে দিলেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে সম্পদ জমার প্রতি একনিষ্ঠভাবে ঝুঁকে পড়েন।

রাবে বিন ইউনুস হাজিব বলেছেন যে, মানসুর বলেছেন, "খলীফা চার জন - আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), উমর ফারুক (রাঃ), উসমান গনী (রাঃ) আর আলী (রাঃ)। আর বাদশাহ চার জন - মুআবিয়া (রাঃ), আব্দুল মালিক, হিশাম আর আমি।"

মালিক বিন আনাস বলেছেনঃ একদিন মানসুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কে সর্বশ্রেষ্ঠ ?" আমি বললাম, "আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আর উমর ফারুক (রাঃ)।" মানসুর বললেন, "সত্য বলেছেন, আমারও অভিমত সেটাই।"

ইসমাঈল ফিহরী বলেছেনঃ মানসুর আরাফাতের দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ ভাষণ প্রদান করেন - উপস্থিতি, আল্লাহ তাআলা প্রজাবৃন্দকে সতর্ক করার জন্য আমাকে বাদশাহ বানিয়েছেন। তিনি দান করার জন্য আমাকে ধনগার দিয়েছেন। জনমণ্ডলী, পবিত্রতম এই আরাফার দিনে তোমরা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তিনি এই দিনে পবিত্র কুরআন মাজীদে তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন -

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম আর ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সুরাহ আল- মাইদাহ, ৫ : ৩)

তোমরা তার কাছে এই প্রার্থনা করো - হে আল্লাহ, আমাদেরকে হিদায়েতের পথ নির্দেশ করুন। তোমাদের সাথে তিনি আমাকেও নমনীয়তা, করুণা আর দান করার শিক্ষা দিন।"

সূলী বলেছেন, "লোকেরা তাকে কৃপণ ভাবতো বলে তিনি তার এ ভাষণের শেষাংশের কথাগুলো বলেন।"

আসমায়ী বলেছেনঃ একদিন মানসুর মিম্বরে দাঁড়িয়ে -

الحمد لله احمده ونستعينه واومن به اتو كل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

- এ পর্যন্ত বলেছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, “আমিরুল মুমিনীন, বলুন আপনি কে ?” মানসুর তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “স্বাগতম! তুমি মূল্যবান কথা বলেছো। আল্লাহর শুকরিয়া, আমি তাদের মধ্যে নই - আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করার পরও (যে) অধিক হারে পাপ কাজে লিপ্ত হয়। আমাদের ঘর থেকেই ওয়ায- নসীহত শুরু হয়েছে। হে প্রশ্নকারী, আল্লাহর কসম। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ভালো নয়। প্রসিদ্ধতা অর্জনের জন্য তা বলেছো। আমি তোমাকে ক্ষমা করছি। জনতা, এ ধরণের লোক থেকে তোমরা দূরে থাকো।” অতঃপর তিনি মূল খুৎবা যেখান থেকে ছেড়েছিলেন, সেখান থেকে আবার শুরু করেন। তিনি কাগজে লিখিত খুতবা পাঠ করতেন।

বর্ণিত রয়েছেঃ মানসুর তার ছেলে মাহদীকে এই বলে উপদেশ দেন - “হে আবু আব্দুল্লাহ, খলীফাকে পরহেযগারী আর বাদশাহকে ফরমাবরদারী ঠিক রাখতে হয়। কোন প্রজা ইনসাফ ছাড়া আনুগত্য করবে না। যে ক্ষমাশীল, সে- ই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আর যে দুর্বলের উপর অত্যাচার করে, সে নির্বোধ। চিন্তা- ভাবনা ছাড়া কোন কাজ করবে না । কারণ মননশীলতা মানুষের দর্পণ। এ দর্পণে নিজ নিজ কাজের ভুলগুলো ধরা যায়। বাবা, সবসময় নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। ক্ষমাপরায়ণ হবে। দয়ার্দ্রতার মধ্য দিয়ে শাসন করবে। মনে রাখবে, বিজয় অর্জনের পর সর্বদা নমনীয়তা ও দয়ার্দ্রতা প্রদর্শন করবে।”

মুবারক বিন ফুযালা বলেছেনঃ একদিন আমি মানসুরের কাছে বসেছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, “আমীরুল মুমিনীন, আমি হাসান (রাঃ) থেকে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন আহবানকারী এ বলে আওয়াজ দিবে - ‘যার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রদান করবেন তিনি দাঁড়াবেন, এছাড়া অন্য কেউ দাঁড়াতে পারবেন না।’ তখন সে- ই দাঁড়াবে, যে ক্ষমা করতো।” এ কথা শুনে মানসুর বললেন, তাকে ছেড়ে দাও।

আসমায়ী বলেছেনঃ মানসুর এক অপরাধীকে শাস্তি দেবার জন্য ডেকে আনলে সে বললো, “আমিরুল মুমিনীন, প্রতিশোধ গ্রহণ করা ইনসাফ, কিন্তু ক্ষমা করা মহৎ গুণ। আমি আল্লাহ্ তাআলার কাছে আমিরুল মুমিনীনের জন্য দুআ করবো, তিনি তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।” এ কথা শুনে তিনি তার ক্ষমা পত্রে স্বাক্ষর করেন।

আসমায়ী বলেছেনঃ একবার মানসুর শাম দেশে গিয়ে এক গেঁয়ো লোককে বললেন, “আল্লাহর শোকর, আমার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তিনি তোমাদের উপর থেকে প্লেগ রোগ তুলে নিয়েছেন।” গেঁয়ো লোকটি বললো, “আপনার শাসন আর প্লেগ রোগ দুটোই সমান। আল্লাহর শোকর, তিনি উভয়টি আমাদের উপর চাপিয়ে দেননি।”

মুহাম্মদ বিন মানসুর বাগদাদী বলেছেনঃ এক সাধক ব্যক্তি মানসুরের কাছে এসে নসীহত করে বললেন, “আল্লাহ তাআলা আপনাকে সকল নেয়ামত দান করেছেন। আপনি তা দিয়ে আখিরাতে নিজের

শান্তির জন্য কিছু কিনুন। আপনি সেই রাতের কথা মনে করুন, যে রাত কবর জীবনের প্রথম রাত হবে; আর সেই দিনের কথা ভেবে দেখুন, যার পর আর কোনো রাত হবে না।" এ কথা শুনে মানসুর তাকে অর্থকড়ি দেবার নির্দেশ দিয়ে নীরব হয়ে গেলেন। সাধক বললেন, "আমি আপনার অর্থ- কড়ির আশা করলে আপনাকে নসীহত করার সওয়াব পেতে পারি না।"

আব্দুস সালাম বিন হরব বলেছেনঃ একদিন মানসুর আমর বিন উবায়েদকে ডেকে এনে তার সামনে অনেক সম্পদ পেশ করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করায় মানসুর বললেন, "আল্লাহর কসম, তোমাকে তা গ্রহণ করতেই হবে।" তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি তা কখনই ছুঁবো না।" মাহদী আমরকে বললেন, "আমিরুল মুমিনীন তো কসম করেছেন।" তিনি বললেন, "আমিরুল মুমিনীনের কাফফারাহ আদায় করা আমার চেয়ে বেশী সহজ।" মানসুর বললেন, "আপনি জানেন যে, আমি মাহদীকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেছি।" তিনি বললেন, "মৃত্যুর সময় আপনি অন্যের বিষয় নিয়ে চিন্তিত! আপনার স্মরণ নেই তখন তিনি হবেন শাসনকর্তা।"

আব্দুল্লাহ বিন সালিম বলেছেনঃ বসরার বিচারপতি সাওয়ার বিন আব্দুল্লাহকে এ মর্মে পত্র লিখলেন – "জমিজমা নিয়ে বিরোধ সংক্রান্ত যে মামলা আপনার কাছে আছে, তা ব্যবসায়ীর পক্ষে রায় দিবেন।" জবাবে বিচারপতি মানসুরকে সাফ জানিয়ে দিলেন – "আল্লাহর কসম, আমি ইনসাফের বিপক্ষে রায় দিবো না।" মানসুর আবার নির্দেশ দেওয়ার পর তিনি একই জবাব দিলে মানসুর বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। আমার নিয়োগকৃত বিচারপতি আদালতে সত্যের পক্ষে লড়তে গিয়ে আমার বিরোধীতা করতে পারেন।"

কথিত আছে, এক ব্যক্তি কর্তৃক বিচারপতি সওয়ারকে তলব করে বাদী- বিবাদীর সামনে মানসুর হাঁচি দিলেন। বিচারপতি এর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ না বলায় তিনি কারণ জানোতে চাইলে সওয়ার বললেন, "আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলেননি।" মানসুর বললেন, "মনে মনে বলেছি।" তিনি বললেন, "আমিও মনে মনে বলেছি।" মানসুর বললেন, "আপনি যেহেতু আমার পক্ষপাতিত্ব করলেন না, সেহেতু আমার বিশ্বাস, আপনি অন্যায়ভাবে কারো পক্ষ নিতে পারেন না। তাই আপনি নিজ পদে ফিরে যান।"

নামীর মাদয়ী বলেছেনঃ একদিন মানসুর মদীনায় এলে কিছু উষ্ট্রিচালক মানসুরের বিরুদ্ধে মদীনার বিচারপতি মুহাম্মাদ বিন ইমরানের কাছে কোনো এক বিষয়ে অভিযোগ করলো। আমি সে সময় বিচারপতি মুহাম্মাদ বিন ইমরানের নিয়োগ করা কেরানী। তিনি খলীফার বিরুদ্ধে আমাকে সমান জারি করার নির্দেশ দিলেন। আমি নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে দিলাম। তিনি আব্বার তাকিদ দিলেন। অবশেষে আমি অভিযোগলিপি লিখে তাতে মোহর লাগিয়ে দিলাম। এরপর বিচারপতি এ পত্র নিয়ে যেতে বললেন। আমি তা নিয়ে মন্ত্রী রবীর কাছে গেলাম। তিনি খলীফার কাছে গিয়ে তাকে বিষয়টি জানালেন। তার কাছ থেকে ফিরে এসে রবী বললেন, আমিরুল মুমিনীন বলেছেন, আমাকে আদালতে ডাকা হয়েছে, আমার সাথে কেউ যেতে পারবে না। অবশেষে মানসুর আর রবী উভয়ে আদালতে এলেন। খলীফার সম্মানার্থে আমাদের কেউ দাড়ালো না।

বিচারপতি চাদর পড়ে নিজ আসনে বসলেন। বিচারের বাদী পক্ষকে ডাকা হলো। উভয়ের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি খলীফার বিরুদ্ধে রায় দিলেন। বিচার কাজ শেষে মানসুর বললেন, "আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এ ইনসাফপূর্ণ বিচারের জন্য আমি আপনাকে দশ হাজার দিনার প্রদান করছি।"

মুহাম্মাদ বিন হাফয আল- আজলী বলেছেনঃ আবু দালামার পুত্র সন্তান হলে তিনি এ খবর মানসুরকে জানানোর পর এ কবিতা আবৃত্তি করলেন - "অলৌকিকতা আর বুযর্গীর কারণে কেউ যদি সূর্যে গিয়ে উপবেসন করেন, হে আব্বাস সন্তান সেটা আপনি; কারণ আপনিই লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" এ বলে আবু দালামা একটি থলি বের করে মানসুরের সামনে রাখলেন। মানসুর বললেন, "এটা কি ?" আবু দালামা বললেন, "আপনি যা দিতেন, আমি এর মধ্যে আপনাকে তাই দিয়েছি।" এরপর মানসুর থলিটি ভরে দিরহাম দিতে বলেন। বস্তুত সেই থলিতে আরো দুই হাজার দিরহাম ধরেছিলো।

মুহাম্মদ বিন সালাম জামহী বলেছেনঃ এক ব্যক্তি মানসুরকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনার কোনো আশা অপূর্ণ রয়েছে কি ?" তিনি বললেন, "একটি আকাঙ্ক্ষা বাকী রয়ে গেছে। আর তা হলো, আমি এক চত্বরে বসে থাকবো, আর আমাকে ঘিরে বসবে আসহাবে হাদীসের একটি দল।" রাবী বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি রহম করুন। এরপর তিনি অন্যান্য আলোচনা করলেন। পরদিন মন্ত্রীদের ছেলেরা তার কাছে এসে বললো, "নিন, আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।" মানসুর বললেন, "এরা তো সেই লোক নয় (যারা হাদীসের চর্চা করবে), তাদের পোশাক হবে ময়লা আর বেহাল অবস্থা। তাদের পদযুগল হবে নগ্ন, মাথার চুল হবে লম্বা, তারা হবেন মুসাফির; আর তারাই হাদীস নকলের কাজ করবেন।"

আব্দুস সামাদ বিন আলী মানসুরকে বললেন, "আপনি এমনভাবে শাস্তি দেন যে, মনে হয় ক্ষমা শব্দটি কখনোই আপনি শোনেননি।" মানসুর বললেন, "বনূ মারওয়ানের রক্ত এখনও শুকায়নি আর আবু তালিব পরিবারের তলোয়ারগুলো এখনও খাপবদ্ধ হয়নি। আমরা এখন পর্যন্ত ঐ জাতির মধ্যে বসবাস করছি, তারা কিছুদিন আগে আমাদেরকে বাজারে ঘুরতে দেখেছে, অথচ আজ খলীফা হিসেবে দেখছে। এখনও আমাদের দাপট লোকদের অন্তরে বসেনি। লোকেরা যেন আমাদের ক্ষমার কথা ভুলে না যায় আর সর্বদা যেন শাস্তির জন্য প্রস্তুত না থাকে।"

ইউনুস বিন হাবীব বলেছেনঃ একবার যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ হারেসী সাহিত্যরসে সিক্ত আর পণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় নিজের বেতন- ভাতা বৃদ্ধির জন্য মানসুরের নিকট চিঠি লিখলেন। জবাবে মানসুর লিখলেন, "ভাষার অলংকার আর অহংকার একত্রিত হলে সেই লোকের মধ্যে গর্ব ফুটে উঠে। আমিরুল মুমিনীন তোমার ব্যাপারে এ আশঙ্কাই করছেন। তুমি এ অহংকার মিশ্রিত ভাষা বর্জন করো।"

মুহাম্মাদ বিন সালাম বলেছেনঃ একদিন মানসুরকে তালিযুক্ত পোশাক পরতে দেখে এক বাঁদি বললো, "ইনি খলীফা, কিন্তু পোশাক তা প্রমাণ করে না।" মনসুর বললেন, "আফসোস! তুমি কি ইবনে হরামার এ কবিতা শুনোনি - 'পুরনো চাদর আর তালিযুক্ত পোশাক পরিহিতরাও মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন।' "

আসাকেরী 'আওয়ায়েল' গ্রন্থে লিখেছেনঃ উমাইয়া বংশের আব্দুল মালিকের মতো আব্বাসীয় বংশের মানসুর ছিলেন কৃপণ। এক ব্যক্তি তাকে তালি দেওয়া পোশাক পড়তে দেখে বললো, আল্লাহ্ তাআলার কুদরত, তিনি মানসুরের রাজত্বকে দরিদ্রতার সাথে সংযুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে মুসলিম আল- হাদী একটি গান গাইলো। তিনি পাশেই ছিলেন। তিনি এ গান শুনে আনন্দিত হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে তাকে অর্ধেক দিরহাম বখশিশ দিলেন। মুসলিম আল- হাদী বললো, "আমার গান শুনে হিশাম দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন।" মানসুর বললেন, "এ ব্যাপারে বাইতুল মালের অর্থ খরচ করা জায়েয নেই। তবে কেউ যদি শর্ত করে, সে কথা ভিন্ন।"

আসাকেরী 'আওয়ায়েল' গ্রন্থে লিখেছেনঃ ইবনে হারামা মদ পান করতো। একবার সে মানসুরের কাছে এসে এ কবিতাটি আবৃত্তি করলো - "তার দৃষ্টি তখতের আশেপাশে নিবদ্ধ, যেখানে শাস্তি ও পুরস্কার উভয়টাই রয়েছে। তখত যাকে নিরাপত্তা দেয়, ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও সে নিরাপত্তা পায়; আর যাকে ধ্বংস করে, তার মা কেঁদে ফেরে।" এ কবিতা শুনে মানসুর খুশি হয়ে বললেন, "তুমি কি চাও ?" হারামা বললো, "আপনি মদীনার শাসনকর্তাকে লিখে পাঠান, তিনি আমাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখলে আমার প্রতি যেন হদ জারি (আশি বেত্রাঘাত) না করেন।" তিনি বললেন, "আমি কিছুতেই শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম করতে পারবো না।" সে বললো, "তাহলে আমার জন্য বিকল্প একটা কিছু করুন।" মানসুর মদীনার শাসনকর্তকে লিখলেন, "যে ইবনে হারামাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধরে আনবে, তাকে একশো বেত্রাঘাত আর ইবনে হারামাকে আশি বেত্রাঘাত করবেন।" এ নির্দেশ পাওয়ার পর মদীনার শাসনকর্তা যদি নিজেও নেশায় বুদ হতে দেখতেন, তাহলে তাকে এ বলে ছেড়ে দিতেন, "আশি বোত্রাঘাত লাগানোর জন্য কে একশো বেত্রাঘাত খাবে।" মানসুর একবার তার কবিতা শুনে খুশি হয়ে তাকে দশ হাজার দিরহাম দিয়ে বললেন, "হে ইবরাহীম, (ইবনে হারামা) একে সাবধানতার সাথে খরচ করবে। তোমার জন্য আমার পক্ষ থেকে আর কিছু নেই।" ইবনে হারামা বললো, "আমি এগুলো শক্ত মোহর দিয়ে এঁটে রাখবো আর তা পুলসিরাত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবো।"

মানসুর অনেক কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তন্মধ্যে দুটি চরণ এমন - "তুমি জ্ঞানী হলে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলভাবে শক্ত করবে, কারণ ভঙ্গুর ইচ্ছাশক্তি মানুষকে দোদুল্যতায় নিক্ষেপ করে। শত্রু পক্ষের উপর বিজয় অর্জনের পর তাদেরকে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দিবে না।"

আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন ইনআম আফ্রিকী বলেছেনঃ আমি মানসুরের সাথে পড়ালেখা করেছি, একবার তিনি আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন আর আমার জন্য খাবার এলো, যার মধ্যে গোশত ছিল না। মানসুর সেবিকাকে বললেন, "মিষ্টি নেই ?" সে বললো, "না।" তিনি বললেন, "খেজুর নেই ?" সে বললো, "না।" এ কথা শুনে তিনি শুয়ে গেলেন আর এ আয়াত পাঠ করলেন -

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ

মানসুর খিলাফত পাওয়ার পর আমি তার কাছে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "উমাইয়া বংশের মোকাবিলায় আমাদের রাজত্ব কেমন ?" আমি বললাম, "কোনো বাদশাহ'র যুগে এত অত্যাচার হয়নি, যা এখন হচ্ছে।" মানসুর বললেন, "আমি কোনো সাহায্যকারী পাইনি।" আমি বললাম, "উমর বিন আব্দুল আযীয বলেছেন, বাদশাহকে বাজারের সাথে উপমা দেয়া যায়। বাজারে সর্বাধিক বিক্রিত দ্রব্যাদিই আমদানি হয়। বাদশাহ দানশীল আর সাধক হলে তার কাছে এমন লোকরাই আসবে, আর বাদশাহ বদকার ও পাপাচারী হলে এমন লোকেরই সঙ্গ মিলবে।" এ কথা শুনে মানসুর মাথা নিচু করে ফেলেন।

মানসুরের বাণী হলঃ তিনটি বিষয় ছাড়া বাদশাহগণ সকল কথা শুনতে রাজি। এক - গোপন তথ্য ফাঁস না করা; দুই - হারাম কাজে বাধা প্রদান; এবং তিন - সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়া। সূলী আরেকটি সংযোজন করেছেন - শত্রুর হাত প্রসারিত করলে হাত কেটে ফেলবে।

ইসহাক মসূলী বর্ণনা করেছেনঃ খাবার-দাবার ইত্যাদির সময় মানসুর নিজ সাথীদের সাথে একত্রে বসতেন না। উভয়ের মাঝে বিশ গজের একটি পর্দা ঝোলানো থাকতো। এ পর্দা থেকে উভয়ে বিশ গজ দূরত্বে বসতেন। আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে মাহদী সর্বপ্রথম সাথীদের সাথে একত্রে বসতেন।

সূলী বলেছেনঃ একদিন মাছি মানসুরকে খুব বিরক্ত করলে তিনি মুকাবিন বিন সুলায়মানকে ডেকে মাছি সৃষ্টির রহস্য জানোতে চাইলে তিনি বলেন, "মাছিরা অত্যাচারীদের অপমানিত করে।"

মুহাম্মাদ বিন আলী খুরাসানী বলেছেনঃ খলীফা মানসুর সর্বপ্রথম কবিদের সভাসদ হিসেবে নিয়োগ করেন আর তাদের পরামর্শে কাজ করেন। তিনি সর্বপ্রথম অনারব সুরিয়ানী ভাষায় আরবী গ্রন্থাদি অনুবাদ করেন। মানসুর সর্বপ্রথম অনারব লোকদের আহলে আরবদের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এভাবে একদিন আসে, যখন আরবের লোকদের জন্য শাসনকর্তা হওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যায় আর তাদের নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়।

মানসুর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহঃ

সূলী বলেছেনঃ মানসুর তৎকালীন যুগের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস আর বংশ তালিকা মুখস্থের দিক দিয়ে প্রথিতযশা পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

ইবনে আসাকির 'তারিখে দামেশক' গ্রন্থে লিখেছেনঃ খলীফা মানসুর তার বাবা, তার দাদা আর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাতে আংটি পড়তেন।"

সূলী মানসুরের বরাত দিয়ে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার আহলে বাইত নূহ (আঃ) এর কিশতীর মতো। যারা এতে আরোহণ করবে তারা পরিত্রাণ পাবে, আর যারা দাঁড়িয়ে থাকবে (আরোহণ করবে না) তারা ধ্বংস হবে।"

মানসুর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি যখন কাউকে আমীর বানিয়ে তার জন্য মাসিক ভাতা নির্ধারণ করে দিবো, যদি সে এর চেয়ে বেশী নেয়, তবে সে আত্মসাৎকারী।" (সূলী)

ইয়াহইয়া বিন হামযা হাযরামী বলেছেনঃ আমি আমার পিতার কাছ থেকে জেনেছি যে, খলীফা মাহদী তাকে দায়িত্ব দেওয়ার পর বলেন, নির্দেশ বাস্তবায়নে কঠোরতা অবলম্বন করবে না। কারণ আমার পিতা মানসুরের কাছে জেনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমার সম্মান ও মর্যাদার কসম, আমি জালেমের থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিশোধ নিবো। মজলুমকে দেখেও যারা সাধ্যমত সাহায্য করে না, তাদেরও বদলা নিবো।" (সূলী)

সুলী আবু ইসহাকের বরাত দিয়ে মানসুর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন, "চাঁদের শেষ তিন তারিখে ভ্রমণ করবে না।"

মানসুরের শাসনামলে বর্ণিত ওলামাগণ পরলোক গমন করেন - ইবনে মুকফাআ, সুহায়েল বিন আবু সালিহ, আলা বিন আব্দুর রহমান, মিসরের আইনবিদ খালিদ বিন ইয়াযিদ, দাউদ বিন আবু হিন্দ, আবু হাযিম, সালামা বিন দিনার আল- আরাজ, খাত্তা বিন আবু মুসলিম খুরাসানী, ইউনুস বিন উবায়েদ, সুলায়মান আল- আহওয়াল, বিখ্যাত মাগাযী গ্রন্থের লেখক মূসা বিন উকবা, আমর বিন উবায়েদ মুতাযালী, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারী কালবী, ইবনে ইসহাক, জাফর বিন মুহাম্মাদ সাদেক আমাশ, শবল বিন উবাদা মাকরী মক্কা, মদীনার আইনবিদ মুহাম্মাদ বিন আজলান, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা, ইবনে জারীর, ইমামে আযম আবু হানিফা, হাজ্জাজ বিন আরতাত, হাম্মাদ, রুবা শায়ের হায়েরী, সুলায়মান তামীমী, আসেম আল আহওয়াল, ইবনে শাবারামা আল- যবী, মোতেল বিন হাইয়ান, মুকাতিল বিন সুলায়মান, হিশাম বিন উরওয়া, আবু আমর বিন আলা, হামযা বিন হাবীব প্রমুখ।

মাহদী

আল- মাহদী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মানসুর ১২৭ হিজরীতে আইদবিজ নামক স্থানে, ভিন্ন মতে ১২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতার নাম উম্মে মূসা বিনতে মানসুর আল- হুমায়রিয়া।

তিনি ছিলেন খুবই দানশীল, জনপ্রিয় আর প্রশংসিত। তিনি সুন্দর চেহারা আর নির্মল বিশ্বাসের অধিকারী। তিনি ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের মূলোৎপাটন করেন। মাহদী প্রথম খলীফা, যিনি প্রাথমিক জীবনে ভ্রান্ত মতে বিশ্বাসীদের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

তিনি পিতা মানসুর আর মুবারাক বিন ফুযালা থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, আর তার থেকে ইয়াহইয়া বিন হামযা, জাফর বিন সুলায়মান আনসাবয়ী, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রাকাশী, আবু সুফিয়ান, সাঈদ বিন ইয়াহইয়া আল- হুমায়রী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী বলেছেনঃ মাহদীর রেওয়ায়েতকে (বর্ণনাকে) কেউ খণ্ডন আর পরিমার্জন করেনি।

উসমান থেকে ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মাহদী হবেন আমার চাচা আব্বাসের বংশধর।" এ হাদীস মাওযু।

আবু দাউদ আর তিরমিযী শরীফে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসটি হলো, "মাহদীর নাম আমার নামের সাথে আর তার পিতার নাম আমার পিতার নামের সাথে মিল থাকবে।" (টীকাঃ তাই এই "খলীফা মাহদী" সেই মাহদী নন, যার সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদিস থেকে তার ব্যাপারে জানা যায়, সেই 'আল- মাহদি'র নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, যিনি শেষ জমানায় এসে তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন আর ঈসা আলাইহিস সালাম তার ইমামতিতে সালাত আদায় করবেন)

মাহদী যৌবনপ্রাপ্ত হলে মানসুর তাকে তিবরিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি সেখানে জ্ঞান চর্চা ও আলেমদের সহচার্য গ্রহণে ভালো মন্দ বিচারের ক্ষমতা অর্জন করলে মানসুর তাকে খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।

মানসুরের ইন্তেকালের সংবাদ বাগদাদে গিয়ে পৌছলে আমজনতা সেখানে মাহদীর কাছে বাইআত দেয়। এরপর তিনি মিম্বরে দাড়িয়ে এ ভাষণ প্রদান করেন –

"আমিরুল মুমিনীনও এক আল্লাহর বান্দা। ডাক আসলে তিনিও চলে যাবেন, অথবা কোন নির্দেশ এলে তা পূর্ণমর্যাদায় বাস্তবায়ন করবে।"

এ কথা বলতে বলতে তার চোখ দুটো অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি আবার বলতে লাগলেন –

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই বন্ধুর পৃথক হওয়ায় কেঁদেছিলেন। আর আমি প্রথমত বাবার শোকে মুহ্যমান, আর দ্বিতীয়ত, আমার উপর খিলাফতের বোঝা অর্পিত হয়েছে। আমিরুল মুমিনীনের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। আমি মুসলমানদের খিলাফত পরিচালনার জন্য তারই সাহায্য প্রার্থনা করছি। উপস্থিতি, আপনার আমার আনুগত্যের প্রকাশ যেভাবে করেছেন, ঠিক সেভাবেই আমার আদেশ পালন করার জন্য নিজেদের মনকে প্রস্তুত করুন, যাতে আমি আপনাদের খেদমত করতে পারি আর প্রতিটি কাজের ফলাফল সুন্দর হবে। আপনাদের মধ্যে যারা ইনসাফের প্রসার ঘটাতে চায়, আমি তাদের ফরমাবরদারী করবো। আপনাদের উপর কঠোরতা হলে আমি তা দমন করার চেষ্টা করবো। আমি আপনাদের প্রতি সাধ্যমত সর্বদা প্রশান্তির শীতল বাতাস ছড়িয়ে দিবো। আপনাদেরকে কষ্ট থেকে পরিত্রাণ দিতে আর ইহসান করতে আমি জীবনকে উৎসর্গ করবো।"

লাফযুয়া বলেছেনঃ ধনভাণ্ডারপ্রাপ্ত হলে মাহ্দী অত্যাচারীদের দমন করার জন্য প্রচুর ব্যয় করেন। অভাবীদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যাপক খরচ করেন। তিনি গভর্নরদের পুরস্কার দেন আর পরিবার- পরিজন ও গোলাম বাঁদিদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন।

তিনি বলেনঃ আবু দালামা সর্বপ্রথম মাহ্দীকে তার খিলাফতের সুসংবাদ আর তার পিতার মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আবু দালামা খিলাফতের জন্য অভিনন্দন আর বাবার মৃত্যুতে সমবেদন জানাতে গিয়ে মাহ্দীর সামনে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন - "আমার চক্ষুদ্বয় আজব দৃশ্য দেখছে। এক দিকে খিলাফতের আনন্দ, অন্য দিকে বইছে শোকের অশ্রু। সর্বদা একটি চোখ রোদন করছে, অন্যটি হাসছে। একটি কষ্ট ভারী মনে হলেও অপর প্রান্তে রয়েছে খুশী ও আনন্দ। এক খলীফার মৃত্যুতে দুঃখ পেলেও অপর দয়ার্দ্র খলীফার তখতে আরোহণের খুশি ছড়িয়ে পড়েছে। একজন খলীফা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দ্বীনের উপর ইন্তেকাল করার পর সহকারী এসেছে আপনার কাছে। আল্লাহ তাকে হিদায়েত দিন, খিলাফতের মর্যাদা দান করুন আর জান্নাতুন নাঈমের পথে পরিচালিত করুন।"

১৫৯ হিজরীতে মাহদী তার দুই ছেলে মূসা হাদী, এরপর হারুন রশীদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।

১৬০ হিজরীতে ভারতের আরবাদ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়। মাহদী এ বছর হাজ্জ আদায় করেন। পর্দার ভারে কাবা গৃহ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় কাবা শরীফে মাহদী কর্তৃক নির্দিষ্ট পর্দা ছাড়া অতিরিক্ত পর্দা দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মাহদীর জন্য মক্কায় বরফ সরবরাহ করা হয়। যাহাবী বলেন, "মাহদী ছাড়া অন্য কোন খলীফার জন্য মক্কায় আর কোনো দিন বরফ তৈরি বা সরবরাহ করা হয়নি।"

১৬১ হিজরীতে মাহ্দী মক্কা শরীফে প্রশস্ত রাস্তা, ভবন আর পানির হাউস তৈরি করেন। তিনি জামে মসজিদগুলোর গভীর মিহরাব তৈরির প্রক্রিয়া বন্ধ আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের অনুরূপ ছোট মিম্বার নির্মাণ করেন।

১৬৩ হিজরী আর এর পরবর্তীতে রোমান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল বিজিত হয়।

১৬৬ হিজরীতে তিনি দারুস সালামকে দারুস সুলতানাত হিসেবে অভিহিত করেন আর এখান থেকে মক্কা, মদীনা ও ইয়ামানের সাথে উট ও খচ্চরের মাধ্যমে ডাক যোগাযোগ স্থাপন করেন। যাহাবী বলেছেন, মাহদীই সর্বপ্রথম হিজায থেকে ইরাক পর্যন্ত ডাক ব্যবস্থা চালু করেন। এ বছর তিনি অনেক জায়গায় পথভ্রষ্টদের সাথে সরাসরি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন।

১৬৭ হিজরীতে মসজিদে হারাম সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। এতে অনেক ঘর বাড়ি ভেঙ্গে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৬৯ হিজরীতে একবার মাহদী এক শিকারের পেছনে ঘোড়া ছুটান, শিকারটি এক পুরনো বাড়ির মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করে। ঘোড়াটিও শিকার ধরার জন্য প্রাণপণে ছুটে চলে। দ্রুত চলতে গিয়ে বাড়িতে ঢোকার সময় মাহদীর কোমরে এমনভাবে আঘাত লাগে যে, সেখানেই তার জীবন সাঙ্গ ঘটে। সেদিন ছিল ১৬৯ হিজরীর মুহাররম মাসের ২২ তারিখ। কারো মতে বিষ খাইয়ে তার মৃত্যু হয়। সালেম আল- খাতির মাহদীর মৃত্যুতে একটি করুণ শোক গাঁথা রচনা করেছেন।

সূলী বলেছেনঃ এক রমণী মাহদীর কাছে এসে বললো, “রাসুলুল্লাহ’র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হে বংশধর, আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিন।” তিনি বললেন, “এ শব্দগুলো আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনিনি।” এরপর তিনি তাকে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিলেন।

কুরাইশ খাত্তালী বলেছেনঃ সালেম বিন আব্দুল কুদ্দুস বসরীকে অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্য মাহদীর সামনে হাযির করা হলো। তিনি তাকে হত্যা করতে চাইলেন। সে বললো, “আমি ভ্রান্ত আকীদা গ্রহণের জন্য তাওবা করছি।” এরপর সে একটি কবিতা আবৃত্তি করলো। তিনি ক্ষমা করে দিলেন। সে চলে যেতে উদ্যত হলে তিনি তাকে বললেন, “তোমার পঠিত কবিতার একটি চরণ তুমি গোপন করেছো। আর যা হল- ‘বৃদ্ধকালে কোন লোক তার অভ্যাস ছাড়তে পারে না।’ ” সে বললো, “হ্যাঁ।” এরপর তিনি তাকে হত্যার আদেশ দিলেন।

যহির বলেছেনঃ দশজন হাদীস বিশারদ মাহদীর কাছে এলেন। যাদের মধ্যে ফরজ বিন ফুযালা আর গায়াস বিন ইবরাহীমও ছিলেন। মাহদী কবুতর নিয়ে খেলতে ভালোবাসতেন। মাহদী গায়াস বিন ইবরাহীমকে বললেন, একটি হাদিস শোনান। তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন - অশ্বারোহী, তীরন্দাজ (মাহদীর কারণে হাদীসের মধ্যে এতটুকু বৃদ্ধি করে বললেন), পাখিপ্রেমীদের মোকাবিলা করা জায়েয নেই। মাহদী এটি শুনে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিলেন। গায়াস যাবার সময় (মাহদীর মনে হলো, তাঁকে খুশি করার জন্য সে হাদীসের কিছু অংশ বৃদ্ধি করেছে।) তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি মিথ্যা বলেছেন আর মিথ্যার বেড়াজালে অর্থ উপার্জন করেছেন। এরপর তিনি কবুতরগুলো যবেহ করার নির্দেশ দেন।

কথিত আছেঃ একবার শরীক মাহদীর কাছে এলে মাহদী বললেন, “হয় আমার আনুগত্য করতে হবে, নতুবা আমার ছেলেদের ইলম শিক্ষা দিতে হবে, না হয় আমার সাথে খাবার খেতে হবে - এ তিনটির মধ্যে যে কোন একটি আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে।” শরীক কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, “আপনার সাথে খাবার খাওয়াই

সবচেয়ে সহজ।” মাহদী দস্তরখানে বিভিন্ন প্রকার খাবার দিতে বললেন। খাদ্য গ্রহণের সময় শাহী বাবুর্চি বললো, “হযরত, এখন আপনি ফেঁসে গেছেন।” বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এরপর শিক্ষাদান শুরু করেন আর আনুগত্য গ্রহণ করেন।

বাগবী জাদিয়াদ গ্রন্থে হামদান ইস্পাহানী থেকে রেওয়ায়েত করেছেনঃ আমি একদিন শরীকের সাথে বসেছিলাম। মাহদীর ছেলে এসে হেলান দিয়ে বসে শরীককে একটি হাদীস জিজ্ঞেস করলো। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সে আবার প্রশ্ন করলো। তিনি কোনোই ভ্রুক্ষেপ করলেন না। শাহজাদা বললো, “আপনি খলীফার বংশধরকে অবজ্ঞা করছেন।” শরীক বললেন, “আহলে ইলমদের দৃষ্টিতে ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে শাহজাদার বিশেষ কোন মর্যাদা নেই।” এরপর সে আদবের সাথে বসে আবারো প্রশ্ন করলে শরীক বললেন, “হ্যাঁ, এটা হল তালাবে ইলমদের পদ্ধতি।”

মাহদী অনেক কাব্য- কবিতা আবৃত্তি করেন। সূলী মুহাম্মদ বিন আম্মারাহ থেকে নকল করেনঃ মাহদী এক বাঁদির প্রেমে পড়েন। একদিন বাঁদির মনের ভাব বুঝার জন্য তিনি এক ব্যক্তিকে বাঁদির কাছে পাঠান। লোকটি কথা বললে বাঁদি তাকে বললো, “আমার ভয় হচ্ছে, তিনি আমাকে বিরক্ত করবেন আর বর্জন করবেন। আর এতে আমার মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে।” এ প্রেক্ষিতে মাহদী এই কবিতাটি পাঠ করেন - “চাঁদের চেয়েও কোমল এক প্রেমিকা আমার অন্তর জয় করেছে। তার প্রতি আমার প্রেম বিশুদ্ধ, অথচ সে অসুস্থতার বাহানা করছে, আবার সে পৃথকও হয়ে যায় না।”

উমর বিন ইয়াযিআ হলো মাহদীর বন্ধু। তিনি তার সম্বন্ধে এ কবিতা রচনা করেন - “হে আল্লাহ, আমার একান্ত বন্ধু আবু হাফযের জন্য আমার অবদানকে পরিপূর্ণ করে দিন। গান, বদান্যতা, সুগন্ধ, বাঁদী, সুরা আর আভিজাত্যের মধ্যে আমার জীবন সীমাবদ্ধ।”

গ্রন্থকার বলেন, “আমার মতে মাহদীর কবিতাগুলো পিতা মানসুর আর তার ছেলেদের চেয়েও সৌন্দর্যের রসে সিক্ত। তিনি কবিদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত।”

সূলী আবু কারীমা থেকে নকল করেছেনঃ মাহদী হঠাৎ এক বাঁদির কক্ষে ঢুকে পড়ে। বাদি সে সময় কাপড় খুলে অন্য কাপড় পরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। মাহদীকে আসতে দেখে তড়িঘড়ি করে সে হাত দিয়ে সতর ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে। মাহদী হেসে উঠে এ কবিতাটি আবৃতি করেন - “আমার চক্ষু আমাকে ধ্বংসের দৃশ্য দেখিয়েছে।”

ইসহাক মসূলী বলেনঃ মাহদী এক বছর পর্যন্ত সাথীদের সাথে পর্দার আড়ালে বসতেন। পরে পর্দা উঠিয়ে দেয়া হলে এক ব্যক্তি বললো, “আপনার জন্য পর্দাই উত্তম ছিল।” মাহদী বললেন, “দেখার মধ্যে যে তৃপ্তি, অদৃশ্যে তা নেই।”

মাহদী বিন সাবেক বলেছেনঃ একদিন মাহদী একটি ছোট্ট সেনাদল পরিবেষ্টিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে এক যাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি চিৎকার করে এ কবিতা আবৃত্তি করে - “খলীফাকে জানিয়ে দাও, আপনার হাতিম

বিশ্বাসঘাতক। আপনি আল্লাহকে ভয় করুন আর আমাদেরকে হাতিম থেকে রক্ষা করুন। যদি সৎ লোক বিশ্বাসঘাতককে সাহায্য করে, তার সওয়াবও গুনায় পরিণত হবে।" এ কবিতা শুনে মাহদী নির্দেশ দিলেন, "আমার সাম্রাজ্যে হাতিম নামে যে গভর্নর আছে, তাকে অপসারণ করো।"

আবু উবায়দা বলেছেনঃ মাহদী বসরায় এলে জামে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াতেন, একদিন তিনি এলেন। লোকেরা নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। এক গ্রাম্য লোক বলে উঠলো, "আপনার পেছনে নামায পড়ার খুব ইচ্ছা। কিন্তু আমি অযূ করিনি।" মাহদী মুসল্লিদের লোকটির জন্য অপেক্ষা করতে বলে তিনি নিজেও মিহরাবে দাড়িয়ে তার অপেক্ষায় রইলেন। লোকেরা এ সুন্দর চরিত্র দেখে বিমুগ্ধ হয়।

ইবরাহীম বিন নাফে বলেছেনঃ একটি নদী নিয়ে বসরাবাসীর মধ্যে ঝগড়া হলে মাহদী বললেন, "আল্লাহ্ তাআলা এ ভূখণ্ড মুসমানদের দান করেছেন, তাই এর কোন একক মালিক নেই। কেউ একে ক্রয়- বিক্রয় করতে পারবে না। যদি করা হয়, তবে এর সমুদয় অর্থ সকল মুসলমানের মধ্যে বন্টন করতে হবে, নয়তো মুসলমানদের সাহায্যার্থে তা ব্যয় করতে হবে।" একদল লোক নিজেদের দাবীতে অনঢ় রইলো। তারা বললো, "নদী আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - যে মৃত যমীনকে জীবিত করে (যে পরিত্যক্ত যমীনে চাষাবাদ করে ফসল ফলায় - অনুবাদক) সে হবে সেই যমীনের হকদার। আমাদের যমীন মৃত। ফলে এটি শুধুই আমাদের হক।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফরমান শুনে মাহদী মাথা এতই নিচু করলেন যে তা যমীন স্পর্শ করবে। তিনি বললেন, "তোমরা যে হাদীস শরীফের বিবরণ পেশ করছো, তা আমি মানি আর শুনেছি, তবে আমি সরেজমিনে এটাই দেখতে এসেছিলাম যে, এ যমীন মৃত কিনা। কুদরতীভাবে যার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় সে যমীন মৃত হতে পারে না - আমি এটা মানতে পারি না। তবে তোমরা যদি তা প্রমাণ করতে পার তাহলে মানবো।"

আসমায়ী বলেছেনঃ আমি বসরায় মিম্বরে দাড়িয়ে খুতবার মধ্যে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা আপনাদের সেই কাজ করতে আদেশ করেছেন, যা তিনি নিজ সত্ত্বা আর ফেরেশতাদের জন্য পছন্দ করতেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে -

إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা নবীর উপর দরূদ পাঠান ..." (সূরাহ আল- আহযাব, ৩৩ : ৫৬)

বর্ণিত আয়াত দিয়ে এ কথা বুঝায় যে, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছেন। এভাবেই আপনাদেরকেও সকল উম্মতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে।"

গ্রন্থকার বলেন, "সর্বপ্রথম মাহ্দীই খুৎবার মধ্যে এ আয়াত পাঠ করেন। এরপর থেকে সকল খতীব তাদের নিজ নিজ খুৎবায় আবশ্যকীয়ভাবে এ আয়াত উল্লেখ করেন।

মাহ্দী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ

সূলী আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আর তিনি আব্দুর রহমান বিন মুসলিম মাদায়েনী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ মাহ্দী তার খুতবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ খুৎবাটি উল্লেখ করতেন, যা আবু সাঈদ খুদরী থেকে সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় সম্বন্ধে বর্ণিত।

সূলী বলেছেন যে, ইয়াকুব বিন হাফয খাত্তাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মাহ্দী বলেছেনঃ অনারব এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এলো। তাদের দাড়ি ছিল কমানো, আর গোঁফ লম্বা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমরা এদের বিপরীতে দাড়ি লম্বা আর গোঁফ ছোট করবে; যাতে তা মুখে এসে না পড়ে।" মাহ্দী হাদীসটি বর্ণনা করার সময় ঠোঁটে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেন।

ইয়াহইয়া বিন হামযা বলেছেনঃ মাহ্দী আমাদের মাগরীবের নামায পড়ানোর সময় উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলতেন। আমি বললাম, "আমিরুল মুমিনীন, এটা আপনি কি করছেন ?" মাহ্দী জবাবে বললেন, "আমি আমার পিতা থেকে, তিনি আমার দাদা থেকে, আমার দাদা আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটাই করতেন।" আমি বললাম, "এ জন্যই কি আপনি এমনটা করছেন ?" মাহ্দী বললেন, "হ্যাঁ।"

যাহাবী বলেছেনঃ এ হাদীসের সনদগুলো মুত্তাসিল (সংযুক্ত)। তবে আমার জানা নেই যে, কে মাহ্দী আর তার পিতাকে শরীয়তে দলীল বানিয়েছেন।

এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে বনূ হাশিমের গোলাম মুহাম্মাদ ইবনে ওলীদ একজন। তার সম্বন্ধে ইবনে আদী বলেছেন, "তিনি মুনফারিদ (একক)। তিনি হাদীস পরিবর্তন করেছেন।" গ্রন্থকার বলেন, "এটা বললে বিশুদ্ধ হবে না। তিনি মুনফারিদ নন, আর লোকদের তার বাধ্যতায় দেখা গেছে।"

মাহ্দীর শাসনামলে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - শুবা বিন আবু যানবা, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম বিন আদহাম (দানশীল), দাউদ তাঈ (দানশীল), হাদীস বিশারদদের মধ্যে প্রথম কবি বাশার বিন বারদ, হাম্মাদ বিন সালামা, ইবরাহীম বিন তহান, খলীল বিন আহমাদ।

আবু মুহাম্মাদ হাদী

হাদী আবু মুহাম্মাদ মূসা বিন মাহ্দী বিন মানসুর বারবার বংশীয়া খীযরান বিনতে আদরামের গর্ভ থেকে ১৪৭ হিজরীতে যী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা ছিলেন বাঁদী। পিতার মৃত্যুর পর তিনি খিলাফতের তখতে আসীন হোন।

খতীব বলেছেন, "যে বয়সে হাদী তখতে উপবেশন করেন, সে বয়সে আর কোন খলীফা তখতে বসেননি। তার বয়স তার সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করেনি। তিনি মাত্র এক বছর কয়েক মাস খিলাফতের তখতে ছিলেন। তার পিতা মাহ্দী ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের হত্যা করার জন্য তাকে ওসীয়ত করেছিলেন। সে কারণে তিনি অনেককে ইহজগত থেকে সরিয়ে দেন।"

তার উপাধি মূসা আতবাক। তিনি উপরের ঠোঁটটি উচু করে রাখার কারণে সর্বদা তার মুখ ফাঁক হয়ে থাকতো। এজন্য তার বাবা একজন লোক নিয়োগ করেন। মুখ ফাঁক দেখলেই সে তাকে বলতো, "মূসা আতবাক" (অর্থাৎ - মূসা, মুখ বন্ধ করো)। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখ বন্ধ করে নিতেন। এ কারণে তার নাম মূসা আতবাক হয়ে যায়।

যাহাবী বলেছেন, "হাদী মদ পান করতেন, খেলাধুলায় মশগুল থাকতেন, নকশা করা গদির উপর সওয়ার হতেন। খিলাফতের কাজে অনেক ভুল-ত্রুটি করেন। তবে তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী, ভীতু আর উঁচু মাপের কথাশিল্পী।"

কেউ বলেন, তিনি জালেম ছিলেন। হাদীর যাত্রা পথে একদল সওয়ারী খোলা তলোয়ার, বর্শা ও তীর নিয়ে তার আগে আগে চলতো। তিনি সর্বপ্রথম এ প্রথার প্রবর্তন করেন। তার পদাঙ্ক অনুসরণের অংশ হিসেবে তার শাসনকর্তারাও এমন করতো। তার যুগে অস্ত্রের ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

১৭০ হিজরীর রবিউল আখের মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর কারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, বাঁশবাগানে হাদীর বন্ধু পড়ে যাওয়ার সময় সাহায্য চাইলে হাদী ধরতে গিয়ে তিনিও পড়ে যান, বন্ধুর পেটে আর তার নাকে বাঁশ ঢুকে উভয়ের মৃত্যু হয়। কারো মতে, পেটে আঘাত পেয়ে তার মৃত্যু হয়। কেউ বলেন, তার পর খিলাফতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হারুন রশীদকে হত্যা করে হাদী তার ছেলেকে উত্তরাধিকার বানাতে চাইলে তার মা নিজে তাকে বিষ খাওয়ায়। অন্যান্যরা বলেন, হাদীর মা খীযরার রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজের দেখভাল করতেন। তার দরজায় সওয়ারীরা পাহারা দিতো, এটা দেখে হাদী তার মায়ের সাথে কর্কশ ভাষায় তর্ক করেন আর বলেন, "আজ থেকে আপনার দরজায় পাহারা দেখলে আমি তাদের হত্যা করবো। আপনার কাজ চরকা কাটা, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, তাসবীহ পাঠ আর নাযাযে মশগুল থাকা। প্রশাসনিক কাজে আপনাকে আর যেন নাক গলাতে না দেখি।" তার মা প্রবল ক্রোধে প্রস্থান করলেন। সেদিনই হাদী তার মায়ের কাছে বিষ মিশ্রিত খাবার পাঠান, তিনি তা কুকুরকে খেতে দেন, কুকুর সঙ্গে সঙ্গে

মারা যায়। এটা দেখে খীযরান হাদীকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। একদিন হাদীর জ্বর হয়, তিনি জ্বরের প্রকোপে মুখ ঢেকে শুয়েছিলেন। কিছু লোক তার মায়ের ইশারায় হাদীকে গলা টিপে মেরে ফেলে। তিনি সাত পুত্র সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেন।

হাদী তার ভাই হারুন রশীদ সম্বন্ধে এ কবিতাটি রচনা করেন - "আমি হারুনকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে। যে নসীহত গ্রহণ করে না সে লজ্জিত হয়। আমি তাকে এমন কাজের প্রতি আহবান করেছিলাম, যাতে উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা সম্পর্ক অটুট থাকে। কিন্তু সে তা মানলো না। সে এক কাজ করায় জালেম, আমি যদি সামনের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করতাম, তবে সে তাই করতো যা আমি তাকে বলেছি। আর এর কারণে সে সময় সে ভীষণ অপমানিত হতো।"

খতীব ফজল থেকে বর্ণনা করেছেনঃ হাদী এক লোকের উপর ভীষণ রাগ করেন। জনৈক ব্যক্তি এ ব্যাপারে সুপারিশ করলে তিনি সন্তুষ্ট হন। এরপরও সে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করায় হাদী তাকে বললেন, "আবার কেন ক্ষমা চাইছো ? আমার সন্তুষ্টিই তোমার জন্য যথেষ্ট।"

মারওয়ান ইবনে আবু হাফস হাদীর কাছে এসে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন - "একদিন আমি তাকে আর তার অনুদানকে তুলনা করছিলাম, কিন্তু কেউ আমাকে এটা বলতে পারেনি যে, আমি কাকে প্রাধান্য দিবো।"হাদী তাকে বললেন, "(পুরস্কারের মধ্যে) তুমি কোন জিনিসকে প্রাধান্য দাও - নগদ ত্রিশ হাজার দিরহাম না এক লাখ ?" মারওয়ান বললেন, "নগদ ত্রিশ হাজার, আর পরবর্তীতে এক লাখ।" হাদী বললেন, "তুমি এখনই সম্পূর্ণ নিতে চাইছো।" এরপর তিনি তাকে এক লাখ ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে দিলেন।

সূলী বলেছেনঃ যে সব রমণীর পেট থেকে দুইজন খলীফা জন্মগ্রহণ করেন তার হলেন খীযরান, হাদী আর হারুন রশীদের মা। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের স্ত্রী ওলাদাহ বিনতে আব্বাস - যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ওলীদ আর সুলায়মান। ওলীদ বিন আব্দুল মালিকের স্ত্রী শাহ ফিরন্দ বিনতে ফিরোজ বিন ইয়াযদ জরদ বিন কিসরা'র গর্ভজাত দুই পুত্র, যারা খিলাফতের তখতে আরোহণ করে, তারা হলেন ইয়াযিদ নাকেস (প্রকৃত নাম মারওয়ান - অনুবাদক) আর ইবরাহীম। খলীফা আব্বাস আর খলীফা হামযার জননী হলেন খলীফা মুতাওয়াক্কিলের বাঁদি বায়ী খাতুন। খলীফা মুতাওয়াক্কিলের আরেক বাঁদীর নাম কাজলের গর্ভে দাউদ আর সুলায়মান যারা খিলাফতপ্রাপ্ত হোন।

সূলী বলেছেনঃ হাদী ছাড়া কোন খলীফা জুরজানো থেকে বাগদাদ পর্যন্ত ডাক যোগাযোগ স্থাপন করেননি। হাদীর মোহরে খোদাই করে লিখা ছিল - الله ثقة مو سى وبه يؤ من

সূলী বলেছেন, "সালেম আল- খাসের হাদীর শানে অভিনব ধারায় একটি কাব্য রচনা করেন, যা এর আগে দেখা যায়নি।"

সূলী সাঈদ বিন সালেম থেকে বর্ণনা করেছেনঃ পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার কাছে আমি আশাবাদী যে, তিনি হাদীর সমস্ত গুনাহ একটি কারণে ক্ষমা করে দিবেন; আর তা হলো - একদিন আবুল খাত্তাব সাদী

হাদীর কাছে এসে তার স্বরচিত কাব্য আবৃত্তি করলেন - "হে পৃথিবীর ভালো মানুষ আর সেই ভালো মানুষেরা, যারা আসন করেছে।" এ কাব্য শুনে হাদী বললেন, "চুপ করো, এসব কি বলছো!" কবি বললো, "এ থেকে এ যুগের লোকের উদ্দেশ্য।" এরপর তিনি কাব্যের আরেকটি চরণ আবৃত্তি করেন - "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য পৃথিবীর সকল মর্যাদা, আর তুমি তার মর্যাদার কারণেই গর্ব করছো।" এ রচনাটি শুনে হাদী তাকে এক হাজার দিরহাম দিলেন।

মাদায়েনী বলেছেনঃ এক লোকের পুত্র সন্তান মারা যাওয়ায় হাদী তাকে এ বলে সান্ত্বনা দেন - "ফিতনা আর বালা মুসিবত হয়ে সে জীবিত থাকলে তুমি খুশি হতে! আর এখন সে তোমার জন্য সওয়াব ও রহমতের আধার হয়েছে, তাই দুঃখ করছো!"

সূলী বলেছেনঃ সালেম আল খাসের হাদীর শানে দুটি চরণ আবৃত্তি করেন - "মূসা খিলাফত আর হিদায়েতপ্রাপ্ত। আমিরুল মুমিনীন মুহাম্মাদ পরলোক গমন করেছেন। যিনি দুর্ভিক্ষকে দূর করতেন তিনিও ইন্তেকাল করেন। আর যিনি সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের জন্য একাই যথেষ্ট তিনি তখত নসীন।"

মারওয়ান বিন আবু হাফস হাদীর শানে এ কবিতা আবৃত্তি করেন - "আমিরুল মুমিনীনের কবরের কারণে শহরের সকল কবর গর্বিত। যদি তার ছেলের (হাদীর) আবির্ভাবে সান্তনা না পেতো, তবে কাদতেই থাকতো।"

হাদী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ

সূলী বলেছেনঃ মুত্তালিব বিন আকাশাহ বলেছেন, "এক ব্যক্তি কুরাইশদের অপবাদ দেয়। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবীপূর্ণ উক্তি করে। আমি হাদীকে গিয়ে বিষয়টি জানালাম। তিনি তৎকালীন ফকীহদের (আইনবিদদের) আর সেই লোকটিকে মজলিশে ডাকলেন। আমি সকলের সামনে তার বেয়াদবীর সাক্ষ্য দিলাম। হাদীর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেলো। তিনি অবনত মস্তকে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বললেন, "আমি আমার পিতা মাহদী, তিনি তার পিতা মানসুর, তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ, তিনি তার পিতা আলী আর তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে শুনেছেন (যে তিনি বলেন), "যে কুরাইশদের অপবাদ দিবে, আল্লাহ তাআলা তাকে অপমানিত করবেন।" এরপর হাদী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আল্লাহর দুশমন, তুমি কি কুরাইশদের গালি দিয়ে সন্তুষ্ট নও, যে গালি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছে গেছে ?" এরপর তিনি তার গর্দন উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

এ হাদীসটি বর্ণিত সনদে মওকুফ। তবে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা মারফু (খতীব)।

হাদীর শাসনামলে মদীনার ক্বারী নাফে প্রমুখ ইন্তেকাল করেন।

হারুন রশীদ আবু জাফর

আবু জাফর হারুন রশীদ বিন মাহদী মুহাম্মাদ বিন মানসুর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস। তার পিতা মাহদী হাদীর পর তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। ভাইয়ের পর ১৭০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ১৬ তারিখ শনিবার রাতে খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন।

সূলী বলেছেন, "সে রাতেই হারুন রশীদের পুত্র আব্দুল্লাহ মামুন ভূমিষ্ঠ হোন। একই রাতে এক খলীফার মৃত্যু, অন্যজনের সিংহাসনে আরোহণ ও আরেক জনের জন্মগ্রহণ - এমন ঘটনা কখনোই ঘটেনি।

প্রথমে তার পরিবারিক নাম ছিল আবু মূসা, পরবর্তীতে তা হয় আবু জাফর। তিনি তার পিতা, তার দাদা আর মুবারক বিন ফুযালা থেকে হাদীস শোনেন আর তার ছেলে মামুন তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পচেতা খলীফা। পৃথিবীর বাদশাহদের মধ্যে তিনি অনেক বড় মর্যাদাশীল বাদশাহ। তিনি অনেক জিহাদ আর হাজ্জ করেন। এ ক্ষেত্রে আবুল আলা কাবী তার শানে এ কাব্যটি রচনা করেন - "কেউ আপনার সাথে দেখা করতে চাইলে সে যেন হারামাইন শরীফাইনে, অথবা সীমান্তের ওপারে তালাশ করলে আপনাকে শত্রু অধ্যুষিত এলাকায় ঘোড়ার পিঠে অথবা পবিত্র ভূমিতে উটের পিঠে পাবে।"

খলীফা হারুন পিতার শাসনামলে ১৪৭ হিজরীতে রায় অঞ্চলে খীযরানের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খীযরানের গর্ভে হাদীও জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে মারওয়ান বিন আবু হাফযা এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন - "হে খীযরান, তোমাকে ধন্যবাদ। আবার ধন্যবাদ। তোমার দুই সন্তান পৃথিবীর প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ।"

হারুন রশীদ ছিলেন সুদর্শন, সুবক্তা আর ইলমে আদবে (সাহিত্য রচনায় - অনুবাদক) পূর্ণদক্ষ। তিনি তার খিলাফতকালে জীবিত থাকা পর্যন্ত অসুস্থতা ছাড়া প্রতিদিন একশো রাকাত নামায পড়তেন। প্রাত্যহিক নিজ সম্পদ থেকে এক হাজার দিরহাম সদকা করতেন। তিনি জ্ঞান ও জ্ঞান পিপাসুদের বন্ধু। পবিত্র ইসলামের সম্মান করতেন। শরীয়তের বিরুদ্ধবাদী লোকদের আর "নস" - এর (আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট নির্দেশের) বিরোধীদের ঘোর শত্রু ছিলেন। কুরআনের সৃষ্টির অনুগামী যারা পবিত্র ইসলামের মর্যাদাকে কটাক্ষ করে, তাদের ব্যাপারে তিনি বলেন, "আমি এদের উপর বিজিত হলে এদের হত্যা করবো।" তিনি নিজ গুনাহর জন্য সীমাহীন কাঁদতেন। ওয়াজ- নসীহত শুনতেন আর পাপের জন্য দারুণ অনুতপ্ত হতেন। তার প্রশংসাকারীদের অনেক পুরস্কার দিতেন আর সম্মান করতেন। তিনি নিজে একজন উচ্চাঙ্গের কবি।

মাররাহ বিন সামাক একদিন তার কাছে এলে তিনি তাকে খুবই সমাদর করেন, তা দেখে ইবনে সামাক বললেন, "আপনার বিনয় আপনার মর্যাদার চেয়েও বেশী।" এরপর ইবনে সামাক ওয়াজ করলে তিনি অনেকক্ষণ কাঁদলেন।

তিনি ফযীল বিন আয়াসের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। আব্দুর রাজ্জাক বলেছেনঃ একদিন আমি মক্কা শরীফে ফযীল বিন আয়াসের কাছে উপস্থিত ছিলাম। সামনে দিয়ে হারুন রশীদকে যেতে দেখে তিনি বললেন, “লোকেরা হারুনকে ভালো মনে করে না। আমার মতে, পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশী প্রিয় আর কেউ নেই, তিনি ইন্তেকাল করলে লোকদের উপর বালা- মুসীবত নাযিল হবে।”

আবু মুআবিয়া যারীর বলেছেনঃ হারুনের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উচ্চারিত হলে তিনি বলতেন - صلى الله على سيدى

(অর্থাৎ, আমার নেতার উপর আল্লাহ তাআলার দয়া বর্ষিত হোক)

একদিন আমি তাকে এ হাদীস শুনালাম - আমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হবো, আবার জীবিত হবো, আবার নিহত হবো। এটা শুনে হারুন রশীদ চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন।

একবার আমি তাঁকে এ হাদীসটি শুনালাম - আদম (আঃ) আর মূসা (আঃ) এর কথা হয়েছে। সে সময় তার কাছে কুরাইশদের এক সভ্রান্ত ব্যক্তি বসেছিলেন। তিনি হাদীসটি শুনে বললেন, দুই পয়গম্বরের সাক্ষাত কোথায় হয়েছিলো ? এ কথা শুনে হারুন রশীদ ক্রোধান্বিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন, “এ লোকটির শাস্তি তলোয়ার। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অপবাদ দিয়েছে।” আমি বললাম, “আমিরুল মুমিনীন, তার অজ্ঞতার কারণে এমনটা হয়েছে।” এরপর হারুনের ক্রোধ প্রশমিত হয়।

আবু মুআবিয়া বলেছেনঃ একদিন হারুন রশীদ আমাকে নিয়ে খাবার খেতে বসলেন। রীতি অনুযায়ী একজন আমার হাত ধুয়ে দিলেন। হাত ধোয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, “বলতে পারেন, কে আপনাকে হাত ধুয়ে দিয়েছেন ?” বললাম, “আমার জানা নেই।” তিনি বললেন, “ইলমের সম্মানার্থে আমি নিজেই আপনার হাত ধুয়ে দিয়েছি।”

মানসুর বিন আম্মার বলেছেন, “ফযীল বিন আয়াস, হারুন রশীদ ও এক ব্যক্তি - এ তিনজন ছাড়া ওয়াযের মধ্যে কাউকে এতো অধিক কাঁদতে দেখিনি।”

আব্দুল্লাহ আল- কাওয়ারিরী বলেছেনঃ একদা হারুন রশীদ ফযীল বিন আয়াসের সাথে দেখা করলে তিনি তাকে বললেন, “হে সুদর্শন ব্যক্তি, কিয়ামতের দিন এ উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।” এরপর ফযীল বিন আয়াস এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন -

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

“... আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক।” (সূরাহ আল- বাকারাহ, ২ : ১৬৬)

আর বললেন, “কিয়ামতের দিনে দুনিয়ার সকল বস্তুর সাথে সম্পর্ক ছেদ হবে।” এটা শুনে হারুন রশীদ ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

ইবনে মুবারাকের ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে খলীফা সমবেদন জ্ঞাপন করেন আর সাম্রাজ্যের আমীর-উমারাদেরও সমবেদনা জ্ঞাপনের নির্দেশ দেন।

লাফযুয়া বলেছেনঃ হারুন রশীদ তার দাদা আবু জাফর মানসুরের পদাঙ্ক অনুসরণে চলতেন। তবে পার্থক্য শুধু মানসুর কৃপণ ও লোভী। কিন্তু তিনি তা ছিলেন না। উপরন্তু, খলীফাদের মধ্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী দানশীল। একবার তিনি সুফিয়ান বিন আইয়েনাকে এক লাখ অর্থ প্রদান করেন। একবার ইসহাক মুওসুলীকে দুই লাখ অর্থ দানের নির্দেশ দেন। একটি কাব্যের প্রতিদান হিসেবে তিনি মারওয়ান বিন আবু হাফসকে পাচ হাজার দিনার, শাহী পোশাক, নিজের খাস ঘোড়া আর দশজন রোমান গোলাম পুরস্কার দেন।

আসমায়ী বলেছেনঃ একবার তিনি আমাকে বললেন, "হে আসমায়ী, আমার প্রতি কেন আপনার এই জুলুম আর উদাসীনতা ?" আমি বললাম, "আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহর কসম, আপনার কাছে হাযির হওয়ার জন্য অতিদ্রুত গতিতে ছুটে এসেছি। কোন জনপদে দু'দণ্ড বিশ্রাম নেইনি।" এ কথা শুনে হারুন চুপ হয়ে গেলেন। লোকেরা চলে গেলে আমি এ কবিতাটি আবৃত্তি করলাম - "দান করার কারণে আপনার হাতে দিরহাম লেগেই থাকে, আর অন্য হাতে থাকে রক্ত মাখা তলোয়ার।" এটা শুনে তিনি বললেন, "যথার্থ। আপনি আমাকে লোকদের সামনে কিছু বলবেন না, আর নির্জনে আমাকে নসীহত করুন।" এরপর আমাকে পাঁচ হাজার দিনার পুরস্কার দিলেন।

মরুজুল মাসউদী গ্রন্থে রয়েছেঃ হারুন রশীদের ইচ্ছা ছিল রোমান সমূদ্র ও কলুজুম সমুদ্রের গতি ভূখণ্ডে প্রবাহিত করার। কিন্তু ইয়াহইয়া বিন খালিদ বরমক্কী এ পরামর্শ দিলেন - "এমনটা করলে রোমান মুসলমানদের মসজিদে হারাম দ্রুত আক্রমণের পদ ত্বরান্বিত হবে। তাছাড়া রোমানদের জাহাজ হিজাজ পর্যন্ত যাতায়াত করে।" এ কথা শুনে তিনি তার সিদ্ধান্ত মুলতবী ঘোষণা করেন।

হাখত বলেছেনঃ এমন লোকদের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হারুন রশীদের জন্য যতো সহজ ছিল, অন্য খলীফাদের জন্য ততো সহজ ছিল না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ছিলেন বিচারক, মারওয়ান বিন আবু হাফয কবি, আয়াস বিন মুহাম্মাদের বাবার চাচা তার সভাসদ, ফজল বিন রবীআী প্রহরী, ইবরাহীন মওসূলী মুখপাত্র আর রাবেদা তার পত্নী। হারুন রশীদের যুগ ছিল ঈর্ষণীয় যুগ, যেমন বিয়ের সময় বর ঈর্ষণীয়।

যাহাবী বলেছেনঃ হারুন রশীদের আরো অনেক দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে। তিনি খেলাধুলা করতেন না, গান শুনতেন না, নিষিদ্ধ কাজ করতেন না। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন।

তার শাসনামলে যেসকল ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - মালিক বিন আনাস, লায়েস বিন সাদ, বিচারক ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম আবু হানীফা, কাসিম বিন মঈন, মুসলিম বিন খালিদ আযযানবী, নূহল জামে, হাফেজ আবু আওয়ানাহ ইয়াশকারী, ইবরাহীম বিন সাদ যহরী, আবু ইসহাক ফরনারী, ইমাম শাফী (রহঃ) এর উস্তাদ ইবরাহীম বিন আবু ইয়াহইয়া, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র আসাদুল কুফী, ইসমাঈল বিন আয়াশ, বশর বিন মুফাসসল, জারীর বিন আব্দুল হামীদ, যিয়াদুল বাকায়ী, হামযার ছাত্র সলিমুল মুকরা, আরবের ইমাম সায়বুয়া, দানশীল আব্দুল্লাহ উমরী, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, আব্দুল্লাহ বিন

ইদরীস কুফী, সভাসদ আব্দুল আযীয বিন আবু হাযিম, কাসাই কারী এবং অলংকার শাস্ত্রবিদের উস্তাদ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন হাসান, (তারা উভয়ে একই দিন ইন্তেকাল করেন)। আলী বিন মুসহার, গিনজার, ঈসা বিন ইউনুস সাবীয়ী, ফযীল বিন আয়াস, ইবনে সামাকা, কবি মারওয়ান বিন আবু হাফয, মাআবী ইমরান মওসূলী, মুঅতামার বিন সুলায়মান, মিসরের বিচারক মুফসল বিন ফুযালা, মূসা, মূসা রবীআ, তৎকালীন যুগের বিখ্যাত ওলী আবুল হাকাম মিসরী, নুমান বিন আব্দুস সালাম ইস্পাহানী, হাশিম ইয়াহইয়া বিন আবু যায়েদাহ, ইয়াযিদ বিন যারীআ, নাহুবিদ ইউনুস বিন হাবীব, মদীনা শরীফের ক্বারি ইয়াকুব বিন আব্দুর রহমান, ইমাম মালিক (রহঃ) এর ছাত্র স্পেনের বরেণ্য আলেম সাআসআ বিন সালাম, ইমাম মালিক (রহঃ) এর ছাত্র আব্দুর রহমান বিন কাসিম, প্রসিদ্ধ কবি আবু বকর বিন আয়াশ মকরী, আব্বাস বিন আহনাফ, ইউনুস বিন মাজশু প্রমুখ।

১৭৫ হিজরীতে তার শাসনামলে একটি চমৎকার ঘটনা ঘটে। আব্দুল্লাহ বিন মুসআব যহরী ইয়াহইয়া বিন আব্দ বিন হাসান উলুয়ীর ব্যাপারে এ অপবাদ ছড়ায় যে, সে একটি দল সংগঠিত করেছে। অচিরেই এ দলটি হারুন রশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। এ অভিযোগের কারণে ইয়াহইয়াকে ডেকে আনা হলো। এরপর হারুন তার হাতে হাত রেখে ইয়াহইয়াকে এ দু' আ করতে বললেন - "ইয়া রাব্বাল আলামীন, ইয়াহইয়া যদি আমিরুল মুমিনীনের খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা করে, তাহলে আপনি আমাকে স্বীয় শক্তি ও শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।" প্রথমে ইয়াহইয়া এ দুয়া করলো। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন মুসআব এ দুয়া করতে অনীহা পোষণ করে আর পরবর্তীতে সেও দুয়া করে, দুয়া শেষে উভয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। সে দিনেই আব্দুল্লাহ বিন মুসআব ইন্তেকাল করে।

১৭৬ হিজরীতে আব্দুর রহমান বিন আব্দুল মালিক বিন সালিহ আব্বাসীর হাতে ওবাসা শহর বিজিত হয়।

১৭৯ হিজরীর রমযান মাসে হারুন রশীদ উমরাহ করেন। এই ইহরামেই তিনি হাজ্জ করেন আর মক্কা থেকে আরাফাতে পায়ে হেঁটে সফর করেন।

১৮০ হিজরীতে ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্প হয়, যার কারণে ইস্কান্দারিয়ার মিনারগুলোর উপরাংশ ভেঙে পড়ে।

১৮২ হিজরীতে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের মাধ্যমে স্বয়ং আমিরুল মুমিনীন হারুন রশীদের হাতে সফ্সাফ নামক দুর্গ বিজিত হয়।

১৮৩ হিজরীতে খারাজ সম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট বিদ্রোহে আর্মেনিয়ায় অনেক মুসলমান ধ্বংস হয়। তারা এক লাখ মুসলমানকে বন্দী করে, এমন মুসীবতের কথা এর আগে আর কখনোই শোনা যায়নি।

১৮৭ হিজরীতে রোম সম্রাট ইয়াকফুর অঙ্গিকারভঙ্গ পত্র যে অঙ্গিকার সম্পাদিত হয়েছিলো মুসলমান আর রোমানদের মধ্যে, তা হারুন রশীদের কাছে পাঠান। তাতে লিখা ছিল - "রোমান অধিপতি ইয়াকফুরের পক্ষ হতে আরব জাহানের বাদশাহ রশীদের প্রতি। অবগত আছেন, যে সম্পত্তি আমার আগে রোমানদের অধীনে ছিল, সে সময় আপনার অবস্থা ছিল দাবার গুটির মতো, আর তারা ছিল দুর্বল ও নির্বুদ্ধির। ফলে তারা প্রচুর

ধন-রত্ন দিয়ে আপনার সাথে সন্ধি করেছে। তাই এ পত্র পৌছার সঙ্গে সঙ্গে যে ধনরাজি আপনি তাদের থেকে অর্জন করেছেন তা ফেরত দিবেন, নতুবা তলোয়ার দিয়ে ফায়সালা হবে।”

পত্রটি পড়ে হারুন রশীদ এতোই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়লেন যে, রাগে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তার চেহারার দিকে তাকানোর মতো সাহস কারো ছিল না, কেউ কথাও বলতে পারলো না। তার সভাসদবৃন্দ আর আমীর-উমারাগণ তার সামনে থেকে চলে গেলেন। হারুন রশীদ আমীর-উমারাদের সাথে পরামর্শ ছাড়াই এ পত্রটি লিখলেন - “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমিরুল মুমিনীন হারুনের পক্ষ থেকে, ইয়াকফুক নামক রোমান কুকুরের জেনে রাখা উচিত যে, হে কাফিরের বাচ্চা, আমি আমি তোমার পত্র পড়েছি। এর জবাব অচিরেই তুমি নিজ চোখে দেখতে পাবে - শোনার প্রয়োজন নেই।”

তিনি সে দিনই একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। হিরাকিল শহরে পৌঁছে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধের তীব্রতার কথা আজও জনশ্রুতি হয়ে মুখে মুখে ফিরে। মুসলমানরা বিজয় অর্জন করে ইয়াকফুর সন্ধির প্রস্তাব করেন আর প্রতি বছর খারাজ দিতে সম্মত হোন। হারুন রশীদ এ প্রস্তাব অনুমোদন করে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সদলবলে রাকা জনপদে ফিরে এলে কাফেরের বাচ্চা আবার সন্ধির শর্তাদি ভঙ্গ করে, আর তারা এ ধারণা করে যে, শীতের কারণে হারুন আর আক্রমণ করবেন না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সংবাদ সাহস করে কেউ আমিরুল মুমিনীনের কানে দিতে পারলো না। অবশেষে আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ তামীমী এ কবিতাটি আবৃত্তির মাধ্যমে খবরটি আমিরুল মুমিনীনের কর্ণ কুহরে পৌঁছে দেন - “ইয়াকফুর আপনাকে যা দিয়েছিলো, সে আবার ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। সম্ভবত পরিভ্রমণের দিনগুলো এখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে, আমিরুল মুমিনীনের জন্য সুসংবাদ, আল্লাহ পাক আপনাকে অনেক ছাগল দান করেছেন।”

আবুল-আতাহীও এ ধরনের একটি কবিতা পাঠ করেন, যা দিয়ে হারুন রশীদ বিষয়টি অনুধাবন করেন আর আবার ফিরে যান। অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে সেখানে পৌছেন, আর নিজেদের শক্তি নিঃশেষ ও ইয়াকফুরকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। এ প্রসংগে আবুল আতাহীয়া এ কবিতা আবৃত্তি করে - “হিরাকল যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গেছে। বাদশাহ (হারুন রশীদ) উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিজয় লাভ করেছেন। হারুন বিদ্যুতের মত তরবারী নিয়ে বিজয়ের হেলাল খচিত পতাকা হাতে পৌছেন।”

১৮৯ হিজরীতে রোমানরা সেখান থেকে মুসলমানদের বের করে দেয়।

১৯০ হিজরীতে রোমান সাম্রাজ্যে শারাহীল বিন মাআন ইবনে যায়েদার সেনাপতিত্বে সৈন্য পাঠানো হয়। তারা রোমান সৈনিকদের পর্যদুস্ত করেন। হিরাকেলা আর সাকালীয়া দূর্গ বিজিত হয়। উপরন্তু ইয়াযিদ বিন মুখাল্লাদ ফালকুনীয়া জয় করেন। আর হামীদ বিন মায়ুফকে কবরশের দিকে পাঠানো হয়। তিনি কবরশবাসীকে পরাজিত করে সেখানে অগ্নিসংযোগ করেন। আগুনের লেলিহান শিখা হাজার লোককে ভস্ম করে।

১৯২ হিজরীতে হারুন খুরাসানের দিকে মুভ করেন, তিনি নিজেই সেখানে যান। মুহাম্মাদ বিন সাবাহ তবরী বলেছেন, আমার বাব নহরে ওয়ান পর্যন্ত হারুনের সাথে ছিলেন। সফরের মধ্যে এক দিন হারুন তাকে বললেন, “সাবাহ, মনে হয় এরপর আর তুমি আমার সাথে মিলিত হতে পারবে না।” তিনি বললেন,

“আল্লাহ তাআলা আপনাকে সুস্থতার সাথে ফিরে আনুন।” আবার তিনি বললেন, “এরপর আর তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।” সাবাহ পুনরায় একই জবাব দিলেন। হারুন রাস্তা থেকে সরে এসে বললেন, “তুমি এসো, তোমাকের রাষ্ট্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো। কারো কাছে তা প্রকাশ করবে না।” অতঃপর তিনি জামার কাপড় সরিয়ে পেট বের করলেন। পেটের চারপাশে রেশমের পট্টি বাধা ছিল। দেখিয়ে তিনি বললেন, আমার এ রোগ হয়েছে, যা আমি লোকদের কাছে গোপন রেখেছি। আর আমাদের ছেলেদের অবস্থা এই যে, তাদের তত্ত্বাবধান আমার সাথে সম্পৃক্ত। মামুনের সহায়ক মাসরুর, আমীনের সহায়ক জিবরীল বিন বাজদীজু; (রাবী বলেন) আর তিনি (হারুন) যে তৃতীয় জনের নাম বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। তারা প্রত্যেকেই আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায়। তারা আমার জীবনের দিনগুলো গুনছে আর আমার জীবনকে দীর্ঘ মনে করছে। যদি এ কথায় সত্যত জানোতে চাও তবে এসো। আমি তুর্কী ঘোড়া চাইছি। কিন্তু আমার অসুস্থতা যেন বেড়ে যায় সে জন্য দুর্বল ঘোড়া দেয়া হবে। (রাবী বলেন) তিনি ঘোড়া চাইলেন। তাকে দুর্বল ঘোড়া দেয়া হলো। তিনি বেদনাভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে বিদায় দিয়ে জুরজানের দিকে চলে গেলেন, হারুন অসুস্থ অবস্থায় তওস অঞ্চলে পৌছে ১৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৭৫ হিজরীতে হারুন রশীদ যাবেদার ইচ্ছা অনুযায়ী পুত্র আমীনকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সে সময় তার বয়স পাঁচ বছর। আমীনের নাম মুহাম্মাদ, পদবী আমীন।

যাহাবী বলেছেনঃ মুসলিম বিশ্বে এটা ছিল দুর্বলতার প্রথম সূচনা। হারুন রশীদ ১৮২ হিজরীতে আমীনের পর আব্দুল্লাহকে, যার পদবী মামুন, তাকে উত্তরাধিকার বানিয়ে খুরাসানের প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেন। মামুনের পর তিনি পুত্র কাসেমকে, যিনি খুবই অল্প বয়স্ক, তাকে মুতমান পদবী দিয়ে ১৮৬ হিজরীতে উত্তরাধিকার মনোনীত করে জাযীরা আর সীমান্তাঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করেন। এভাবে তিনি ইসলামী জগতকে তিন ভাগে বিভক্ত করে ফেলেন। কোন কোন জ্ঞানী সে সময় বলেছিলেন, হারুন এদের মধ্যে সংঘাতের বীজ বপন করলেন, প্রজা জনসাধারণাকে দুঃখ- কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। কবিগণ তাদের প্রশংসাসূচক কবিতায় এদের গুণকীর্তন করেছেন। উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্রমধারার অঙ্গিকার নামাটি কাবা শরীফে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

কেউ কেউ বলেন, হারুন রশীদ নিজ পুত্র মুতাসিমকে মূর্খ ও একেবারে অশিক্ষিত হওয়ার কারণে খিলাফত থেকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর বংশধরের মধ্যেই খিলাফত স্থানান্তর করেন আর সকল খলীফা তারই বংশদ্ভুত। হারুন রশীদের অপর আওলাদ থেকে কোন খলীফা জন্ম নেননি।

বিভিন্ন ঘটনাবলী

তাওরিয়াত গ্রন্থে ইবনে মুবারকের সূত্রে সালাফী লিখেছেনঃ হারুন রশীদ খলীফা হওয়ার পর মাহদীর এক বাঁদিকে তার মনে ধরে। হারুন রশীদ বাঁদিকে ডাকলে সে বললো, “আমার সাথে আপনার বাবার মিলন হয়েছে।” কিন্তু তিনি প্রেমের হস্তবাহু উন্মুক্তই রাখলেন। তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) কে এ সম্পর্কে

মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। কাযী আবু ইউসুফ বললেন, "আমিরুল মুমিনীন, বাঁদি যা বলেছে তা কি সত্য ? কারণ সে তো পবিত্র নয়, তাকে সত্যায়িত করবেন না।"

ইবনে মুবারাক বলেছেন, "আমি যে সব বিষয়ে আশ্চর্য ও আফসোস করি তা হলো ঐ বাদশাহ ও খলীফাদের ব্যাপারে, যাদের হাত মুসলমানদের মালে ও রক্তে রঞ্জিত আর যিনি পিতার মর্যাদার প্রতি খেয়াল করেন না। অথবা আমিরুল মুমিনীনের মত শানদার খলীফাও বাঁদির প্রতি আসক্ত, অথবা যুগ শ্রেষ্ঠ ফকীহ আর ইসলামের কাযী যিনি খলীফাকে বাবার অভিব্যক্তি ও সংকল্পের সাথে সহবাসের পরামর্শ দিয়ে গুনাহর বোঝা (নাউযুবিল্লাহ) নিজ কাঁধে নেন।"

আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ বলেছেনঃ রশীদ একদিন কাযী আবু ইউসুফকে বললেন, "আমি এক বাঁদি কিনেছি। এক হায়েয পার হওয়ার আগেই আমি তার সাথে সহবাস করতে চাই। সুতরাং যদি শরীয়তের কোন হিলা আপনার জানা থাকে তবে বলুন।" কাযী আবু ইউসুফ বললেন, "প্রথমে তাকে নিজের ছেলের কাছে হেবা করুন, এরপর তাকে বিয়ে করুন।"

ইসহাক বিন রাহুয়া বলেছেনঃ একদিন রাতে কাযী আবু ইউসুফকে ডেকে হারুন একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করেন। মাসয়ালা বয়ান করার পর হারুন তাকে এক লাখ দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দিলেন। কাযী আবু ইউসুফ বললেন, "আমিরুল মুমিনীন, এ অর্থ আমাকে ভোর হওয়ার আগে দিলে ভালো হবে।" হারুন সকাল হওয়ার আগে অর্থ দানের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এক ব্যক্তি বললো, "কোষাধ্যক্ষ বাড়িতে, আর কোষাগার বন্ধ।" কাযী আবু ইউসুফ বললেন, "যখন আমাকে ডাকা হয়েছিলো, তখনও দরজা বন্ধ ছিল।" এ কথা শুনে কোষাগারের দরজা খুলে দেয়া হলো।

ইয়াকুব বিন জাফর থেকে সূলী বর্ণনা করেছেনঃ হারুন রশীদ খলীফা হওয়ার পর সে বছরেই রোমের আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ শেষে শাবান মাসে সেখান থেকে ফিরে এসে হাজ্জের ফরযিয়াত আদায় করেন। তিনি হারমাইন শরীফাইনে গিয়ে বিপুল পরিমাণে অর্থ সম্পদ খরচ করেন। এর পূর্বে হারুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "এ মাসেই তোমার উপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হবে। তোমার জন্য উচিত যে, তুমি লড়াই করবে, জিহাদ করবে, হাজ্জ করবে আর হারামাইন অধিবাসীদের প্রচুর অর্থ- সম্পদ দান করবে।" হারুন খিলাফত লাভের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি হুকুম অক্ষরে অক্ষরে আদায় করেন।

মুআবিয়া বিন সালিহ তার বাবা থেকে বর্ণনা করেছেনঃ হারুন রশীদ জীবনের প্রথম কবিতাটি প্রথম হাজ্জের সময় আবৃত্তি করেন। ঘটনাটি এ রকম - তিনি এক বাড়িতে গেলেন, সে বাড়ির দেওয়ালে এ কবিতাটি লিখা ছিল - "আমিরুল মুমিনীন, আপনি দেখেননি যে, আমি আপনাকে ফিদয়ার ক্ষেত্রে আমার প্রিয়তমকে বর্জন করেছি।" হারুন এর নিচে এ কবিতাটি লিখলেন - "হজ্বের যে পশুগুলো হারাম শরীফে যবেহ করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে, সেগুলো পবিত্র মক্কা শরীফের দিকে ধাবিত হতে অসমর্থ রয়ে গেছে।"

সাঈদ বিন মুসলিম বলেছেনঃ হারুন রশীদের জ্ঞান ছিল আলেমদের অনুরূপ। তিনি অধিকাংশ কবির বিভিন্ন কাব্য ও চরণ শুদ্ধ ও সংস্কার করে দিতেন। একবার কবি নুমানের কবিতার একটি চরণ শুদ্ধ করে দেন, যা তিনি ঘোড়া চিহ্নিতকরণে লিখেছিলেন।

ইবনে আসাকির ইবনে উলায়া থেকে বর্ণনা করেছেনঃ হারুন রশীদ এক ধর্মচ্যুতকে ধরে এনে হত্যা করার নির্দেশ দিলে সে বললো, "আপনি কোন অপরাধে আমাকে হত্যা করবেন ?" তিনি বললেন, "তোমার ফিতনা থেকে আল্লাহর সৃষ্টিকুল নিরাপদ থাকবে।" সে বললো, "আমি এক হাজার মনগড়া হাদীস লিপিবদ্ধ করে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছি - এগুলো আপনি কি করবেন ?" হারুন রশীদ বললেন, "এমনটা কেন করেছো হে আল্লাহর দুশমন? " পরবর্তীরা আবু ইসহাক কুযারী আর আব্দুল্লাহ বিন মুবারক জাল হাদীসগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে এক একটি করে অক্ষর সমুদ্র নিক্ষেপ করেন।

ইসহাক হাশমী থেকে সূলী বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আমি হারুন রশীদের কাছে বসেছিলাম। তিনি বললেন, "আমি জানোতে পেরেছি, আমজনতা আমার প্রতি এ ধারণা পোষণ করছে যে, আমি নাকি আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে শত্রুতা পোষণ করি। আল্লাহর কসম, আমি কাউকে হযরত আলী (রাঃ) এর চেয়ে ভালোবাসি না। বস্তুত যারা আমার শত্রুতা করে, তারা আমার অপবাদ ছড়াচ্ছে। যারা আমার সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, তারা এ কথা ছড়িয়ে দিয়েছে। আর শুধু এজন্য যে, আমি তাদের শাস্তি দিব তাই এবং তারা বনূ উমাইয়্যার অনুগত। আলী (রাঃ) এর পুত্রদ্বয় সকল মর্যাদাবান ও সম্মানিতদেরও উর্ধ্বে, আমার বাবা মাহদী আমার কাছে এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেন, যা তিনি তার পিতা থেকে আর তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন - নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম হাসান (রাঃ) আর ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর ব্যাপারে বলেছেন, 'যে এ দুজনকে ভালোবাসবে, সে আমাকেও ভালোবাসবে; আর যে তার শত্রুতা করবে, সে আমারও শত্রুতা করবে।' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন, 'ফাতিমাতুয যুহরা মারিয়ম বিনতে ইমরান এবং আসীয়া বিন মুযাহিম (ফিরাউনের স্ত্রী) ছাড়া পৃথিবীর সকল নারীদের নেত্রী।' "

বর্ণিত আছেঃ একদিন ইবনে সামাক হারুন রশীদের কাছে এলেন। সে সময় হারুন রশীদের পিপাসা লেগেছিলো। তিনি পানি চাইলেন, কেউ পানি এগিয়ে দিলে ইবনে সামাক বললেন, "থামুন, আপনার যদি খুব পিপাসা লাগে আর কোথাও পানি না পান, তাহলে এক গ্লাস পানি আপনি কত দিয়ে ক্রয় করবেন ?" হারুন রশীদ বললেন, "অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে।" ইবনে সামাক বললেন, "এবার পান করুন।" তিনি পানি পান করলে ইবনে সামাক আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার পানকৃত পানি যদি পেটেই থেকে যায়, তাহলে তা বের করার জন্য আপনি কতটুকু খরচ করবেন ?" হারুন বললেন, "বাকী অর্ধেক রাজ্য।" ইবনে সামাক বললেন, "আপনি মনে রাখবেন, আপনার গোটা সাম্রাজ্য এক গ্লাস পানি পান আর পেশাবের সমমূল্য। তাই একজন জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য বাদশাহীর দিকে ঝুঁকে পড়া নিরেট বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়।" এ কথা শুনে হারুন রশীদ খুব কাঁদলেন।

ইবনে জাওযী বলেছেনঃ হারুন রশীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে শায়বান তাকে এ নসীহত করেন - "আপনার যে প্রিয়জন আপনাকে ভয় দেখান আর এর ফলাফল হয় নিরাপদ, তিনি সেই প্রিয়জনের চেয়ে উত্তম - যার ভয় প্রদর্শনের ফল দাঁড়ায় বেপরোয়া হয়ে যাওয়া।" হারুন বললেন, "ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলুন আপনার কথার উদ্দেশ্য কি ?" তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আপনাকে বলবে কিয়ামত দিবসে সকল বিষয়ে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন, তাই আল্লাহকে ভয় করুন - এ ব্যক্তিটি ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যে বলবে - আপনি আহলে বাইত, আপনার সকল পাপরাশি মার্জনীয়, কারণ আপনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয়।" এ কথা শুনে তিনি এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন, যারা তার পাশে ছিল তাদের মাঝেও দয়ার উদ্রেক হলো।

সূলী স্বরচিত কিতাবুল আওরাক গ্রন্থে লিখেছেনঃ হারুন খলীফা হওয়ার পর ইয়াহইয়া বিন খালিদ মাক্কীকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিলে ইবরাহীম মওসুলী এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন - "হে সম্বোধিত ব্যক্তি, আপনি কি দেখেননি যে, সূর্য অসুস্থ (আলোহীন) ছিল ? হারুন খিলাফতপ্রাপ্ত হওয়ায় তার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পৃথিবী তার সৌন্দর্যে প্লাবিত, কারণ হারুন বাদশাহ, আর তার মন্ত্রী হলেন ইয়াহইয়া।" এ কবিতা শুনে হারুন কবিকে এক লাখ দিরহাম আর ইয়াহইয়াকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিলেন।

দাউদ বিন যারীন ওয়াসতীও অনুরূপ একটি কবিতা আবৃত্তি করেন - "হারুনের সংস্পর্শে প্রতিটি শহর, নগর, জনপদে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এর কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনসাফ। তিনি লোকদের ইমাম। তার কাজ হল হাজ্জ করা আর জিহাদের ময়দানে যাওয়া। তার চেহারার নূরে পৃথিবীর আলো বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। তিনি লোকদের সামনে এলে তার বদান্যতার হাত প্রসারিত হতো। সে সময় যারা তার থেকে যতটুকু আশা করতেন, তারা তার চেয়েও অনেক বেশী পেতেন।"

কাযী ফাযেল স্বরচিত কতিপয় পুস্তিকায় লিখেছেনঃ আমার দৃষ্টিতে দুইজন বাদশাহ ছাড়া জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন বাদশাহ এতো অধিক ভ্রমণ করেননি - এক, হারুন রশীদ তার দুই ছেলে আমীন আর মামুনকে নিয়ে মুয়াত্তা ইমাম মালিক পড়ার জন্য ইমাম মালিক (রহঃ) এর কাছে যান। মুয়াত্তা ইমাম মালিকের যে কপিটি তারা তিনজন পড়েছেন, তা মিসর অধিপতিদের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল। দুই, সুলতান সালাহউদ্দীন বিন আইয়ূব পরবর্তীতে এই মুয়াত্তা ইমাম মালিক পড়ার উদ্দেশ্যেই ইসকান্দারিয়া পর্যন্ত সফর করেন এবং সেখানে আলী বিন তহেব বিন আউন তাকে মুয়াত্তা পড়ান।

মানসুর নামরী এ সম্বন্ধে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন- "তিনি কুরআনকে নিজের ইমাম আর দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ কুরআন শরীফ তার মতে অবশ্য অনুসরণীয়।" এ প্রেক্ষিতে তিনি এক লাখ দিরহাম ইনাম পান।

হারুন রশীদের স্মরণীয় উক্তিগুলোর মধ্যে একটি হলো - "আমার প্রশংসাসূচক কাব্যগুলোর মধ্যে আমার কাছে এ কাব্যটি সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় - 'হে আমীন, মামুন এবং মুতামিনের বাবার আওলাদ কতই না নেককার!' "

ইসহাক মওসূলী বলেছেনঃ একদিন আমি হারুন রশীদের কাছে এসে এ কবিতাটি পেশ করলাম - "যখন এ নারী কৃপণতার নির্দেশ করেছিলেন, তখন আমি বললাম - কৃপণতা হ্রাস করো, কারণ অর্থ এমন জিনিস, যা আসবে যাবে। আমি লোকদের দানশীলদের বন্ধু হতে দেখেছি, কৃপণদের কোন বন্ধু আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। কৃপণতা কৃপণকে কলঙ্কিত করে। আমার মন চায় কোন কৃপণ আমাকে বলে, এ যুবকের ভালো দিকগুলোর মধ্যে এটি একটি যে, যখন তার কাছে সম্পদ থাকে তখন সর্বদা সে তা খরচ করে। আমি কেন দরিদ্রতাকে ভয় আর ধনাঢ্যতাকে সম্মান করবো, যখন আমিরুল মুমিনীন আমার ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করবেন?" এটা শুনে হারুন রশীদ বললেন, "হ্যাঁ, কেন ভয় পাবে ? হে ফজল, তাকে এক লাখ দিরহাম দাও। আল্লাহর কসম, তার কবিতাগুলো খুবই সুন্দর।" আমি বললাম, "আমিরুল মুমিনীন, আমার কবিতার চেয়ে আপনার ফরমান আরো সুন্দর।" হারুন বললেন, "ফজল, তাকে আরো এক লাখ দিরহাম দাও।"

মুহাম্মাদ বিন আলী খুরাসানী বলেছেনঃ খলীফাদের মধ্যে হারুন রশীদ সর্বপ্রথম পোলো আর চিহ্ন নিশানা করে তীর নিক্ষেপকরণ জাতীয় খেলা খেলেন। বনু আব্বাসের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম দাবা খেলেন। সূলী বলেছেন, "তিনিই সর্বপ্রথম গায়কদের পদ মর্যাদা নির্ধারণ করেন।"

তিনি বাঁদি হেলেনার মৃত্যুতে একটি দীর্ঘ শোক গাঁথা আবৃত্তি করেন।

হারুন রশীদ খুরাসান রাজ্যের তাওস অঞ্চলে জিহাদে গিয়ে ১৯৩ হিজরীর জামাদিউল আখির মাসের তিন তারিখে ৪৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। তার ছেলে সালিহ তার জানাযা পড়ান।

সূলী বলেছেন, "হারুন রশীদ নগদ দশ কোটি দিনার, বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্র, মনি- মুক্তা, রৌপ্য, ঘোড়া আর দশ কোটি পঁচিশ হাজার ভূসম্পত্তি রেখে যান।"

কথিত আছেঃ হারুন স্বপ্নে দেখেন তিনি তাওস যাত্রা করছেন। ভোরে উঠে তিনি খুব কাঁদলেন। এরপর তিনি বললেন, "আমার কবর খনন করো।" কবর খনন করা হলো। তিনি নিজে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে কবর দেখতে যান। কবরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তিনি বলে উঠলেন - "হে ইবনে আদম, তুমি একেই গ্রহণ করবে।" এরপর কয়েকজনকে কবরে নামার নির্দেশ দিলেন। সেখানে তিনি কুরআন শরীফ খতম করান। সে সময় তিনি কবরের পাশে বসে ছিলেন।

তার ইন্তেকালের পর লোকেরা আমীনকে বায়াত দেয়। আমীন সে সময় বাগদাদে ছিলেন। বাগদাদে মৃত্যু সংবাদ পৌঁছার পর আমীন জুমআর দিন খুৎবা দেন আর এতে লোকদের হারুন রশীদের ইন্তেকালের সংবাদ জানিয়ে দেন। সে দিন সেখানেই আম বাইআত অনুষ্ঠিত হয়। রাজা নামক হারুন রশীদের গোলাম হারুন রশীদের চাদর, ছড়ি আর মোহর নিয়ে বারো দিন পর জামাদিউল আখির মাসের পনেরো তারিখে বাগদাদে এসে সেগুলো আমীনকে বুঝিয়ে দেয়।

সূলী বলেছেনঃ হারুন রশীদ দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি আনাস (রাঃ) থেকে - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সাদকা খেজুরের অর্ধেক অংশ হলেও তা পরিশোধ করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো।” দ্বিতীয়টি ইবনে আব্বাস (রাঃ), তিনি আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) থেকে - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মুখ পরিষ্কার করবে, কারণ এটি কুরআন শরীফের পথ।”

আমীন মুহাম্মাদ আবু আব্দুল্লাহ

আমীন মুহাম্মাদ আবু আব্দুল্লাহ বিন রশীদ পিতার জীবদ্দশায় উত্তরাধিকার মনোনীত হয়েছিলেন। ফলে পিতার মৃত্যুর পর তিনি খিলাফতে তখ্‌তে আরোহণ করেন।

তিনি ছিলেন সুদর্শন, নির্ভীক ও টগবগে যুবক। কথিত আছে, তিনি একবার নিজ হাতে বাঘ হত্যা করেন। তিনি বক্তা, বাগ্মী, সাহিত্যিক ও মর্যাদাবান। তবে তিনি অপব্যয়ী, দুর্বল মতামত ও বোকা ছিলেন, খিলাফতের যোগ্য ছিলেন না।

খলীফা হওয়ার আগের দিন মনসুর প্রাসাদ সংলগ্ন পোলো খেলার মাঠ তৈরির নির্দেশ দেন। ১৯৪ হিজরীতে নিজ ভাই কাসেম, যাকে তার পর উত্তরাধিকার মনোনীত করা হয়েছিলো তাকে সরিয়ে দেয়ার কারণে মামুনের সাথে তার মনোমানিল্যতার সৃষ্টি হয়।

কথিত আছে, ফজল বিন রবীআ ভাবল মামুন খলীফা হলে আমার শপথ অক্ষুন্ন থাকবে না। ফলে সে আমীনকে উত্তেজিত করে মামুনকে উত্তরাধিকারের পথ থেকে অপসারণ করে মূসা বিন আসীনকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে নেয়। সংবাদ পেয়ে মামুন আমীনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এরপর আমীন দূত মারফত মামুনকে জানালেন - তোমার পরিবর্তে আমার ছেলে মূসাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেছি, মূসার পর তুমি উত্তরাধিকার। মূসার নাম নাতেক বিলহক রাখা হয়েছে। মামুন এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন আর দূতকে কাছে বসিয়ে শরাব পান করান। রাজকীয় অনুকম্পায় প্রভাবিত হয়ে দূত মামুনের হাতে বাইয়াত দিয়ে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে মামুনকে নিয়মিত সেখানকার সংবাদ জানিয়ে দিতো।

দূত ফিরে এসে মামুনের আদেশ প্রত্যাখ্যান করার সংবাদ দিলে আমীন শপথনামা থেকে তার নাম সরিয়ে দেন, যা হারুন রশীদ কাবা শরীফে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। আমীন তা নিয়ে এসে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। ফলে উভয় পক্ষে শত্রুতার জের বৃদ্ধি পায়।

আমীনকে অনেক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এ কথা বুঝিয়েছেন আর হাযেম বিন খুজাইমা আমীনকে বলেছেন, “আমিরুল মুমিনীন, যে আপনার সামনে মিথ্যা বলে সে কল্যাণ বয়ে আনে না, আর সে সত্য বলে সে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে না। আপনি বাইআত থেকে (মামুনকে) বঞ্চিত করবেন না, তাহলে জনগণ আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। লোকদের সাথে শপথ ভঙ্গ করবেন না, তবে তারা আপনার সাথে শপথ ভঙ্গ করবে। মনে রাখবেন, আপত্তি উত্থাপনকারীদের প্রতি জনতা হিংসা করে আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।” কিন্তু আমীন কারো কথাই শুনলেন না। লোকদের উপঢৌকন দিয়ে নিজের পক্ষে নিয়ে মূসার বাইআত করিয়ে নিলেন। সে সময় মূসা দুধের শিশু।

মামুন নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর নিজেকে ইমামুল মুমিনীন দাবী করেন আর এ নামটি লিখতে শুরু করেন। এদিকে ১৯৫ হিজরীতে আমীন আলী বিন ঈসা বিন মাহানকে

জবল, হামদান, নিহাওন্দ, কম আর আসফান শহরে পাঠান। শহরগুলো মামুনের বৃত্তি হিসেবে প্রাপ্য ছিল। আলী বিন ঈসা জমাদিউল আখের মাসের মাঝামাঝিতে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে যাত্রা করলো। মামুনকে বন্দী করে আনার জন্য আলী রুপার একটি হাতকড়া সাথে নিয়েছিল। তাদের প্রতিহত করার জন্য মামুন চার হাজারের কিছু কম সৈন্য দিয়ে তাহের বিন হুসাইনকে পাঠান। তাহের জয়লাভ করে। আলী বিন ঈসা যুদ্ধে নিহত হয় আর তার সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাহের আলী বিন ঈসার মাথা কেটে মামুনের নিকট পাঠায়। মামুন নির্দেশ দিলেন, এ কাটা মাথা খুরাসানের পথে পথে নিয়ে ফের আর জনতাকে বলো তারা যেন মামুনকে খলীফা হিসেবে মেনে নেয়।

যখন পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে দূত এলো, আমীন তখন মাছ শিকারে ব্যস্ত। তিনি দূতকে ধমক দিয়ে বললেন, “কমবখত, এ পুকুর থেকে দুটি মাছ ধরার সুযোগ তো দিবে। কারণ কাওসার দুটি পেয়েছে, আর আমি একটাও না।” এদিকে আমীনের ছিল এ অবস্থা, আর ওদিকে মামুন খিলাফতের তখত কব্জা করেন।

আব্দুল্লাহ বিন সালিহ জারমী বলেছেনঃ যুদ্ধে আলী বিন ঈসা নিহত হওয়ায় বাগদাদে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন আমীনের চোখ খুললো। মামুনকে বাইআত থেকে পৃথক করায় লজ্জিত হলেন। সভাসদদের ধোঁকা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। একদিকে ভাতা না দেয়ায় সৈনিকদের মাঝে গোলমাল লেগে যায়, অন্যদিকে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়, এর সাথে যুক্ত হয় আমীনের খেলাধুলার নেশা ও চরম মূর্খতা। ফলে তার সৌভাগ্যের পতন হয়। আর মামুন আহলে হারামাইন শরীফাইন আর অধিকাংশ ইরাকীর বাইআত করানোর কারণে তার সৌভাগ্যের বাতায়ন অবারিত হতে থাকে। ইরাকসহ প্রভৃতি শহর- নগর হাতছাড়া হওয়ায় আমীনের অবস্থা আরো সংকটময় হয়। সৈন্যদের মাঝে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। কোষাগার শূন্য হয়ে যায়। জনতার উপর মুসীবত চেপে বসে। সংঘাত ও সংঘর্ষে শহর বিজন বনে পরিণত হয়। ভবনগুলো কামানের গোলায় ভেঙে পড়ে। বাগদাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নগর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কবিগণ এ দৃশ্য দেখে রচনা করেন দীর্ঘ শোক গাঁথা।

এক কবি লিখেছেনঃ আমি চোখের অশ্রু দিয়ে রক্তাক্ত বাগদাদ দেখেছি, যখন আনন্দ ম্লান হয়েছে, হিংসুকদের দৃষ্টি পড়েছে আর কামানের গোলায় বাগদাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

পনেরো দিন বাগদাদ অবরুদ্ধ ছিল। অধিকাংশ বনূ আব্বাস আর রাষ্ট্রের কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ মামুনের দলে এসে যোগ দেয়। তারা বিশৃঙ্খলা ঠেকানোর জন্য আমীনের সাথে লড়াই করে। অবশেষে ১৯৮ হিজরীতে তাহের বিন হুসাইন তরবারীর জোরে বাগদাদে প্রবেশ করে আমীন, তার মা আর তার পরিবারকে শাহী প্রাসাদ থেক তাড়িয়ে দিয়ে আল- মানসুর শহরে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে তিনি তার সেনাবাহিনী ও গোলাম- ভৃত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সেখানে তার সবচেয়ে বড় দুর্দশা ছিল খাবার- দাবারের, তার কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না।

মুহাম্মাদ বিন রাশেদ বলেছেনঃ ইবরাহীম বিন মাহদী আমার কাছে বলেছেন, আল- মানসুর শহরে আমি আমীনের সাথে ছিলাম। এক রাতে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, “দেখো কি চমৎকার রাত। চাঁদের জোছনা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। চাঁদের আলো পানিতে পড়ে কি বিমোহিতকর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ সুন্দর পরিবেশে

শরাব পানের অনুষ্ঠান দারুণ মানাবে।” আমি বললাম, “আপনার যেমন অভিরুচি।” শরাব পানের মজলিস বসলো। সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আমীন যউফ নামক এক বাঁদিকে তলব করলেন। বাঁদির গান শুনে আমীন বললেন, “আল্লাহ তোমার উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন। তুমি চলে যাও।” বাঁদির যাওয়ার পথে কাঁচের একটি মূল্যবান গ্লাস তার পায়ের আঘাতে পড়ে ভেঙে গেলে আমীন বললেন, “ইবরাহীম, দেখো তো কি হল। আল্লাহর কসম, আমার মনে হচ্ছে আমার সময় সমাগত প্রায়।” আমি বললাম, “আল্লাহ তাআলা আপনার আয়ু বৃদ্ধি করুন। আপনার সাম্রাজ্য অটুট থাকবে।” আমি এ কথা বলেছি এমন সময় দজলা নদীর দিক থেকে এ আওয়াজ ভেসে এলো - “যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলে তা পূর্ণ হয়েছে।” আমীন এ কথা শুনে বিষন্ন ও বিবর্ণ হয়ে পড়েন। এর এক/দুই দিন পর তিনি বন্দী হোন। তাকে এক স্থানে আটকে রাখা হয়। কিছু অনারব লোক সেখানে এসে তলোয়ার দিয়ে একটি আঘাত করে। তিনি পড়ে গেলে তারা মাথা কেটে তাহেরের কাছে নিয়ে গেলো, তাহের তার কাটা মাথা এক বাগানের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়ে এ ঘোষণা করলো - এটা আমীনের বিচ্ছিন্ন মাথা। তার দেহটি পাহাড় চূড়ায় ফেলে রাখা হয়েছে।

এরপর তাহের এ মাথা, চাদর, ছড়ি আর খেজুরের পাতার জায়নামায মামুনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। নিজের ভাই নিহত হওয়ায় মামুন দারুণ মর্মাহত হোন। তিনি ভেবেছিলেন আমীনকে জীবিত তার কাছে পাঠানো হবে আর তা মতামতের উপর ভিত্তি করে তার উপর শাস্তির দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। এ অপরাধের প্রতিশোধ হিসেবে মামুন তাহেরকে নির্বাসিত করেন আর তাহের সেখানেই মারা যায়। এর মধ্য দিয়ে আমীনের একটি কথার প্রতিফলন ঘটে। একবার আমীন তাহেরকে লিখেছিলেন, “হে তাহের, যে লোকটি আজ পর্যন্ত আমার প্রাপ্য কুক্ষিগত করে রেখেছে আর আমার উপর অত্যাচার করছে তার শাস্তি সর্বদা তলোয়ার। ফলে তুমিও তার অপেক্ষায় থাকো।”

কথিত আছে, আমীন চারদিক থেকে খেলোয়াড়দের সংগ্রহ করেন। তাদের বেতন- ভাতা নির্ধারণ করেন। তিনি বন্য প্রাণী ও বিভিন্ন ধরনের পাখি পুষতেন। নিজ পরিবার ও সভাসদদের থেকে পর্দা করতেন এবং তাদের আমর্যাদা করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুণ্ঠন করেন, মণিমুক্তা ও মূল্যবান সম্পদ অপচয় করেন, খেলাধুলার জন্য অনেক ভবন নির্মাণ করেন। এক গায়ককে সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য এক নৌকা ভর্তি স্বর্ণ পুরস্কার দেন। পাঁচটি প্রাণী - বাঘ, হাতি, সাপ, ঘোড়া আর ঈগল পাখি শিকারের জন্য পাঁচটি জাহাজ তৈরি করেছিলেন।

আমীন নিহত হলে আমীনের পক্ষ অবলম্বনকারী কবি তাঈমী মামুনের কাছে এসে তার প্রশংসা করলো। কিন্তু তিনি তার প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ফজল বিন সাহল তার ব্যাপারে সুপরিশে কিছুটা নমনীয় হলে মামুন তাঈমীর দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন, “তাঈমী, তোমার কবিতা এখন কেমন হবে, যখন একজন বাদশাহ তার ভাইয়ের সাথে হিংসা করছে।” তাঈমী তখন এ কবিতা আবৃত্তি করলো - “মামুন আব্দুল্লাহর প্রতি অত্যাচার আর তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করায় তিনি বিজয় অর্জন করেছেন। সেই প্রতিশ্রুতি - যা তার পিতা তাদের করিয়েছিলেন। এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার ভাই কাজ করেনি।” এটা শুনে মামুন তার অপরাধ ক্ষমা করে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিলেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তার কাছে আমার একান্ত আশা, তিনি আমীনকে শুধু এ কারণে ক্ষমা করে দিবেন যে, ইসমাঈল বিন উলীয়া তার কাছে এলে তিনি খুবই কঠোর ভাষায় তাকে বললেন - 'হারামজাদা, তুই কুরআন শরীফকে মাখলুক বানিয়েছিস!' "

মাসউদী বলেছেন, "আমার সময় পর্যন্ত আলী বিন আবু তালিব, ইমাম হাসান আর আমীন ছাড়া কোন হাশেমী খলীফা হাশেমী নারীর পেট থেকে জন্মগ্রহণ করে খিলাফতের তখতে বসেননি। আমীনের মা হলেন যাবীদা বিনতে জাফর বিন আবু জাফর মানসুর, তার আসল নাম উম্মুল আযীয, লকব হচ্ছে যাবীদা।"

ইসহাক মওসূলী বলেছেন, "আমীনের কিছু বৈশিষ্ট্য এমন ছিল, যা অন্যান্য খলীফার মধ্যে ছিল না। তিনি খুবই সুন্দর, দানশীল, মা বাবা উভয় দিক দিয়ে সম্মানিত, সুযোগ্য সাহিত্যিক আর উচ্চাঙ্গের কবি। কিন্তু আফসোস, খেলাধুলা তাকে গ্রাস করে। তিনি তদানীন্তন যুগের দানশীল ছিলেন, কিন্তু খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে দারুণ কৃপণ ছিলেন।"

আবুল হাসান আহমর বলেছেন, "আমি যদি কখনো কোন কবিতা দলিল দেওয়ার সময় ব্যাকরণ ভুলে যেতাম, তখন আমীন আমাকে সেই কবিতাটি পড়ে শোনাতেন। আমি বাদশাহর ছেলেদের মধ্যে আমীন আর মামুনের চেয়ে বেশী মেধাবী আর কাউকে দেখিনি।"

১৯৮ হিজরীর মুহাররম মাসে ২৭ বছর বয়সে আমীন নিহত হোন।

তার খিলাফতকালে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - ইসমাঈল বিন উলীয়া, গিন্দর, শফীক, আবু মুআবিয়া জরীর, ঐতিহাসিক সুদুসী, আব্দুল্লাহ বিন কাসির, কবি আবু নাওয়াস, ইমাম মালিক (রহঃ) এর ছাত্র আব্দুল্লাহ বিন ওহাব, দরশে মাকরী, কাঈ প্রমুখ।

আলী বিন মুহাম্মাদ, নওফেল প্রমুখ বলেছেন, "সাফফাহ, মানসুর, মাহদী, হাদী, রশীদ মিম্বরে দাঁড়িয়ে কেউ নিজেদের গুণাবলী প্রকাশ করতেন না। কিন্তু আমীন খলীফা হওয়ার পর মিম্বরে দাঁড়িয়ে নিজের গুণাবলী জাহির করতেন। তিনি চিঠির শুরুটা এভাবে লিখতেন - আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আমীন আমিরুল মুমিনীনের পক্ষে থেকে।"

আসকারী বর্ণনা করেছেনঃ তার কবিতাগুলো ছিল পবিত্র। তিনি যখন শুনলেন মামুন তাকে দোষিয়েছে আর আমীনের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলেছে, তখন তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। যাতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব আর মামুন যে মায়ের পেট থেকে প্রসবিত হয়েছেন সে মায়ের কারণে অমর্যাদার বিষয়টি বিধৃত রয়েছে। গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে এ কবিতার গুণগত মান উচ্চাঙ্গের, তার ভাই আর তার পিতার কবিতার চেয়ে হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম।

তাহের বিজয় অর্জন করলে আমীন খিলাফতের আশা- ভরসা ছেড়ে দিয়ে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন - "হে প্রাণ, সত্যকে মেনে নাও। আল্লাহর হুকুম থেকে সরে আসার কোন পথ নেই। যারা সরে আসবে, তারা ভুলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে।"

সূলী বলেছেনঃ আমীন নিজের কাতেব দিয়ে লিখিয়ে তাহেরের কাছে এ চিঠিটি পাঠান - "আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আমীন আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে তাহের বিন হুসাইনের প্রতি আসসালামু আলাইকুম। এরপর, আমি ও আমার ভাইয়ের মধ্যবর্তীতে এসে যে দাঁড়িয়েছে লোকেরা তাকে স্পষ্টভাবে চেনে। ভাগ্যে যা লিখা রয়েছে তাই হবে। তবে আমি চাই তুমি আমার উপর থেকে পরওয়ানা উঠিয়ে নাও, যাতে আমি আমার ভাইয়ের কাছে যেতে পারি। যদি সে আমার সম্মান করে তবে সে তার যোগ্য। আর যদি হত্যা করে তবে এটাই তার পুঁজি। বীরত্ব বীরত্বকে কর্তন করে। আর তলোয়ার তলোয়ারকে, যদি আমাকে কোন বন্য প্রাণী টুকরো টুকরো করে তাহলে তা হবে কোন ক্ষুধার্থ কুকুর টুকরো টুকরো করার চেয়ে উত্তম।" কিন্তু তাহের তা প্রত্যাখ্যান করলো।

ইসমাঈল বিন আবু মুহাম্মাদ ইয়াযিদী বলেছেনঃ আমার বাবা অনেক বার আমীন আর মামুনের সাথে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমি তাদের দুইজনকে খুবই মিষ্টভাষী ও বাকপটু হিসেবে পেয়েছি। বনূ উমাইয়ার খলীফাদের ছেলেরা বাগ্মীতা অর্জনের জন্য বাদয়ূর কাছে যেতো। এরপরও বনূ আব্বাস ভাষাসাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশী অগ্রগামী।

সূলী বলেছেনঃ আমি আমীনকে একটি ছাড়া আর কোন হাদীস বর্ণনা করতে দেখিনি।

মুগীরা বিন মুহাম্মাদ বলেছেনঃ একবার হুসাইন বিন যহাকের কাছে বনু হাশিমের একটি দল বসেছিলো। এ দলে মুতাওয়াককীলের ছেলেরাও ছিলেন। এক ব্যক্তি হুসাইন বিন যহাককে জিজ্ঞেস করলো, "আমীন কেমন সাহিত্যিক ?" হুসাইন বললেন, "খুব উঁচু মাপের।" আবার প্রশ্ন করা হলো, "ফিকাহ (আইন) শাস্ত্রে তার অবস্থান ?" তিনি বললেন, "মামুন তার চেয়ে বড় ফিকাহবিদ।" বলা হলো, "আর হাদীসে ?" তিনি বললেন, "আমি তার মুখ থেকে মাত্র একটি হাদীস শুনেছি। তার এক গোলাম হাজ্জে গিয়ে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমীন বললেন, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - 'যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মারা যাবে, কিয়ামতের দিন তাকে লাব্বাইক বলতে বলতে উপস্থিত করানো হবে।' "

সাআলাবী লিতইফীল মাআরিফ গ্রন্থে লিখেছেন যে, আবুল আইনা বলেছেন, যাবীদা তার খোঁপার চুল ছেড়ে দিলে চুলের ভাঁজে ভাঁজে খলীফা আর উত্তরাধিকার দেখা যেতো। কারণ মানসুর তার দাদা, সাফফাহ দাদার ভাই, মাহদী চাচা, রশীদ স্বামী, আমীন সন্তান, মামুন এবং মুতাসিম সতিনের ছেলে, মুতাওয়াককিলও সতিনের ছেলে। আর উত্তরাধিকারের দৃষ্টান্ত যদি দেয়া হয়, তাহলে বনু উমাইয়ার আতীকা বিনতে ইয়াযিদ বিন মুআবিয়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ ইয়াযিদ তার পিতা, মুআবিয়া (রাঃ) দাদা, মুআবিয়া বিন ইয়াযিদ তার ভাই, মারওয়ান বিন হাকাম তার শ্বশুর, আব্দুল মালিক তার স্বামী, ওলীদ তার ছেলে হিশাম তার পৌত্র, সুলায়মান তার সতিনের ছেলে আর ইয়াযিদ ও ইবরাহীম তার সতিনের পৌত্র।

আল মামুন আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাস

মামুন আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাস বিন হারুন রশীদ ১৭০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝিতে জুমআর রাতে যেদিন হাদীর ইন্তেকাল হয় সেদিন জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আমীনের পর তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। তার মাতার নাম মারাজিল, যিনি বাদী ছিলেন। তিনি সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিনের মধ্যেই মারা যান।

মামুন বাল্যকালে ইলম অর্জন করেন। তিনি তার পিতা, হাশিম, উবাদা বিন আওয়াম, ইউসুফ বিন আতীয়া আবু মুআবিয়া আল যরীর, ইসমাঈল বিন উলীয়া, হাজ্জাজ আউর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইয়াযিদীর কাছে ভাষা- সাহিত্য চর্চা করেন। দূর- দূরান্ত থেকে ফিকাহবিদদের সমবেত করে ফিকাহ, আরবী ও ইতিহাসে পান্ডিত্য অর্জন করেন। পরিণত বয়সে তিনি দর্শন ও উলুমুল আওয়ায়েল (সূচনা সংক্রান্ত বিদ্যা) অর্জন করেন আর তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও চর্চা করার কারণে তিনি খলকে কুরআনে বিশ্বাসীতে পরিণত হোন। তার থেকে তার ছেলে ফজল, ইয়াহইয়া বিন আকতাম, জাফর বিন আবু উসমান আল তায়ালাসী, আমীর আব্দুল্লাহ বিন তাহের, আহমাদ বিন হারেস শায়আ, ওয়ায়েল খাযায়ীসহ অনেক লোক হাদীস বর্ণনা করেন।

তিনি বনূ আব্বাস বংশে অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, সংকল্প, নম্রতা, জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধিমত্তা, আকস্মিকতা, বীরত্ব ও নেতৃত্বের দিক থেকে সবার বড়। তার মধ্যে বহু নেক গুণাবলীর সমাবেশ ছিল। এর মধ্যে কারো কোন প্রকার সন্দেহ নেই যে, বনূ আব্বাস খান্দানে তিনি সবচেয়ে বড় আলেম। তিনি উচুঁ মাপের বাগ্মী আর ভাষাবিদ। তার বিখ্যাত উক্তি হলো - "মুআবিয়ার, উমরের আর আব্দুল মালিকের হাজ্জাজের প্রয়োজন ছিলো। আর আমার কারো প্রয়োজন নেই।"

বর্ণিত রয়েছেঃ বনূ আব্বাসের প্রথম খলীফা সাফফাহ, মধ্যবর্তী খলীফা মামুন আর শেষ খলীফা মুতাযদ।

কথিত আছে, কোন কোন রমযানে তিনি ৩৩ বার কুরআন শরীফ খতম করতেন। তার ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, তিনি ছিলেন শীআ। যারা এ মত প্রকাশ করেছে তাদের দলিল হলো, তিনি নিজের ভাই মুতামানকে উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ইমাম আলী রেযাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।

আবু মুশার আল মাজাম বলেছেন, "মামুন ন্যায়বিচারক এবং প্রশাসকদের ইনসাফের প্রতি তাকীদ দিতেন। তিনি ফিকাহ শাস্ত্রে এতোই বিজ্ঞ ছিলেন যে, তাকে বড় আলেমদের মধ্যে গন্য করা হয়।"

হারুন রশীদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "মামুনের মনসুরের মতো দৃঢ়তর সংকল্প, মাহদীর মত বদান্যতা আর হাদীর মত মর্যাদাবোধ ছিল। আমি ইচ্ছে করলে তাকে আমার পর স্থান করে দিতে পারতাম। আমীন প্রবৃত্তি তাড়িত ব্যক্তি। সে অপচয়, বাঁদি ও নারীদের সাথে যুক্ত - এ কারণে মামুন তার চেয়ে অগ্রগামী। যদিও তার মান বনূ হাশিম বংশোদ্ভূত, এছাড়া সব বিষয়ে মামুন অগ্রজ।

১৯৮ হিজরীতে আমীন নিহত হওয়ার পর মানুন আবূ জাফর উপাধি ধারণ করে খলীফা হোন।

সূলী বলেছেনঃ এ উপাধি মামুনের খুব প্রিয় ছিল, কারণ মানসুরের এ উপাধি ছিল। আর তিনি হলেন অত্যন্ত প্রতাপান্বিত বাদশাহ। এ উপাধি ধারনকারী বাদশাহগণ দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন, যেমন মানসুর ও হারূন রশীদ।

২০১ হিজরীতে মামুন নিজ ভাই মুতামিনকে বঞ্চিত করে তদস্থলে আলী রেযা মূসা আল কাযিম বিন জাফর সাদিককে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। লোকেরা এ কাজ তার শীআ হওয়ার দলিল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এমনকি তারা এ কথাও বলে যে, মামুন নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করে খিলাফতের দায়িত্ব আলী রেযার উপর অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাকে রেযা উপাধিতে ভূষিত করেন। তার নাম ধারণের জন্য শাস্তি দেন। নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। গোটা সাম্রাজ্যে তার নাম ঘোষণা করেন। তিনি কালো কাপড় পরতে নিষেধ করে সবুজ কাপড় পরার হুকুম জারি করেন। এ নির্দেশে বনূ আব্বাস অসন্তুষ্ট হয়ে ইবরাহীম বিন মাহদীর কাছে বাইআত করে মামুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বনূ আব্বাস সে সময় ইবরাহীম বিন মাহদীকে মুবারক উপাধিতে ভূষিত করে। মামুন তার সাথে মোকাবিলা করেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মামুন ইরাক সফরে গেলে ২০৩ হিজরীতে আলী রেযা পরলোক গমন করে। এরপর মামুন বাগদাদবাসীকে এ চিঠি লিখে পাঠান - আলী রেযার মৃত্যু হওয়ায় তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছো। জবাবে বাগদাদবাসী লিখলো - মামুনকে তারা অত্যন্ত জঘন্য মনে করে। এরপর তারা সহজে ইবরাহীমকে সহযোগিতা করতে লাগলো। ফলে ইবরাহীম প্রায় দুই বছর শেষে যিলহাজ্জ মাসে আত্নগোপন করেন। আট বছর তিনি আত্নগোপন করে ছিলেন।

২০৪ হিজরীর সফর মাসে মামুন বাগদাদে ফিরে আসেন। তখন বনূ আব্বাসসহ অন্যান্য লোকেরা সবুজ কাপড় ছেড়ে কালো কাপড় পরতে আরম্ভ করে। প্রথমে মামুন এ বিষয়টিকে ভিন্ন চোখে দেখলেও পরবর্তীতে তা মানিয়ে নেন।

সূলী বলেছেনঃ মামুনের পরিবারের কিছু লোক তাকে বললো, "আপনি আলী বিন আবু তালিবের সন্তানদের সাথে সৎ আচরণ করতে চাইলে তাদের উপ খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করলে কিভাবে আপনি এ কাজ পরিচালনা করবেন ? সুতরাং খিলাফত আপনার হাতে থাকা পর্যন্ত আপনি শক্তিধর। তাদের হাতে চলে গেলে আপনি আর কিছুই করতে পারবেন না।" মামুন জবাবে বললেন, "আমি তা এ জন্যই করছি যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর হাশেমী লোককে উত্তরাধিকার মনোনীত করেননি। এভাবে উমর (রাঃ) আর উসমান (রাঃ) কেন হাশেমীকে খিলাফতের কোন দায়িত্ব দেননি। খলীফা হওয়ার পর আলী (রাঃ) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে বসরায়, উবায়দুল্লাহকে ইয়ামানে, মাবাদকে মক্কায় আর কাসামকে বাহরাইনে প্রশাসক নিয়োগ করেন; বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোনভাবে পদমর্যাদাসম্পন্ন অফিসার নিয়োগ করেছেন। এ প্রক্রিয়ায় অংশ হিসেবে আমি তার আওলাদদের তা প্রদান করতে চাই।"

২১০ হিজরীতে মামুন বোরান বিনতে হুসাইন বিন সহলকে বিয়ে করেন। এতে সহস্রাধিক সম্পদ মামুনকে দেয়া হয়। বোরানের বাবা ছিলেন মহানুভব দাতা। তিনি সকল নেতাদের উপঢৌকন দেন আর সতেরো দিন দাওয়াত খাওয়ান। তিনি অনেক স্লিপ লিখেন, প্রত্যেক স্লিপে কোন না কোন জায়গীরের (জমিদার কর্তৃক প্রাপ্ত জমি) কথা উল্লেখ ছিল। স্লিপগুলো বনূ আব্বাস এবং আমন্ত্রিক নেতাদের বন্টন করে দেয়া হয়। যে স্লিপ যার কাছে যায়, তাকেই সেই জায়গীর প্রদান করা হয়। যাওয়ার সময় সোনা ও মুক্তভর্তি অনেকগুলো থলে এনে মামুনকে দেওয়া হয়।

২১১ হিজরীতে মামুন ঘোষণা করে, যে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর গুণবলী আলোচনা করবে, আমি তার নিরাপত্তা থেকে দূরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আলী (রাঃ)।

২১২ হিজরীতে সে খলকে কুরআনের মাসআলা ইলান করে। আর সে আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রা;) এর উপর হযরত আলী (রাঃ) এর মর্যাদার কথা ঘোষণা করে। এতে করে তার প্রতি লোকদের ঘৃণা জন্ম নেয়। অধিকাংশ শহরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কেউ তার এ আকীদা গ্রহণ না করায় ২১৮ হিজরীতে মামুন অপারগ হয়ে নিজের প্রচারিত মতবাদ থেকে নিজেই ফিরে আসে।

২১৫ হিজরীতে যুদ্ধ করতে রোম যাত্রা করেন। সেখানে কুরা আর মাজেদা নামক দূর্গদ্বয় যুদ্ধ করে জয় করেন। এরপর দামেশক ফিরে আসেন।

২১৬ হিজরীতে আবার রোমে গিয়ে কিছু দূর্গ জয় করে দামেশক প্রত্যাবর্তন করেন। দামেশক থেকে মিসরে যান। আব্বাসীয় কোন বাদশাহর এটাই প্রথম মিসর সফর।

২১৭ হিজরীতে মিসর থেকে এসে আবার রোম গমন করেন।

২১৮ হিজরীতে খলকে কুরআনের মাসয়ালা সম্পর্কে লোকদের পরীক্ষা করেন। বাগদাদ সাম্রাজ্যের নায়েব তাহের বিন হুসাইনের চাচাতো ভাই ইসহাক বিন ইবরাহীম খাযায়ী বাগদাদের আধ্যাত্মিক ওলামাদের কাছে এ মর্মে পত্র লিখেন যে - আমিরুল মুমিনীন অনেক মর্যাদাবান, আর ব্যক্তিবর্গ এমনকি আলেম থেকে জাহেল পর্যন্ত যাদের দ্বীনের কোন জ্ঞান নেই, যাদের অন্তরের ইলমের আলো নেই, যাদের কাছে কোন দলিল নেই - তাদের ব্যাপারেও অবগত আছেন। আল্লাহ তাআলার মারিফাতে যারা মূর্খ, অন্ধ আর গোমরাহ, যারা দ্বীনের গূঢ় রহস্য জানে না, আল্লাহ তাআলাকে সঠিকভাবে চেনে না, যারা হাকিকত- মারিফত বুঝে না, তার সৃষ্টি জগতের পার্থক্য করতে পারে না, তারা আল্লাহ তাআলা, তার মাখলুক আর যা কিছু কুরআন শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে সবগুলোকে একই সমান মনে করে। এ কারণে লোকদের ধারণা - কুরআন শরীফ পুরাতন বা সেকেলে, আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করেননি। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

“আমি কুরআন শরীফকে আরবী বানিয়েছি ....” (সূরাহ আয- যুখরুফ, ৪৩ : ৩)

বুঝা গেলো, যাকে বানানো হয় সে মাখলুক। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে -

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ

"আমি পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদ আপনার কাছে বর্ণনা করি ..." (সূরাহ ত্বহা, ২০ : ৯৯)

আবার, ইরশাদ হচ্ছে -

وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

"আর অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন।" (সূরাহ আল- আনআম, ৬ : ১)

এ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাআলা অনেক বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে -

أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ

"... যার আয়াতসমূহ খুবই সুস্পষ্ট (ও সুবিন্যস্ত) করে রাখা হয়েছে, এরপর (এর বর্ণনাসমূহও এখানে) বিশদভাবে বলে দেওয়া হয়েছে ..." (সূরাহ হুদ, ১১ : ১)

এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনকে আহকাম আর বিস্তারিত করে বানিয়েছেন। তিনিই খালিক বা সৃষ্টিকর্তা। এরপরও তারা নিজেদের সুন্নতের দাবীদার হিসেবে জাহির করে এবং নিজেদের আহলুল হক ওয়াল জামাআত নাম রাখে। যারা তাদের আকীদা বিশ্বাস করে না, তারা তাদেরকে আহলে বাতেল ওয়াল কুফর বলে। এ বিষয়ে তারা সীমালঙ্ঘন করে এবং জাহেলদের ধোঁকার মধ্যে ফেলে, এমনকি পরহেযগার লোকেরাও তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে আর সত্য থেকে মিথ্যার দিকে চলে যাচ্ছে। তারা নিজের গোমরাহীর কারণে নিজের মতো করে আল্লাহর ইবাদত করছে। আমিরুল মুমিনীনের দৃষ্টিতে বজ্জাত আর জঘন্য ওরা; যারা তাওহীদ থেকে সরে যায়। যারা তাওহীদের মধ্যে কমি করবে সে জাহেল। আর যে তাওহীদের মিথ্যা প্রচার করবে সে শয়তান। শয়তান তার বন্ধুর মুখ দিয়ে কথা বলে, আর শত্রু অর্থাৎ আল্লাহর খাস বান্দাদের ভয় করে। ওদের (শয়তানের বন্ধুদের) সত্য কথারও কোন মূল্য নেই। তাদের সাক্ষ্য পরিত্যাজ্য, কারণ যে তাওহীদের বিষয়ে অন্ধ, তার চেয়ে বড় অন্ধ এবং পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে!

আমিরুল মুমিনীনের কসম, সবচেয়ে মিথ্যাবাদী লোক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ এবং তার ওহীকে মিথ্যা জ্ঞান করে, বাতিলের সঙ্গ দেয় দেয় আর আল্লাহ তাআলাকে সঠিকভাবে চেনে না। অতএব সকল কাযীকে সমবেত করে আমার পত্রখানা তাদের সামনে পড়া হবে। তারা কিছু বললে তাদেরও পরীক্ষা নেওয়া হবে। সৃষ্টিজগৎ আর কুরআনের জন্ম সম্পর্কিত তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তাদের বলা হবে, যে ব্যক্তি দীনের উপর অটল নয়, তার প্রতি কখনই ভরসা করা হবে না। কোন কাজে তাকে সাহায্য করা হবে না। আর যদি সে এ মাসয়ালাকে স্বীকৃতি দেয়, তবুও তার জন্য কুরআনের জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যক্তিদের উপস্থিতি আর তাদের সাক্ষ্য প্রয়োজন হবে। যারা এ মাসয়ালাকে স্বীকৃতি দিবে না, তাদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কাযীদ্র নির্দেশ প্রদান করেছি।

মামুন পত্রটি যে সাতজনের কাছে পাঠিয়ে তাদের ডেকে পাঠান, তারা হলেন - ওকেদীর লেখক মুহাম্মাদ বিন সাদ, ইয়াহইয়া বিন মঈন, আবু খায়সামা (যাহীর বিন হরব - অনুবাদক), আবু মুসলিম মুসতামালা, ইয়াযিদ বিন হারুন, ইসমাঈল বিন দাউদ, ইসমাঈল বিন আবু মাসউদ আর আহমাদ বিন ইবরাহীম দুরকী। তারা এলে খলকে কুরআন সম্পর্কে তাদের পরীক্ষা করা হয়। তাদের ভূমিকা অপরিবর্তনীয় থাকায় তাদের জণ্য বাগদাদের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে দুঃখ- দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তারা তা কবুল করেন।

এরপর মামুন ইসহাক বিন ইবরাহীমকে পত্র মারফত জানালেন যে, তুমি মুফতী আর আলেমদের একত্রিত করে জানিয়ে দাও, উপরিউক্ত সাতজন খলকে কুরআনের আকীদা মেনে নিয়েছেন। ইসহাক সেটাই করলেন। কিছু লোক কথাটি বিশ্বাস করলো, আবার অধিকাংশরা তা প্রত্যাখ্যান করলো।

পুনরায় মামুন ইসহাককে পত্র লিখে নির্দেশ দিলেন - যারা এ আকীদা প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের একত্রিত করে ভালোভাবে জেনে নাও। ইসহাক তাদের ডাকলেন। ইয়াহইয়া বিন মুঈন বলেন, তলোয়ারের জোরে আমরা এ আকীদা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি।

ইসহাকের ডাকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, বশর বিন ওলীদ কিন্দী, আবু হাসান যিয়াদী, আলী বিন আবু মুকাতিল, ফজল বিন গানিম, উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারেরী, আলী বিন জাআদা, সুজাদা যিয়াল বিন হাশিম, কায়তাবা বিন সাঈদ, ইসহাক বিন ঈসরাঈল, ইবনে হরশ, ইবনে উলীয়া আল আকবর, মুহাম্মাদ বিন নূহ আল আজলী, ইয়াহইয়া বিন আব্দুর রহমান উমরী, বাবু নসর তামার, আবু মুআম্মার কতীয়ী, মুহাম্মাদ বিন হাতিম বিন মাইমুন, সাদ প্রমুখ সমবেত হলে ইসহাক মামুনের পত্রটি পড়ে শোনান। শোনার পর তারা মাথা নিচে করে ফেলেন, কোন উত্তর দিলেন না, বরং ভাসা ভাসা কিছু কথা বললেন। অবশেষে ইসহাক বশর বিন ওলীদকে বললেন, “আপনার অভিমত কি ?” তিনি বললেন, “আমি আমিরুল মুমিনীনকে বলবো।” ইসহাক বললেন, “আমিরুল মুমিনীন একে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার ফরমানকে মান্য করা জরুরি।” তিনি বললেন, “আমার মতামত হলো, কুরআন শরীফ আল্লাহ তাআলার কালাম।” ইসহাক বললেন, “আমি আপনাকে এটা প্রশ্ন করিনি; বরং আমি জিজ্ঞেস করছি - আপনি কুরআন শরীফকে মাখলুক বলেন কিনা ?” তিনি বললেন, “আমি যা বলেছি এর চেয়ে বেশী কিছু বলা শোভন মনে করি না। আমি আমিরুল মুমিনীনের নিকট শপথ করেছি যে, এ মাসয়ালা সম্বন্ধে অগ্রিম কিছু বলবো না।”

এরপর ইসহাক আলী বিন আবূ মুকাতিলের মতামত জানোতে চাইলেন। তিনি বললেন, “কুরআন শরীফ আল্লাহর বাণী। যদি আমিরুল মুমিনীন কিছু বলেন, তবে আমরা শুনবো আর তার আনুগত্য করবো।” ফের আবু হাসান যিয়াদীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনিও একই উত্তর দিলেন। তারপর হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, “কুরআন আল্লাহর কালাম।” ইসহাক বললেন, “কুরআন মাখলুক কিনা ?” তিনি বললেন, “এটা আল্লাহর কালাম - এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারবো না।” এরপর অবশিষ্টদের যাচাই করা হয়। অবশেষে ইবনে বাকা আল আকবার বললেন, “কুরআন শরীফ বানানো (তৈরি বা সৃষ্টি করা) হয়েছে। কুরআন মুহদিস। কারন এ ব্যাপারে কুরআনিক দলিল রয়েছে।” ইসহাক বললেন,

"যাকে বানানো হয়, সে-ই তো মাখলুক।" ইবনে বাকা আল- আকবার বললেন, "জ্বি।" ইসহাক বললেন, "তাহলে কি কুরআন শরীফও মাখলুক ?" ইবনে বাকা আল আকবার বললেন, "আমি কুরআনকে মাখলুক বলবো না।"

ইসহাক আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ লিখে খলীফা মামুনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জবাবে মামুন দীর্ঘ চিঠি লিখে ইসহাকে কাছে পাঠালেন। তিনি লিখেছিলেন - তোমার পত্র পড়েছি। যারা নিজদের আহলে কিবলা আর শাসকগোষ্ঠী বলে দাবী করছেন, তারা মূলত আহলে কিবলা আর শাসকগোষ্ঠী নয়। যারা খলকে কুরআনে বিশ্বাসী নয়, তাদেরকে ফতোয়া দেওয়া, হাদীস বর্ণনা করা আর কুরআন শিক্ষা দেয়া থেকে বিরত রাখবে। বশর মিথ্যা বলেছে, আমিরুল মুমিনীনের সাথে তার কোন কসমের মোয়ামেলা নেই। আমিরুল মুমিনীনের বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও বানী হলো - কুরআন মাখলুক। যা তাকে বলা হয়েছে। যদি সে তাওবা করে, তবে তা ঘোষণা করবে। নাহলে তাকে হত্যা করে তার মাথা আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে।

ইবরাহীম বিন মাহদীকে আবার বলো, যদি সে তা গ্রহণ করে তবে ভালো, নাহলে তার গর্দানও উড়িয়ে দাও। আলী বিন আবূ মুকাতিলকে বলো, সে কি আমিরুল মুমিনীনকে বলেনি - আপনিই হালাল হারাম করবেন। যিয়ালকে বলো, শহরে লুটতরাজের অপরাধই তোমার জন্য যথেষ্ট। আহমাদ বিন ইয়াযিদ আর আবুল আওয়ামের কুরআন সম্পর্কিত জবাব সন্তোষজনক নয়। তারা বয়সে বৃদ্ধ হলেও বুদ্ধির দিক থেকে শিশু আর মূর্খ। তাদের আবার জিজ্ঞেস করো। যদি তারা নিজ অবস্থানে অটল থাকে, তাহলে ঘোষণা দিয়ে তলোয়ার দ্বারা তাদের মোকাবিলা করবে। আহমদ ইবন হাম্বলকে বলো, আমিরুল মুমিনীন আপনার জবাবের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন আর আপনার মূর্খতাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফজল বিন গানিমকে জানিয়ে দিবে, মিসরে সে যা করেছে,আমিরুল মুমিনীনের তা অজানা নয়। অর্থাৎ মিসরে অল্প সময়ের জন্য কাযী থাকা অবস্থায় তিনি অনেক সম্পদ অর্জন করেছেন। যিয়াদীকে বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছো। আবু নসরকে বলো, তার ব্যবসার ব্যাপারে আমিরুল মুমিনীনের আগে থেকেই সন্দেহ ছিল। ইবনে নূহ আর ইবনে হাতিমকে জানিয়ে দিবে, সুদ খেতে খেতে তাওহীদের জ্ঞান তাদের লোপ প্যেছে। সুদ খাওয়ার কারণে আমিরুল মুমিনীন তোমাদের সঙ্গে লড়াই করবেন। ইবনে শুজাকে বলো, আমীরের সম্পদ আলী বিন হিশামের জণ্য বৈধ, যা তুমি গ্রাস করেছো। সাদকে বলবে, যে রাজত্বের লোভ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে এতটুকুও দিবেন না। সাজাদাহকে জানিয়ে দাও, তুমি এ বিষয়টি অস্বীকার করবে যে, তোমার পাশে যে আলেমরা থাকেন, তাদের কাছ থেকে কুরআন মাখলুক - এ কথাটি শোননি? আলী বিন ইয়াহইয়ার আমানতদারী ঠিক করতে গিয়ে সে তাওহীদের কথা ভুলে গেছে। কাওয়ায়েরীর জানা আছে যে, আমি তার রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অবগত। তুমি আবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করো। মানলে তা ঘোষনা করে দাও, নাহলে তাদের বেঁধে আমিরুল মুমিনীনের সৈনিকদের কাছে পাঠিয়ে দাও। তারা তাদের জিজ্ঞেসবাদ করবে। তারপরও না মানলে তলোয়ার দিয়ে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।

এ ফরমান শুনে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, সাজাদাহ, মুহাম্মাদ বিন নূহ আর কাওয়ারেরীর ছাড়া সকলেই খলকে কুরআনের আকীদা গ্রহণ করে নেয়। ইসহাক এ চার জনকে বন্দী করে। পরদিন সে জেলখানায় গিয়ে

এ আকীদা সম্পর্কে তাদের আবার জিজ্ঞেস করে। সাজাদাহ আর কাওয়ারেরী চাপের মুখে নতি স্বীকার করেন এবং এ আকীদা মেনে নেন। এরপর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল আর মুহাম্মাদ বিন নূহকে রোমে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এদিকে মামুন জানোতে পান যে, সকলেই জেদাজেদীর কারণে এ মতাদর্শ গ্রহণ করেছে। এ কথা শুনে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে এ আদেশ লিখে পাঠালেন - সবাইকে বন্দী করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ইসহাক সকলকেই পাঠিয়ে দিলো, কিন্তু তারা গিয়ে না পৌঁছুতেই মামুন পরলোক গমন করে। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রহম করলেন।

মামুন রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। রোগের পীড়া তীব্রতর হলে সে পুত্র আব্বাসকে ডেকে পাঠায়। তার ধারণা ছিল, আব্বাস আসার আগেই সে ইন্তেকাল করবে। কিন্তু মামুনের মুমূর্ষু অবস্থায় আব্বাস এসে পৌঁছে। তবে এর আগেই বিভিন্ন শহরে, নগরের জনপদে পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যার উপরাংশে লিখা ছিল - এ পত্র মামুন আর তার ভাই আবু ইসহাকের পক্ষ থেক, যিনি মামুনের পর খলীফা হবেন। কথিত আছে, এ পত্রটি আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে লিখা হয়েছিলো। আবার কেউ কেউ বলেন, মামুন জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পর এ পত্রটি লিখা হয়।

২১৮ হিজরীর রযব মাসের ১৮ তারিখ বৃহস্পতিবারে রোমের বাযনাদুন অঞ্চলে ইন্তেকাল করে। তাকে তারতুসে দাফন করা হয়।

মাসউদী বলেছেন, বাযনাদুন ঝর্ণার পাদদেশে মামুন তাঁবু স্থাপন করেন। এলাকাটি শীতল, পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও মনোরম হওয়ায় তিনি তা পছন্দ করেছিলেন। হঠাৎ পাশের ঝর্ণায় চাঁদীর মত চকচকে একটি মাছ দেখা গেলো। মামুন এতে আশ্চর্য হয়ে মাছটি ধরার নির্দেশ দিলো। কিন্তু ঝর্ণার পানি খুবই ঠান্ডা হওয়ার কারণে কেউ পা দিতে সাহস করলো না। মামুন মাছটি ধরার জন্য একটি তলোয়ার পুরস্কার ঘোষণা করলে ফারাশ নামক একজন ঝর্ণায় নেমে মাছটি ধরে কিনারায় নিয়ে এলে লাফ দিয়ে তা পানিতে পড়ে যায়। ফারাশ আবার ঝর্নায় নেমে মাছটি ধরে আনে। মামুন একে কাবাব বানানোর নির্দেশ দিলো। কাবাব তৈরি না হতেই মামুনকে দারুণ ঠান্ডায় পেয়ে বসে। সে কাঁপতে থাকে। ফলে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে যায়। এরপরও কম্পন থামে না। সে অসম্ভব রকম কাঁপতেই থাকে। এতে করে তার দাঁতে দাঁতে সংঘর্ষ হতে থাকে। চারদিকে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। মাছটি কাবাব হয়ে আসে। কিন্তু মামুন তা একটুও চাখতে পারলো না। মৃত্যু এসে তাকে পরপারে নিয়ে গেলো। এর মধ্যে সে অল্পক্ষণের জন্য কিছুটা সুস্থতা বোধ করলে বাযনাদুনের অর্থ জানোতে চাইলেন। একজন বললো, পা ফেলাকে বাযনাদুন বলা হয়। এরপর সে এর পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলের নাম জিজ্ঞেস করলো। বলা হলো, এর নাম রোকা। মামুনের জন্মের সময় যে ভবিষ্যবানী করা হয়েছিলো, তাতে লিখা ছিল সে রোকায় মারা যাবে। সে রোকার কথা শুনে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে। সেই সময় সে এ দুয়া করে - "হে জগতের প্রতিপালক, হে সেই পবিত্র সত্তা - যার রাজত্ব কোন দিন ধ্বংস হবে না, এ বান্দার প্রতি রহম করুন, যার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।"

সালাবী বলেছেনঃ মামুন ও তার পিতা হারুন রশিদের কবর (রাজধানী থেকে) যত দূরে, আমার দৃষ্টিতে খলীদাদের মধ্যে কোন পিতা- পুত্রের কবর এত দূরে নয়। বনূ আব্বাসের পাঁচ জনের কবর অনেক দূরে, তারা হলেন - আব্দুল্লাহ তায়েফে, উবায়দুল্লাহ মদীনায়, ফজল সিরিয়ায়, কাসাম সমরকন্দে আর মাঝাদ আফ্রিকায়।

বিভিন্ন ঘটনাবলী

লাফযূয়া বলেছেন যে, হামেদ বিন আব্বাস বিন উযীর আমার কাছে বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আমি মামুনের কাছে বসেছিলাম। মামুন হাঁচি দিলেন, আমি আলহামদুলিল্লাহ'র জবাব দিলাম না। মামুন এর কারণ জানোতে চাইলেন। আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, আমি আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য বলিনি।" তিনি বললেন, "আমি সে রকম বাসশাহ নই, যারা দুয়াকে পরোয়া করে না।"

আবু মুহাম্মাদ ইয়াযিদী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ আমি মামুনকে শৈশবকালে শিক্ষাদান করেছি। একদিন যথারীতি আমি এলাম, কিন্তু মামুন অন্দর থেকে বের হলো না। আমি পরপর দু' জন খাদেমকে ডাকতে পাঠালাম। এরপরও সে এলো না। আমি বললাম, "সে নিজের সময়গুলো নষ্ট করছে।" এ কথা শুনে খাদেমরা বললো, "আপনি যাওয়ার পর শাহজাদা খাদেমদের যথেচ্ছা ব্যবহার করে এবং তাদের প্রহার করে। আজ তাকে হাল্কা শাসন করবেন।" এমন সময় মামুন এলো, আমি তাকে সাতটি বেত্রাঘাত করলাম। মামুন কাঁদতে লাগলো। এমন সময় জাফর বিন ইয়াহইয়া বরমক্কী এসে পড়লেন। শাহজাদা রুমাল দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে কার্পেটের উপর দিয়ে বসলো আর জাফরকে ডেকে নিলেন। আমি উঠে বাইরে গেলাম। মামুন জাফরের কাছে নালিশ করে কিনা এ ব্যাপারে আমার ভয় হলো। জাফর চলে গেলে আমি তার কাছে এসে বললাম, "আমার ভয় ছিল যদি আমার ব্যাপারে নালিশ করো!" এটা শুনে মামুন বলল, "হে বাবা মুহাম্মাদ, আমি হারুন রশীদকেও বলি না, সেখানে জাফরকে বলব ? কারণ শিক্ষা গ্রহণে আমার উপকার। আমি আদবের মোহতাজ।"

আসমায়ী বলেছেন, "মামুনের মোহরে খোদাই করে লিখা ছিল - আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ।"

মুহাম্মাদ বিন উবাদা বলেছেন, "খলীদাফের মধ্যে উসমান (রাঃ) আর মামুন ছাড়া কেউ হাফেজ ছিলেন না।"

ইবনে আয়নাহ বলেছেনঃ একদিন মামুন ওলামাদের সাথে সাধারণ পরিষদে বসেছিলেন। এক মহিলা এসে বললো, "হে আমিরুল মুমিনীন, আমার ভাই ইন্তেকাল করেছে। মৃত্যুর সময় ছয়শত দিনার রেখে গেছে, আমাকে এক দিনার দিয়ে বলা হয়েছে, এটাই তোমার অংশ।" মামুন কিছুক্ষণ ফারায়েযের অংক কষে বললেন, "তুমি একটি দিনারই পাবে।" ওলামা হযরত বললেন, "আমিরুল্ল মুমিনীন, এটা কি করে হয় ?" মামুন বললেন, "মৃত ব্যক্তি দুইজন কন্যা সন্তান রেখে গেছে।" মহিলা বললো, "হ্যা।" মামুন বললেন, "এ দুই সন্তান পেয়েছে দুই- তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ চারশো দিনার। তার মা রয়েছে, তিনি পেয়েছন অষ্টাংশ, অর্থাৎ একশো দিনার। স্ত্রীর ভাগে অষ্টমাংশ, অর্থাৎ ৭৫ দিনার। তার বারোজন ভাই ছিল না ?" মহিলা

বললো, “হ্যাঁ।” মামুন বললেন, “তারা পেয়েছে দুই দিনার করে। অবশিষ্ট থাকে এক দিনার, যা তোমার ভাগে এসেছে।”

মুহাম্মাদ বিন হাফয আল- আনমাতী বর্ণনা করেছেনঃ ঈদের দিন আমি মামুনের সাথে খাবার খেতে বসলাম। দস্তরখানে ছিল তিন শতাধিক প্রকার খাবার। মামুন এক একটি খাবারের প্রতি ইশারা করে বললেন, “এ খাবার অমুক রোগের ঔষধ। যার বমি করার অভ্যাস রয়েছে সে এ খাবার খাবে না - ইত্যাদি এ ধরনের আরো অনেক কথা। ইয়াহইয়া বিন আকতাম এ দৃশ্য দেখে বললো, “আমিরুল মিমিনীন, চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক থেকে দেখা হলে আপনি জালেনুস, জ্যোর্তিবিদ্যায় আপনি হলেন হরমুস, উলুমুল ফিকহে আলী বিন আবু তালিব, দানশীলতায় হতেম তাঈ, সত্যবাদিতায় আবু যর, দায়ার্দ্রতায় কাব বিন উমামা, আর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আপনি হলেন সহুল বিন আদিয়া।” এ কথা শুনে মামুন দারুণ খুশি হয়ে বললেন, “এজন্য জ্ঞানের কারণে মানুষকে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।”

ইয়াহইয়া বিন আকতাম বলেছেনঃ আমি মামুনের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি আর দেখিনি। একদিন রাতে আমি তার সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, “ইয়াহইয়া, দেখো তো আমার পায়ের কাছে কি ?” আমি তেমন কিছু দেখতে পেলাম না। তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বিছানার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রহরীদের ডাকলেন। এক প্রহরী মোমবাতি নিয়ে হাযির হলো, তিনি তাকেও দেখতে বললেন। ফলে দেখা গেলো, বিছানার নিচে একটি লম্বা সাপ বসে রয়েছে। তারা সাপটি মেরে ফেললো। আমি বললাম, “আমিরুল মুমিনীনকে এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলেমুল গায়েব বললেও কোন ক্ষতি নেই।” তিনি বললেন, “আল্লাহ ক্ষমা করুন। তুমি এ কি বলছো ? আমি এইমাত্র স্বপ্নে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে এ কবিতাটি আবৃত্তি করলো - ‘হে ঘুমন্ত ব্যাক্তি, জেগে উঠুন আর নগ্ন তলোয়ার দিয়ে নিজেকে রক্ষা করুন।’ এটা শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো আর বিশ্বাস হল অবশ্যই কিছু একটা হতে চলেছে। অবশেষে বিছানার নিচে সাপ পাওয়া গেলো।”

উমারাহ বিন আকল বলেছেনঃ একদিন কবি আবু হাফসা আমাকে বললেন, “তুমি কি কখন ভেবে দেখেছো যে, আমার দৃষ্টিতে মামুন কবিতার ভাবার্থ মোটেও অনুধাবন করতে সক্ষম নন ?” আমি বললাম, “তার চেয়ে বেশী কথোপকথন অনুধাবনকারী আর কে আছে ? আল্লাহর কসম, আপনি তাকে অনেক কবিতা শুনিয়েছেন। আর তিনি প্রথম চরণ শুনেই গোটা কবিতার সারাংশ ও ভাবার্থ বুঝে ফেলেন।” তিনি বললেন, “আমার শ্রেষ্ঠ রচনা চমৎকার একটি কবিতা তাকে শুনলাম। কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রকার অনুভূতি জাগলো বলে মনে হলো না। কবিতার অর্থটি এমন - ‘ইমাদুল হুদা মামুন দ্বীন নিয়ে মশগুল। আর জনতা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন।’ ” আমি বললাম, “কবিতার প্রভাব- শক্তি মাটি হয়ে গেছে। মামুন যদি শুধু দ্বীন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি কিভাবে সম্পাদন হবে ? আপনি তার শানে সে কবিতাটিই আবৃত্তি করেছেন, যা আপনার চাচা ওলীদের সামনে আবৃত্তি করেছিলেন।”

নযর বিন শামীল বলেছেনঃ আমি তালিযুক্ত চাদর পড়ে মামুনের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, “নযর, আমিরুল মুমিনীনের সামনে এভাবেই কি আসা উচিত ?” আমি বললাম, “হে আমিরুল মুমিনীন, এমনটা

পরেছি গরমের কারণে।” তিনি বললেন, “না, না; কথা এটা নয়। মনে হয় তুমি গরীব ঘয়ে গেছো। এ হাদীসটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা- ভাবনা করে দেখো; যা হিশাম বিন বশীর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনি মুজাহিদ থেকে, মুজাহিদ আল- শাবী থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - ‘এমন নারী, যার মধ্যে দ্বীন ও লাবণ্য রয়েছে, এমন নারীকে বিয়ে করলে অভাব ও দরিদ্রতার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।’ ” আমি বললাম, “আমিরুল মুমিনীন, হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী আপনার অভিমত সত্য। তবে হাসানের বরাত দিয়ে আউফুল আরাবী আমার কাছে বর্ণিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- ‘দ্বীনী ও লাবণ্যময়ী নারীকে বিয়ে করলে আয়েশের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।’ ” মামুন কোলবালিশে হেলান দিয়েছিলেন, আমার কথা শুনে সোজা হয়ে উঠে বসলেন। তিনি বললেন, “তবে কি প্রথম হাদীসে শব্দ ভুল রয়েছে ?” বললাম, “জ্বি, হিশাম ভুল বলেছেন। তিনি বুঝতে পারেননি।” এরপর মামুন রেওয়ায়েতের মধ্যে পার্থক্যগুলো বর্ণনা করলেন।

মামুন আমাকে বললেন, “তুমি কি আরবী কবিদের সনদ বর্ণনা করতে পারবে ?” আমি আরবী কবির একটি কবিতা আবৃত্তি করলাম। এটা শুনে মামুন বললেন, “আল্লাহ তাআলা এমন ধরণের কবিদের বিধ্বস্ত করুন, যারা ইলমুল আদব (আরবি সাহিত্য) ভালোভাবে জানে না।” এরপর তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে ইবনে আবী উরওয়াতাল মাদানী কবির কাব্য বলে শোনালেন। আমিও তাকে অনেক কবিতা শোনালাম। তিনি আমাকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম দেওয়ার নির্দেশ লিখে আমাকেসহ কাগজটি ফজল বিন সহলের কাছে পৌঁছে দিতে বললেন। আমি গেলাম। ফজল বললেন, “আমিরুল মুমিনীদের খুব ভুল ধরছেন ?” আমি বললাম, “হিশাম ভুলের উপর ছিলেন। আর তিনি তার অনুসরণ করছিলেন।” এ কথা শুনে ফজল নিজের পক্ষ থেকে আরো ত্রিশ হাজার দিরহাম দিলেন।

মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ আরাবী থেকে খতীব বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আমি মামুনকে ইয়াহইয়া বিন আকতামের সাথে বাগানে পায়চারী করতে দেখলাম। সামনে গিয়ে খলীফাসূচক অভিবাদন জানালাম। আমি শুনলাম তিনি ইয়াহইয়াকে বললেন, “আবু মুহাম্মাদ ইলমে আদব সম্পর্কে অভিজ্ঞ।” এরপর তিনি আমাকে একটি কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি এর যথাযথ ব্যাখ্যা করায় তিনি আমাকে আম্বর দান করলেন, সে সময় যা তার হাতে ছিল। তিনি পাঁচ দিরহামে বিক্রি করি।

আবু উবাদা বলেছেন, “মামুন পৃথিবীর বাদশাহ, তার মতো আর একজনকেও দেখিনি।”

আবু দাউদ বলেছেনঃ মামুনের কাছে এক খারেজী লোক এলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কাছে আমার খিলাফতের কোন দলিল আছে কি ?” সে বললো - আছে, তা হলো কুরআন শরীফের এ আয়াত -

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“আল্লাহ’র নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা বিচার- ফয়সালা করে না, তারাই (হচ্ছে) কাফের।” (সূরাহ আল- মাইদাহ, ৫ : ৪৪)

মামুন বললেন, "কিভাবে বুঝলে এটা কুরআনের আয়াত ?" সে বললো, "উম্মতের ইজমা দ্বারা।" তিনি বললেন, "যখন তোমরা নাযিলকৃত আয়াতের ক্ষেত্রে উম্মতের ইজমা দ্বারা একমত হচ্ছো, তখন বিশ্লেষণসাপেক্ষেও ঐকমত্যে পৌঁছা উচিত।" সে বললো, "আপনি সত্য বলেছেন।"

মুহাম্মাদ বিন মানসুর থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ মামুনের উক্তি হল – "ভদ্র লোকদের আলামত হচ্ছে সে ঊর্ধ্বতন লোকদের অত্যাচার সহ্য করবে, কিন্তু দুর্বলদের উপর জুলুম করবে না।"

সাঈদ বিন মুসলিম বলেছেনঃ মামুন বলতেন, "আমি ক্ষমা করতে এতটাই ভালোবাসি যে, যদি অপরাধীরা তা জানোতে পারে তাহলে তাদের অন্তর থেকে ভয় উঠে যাবে আর তারা ভীষন আনন্দিত হবে।"

ইবরাহীম বিন সাঈদ জাওহারী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ এক অপরাধীকে মামুনের সামনে আনা হলে তিনি কসম খেয়ে বললেন, "আমি তোমাকে হত্যা করবো।" সে বললো, "হে আমিরুল মুমিনীন, একটু ধৈর্য ধরুন আর সহনশীলতার সাথে কাজ করুন। কারণ নমনীয়তা প্রদর্শন অর্ধেক ক্ষমা করার সমান।" মামুন বললেন, "আমি যে কসম করেছি।" সে বললো, "আল্লাহ তাআলার সামনে হত্যাকারী হিসেবে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে কসম তরককারী হয়ে হাযির হওয়া অনেক ভালো।" এ কথা শুনে তিনি তাকে ছেড়ে দেন।

আবুল সলত আব্দুস সালাম বিন সালিহ থেকে খতীব বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আমি মামুনের কক্ষে শুয়ে গেলাম। এদিকে মশালবাহীদের তন্দ্রার কারণে মশাল গলে পড়ে যায়। মামুন নিজেই উঠে আসেন আর মশালগুলো ঠিক করে দেন। এমন সময় আমার চোখ খুললো। আমি শুনতে পেলাম মামুন বলছেন, "নিয়ম অনুযায়ী আমি গোসলখানায় ছিলাম। গোসলখানার খাদেমরা আমাকে গালি দিলো। আমি যে তাদের গালি শুনতে পেলাম তা তারা জানোতো না। আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।"

আব্দুল্লাহ বিন আল বাওয়াব থেকে সূলী বর্ণনা করেছেনঃ মামুন খুবই ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছিলেন। এমনকি তার ধৈর্যশীলতা দেখে আমাদেরই রাগ হতো। একদিন আমরা জাহাজে করে দজলা নদী ভ্রমণ করছিলাম। জাহাজের ডেকে পর্দা টানানো ছিল। একদিকে আমরা অন্যদিকে মাঝি মাল্লার দল বসেছিলো। একজন মাঝি বললো, "তোমরা জানো আমার অন্তরে মামুনের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধাবোধ নেই। তিনি আমার চোখের কাঁটা। কারণ তিনি নিজ ভাইয়ের হত্যাকারী।" আল্লাহর কসম, এ কথা শুনে মামুন হেসে উঠলেন। এরপর তিনি আমাদের বললেন, "আপনারা একটি গ্রহণযোগ্য উপায় বের করুন যা দ্বারা মর্যাদাবান ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে আমি সম্মানিত হতে পারি।"

খতীব ইয়াহইয়া বিন আকতাম থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আমি মামুনের চেয়ে দয়াবান আর কাউকে দেখিনি। একদিন আমি তার ঘরে শয়ন করলাম। তখনও আমি ঘুমিয়ে যাইনি। মামুন হাচিঁ দিয়ে উঠে বসলেন। হাঁচির শব্দে কারো যেন ঘুমের ক্ষতি না হয় সেজন্য জামার কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়ে বলতে লাগলেন, "ইনসাফের প্রথম পর্যায় হচ্ছে নিকটবতী বন্ধুদের প্রতি ইনসাফ প্রদর্শন, এরপর ক্রমান্বয়ে নগণ্যদের প্রতিও।"

ইয়াহইয়া বিন খালিদ বরমক্কী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ একদিন মামুন আমাকে বললেন, "ইয়াহইয়া, লোকদের প্রয়োজনে সাহায্য করাকে সৌভাগ্য মনে করবে। কারণ আকাশ ধ্বংস হবে, যুগ যুগান্তর কেউ বেঁচে থাকবে না, আর কারো দয়াও অবিনশ্বর নয়।"

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ যহরী কর্তৃক বর্ণিতঃ মামুন বলেছেন, "আমার মতে কষ্টার্জিত বিজয় স্বভাবজাত বিজয়ের চেয়ে প্রিয়। কারণ স্বভাবজাত বিজয় ম্লান হয়ে পড়ে, আর কষ্টার্জিত বিজয় অটুট থাকে।"

শাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মামুন বলেছেন, "যে তোমার ভালো সংকল্পে গর্বিত নয়, সে তোমার নেক কাজেরও সমর্থক নয়।"

আবুল আলীয়া বলেছেনঃ আমি মামুনকে বলতে শুনেছি, "সুলতানের খোশামোদ করা ঘৃণ্য কাজ।"

আলী বিন আব্দুর রহীম আল মুরুষী বলেছেনঃ মামুন বলতেন, "ঐ ব্যক্তি নিজের নফ্‌সের উপর অত্যাচার করে - যে এমন কাউকে কাছে পেতে চায়, যে তার থেকে নিজেকে দূরে রাখে। যে এমন ব্যক্তির সামনে বিনয় প্রদর্শন করে যে তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে না। এবং যে এমন লোকের প্রশংসায় পরিতৃপ্ত হয় যে তার সম্পর্কে জানে না।"

মুখারিক বলেছেনঃ একদিন আমি মামুনের সামনে এ কবিতাটি আবৃত্তি করলাম, "আমি এমন বন্ধু চাই, চরম হতাশা ও বেদনার সময় যে আমাকে সান্তনা দিবে।" মামুন কবিতাটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে বললেন। আমি সাতবার আবৃত্তি করলাম। তিনি বললেন, "মুখারিক, আমার গোটা রাজত্ব নিয়ে নাও, পরিবর্তে আমাকে এ ধরনের একটি বন্ধু এনে দাও।"

হুদাবা বিন খালিদ বলেছেনঃ একবার আমি মামুনের সাথে খেতে বসলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষে দস্তরখান উঠানোর সময় যেসব দানা মাটিতে পড়ে যায় সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেতে লাগিলাম। তা দেখে মামুন বললেন, "তোমার কি পেট ভরেনি ?" আমি বললাম, "জি, পেট ভরেছে। কিন্তু হাম্মাদ বিন সালামা, সাবিত বাসফীর বরাত দিয়ে আনাস (রাঃ) এর একটি হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - 'যে দস্তরখানার নীচে পড়ে থাকা দানা উঠিয়ে খাবে, সে দরিদ্রতা থেকে মুক্ত থাকবে।' " এ হাদীস শুনে মামুন আমাকে এক হাজার দিরহাম দিলেন।

হাসান বিন আবদাশ সাফার বলেছেনঃ মামুন বুরান বিনতে হাসান বিন সাদকে বিয়ে করার সময় লোকেরা হাসানকে অনেক উপহার দেয়। এক ফকীর দুটি উপহার পাত্র পাঠায়। সে একটিতে লবণ, অপরটি পাউডার ভর্তি করে এ মর্মে একটি পত্র লিখে হাসানের কাছে পাঠায় - "আমি এক ফকীরের পক্ষ থেকে এ উপহারটুকু পাঠালাম। ধনাঢ্যদের উপহার সামগ্রীর তালিকায় যেন আমার নাম লিখা না হয়। বরকতের জন্য লবণ আর সুগন্ধির জন্য পাউডার পাঠালাম।" হাসান এ পাত্র দুটি মামুনের সামনে পেশ করলো। তিনি তা পছন্দ করলেন আর পাত্র দুটি খালি করে তাতে স্বর্ণমুদ্রা ভরে পাত্র দুটি ফকীরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

মুহাম্মাদ বিন কাসেম থেকে সূলী বর্ণনা করেছেনঃ আমি মামুনকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহর কসম, ক্ষমা করার মধ্যে আমি এমন মজা পাই যে, এটা বুঝতে পারলে লোকেরা অপরাধ করে এমনিতেই আমার কাছে আসতো।"

হুসাইন আল-খলীহ থেকে সূলী বর্ণনা করেছেনঃ একদা মামুন রেগে আমার ভাতা বন্ধ করে দেন। আমি একটি কবিতা লিখে এক লোকের হাতে মামুনের কাছে পাঠালাম। এতে তার প্রশংসা আর আমার অর্থ সংকটের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। তিনি তা পাঠা শেষে বললেন, "কবিতাটি সুন্দর হয়েছে। তবে আমার কাছে সে কিছু পাবে না। কারণ সে আমীনের প্রশংসাগাথায় আমার দুর্নাম করেছে।" এটা শুনে জনৈক প্রহরী বললো, "আমিরুল মুমিনীন, আজ আপনার ক্ষমার প্রবণতা কোথায় ?" এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার ভাতা চালু করে দিলেন।

হাম্মাদ বিন ইসহাক বলেছেন, "মামুন বাগদাদে এলে যুহর পর্যন্ত আদালতে বসে লোকদের প্রতি ইনসাফ করতেন আর মজলুমদের ন্যায়বিচার করে দিতেন।"

মুহাম্মাদ বিন আব্বাস বলেছেনঃ মামুন রশীদের দাবা খেলার প্রতি প্রবল ঝোক ছিল। তিনি বলতেন, এ খেলা মেধাকে সতেজ রাখে। তিনি এ খেলার নতুন নতুন দিক উদ্ভাবন করেন। তিনি বলেন, আমি কাউকে নিয়ে খেলতে চাইলে সকলে বাহানা দিত। আসলে তারা ভালো খেলতে জানোতো না।

হাখাত বলেছেনঃ মামুনের বন্ধু বলেন, তার অবয়ব আর শরীরের রং একই মতো। তবে হাঁটুর নীচের দিকের রং ছিল গাঢ় হলুদ বর্ণের।

ইসহাক মৌসূলী বলেছেনঃ মামুনের কথা হলো - সেই সঙ্গীত উত্তম, যে সঙ্গীতে মাধ্যমে মেহেরবানী আর শিষ্টতার বাণী প্রচারিত হয়।

ইবনে আবু দাউদ বলেছেনঃ একবার রোম সম্রাট মামুনের কাছে ১০০ কেজি মেশক আম্বর উপঢৌকন হিসেবে পাঠালে তিনি দ্বিগুণ উপঢৌকন পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে বললেন, যাতে তারা ইসলামের শানশওকত বুঝতে পারেন।

আবু উবাদা বলেছেন, আমার জানা নেই, আল্লাহ তাআলা মামুনের চেয়ে বেশী দানশীলতা ও দয়ার্দ্রতার গুণ দিয়ে আর কাউকে সৃষ্টি করেছেন কিনা।

সুমামা বিন আশরাস বলেছেনঃ বাগ্মীতার দিক থেকে আমি জাফর বিন ইয়াহইয়া এবং মামুনের চেয়ে বড় আর কাউকে দেখিনি।

সালাফী তওরিয়াত গ্রন্থে হাফয মাদায়েনী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ এক হাবশী লোক মামুনের কাছে এসে নবুওয়তের দাবী করে বললো, "আমি মূসা বিন ইমরান।" মামুন বললেন, "মূসা (আঃ) হাত দিয়ে ডিম

তৈরির মুজিযা দেখিয়েছেন। তুমিও যদি সেই মুজিযা দেখাতে পারো, তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো।" লোকটি বললো, মূসা বিন ইমরানের সামনে ফিরাউন বলেছিলো -

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

"আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব" (সূরাহ আন- নাযিয়াত, ৭৯ : ২৪)

এরপর তিনি মুজিযা দেখিয়েছেন। আপনি সেই দাবী করলে আমি মুজিযা দেখাবো, নাহলে প্রয়োজন নেই।

মামুন বলতেন, "প্রশাসকদের হটকারিতার কারণে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।"

ইবনে আসাকির ইয়াহইয়া বিন আকতাম থেকে বর্ণনা করেছেনঃ মামুন প্রতি মঙ্গলবারে ফিকাহ শাস্ত্র নিয়ে মতবিনিময়ের জন্য আলেমদের নিয়ে মজলিস করতেন। একদিন এক ব্যক্তি একটি কাপড় পড়ে জুতা হাতে নিয়ে মজলিসের এক কোণে এসে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এ মজলিস কি উম্মতের ইজতেমার জন্য, না বিজয় গাথা ও প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় বের করার মজলিস ?" মামুন সালামের জবাব দিয়ে বললেন, "প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টার জন্য নয়; বরং এ মজলিস এ জন্য যে, প্রথমে মুসলিম উম্মাহর কাজের দায়িত্ব আমার ভাইয়ের উপর ছিল। এরপর আমার আর আমার ভাইয়ের মাঝে বিবাদ হওয়ায় এ দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। ইজতেমায় আমি মুসলমানদের মতামতের মোহতাজ। যাতে তারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। তাদের ধারণা খিলাফত আমার হাত থেকে চলে গেলে ইসলামের ভিত্তি ধ্বসে যাবে, মুসলমানদের কাজ গড়বড় হয়ে পড়বে, এতে বিভাদের সৃষ্টি হবে, জিহাদ ভ্রান্ত হয়ে যাবে, হজ্বের কাজ হবে না, সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এ লক্ষ্যে সাবধানতার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি, যাতে মুসলমানদের মধ্যে খিলাফতের বিষয়ে একজনকে রাজি করে তার উপর খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে আমি পৃথক হয়ে যাবো।" এরপর সে লোকটি সালাম দিয়ে চলে গেলো।

মুহাম্মাদ বিন মুনাযির আল- কিন্দী বলেছেনঃ একদা হারুন রশীদ হাজ্জ করার পর কুফায় এসে সকল মুহাদ্দিসকে আহবান করেন। আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস আর ঈসা বিন ইউনুস ছাড়া সকলেই এসে উপস্থিত হোন। হারুন তাদের ডেকে আনার জন্য আমীন আর মামুনকে পাঠালেন। ইবনে ইদরীস তাদের দুইজনের সামনে একশো হাদীস পাঠ করেন। হাদীস পড়া হলে মামুন বললেন, "অনুমতি পেলে সবেমাত্র পাঠকৃত আপনার সকল হাদীস আমি মুখস্থ শুনিয়ে দিবো।" তিনি বললেন, "শোনাও তো দেখি।" তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হুবহু হাদীসগুলো শুনিয়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস মামুনের প্রখর মুখস্থ শক্তি দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন।

কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে, গ্রীক দর্শনের অনেক প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থাদি মামুনের হস্তগত ছিল। যাহাবী সংক্ষিপ্তভাবে এর বিবরণ দিয়েছেন।

ফাকেহী বলেছেনঃ মামুন সর্বপ্রথম কাবা শরীফকে সাদা রেশমের চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করেন। খলীফা নাসেরের যুগ পর্যন্ত সাদা রেশম গিলাফের প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে সুলতান মাহমুদ সবক্তগীন তার শাসনামলে হলুদ রেশমের গিলাফে কাবা শরীফ আচ্ছাদিত করেন।

মামুনের বাণীগুলো হচ্ছে -

লোকদের জ্ঞান-গরিমা নিয়ে গবেষণা করার মধ্যে যতটুকু লাভ রয়েছে, জীবনী আলোচনায় ততটুকু নেই।

দ্বিতীয় বাণী - যখন কোন বিপদ এসে যায়, তখন এ বিপদ থেকে কেটে উঠা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয় বাণী - সবচেয়ে ভালো মজলিস হচ্ছে যেখানে লোকেরা মানুষদের অবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। মানুষ তিন ধরনের - এক, পেটুক - যে সবসময় খায়; দুই, অসুস্থ - যাকে সবসময় ঔষধ খেতে হয়; তিন, সেই অসুস্থ লোক - যার অবস্থা সবসময় অপ্রীতিকর।

মামুন বর্ণনা করেছেনঃ আমি এক ব্যক্তি ছাড়া কারো কাছে নিরুত্তর হইনি। একদিন সে কুফাবাসীকে নিয়ে এসে কুফার প্রশাসকের ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করলো। আমি বললাম, "তুমি মিথ্যা বলছো। তিনি তো বড় ইনসাফগার লোক।" সে বলল, "আমিরুল মুমিনীন সত্য বলেছেন আর আমি মিথ্যা বলেছি। তবে এ শাসককে কেন আমাদের জন্যই শুধু নির্দিষ্ট করেছেন ? কেন তাকে অন্য শহরে স্থানান্তর করছেন না, যাতে সে শহরটিকে তিনি ইনসাফে ভরে দিতে পারেন, যেমন আমাদেরকে ন্যায়বিচারেও সৎ শাসনে ভরে দিয়েছেন ?" আমি অবশেষে অপারগ হয়ে বললাম, "তোমরা যাও। আমি তাকে পৃথক করে দিবো।"

মামুনের অনেক কবিতা রয়েছে। তিনি দাবা খেলার প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেন।

মামুন কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ

বায়হাকী বলেনঃ আমি আবু আব্দুল্লাহ হাকিম থেকে শুনেছি যে, তিনি আবু আহমাদ সায়রাফী আর তিনি জাফর বিন আবু উসমান তায়ালাসী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আমি (জাফর বিন আবু উসমান) আরাফার দিন মামুনের পিছনে মেহরাবে দাড়িয়ে নামায পড়লাম। সালাম ফিরিয়ে লোকেরা তাকবীর পাঠ করতে লাগলো। আমি মামুনকে দেখলাম। তিনি বললেন, "চুপ করো। আবুল কাসেম (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি কুনিয়াত) এর সুন্নত হল আগামীকাল তাকবীর বলা। (রাবী বলেন), ঈদুল আযহার দিন আমি নামায পড়তে গেলাম। মামুন মিম্বরে আরোহণ করে খুৎবা দিলেন। হামদ ও ছানার পর তিনি বললেন,

اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

আমি হাশিম বিন বাশীর থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি ইবনে শবরমা থেকে, তিনি শাবী থেকে, তিনি বারা বিন আযেব থেকে, তিনি আবু বুরদা বিন দিনার থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ঈদুল আযহার নামাযের আগে কুরবানী করবে, সে যাবোহকৃত পশুর গোশত খেতে পারবে। আর যে ঈদুল আযহার নামায্যের পর কুরবানী করবে, সে সুন্নতের পথ ধরে পৌঁছে যাবে।

اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

হে পৃথিবীর প্রতিপালক, আমাকে যোগ্যতা দিন।

হাকিম বলেছেনঃ আমি এ হাদীসটি আবু আহমাদ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে লিপিবদ্ধ করিনি। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি নির্ভরযোগ্য। আমার মনে তার প্রতি কিছুটা সংশয় ছিল। কিন্তু আমি আবুল হাসান আর দারা কুতনীকে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললেন, "আমাদের দৃষ্টিতে জাফরও বিশুদ্ধ।" আমি বললাম, শায়খ আবু আহমাদ ? বললেন, আমি উযীর আবুল ফজল জাফর বিন ফরাত থেকে, তিনি আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রুদবারী থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক তারিখী থেকে বর্ণনা করেন। তারা সকলেই নির্ভরযোগ্য। এরপর বললেন, আমার থেকে তায়ালাসী হাদীস বয়ান করেছেন আর তার থেকে ইয়াহইয়া বিন মুঈন। তিনি বলেন, মামুন খুতবায় এ হাদীসটি পড়েন।

সূলী বলেছেনঃ আমার কাছে তায়ালাসী ইয়াহইয়া বিন মুঈনের বরাত দিয়ে বয়ান করেন, "বাগদাদে আরাফার দিন, সেদিন শুক্রবার ছিল মামুন খুতবা দেন। সালাম ফেরানোর পর লোকেরা তাকবীর দেয়। মামুন তা প্রত্যাখ্যান করেন আর লাফ দিয়ে মেহরাবের লাঠি হাতে নিয়ে বললেন, এটা কিসের আওয়াজ ? অসময়ে কেন তাকবীর দিচ্ছো ? আমাকে হাশিম বিন বশীর, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমরাতুল উকবা পর্যন্ত তালবীয়া পাঠ করতেন, আর দ্বিতীয় দিন যুহর পর্যন্ত তালবীয়া ও তাকবীর বলতেন।

সূলী বলেছেনঃ আহমাদ বিন ইবরাহীম মৌসূলীর বরাত দিয়ে আবুল কাসেম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন এক ব্যক্তি মামুনের কাছে এসে বললো, "হে আমিরুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন - আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি বালবাচ্চা। আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয়, যে তার সৃষ্ট বালবাচ্চাদের উপকার করবে।" মামুন চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, "চুপ করো, আমি হাদীসের দিক থেকে তোমার চেয়ে বড় আলেম। আমার নিকট ইউসুফ বিন আতীয়া সাফায়ী বর্ণনা করেন, তিনি সাবিত থেকে, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন - আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি বালবাচ্চা, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে তার বালবাচ্চাদের উপকার করে।"

ইবনে আসাকিরও এ হাদীসটি অভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যা আবু ইয়ালা মৌসূলী স্বরচিত মসনদ গ্রন্থে ইউসুফ বিন আতীয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সূলী বলেছেনঃ মাসীহ বিন হাতিম আল আকলী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল জব্বার বিন আব্দুল্লাহ বলেছেনঃ আমি মামুনের খুতবা শুনেছি। তিনি লজ্জার উপর বয়ান রাখছিলেন। তিনি এর অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বললেন, "হাশিম আমার কাছে বয়ান করেন, তিনি মানসুর থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি আবু বকরাহ থেকে, তিনি ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন - লজ্জা হলো ঈমান, আর ঈমান হল জান্নাত; বেলজ্জা হলো বাড়াবাড়ি, আর বাড়াবাড়ি হলো জাহান্নাম। ইবনে আসাকির এটি ইয়াহইয়া বিন আকতাম আল মামুন থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেছেনঃ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন তামীম ইয়াহইয়া বিন আকতামের বরাত দিয়ে বলেছেনঃ একদিন মামুন আমাকে বললেন, "ইয়াহইয়া, আমার মন চাইছে যে, আমি হাদীস বর্ণনা করবো।" আমি বললাম, "আমিরুল মুমিনীনের চেয়ে এ কাজ করার বেশী হকদার আর কে আছে ?" তিনি মিম্বর আনতে বললেন, মিম্বর আনা হলো। তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন। সর্বপ্রথম এ হাদীসটি তিনি বয়ান করেন, তিনি বলেন, "হাশিম আমাকে, তিনি আবুল জাহাম থেকে, তিনি যহরী থেকে, তিনি আবু সালামা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন - জাহান্নামে ইমরাউল কায়েস কবিদের পতাকাবাহী হবে।" এরপর তিনি আরো তিনটি হাদীস বর্ণনা করার পর মিম্বর থেকে নেমে এসে আমাকে বললেন, "ইয়াহইয়া, আমার এ মজলিসটি কেমন লাগলো ?" আমি বললাম, "আমিরুল মুমিনীন, আপনার মজলিসটি খুবই চমৎকার হয়েছে।" এরপর তিনি বলতে লাগলেন, "তোমার কসম, এ মজলিসে লোকদের মাঝে কোন মিষ্টতা ছিল না। এ মজলিস তালিযুক্ত কাপড় পরিহিতদের মজলিস ছিল। যারা কলম কালি নিয়ে এসেছিলো।"

খতীব বলেছেনঃ আবুল হাসান আলী বিন কাসেম আমার কাছে ইবরাহীম বিন সাঈদ আল জাওহারী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ মামুন মিসর জয় করলে এক ব্যক্তি তাকে বললো, "সেই প্রতিপালকের শোকর, হে আমিরুল মুমিনীন, যিনি আপনার দুশমনদের পরাজিত করেছেন এবং ইরাক, সিরিয়া ও মিসরবাসীকে আপনার অনুগত করে দিয়েছেন। সাবাশ, আপনি রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাচার সন্তান।" মামুন বললেন, "এখনো আমার একটি অভিপ্রায় বাকী থেকে গেছে, আর তা হলো - আমি একই সভায় বসে ইয়াহইয়ার মত বরেণ্য মুহাদ্দিসদের সাথে মতবিনিময় করবো, তারা বলবেন, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট - এ বিষয়ে আপনি কি বর্ণনা করতে পারেন ? আমি বলবো, "আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামা আর হাম্মদ বিন যায়েদ। তারা সাবিত বানানী থেকে, তিনি আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন - যে দুই সন্তান অথবা এর চেয়ে বেশী সন্তান লালনপালন করবে, তারা তার সামনে লালিতপালিত হবে আর তার সামনে মারা যাবে, তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথে এভাবে থাকবে - এ কথা বলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটি আঙুল ফাঁক করে দেখালেন।

খতীব বলেছেনঃ এ বর্ণনাটি ভুল। আর ভুলটি হলো, মামুন হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, অথচ মামুন ১৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, আর হাম্মাদ বিন সালামা ১৬৭ হিজরীতে ও হাম্মাদ বিন যায়েদ ১৭৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হাকিম বলেছেনঃ মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব বিন ইসমাঈল আমার কাছে মুহাম্মদ বিন সহল বিন আসকার থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন মামুন আযান দেওয়ার জন্য দাড়ালেন। আমরাও তার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় এক মুসাফির, যার হাতে কালির দাওয়াত ছিল, সে এসে বললো, "আমিরুল মুমিনীন, আমি মুহাদ্দিস।" মামুন বললেন, "তুমি এ কি বলছো ? তোমার অমুক অধ্যায়টি মনে আছে ?" এরপর মামুন হাদীস বয়ান করতে শুরু করলেন। পরিশেষে মামুন লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমরা তিনদিন হাদীস পড়ে মুহাদ্দিস বলতে লেগেছো!"

ইবনে আসাকির বলেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইয়াহইয়া বিন আকতাম থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আমি একদিন রাতে মামুনের পাশে শুয়েছিলাম। গভীর রাতে পিপাসার কারণে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমি পাশ পরিবর্তন করলাম। মামুন বললেন, "ইয়াহইয়া, কি হয়েছে ?" আমি বললাম, "পিপাসা লেগেছে।" এ কথা শুনে তিনি এক গ্লাস পানি এনে আমাকে পান করালেন। আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি খাদেমকেও ডাকলেন না, কোন গোলামকেও জাগালেন না।" তিনি বললেন, "আমাকে আমার বাবা, তিনি আমার দাদা থেকে, তিনি উকবা বিন আমের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন - কাওমের সর্দার হবেন তার খাদেম।

খতীব এ বর্ণনাটি মামুনের সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ আমার কাছে হারুন রশীদ, তিনি মাহদী থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি জারীর বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন - কাওমের সর্দার হবেন তার খাদেম।

ইবনে আসাকির আবু হুযায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আমি মামুনের থেকে শুনেছি, তিনি আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমার বাবা আমাকে, তিনি আমার দাদা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন - কাওমের গোলাম এ কাওমের মধ্য থেকেই হবে।

মুহাম্মাদ বিন কাদামা বলেছেনঃ যখন মামুন এ সংবাদ পেলেন যে, আমার থেকে আবু হুযায়ফা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি আবু হুযায়ফাকে ১০ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিলেন।

মামুনের যুগে ২০০ হিজরীতে আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী বনু আব্বাসের জনসংখ্যা ছিল ৩৩ হাজার।

মামুনের যুগে যে সকল ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - সুফিয়ান বিন আয়নাহ, ইমাম শাফী (রহঃ), আব্দুর রহমান বিন মাহদী, ইয়াহইয়া বিন সাইদ আল কাতান, ইউনুস বাকের (মাগাযীর

বর্ণনাকারী), ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র আবু মতীহ বলখী, দানশীল মারুফ কারখী, আল মুবতাদা গ্রন্থের লেখক ইসহাক বিন বশীর, ইমাম মালিক (রহঃ) এর গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র এবং মিশরের কাযী ইসহাক বিন ফরাত, আবু উমর শিবানী, ইমাম মালিক (রহঃ) এর ছাত্র আললাগবী আশহাব, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র হাসান বিন মীয়াদ লুলুয়ী, হাম্মাদ বিন উসামা, হাফেয রুহ বিন উবাদা, যায়েদ বিন হিব্বান, আবু দাঊদ তায়ালাসী, ইমাম মালিক (রহঃ) এর ছাত্র গাযী বিন কায়েস, প্রসিদ্ধ দানশীল আবু সুলায়মান দারানী, আলী রেযা বিন মূসা কাযেম, আরবের ইমাম ফারা, কায়তাবা বিনা মিহরান, নাহুবিদ কতরব, ওয়াকেদী, আবু উবায়দা, মুয়াম্মার বিন মুসনা, নযর বিন শামীল, সাইয়্যেদা নফীসা, কুফী নাহুবিদ হিশাম, ইয়াযিদী, ইয়াযিদ বিন হারুন, বসরার কাযী ইয়াকুব বিন ইসহাক হাযরামী, আব্দুর রাজ্জাক, আবুল আতাহীয়া, আবু আসেম, আবদুল মালিক বিন মাজশুন, আব্দুল্লাহ বিন হাকাম, আবু যায়েদ আনসারী, আসমায়ী প্রমুখ।

আল মুতাসিম বিল্লাহ

আল মুতাসিম আবু ইসহাক মুহাম্মদ বিন হারুন রশীদ ১৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। যাহাবীর মতে ১৭৮ হিজরীর শাবান মাসে ভূমিষ্ঠ হোন।

সূলী বলেছেন, “মারদাহ নামক জননীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, যিনি কুফায় জন্ম নেন। তিনি ছিলেন বাঁদি। হারুনের কাছে মারদাহ ছিলেন অধিক প্রিয়।”

মুতাসিম নিজ পিতা আর মামুনের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তার থেকে ইসহাক মৌসূলী, হামদুন বিন ইসমাঈল প্রমুখ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বড় বীর বাহাদুর, শক্তিধর ও সাহসী ছিলেন। তবে লেখাপড়া জানোতেন না।”

সুলী বলেছেনঃ লেখাপড়া বিষয়ে সাহায্য করার জন্য সর্বদা মুতাসিমের সাথে একজন লোক থাকতো। লোকটির মৃত্যুর পর হারুন মুতাসিমকে বললেন, “এখন তো তোমার গোলাম মারা গেছে।” তিনি বললেন, “জ্বি হযরত। মৃত্যু তাকে লেখাপড়া থেকে অবকাশ দিয়েছে।” হারুন বললেন, “পড়ালেখা তোমার খুব তেঁতে লাগে, তাই তুমি তা ছেড়ে দাও এবং পড়ো না।”

কথিত আছেঃ এরপর থেকে তিনি অল্প অল্প করে লেখাপড়া করতে থাকেন।

যাহাবী বলেছেন, “মুতাসিম যদি খলকে কুরআন সংক্রান্ত বিষয়ে ওলামাদের বেতন ভাতা সংকুচিত না করতেন, তাহলে তিনি হতেন সবচেয়ে বড় প্রতাপান্বিত খলীফা।”

সূলী বলেছেনঃ মুতাসিমের অনেক গুণাবলী রয়েছে। তার জীবনের সাথে গাণিতিক আট শব্দটি সংযুক্ত থাকায় তাকে ‘মুসাম্মিন’ও বলা হতো।

তিনি আব্বাসের অষ্টম খলীফা। আব্বাসের অষ্টম ঔরসজাত তিনি, হারুন রশীদের অষ্টম সন্তান।

আট বছর, আট মাস, আট দিন রাজত্ব করেন। ১৭৮ হিজরীতে জন্ম আর ২১৮ হিজরীতে মৃত্যু হয়। ৪১ বছর জীবিত ছিলেন। আটটি যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেন। আটজন শত্রুকে নিধন করেন। আটজন পুত্র সন্তান আর আটজন কন্যা সন্তান রেখে যান। তার আটটি চূড়া ছিল। রবিউল আউয়াল মাসের আট দিন বাকী থাকতেই মুতাসিম মৃত্যুর মুখে পতিত হোন।

তার অনেক সুন্দর সুন্দর বাণী আর কবিতা রয়েছে।

তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে পড়লে আর কাউকে হত্যা করতেন না। ইবনে আবু দাউদ বলেছেন, মুতাসিম হাতের কবজি আমার পানে প্রসারিত করে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, আমার কবজি কাটো, আর তিনি

বলছিলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। জোরে কাটো। আমি দেখলাম তার কবজিতে বর্শার আঘাতও বসলো না। শুধু দাগ পড়েছে।

নাকাতুয়া বলেছেনঃ মুতাসিম অনেক শক্তিশালী ছিলেন। তিনি মানুষের হাতের হাড় দু' আঙ্গলের চাপে ভেঙে ফেলতে পারতেন। বর্ণিত আছে, খলীফাদের মধ্যে মুতাসিম সর্বপ্রথম তুর্কীদের দাপ্তরিক কাজে নিয়োগ করেন এবং তিনি অনারব বাদশাহদের পদাঙ্ক অনুসরণে চলতেন। তার পরিত্যক্ত গোলামের সংখ্যা দশ হাজারেও বেশী।

ইবনে ইউনুস বলেছেনঃ কবি দাবল মুতাসিমের কুৎসা ও অপবাদসূচক কবিতা রচনার প্রেক্ষিতে তার ভয়ে মিসর পালিয়ে যায়। এরপর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরে পালায়।

মামুনের পর ২১৮ হিজরীতে তিনি বাইআত নেন। তিনি মামুনের পদাঙ্ক অনুসরণে চলতেন। তিনি নিজ জীবনে খলকে কুরআন সংক্রান্ত মাসয়ালাটির পরীক্ষা নেন। তিনি সকল উল্লেখযোগ্য শহরের প্রত্যেক শিক্ষককে ছাত্রদের এ মাসয়ালা শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দান করেন। তিনি এ মাসয়ালার কারণে লোকদের অনেক কষ্ট দেন আর অধিকাংশ ওলামাকে হত্যা করেন। ২২০ হিজরীতে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) কে প্রহার করা হয়।

২২০ হিজরীতে মুতাসিম খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ থেকে সুরমন রায়- এ স্থানান্তর করেন। এ স্থানান্তরের কারণ হলো, তিনি সমরকন্দ, ফারগানাহ প্রভৃতি থেকে তুর্কীদের সংগ্রহ করে তাদের পেছনে অনেক খরচ করেন। স্বর্ণের মালা তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, রেশমের কাপড় পড়ানো হয়। তারা ঘোড়ায় চড়ে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে ঘুরে জনগণের অসুবিধার সৃষ্টি করতো। ফলে বাগদাদবাসী এসে মুতাসিমকে বললো, “আপনি তাদের নিষেধ না করলে আমরা তাদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত।” মুতাসিম বললেন, “কিভাবে আর কোন হাতিয়ার দিয়ে লড়বে ?” তারা বললো, “তীর দিয়ে।” তিনি বললেন, “তীরের মোকাবিলা করার আমার শক্তি নেই।” অতঃপর তিনি রাজধানী স্থানান্তর করেন।

২২৩ হিজরীতে মুতাসিম রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এ আক্রমণের তীব্রতা সকল বাদশাহর আক্রমণ অপেক্ষা অধিক তীব্রতর। এ আক্রমণে রোমানরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রোমানরা এবং তাদের সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। উমরিয়া তরবারীর জোরে বিজিত হয়। এ যুদ্ধে ত্রিশ হাজার রোমান সমাধিস্থ হয় এবং সমসংখ্যক বন্দী হয়। কথিত আছে, যে সময় মুতাসিম এ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন সে সময় জ্যোতিষীরা মুতাসিমকে বলেছিলো, এ যুদ্ধে আপনি পরাজিত হবেন। কিন্তু তিনি বিজিত হোন। এ জন্য কবি আবু তামাম জ্যোতিষিদের বাণীকে ব্যঙ্গ করে তার এ কাব্যটি রচনা করেন - “সে বাণী আজ কোথায় ? কোথায় জ্যোতিষির দল ? যা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।”

২২৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের বৃহস্পতিবারে তিনি পরলোক গমন করেন, যখন তার শক্রিরা লুণ্ঠিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায়।

কথিত আছে, তিনি মৃত্যুর সময় এ আয়াত তিলাওয়াত করেন -

حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً

"..... যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়লো, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম ....." (সূরাহ আল- আনআম, ৬ : ৪৪)

তিনি অন্তিম মুহূর্তে বলেছেন, "সকল আক্রমণের পরিসমাপ্তি হবে, কোন আক্রমণই অনন্তকাল চলবে না।"

কেউ কেউ বলেন যে, তিনি শেষ সময় এ কথা বলেছিলেন - "আমাকে এ সৃষ্টি জগত থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

কারো মতে তিনি বলেন, "হে আল্লাহ, আপনি জানেন আমি আপনাকে নয়, বরং নিজেই নিজেকে ভয় পাচ্ছি আর আপনার কাছে রহমতের আশা করছি, নিজের কাছে নয়।"

মুতাসিম ক্রমাগত পশ্চিম দিকে এতটুকু অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন যে, যে রাজ্য-গুলো বনু উমাইয়্যা বিজয়ের মাধ্যমে হস্তগত করেছিলো, অথচ সেগুলো বনু আব্বাসের অধীনে ছিল না, সেগুলো জয় করার।

আহমাদ বিন খাসীব থেকে সূলী বর্ণনা করেছেনঃ একদিন মুতাসিম আমাকে বললেন, "বনু উমাইয়্যার শাসনকালে আমরা কেউ বাদশাহ ছিলাম না, অথচ আমাদের শাসনকালে স্পেন তাদের শাসনাধীন। তাদের সাথে যুদ্ধ করতে কি পরিমাণ অস্ত্র লাগতে পারে ?" এরপর তিনি স্পেন আক্রমণের জন্য সমরাস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগেন। ইতিমধ্যেই মৃত্যুর ফেরেশতা নাযিল হয় আর তার অসুস্থতা বেড়ে যায়।

সূলী বলেছেনঃ আমি মুগীরা বিন মুহাম্মদ থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন, মুতাসিমের দরজায় যত শাহেনশাহ (টীকাঃ শাহেনশাহ নাম বা উপাধি রাখা হারাম) উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনি যতগুলো বিজয় অর্জন করেছেন, কোন বাদশাহ'র যুগে তা হয়নি।

আযারবাইজানো, তাবরিস্তান, সীসতান, আশয়াসা, ফারগানা, তখারিস্তান, সিফাহ আর কাবেলের রাজাদের বন্দী করে তার কাছে হাযির করা হয়।

সূলী বলেছেনঃ তার আংটিতে এ লিখাটি অঙ্কিত ছিল - الحمد لله الذي ليس كمسله شنى

ইবরাহীম বিন আব্বাস বলেছেনঃ মুতাসিম সাহিত্যপূর্ণভাবে কথাবার্তা বলতেন। তিনিই প্রথম বাদশাহ, যার রান্নাঘরে সর্বদা পাকশাক হতো এবং দৈনন্দিন এ বাবদ এক হাজার দিনার খরচ হতো।

আবুল আলীয়া বলেছেনঃ মুতাসিম বলতেন, খায়েশ ও লোভকে জয় করতে পারলে আবেগ পরাজিত হবে।

ইসহাক বলেচেহন যে, তিনি বলতেন, "যে নিজের সম্পদ আর জ্ঞান দিয়ে সত্যকে তালাশ করবে, সে অবশ্যই সত্যের সন্ধান পাবে।"

মুহাম্মাদ বিন আমার রুমী বলেছেনঃ মুতাসিমের "আজিব" নামক এক গোলাম ছিল। সে দেখতে খুবই সুন্দর, তিনি তাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তার প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, "তুমি জানো যে, আমি আমার ভাইদের চেয়ে অনেক কম লেখাপড়া জানি। কারণ আমিরুল মুমিনীন হারুন রশীদ আমাকে খুবই আদর করতেন। ফলে খেলাধুলাপ্রিয় ছিলাম। কেউ পড়ালেখার কথা বললে আমি তা শুনতাম না। এরপরও আমি আজিব গোলামকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছি, যা আমি আবৃত্তি করবো আর তুমি শুনে তোমার মতামত জানাবে। যদি ভালো হয়, তবে তা প্রচার করবো। আর খারাপ হলে তা ছুড়ে ফেলবো।" এরপর তিনি একটি চমৎকার কবিতা পাঠ করলেন। আমি তার খিলাফতের কসম করে বললাম, "অ- কবি খলীফাদের মধ্যে এ কবিতা অনন্য।" তিনি আমাকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম দিলেন।

সূলী বলেছেন যে, আব্দুল ওহ্হেদ বিন আল আব্বাসী আল রিয়াশী বলেছেনঃ একদিন রোম সম্রাট হুমকি দিয়ে একটি পত্র পাঠালেন। মুতাসিম পত্র পাঠ শেষে ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, "লিখো - বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমি তোমার পত্র পড়েছি। এর জবাব নিজ চোখেই দেখতে পাবে, শোনার প্রয়োজন নেই। কাফেরের দল অচিরেই জানোতে পারবে তোমাদের ঠিকানা কোথায়।"

মুতাসিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ

সূলী বলেছেনঃ আমি আলায়ী থেকে, তিনি আব্দুল মালিক বিন যহাক থেকে, তিনি হিশাম বিন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি মুতাসিম থেকে বর্ণনা করেন, আমি আমার হারুনুর রশীদ থেকে, তিনি মাহ্দী থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি মানসুরের দাদা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ননা করেছেন - রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমুকের সন্তানকে যেতে দেখে রাগত চেহারা নিয়ে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন -

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ

"...কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যে ..." (সূরাহ আল- ইসরা, ১৭ : ৬০)

লোকেরা আরয করলো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সেটা কোন বৃক্ষ ? আমাদের বলুন। আমরা তা থেকে নিজেকে দূরে রাখবো।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সেই বৃক্ষ থেকে বনু উমাইয়্যা উদ্দেশ্য। যখন তারা বাদশাহ হবে অত্যাচার করবে। আমানতের খিয়ানত করবে।" এরপর নিজ চাচা আব্বাস (রাঃ) এর পেটে হাত রেখে বললেন, "চাচা, আল্লাহ তাআলা আপনার ঔরসে এমন এক সন্তানের জন্ম দিবেন, যার হাতে বনু উমাইয়্যা ধ্বংস হবে।" গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীসটি মাওজু। কারণ রাবীদের মধ্যে আলায়ী কলঙ্কিত।

ইবনে আসাকির বলেছেন যে, কাসিমের বাবা আলী বিন ইবরাহীম বর্ণনা করেছেনঃ একদিন ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন মাআয মুতাসিমকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যান। গিয়ে তিনি তাকে বললেন, “ইন শা আল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করবেন।” মুতাসিম বললেন, “এটা কি করে হবে - আমি আমার পিতা হারুন রশীদ থেকে শুনেছি, তিনি তার পিতা মাহদী থেকে, তিনি মানসূর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, যে বৃহস্পতিবারে টিকা দিবে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে আর সেদিনই সে মারা যাবে।

তার শাসনামলে যে সকল ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - ইমাম বুখারীর শিক্ষক হুমায়াদী আবু নাঈম, আল ফজল বিন ওকীল, আবু আসান আল হিন্দী, কালুন আল মাকরী, খুলাদ মাকরী, আদম বিন আবু আয়াস, আফফান, কাবানী, আব্দান আল মুরুযী, আব্দুল্লাহ বিন সালিহ, ইবরাহীম বিন মাহদী, সুলায়মান বিন হরব, আলী বিন মুহাম্মাদ মাদায়েনী, আবু উবায়েদ, কাসেম বিন সালাম, কুররাহ বিন হাবীব, মুহাম্মাদ বিন ঈসা, আসবাগ বিন ফারাজ, আবু উমর মুহাম্মাদ বিন সালাম, সানীদ, সাঈদ বিন কাসীর বিন আফীর, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী প্রমুখ।

আল ওয়াসেক বিল্লাহ

আল ওয়াসেক বিল্লাহ হারুন আবু জাফর; ভিন্ন মতে, আবুল কাসিম বিন মুতাসিম বিন রশীদ ১৯৬ হিজরীর শাবান মাসের ২০ তারিখে কারাতীস নামক রোমান জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তার জননী ছিলেন বাঁদি।

পিতার খিলাফতকালে তিনি উত্তরাধিকার মনোনীত হোন। ২২৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখে তখতে আরোহণ করেন।

২২৮ হিজরীতে তিনি আশনাস নামক তুর্কী এক লোককে সাম্রাজ্যের নায়েব মনোনীত করেন। নায়েব জওহর খচিত মুকুট পড়তেন। আমার (গ্রন্থকারের) মতে, তিনি প্রথম বাদশাহ যিনি সর্বপ্রথম নায়েব মনোনীত করেন। তাছাড়া তার পিতার শাসনামল থেকেই প্রশাসনিক কাজে তুর্কীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

২৩১ হিজরীতে বসরার গভর্নরের কাছে একটি পত্র পাঠিয়ে মামুন এবং মুয়াজ্জিনদের খলকে কুরআনের বিষয়ে পরীক্ষা নেন। তিনি তার পিতার অনুসরণ করতেন। অবশেষে এ বিতর্কিত মাসিয়ালা থেকে তাওবা করে সরে আসেন। ২৩১ হিজরীতে তিনি আহমাদ বিন আল মুনযার খাজায়ীকে, যিনি আহলে হাদিস এবং সৎ কাজের আদেশ প্রদানকারী ও অসৎ কাজে বাধা দানকারী - তাকে হত্য করেন। ঘটনাটি এরূপ- বাগদাদ থেকে সমরাহ পর্যন্ত আহমাদকে বন্দী করে এনে খলকে কুরআন সম্পর্কে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "কুরআন শরীফ মাখলুক নয়।" কিয়ামতের দিন আল্লাহর দিদার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "রেওয়ায়েত দ্বারা দিদারের কথা প্রমাণিত।" তিনি একটি হাদীসও শোনালেন। ওয়াছেক বললেন, "তুমি মিথ্যা বলছো।" আহমাদ বললেন, "আপনিই মিথ্যাবাদী।" তিনি বললেন, "আফসোস! তুমি আল্লাহ তাআলাকে সীমাবদ্ধ, শরীরবিশিষ্ট এক স্থানে বন্দী আর চর্ম চোখে তাকে দেখার কথা ভাবছো, অথচ তা স্পষ্ট কুফার।"

সে সময় ওয়াসেকের পাশে এক দল মুতাযিলা মুফতী বসেছিলেন। তারা আহমাদকে হত্যার ফতোয়া দেন। ওয়াসেক তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন। আহমদকে চামড়ার গালিচায় বসিয়ে দেয়া হলো। এরপর তিনি তাকে শহীদ করে দেন। এরপর তার কাটা মাথা বাগদাদের অলিতে-গলিতে ঘুরিয়ে এক স্থানে লটকিয়ে দেওয়ার এবং মৃত দেহটি সরমন রায় শহরে শূলেতে ঝুলে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাকে সেটাই করা হয়েছিল এবং তার শাসনামলে তাকে এভাবেই রাখা হয়। মুতাওয়াক্কিল বাদশাহ হওয়ার পর তার লাশ দাফন করেন। আহমদকে শূলে ঝুলিয়ে রাখা অবস্থায় লাশ পাহারার জন্য একজন পুলিশ নিয়োগ করা হয়। নির্দেশ মোতাবেক পুলিশ বর্শা দিয়ে তার মুখ কেবলা দিক থেকে ফিরিয়ে দিতো। এ পুলিশ বলেছেন, একদিন তিনি কেবালামুখি হয়ে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করেন। এ ঘটনাটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত রয়েছে।

২৩১ হিজরীতে রোম থেকে এক হাজার ছয়শো মুসলমান কয়েদী মুক্তি পায়। ইবনে দাউদ বলেছেন, এদের মধ্যে যারা খলকে কুরআনের পক্ষে, তাদেরকে দুই দিনার দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর যারা পক্ষে না, তাদের অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

খতীব বলেছেনঃ আহমাদ বিন দাউদ ওয়াসেককে খলকে কুরআনের মাসয়ালা বুঝাতেন এবং এর প্রতি লোকদের দাওয়াত দিতেন। মৃত্যুর আগে তিনিও এ আকীদা থেকে ফিরে আসেন।

কথিত আছে, একদা এক ব্যক্তিকে ওয়াসেকের কাছে ধরে নিয়ে আসা হয়। সে সময় ওয়াসেকের কাছে ইবনে দাউদও ছিল। লোকটি ইবনে দাউদকে বললেন, "তোমরা যে মাসয়ালার প্রতি লোকদের আহবান করছো, তা কি রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানা ছিল না ? যদি জানা থাকে, তবে কেন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এদিকে লোকদের আহবান করেননি ?" ইবনে দাউদ বললেন, "জানা ছিল।" বন্দী লোকটি বললেন, "জানা থাকার পরও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করেননি। অথচ তোমরা তা করছো!" এ কথা শুনে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। আর হাসতে হাসতে অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি বারবার বলতে থাকেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বিষয়টিকে অবৈধ বলেছেন, আমরা তাকে বৈধ বলে বসে আছি।" তিনি লোকটিকে তিনশো দিনার দিয়ে মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং ইবনে দাউদের প্রতি রুষ্ট হন। কথিত আছে, লোকটি আব্দুর রহমান, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আযদী, আবু দাউদ আর নাসায়ীর উস্তাদ।

ইবনে আবীদ দুনিয়া বলেছেনঃ ওয়াসেকের বর্ণ লালচে, দাড়ি সুন্দর আর চোখে একটি বিন্দু সদৃশ্য চিহ্ন ছিল।

ইয়াহইয়া বিন আকতাম বলেছেনঃ তিনি হযরত আলীর পরিবারের সাথে যতো সুন্দর আচরণ করেছেন, ততটুকু আর কেউ করেনি। কথিত আছে, ওয়াসেক উচু মাপের আরবী সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। উপহারস্বরূপ একজন গোলামকে মিসর থেকে তার কাছে পাঠানো হয়। তিনি তাকে খুব ভালোবাসতেন। একদিন তিনি তার প্রতি ভীষণ রাগ করেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন যে, সে আরেক গোলামকে বলছে, "আল্লাহর কসম, কালই ওয়াসেক আমার সাথে কথা বলতে চাইবেন, কিন্তু আমি বলবো না।" একথা শুনে তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন - "ওহে, আমার কষ্টকে নিয়ে তুমি গর্ব করছো ? তুমি এক জালেম গোলাম হয়ে এসেছো। যদি ভালোবাসা না থাকতো, আভিজাত্যপূর্ণভাবে কথাবার্তা বলতাম। যদি এ প্রেমের বাঁধন মুক্ত হও তবে দেখবে।" এ কবিতাটি সাহিত্যের রসে পূর্ণ।

সূলী বলেছেননঃ ইলমে আদব (সাহিত্য) এবং ফজিলতের দৃষ্টিকোণ থেকে মামুন তার চেয়েও ছোট। মামুন তাকে সম্মান করতেন এবং তার ছেলের উপর তাকে প্রাধান্য দিতেন। ওয়াসেক তৎকালীন যুগের বড় আলেম আর উচু মাপের কবি ছিলেন। তিনি খলীফাদের মধ্যে সুর সৃষ্টিতে দক্ষ ছিলেন।

ফজল ইয়াযোদী বলেছেনঃ বনু আব্বাসের মধ্যে তিনি মামুনের চেয়েও বড় মাপের কবি। আসল কথা হলো, মামুন ইলমে আদবের পাশাপাশি সূচনাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। আর ওয়াছেক শুধু সাহিত্যে পূর্ণ দক্ষ।

ইবনে ফাহাম বলেছেনঃ তার দস্তরখানটি ছিল স্বর্ণের। এর চারটি পাট ছিল। প্রতিটি পাট বহনের জন্য বিশজন লোকের প্রয়োজন হতো। এ দস্তরখানের পেয়ালা, গ্লাস, বাটি সবই ছিল স্বর্ণের। একদিন ইবনে দাউদ তাকে বললো, "স্বর্ণের জিনিস ব্যবহার করা নিষেধ।" এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলো ভেঙে বাইতুল মালে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

হুসাইন বিন ইয়াহইয়া বলেছেনঃ একদিন ওয়াসেক স্বপ্নে দেখেন, তিনি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছেন। সে সময় এক ব্যক্তি বলছে, "যার অন্তর মুররত নয়, আল্লাহ পাক তাকে ধ্বংস করবেন না।" সকালে তিনি সভাসদের কাছে মুররতের ব্যাখ্যা চাইলেন। কেউ তা পারলো না। আবু মুহলিমকে ডাকা হলো। তিনি বললেন, "মুররত চাটিয়াল ময়দান বা মরুভূমিকে বলা হয়, যেখানে ঘাস জন্মায় না। অর্থাৎ যার অন্তরে ঈমান রয়েছে, তিনি তাকে ধ্বংস করবেন না।" এরপর ওয়াসেক মুররত শব্দযুক্ত একটি কবিতা পড়লেন। আর আবু মুলহিম অভিন্ন অর্থবোধক মুররত শব্দযুক্ত একটি কবিতার উদ্ধৃতি পেশ করলেন। এ জন্য তিনি তাকে এক লাখ দিনার পুরস্কার দিলেন।

হামদুন বিন ইসমাঈল বলেছেনঃ খলীফাদের মধ্যে ওয়াসেক কষ্টের প্রতি আর বিরোধীদের ক্ষেত্রে বেশী ধৈর্যশীল।

আহমাদ বিন হামদুন বলেছেনঃ একদিন তার উস্তাদ হারুন বিন যিয়াদ তার কাছে এলে তিনি তাকে খুবই সম্মান করলেন। তা দেখে লোকেরা হারুনের পরিচয় জানোতে চাইলে তিনি বললেন, "ইনি সর্বপ্রথম আমার মুখে আল্লাহর যিকির তুলে দিয়েছেন আর আমাকে আল্লাহর রহমত- এ সমর্পণ করেছেন।"

তিনি ২৩২ হিজরীর যিলহজ মাসের ২৪ তারিখে সরমন রায়ে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন - "সকল সৃষ্টি মৃত্যুর আওতাধীন। মৃত্যু বাদশাহ- ফকীর কাউকে ছাড়বে না।"

তার মৃত্যুর পর মুতাওয়াক্কিলের বাইআত ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তার লাশ নির্জনে পড়ে থাকায় বাজপাখি এসে লাশের চোখ তুলে নিয়ে যায়।

তার শাসনামলে যে সকল ওলামাগণ ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - মাসহাদ, খলফ বিন হিশাম, বাযযার মাকরী, ইসমাঈল বিন সাঈদ, ওকেদীর লেখক মুহাম্মাদ বিন সাদ, ইমাম শাফীর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ বিন আরাবী, আলী বিন মুগীরা প্রমুখ।

মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ

আল মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ জাফর আবুল ফজল বিন মুতাসিম বিন রশীদ ২০৬ হিজরী অথবা ২০৭ হিজরীতে শুজা নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ওয়াসেকের পর ২৩২ হিজরীতে তিনি তখতে আরোহণ করেন। মসনদে বসেই তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নতের প্রতি ধাবিত হতে শুরু করেন আর মুহাদ্দিসদের সহযোগিতা করতে থাকেন।

২৩৪ হিজরীতে তিনি সাম্রাজ্যের সকল হাদীস বিশারদদের সামরাহ শহরে সমবেত করে তাদের পুরস্কার দেন আর দিদারে মাওলা সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করতে বলেন। এ কাজের জন্য তিনি আবু বকর বিন আবু শায়বাকে জামে বিসাফায় আর তার ভাই উসমানকে জামে মানসুরে নিয়োগ করেন, যাদের ক্লাসে প্রতিদিন আনুমানিক বিশ হাজার লোক বসতো। তার এ খিদমতে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা মুতাওয়াক্কিলের জন্য দুয়া করতে থাকে। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে অনেকেই এ মন্তব্য করে - খলীফা তিনজন - প্রথম, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), যিনি মুরতাদদের হত্যা করেন; দ্বিতীয়, উমর বিন আব্দুল আযীয, যিনি দুনিয়া থেকে অত্যাচার মুক্ত করেছেন; তৃতীয়, মুতাওয়াক্কিল, যিনি মৃত সুন্নাতকে জীবিত করেছেন।

আবু বকর বিন জিনাদা তার শানে লিখেছেনঃ আজ সুন্নত যে সম্মানের পর্যায়ে গেছে, তা আর কখনো অপমানিত হবে না। সুন্নতের মিনার আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, ফলে বিদাআতের সৌধ ধ্বসে পড়েছে। আল্লাহ তাআলা মুতাওয়াক্কিলকে ক্ষমা করুন। তিনি আমাদের প্রতিপালকের প্রতিনিধি এবং নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাচার বংশীয়। তিনি বনু আব্বাসের খলীফাদের মধ্যে অনন্য। তিনি দ্বীন চলে যাবার আগেই দ্বীনকে একত্রিত করেছেন, মুরতাদদের শিরচ্ছেদ করেছেন। আমাদের রব তার হায়াত বৃদ্ধি করুন আর সকল অনিষ্ঠতা থেকে তাকে রক্ষা করুন।

এ বছর ইবনে দাউদ প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তার কর্মের ফল দেখান। এ বছর ইরাকে প্রচণ্ড মরু সাইমুমে কুফা, বসরা ও বাগদাদের জনজীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এরপর দামেশকে তীব্র ভূকম্পনে নগরীর ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়ায় পঞ্চাশ হাজার লোক নিহত হয়।

২৩৫ হিজরীতে খ্রিস্টানদের গলায় মাফলার বাঁধার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৩৬ হিজরীতে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর কবর শরীফ আর এর আশপাশের মাকবারাগুলো ধ্বংস করে সেখানে চাষাবাদের হুকুম দেন আর লোকদেরকে এর যিয়ারত থেকে বিরত থাকার ফরমান জারি করেন। আগে এগুলো জঙ্গলে পরিণত হয়েছিলো। এতে জনসাধারণ মর্মাহত হয়ে তাকে নাসবী (খারেজী) উপাধি দেয়।

২৩৭ হিজরীতে অত্যাচারের অপরাধে মিসরের প্রধান বিচারপতি আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আবু নায়েসের দাড়ি কেটে বিশটি চাবুকাঘাত করা হয়। এ বছর আসকালান শহর আগুনে ভস্ম হয়ে যায়। এ বছর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে ডাকা হয়, কিন্তু তিনি এসে পৌছতে পারেননি।

২৩৮ হিজরীতে রোমানরা দাময়াত আক্রমণ করে শহরময় লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে ছয়শো মুসলমানকে বন্দী করে সমুদ্রপথে পাচার করে।

২৪০ হিজরীতে খালাতবাসী আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনে সহস্রাধিক লোক নিহত হয়। ইরাকের উপর থেকে ডিম বর্ষিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলীয় তেরোটি গ্রাম মাটিতে দেবে যায়।

২৪১ হিজরীতে অনেক তারকারাজি ঝরে পড়ে আর গভীর রাত পর্যন্ত আসমানে তারকাগুলো উড়ে বেড়ানোর মত মনে হতে থাকে।

২৪২ হিজরীতে তওনিস, রায়, খুরাসান, নিশাপুর, তবরিস্তান আর আসফাহানে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পাহাড়ের চূড়াগুলো উড়তে থাকে আর মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। মিসর অঞ্চলে আসমান থেকে দশমন ওজনের পাথর বর্ষিত হয়। ইয়ামানের পর্বতগুলো প্রকম্পিত হওয়ায় চাষাবাদের ক্ষেতগুলো স্থানান্তরিত হয়। হলব শহরে রমযান মাসে একটি সাদা প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে, প্রাণীটি স্পষ্ট ভাষায় বলে – "হে লোক সকল, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো।" এভাবে সে চল্লিশবার আওয়াজ দিয়ে উড়ে যায়। দ্বিতীয় দিন এসে আবার একই আওয়াজ দেয়। লোকেরা রাজধানীতে এ সংবাদ সরবরাহ করে আর এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঁচশো লোক সাক্ষ্য দেয়। এ বছর ইবরাহীম বিন মুতাহার টাঙ্গায় চড়ে বসরা থেকে হাজ্জ আদায় করে। লোকেরা এ ধরনের নতুন গাড়ি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়।

২৪৩ হিজরীতে মুতাওয়াক্কিল দামেশক যান আর সেখানকার পরিবেশ দেখে ভালো লাগায় সেখানে প্রাসাদ বানিয়ে থেকে যাবার ইচ্ছা করলে ইয়াযিদ বিন মুহাম্মাদ আল মাহিলাবী বললো, "আমার মনে হয় নেতা এখানে থাকলে ইরাকের চেয়েও শামবাসী বেশী খুশী হবে। যদি আপনি এখানে অবস্থান করেন, তাহলে ইরাকবাসীকে ছেড়ে দেয়া হবে। আর এতে করে তাদের সাহায্যকে আপনি বর্জন করছেন।" এ কথা শুনে দুই- তিন সপ্তাহ পর তিনি ফিরে আসেন।

২৪৪ হিজরীতে মুতাওয়াক্কিল তার ছেলেদের উস্তাদ ইয়াকুব সাকীতকে তার দুই ছেলে মুতায ও মুঈদকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে মুতায ও মুঈদ বেশী প্রিয়, না ইমাম হাসান আর ইমাম হুসাইন ?" ইয়াকুব বললেন, "এদের চেয়ে হযরত আলীর গোলাম কানবার বেশী প্রিয়।" এ কথা শুনে তিনি নির্দেশ দিলেন, "ইয়াকুবকে শুইয়ে দাও। এরপর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার পেটে লাফাতেই থাকো।" কেউ কেউ বলেন, তিনি তার জিহবা টেনে বের করায় তার মৃত্যু হয়। এরপর তিনি ইয়াকুবের দিয়ত তার আওলাদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

২৪৫ হিজরীতে ব্যাপক ভূমিকম্প হয়। এতে শহর, নগর, দুর্গ ও পুল ধ্বংস হয়। ইনতাকিয়ার একটি পাহাড় সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। আকাশ থেকে একটি ভয়ঙ্কর আওয়াজ দেওয়া হয়। মিসরও ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বালিশ অঞ্চলের অধিবাসীরা মিসরের দিক থেকে বজ্রনিনাদে একটি শব্দ শুনতে পায়। এতে এক হাজার লোক প্রাণ হারায়। মক্কা শরীফের নাহরগুলো শুষ্ক হয়ে পড়ে। তিনি আরাফাত থেকে মক্কায় পানি সরবরাহের জন্য এক লাখ দিনার খরচ করেন।

তিনি ছিলেন দানশীল, তার মতো কোন খলীফা কবিদের এত বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন দেননি। একদিন তিনি দুটি মতি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আলী বিন জাহাম কবিতার একটি চারণ পড়লো। তিনি উপহারস্বরূপ একটি মতি তার দিকে নিক্ষেপ করলেন। আলী কুড়িয়ে নিয়ে তা ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। তিনি বললেন, "উপহারের মূল্য কি কম ভাবছো ? আল্লাহর কসম, এর দাম এক লাখের চেয়েও বেশী।" আলী বললো, "না, তা ভাবছি না। আরো কিছু কবিতা মনে করছি, যা আবৃত্তি করে দ্বিতীয় মতিটিও নিতে পারি।" এরপর সে আরেকটি কবিতা শুনিয়ে দ্বিতীয় মতিটিও নিয়ে নেয়।

মাসউদী বলেছেনঃ, "তিনি শরাব পান করতেন। তার চার হাজার বাঁদি ছিল।"

আলী বিন জাহাম বলেছেন, "তিনি মুতাযের মাকে খুবই ভালোবাসতেন।"

সালামা কর্তৃক প্রণীত "আল- মুহান" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, শুরুর দিকে হযরত যিননুন মিসরী শিশুর জন্মের অবস্থা (শীর্ষক বিদ্যা - অনুবাদক) প্রকাশ করলে মিসরের আমীর ইমাম মালিকের ছাত্র আব্দুল্লাহ বিন আবুল হাকাম বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে মন্তব্য করেন, "তিনি একটি নতুন বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রবর্তন করেছেন - যা সলফে সালেহীন থেকে বর্ণিত নয়।" আমীরে মিসর তাকে ডেকে এ বিদ্যার ভিত্তি সম্পর্কে জানোতে চাইলে তিনি খুবই সুন্দর আর স্পষ্ট করে এর জবাব তুলে ধরেন। এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার কথা মেনে নেন। এরপর তিনি পত্র মারফত মুতাওয়াক্কিলকে বিষয়টি অবহিত করেন। খলীফা তাকে হাজির হওয়ার ফরমান জারি করেন। তিনি সেখানে হাজির হওয়ার পর খলীফা তাকে দারুণ সমাদরের সাথে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে যিননুন মিসরীর প্রসঙ্গ এলে খলীফা বলতেন, "তাকে সলফে সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত করো।"

মুতাওয়াক্কিল তার ছেলেদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুনতাসির, তারপর মুতায, তারপর মুঈদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। মুতাযের মাকে অধিক ভালোবাসার কারণে মুতাওয়াক্কিল মুতাযকে প্রথম উত্তরাধিকার নিয়োগ করেন। এতে মুনতাসির ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। এদিকে মুতাওয়াক্কিলের অবাধ্য কিছু তুর্কী লোক মুনতাসিরের সাথে যোগ দেয়।

২৪৭ হিজরীর শাওয়াল মাসের পাঁচ তারিখে রাতে মুতাওয়াক্কিল যখন ক্রীড়া- কৌতুকের মজলিসে বসে ছিলেন, তখন পাঁচজন লোক ভিতরে প্রবেশ করে মুতাওয়াক্কিলের সাথে তার মন্ত্রী ফাতাহ বিন খাকানকেও হত্যা করে।

এক ব্যক্তি মুতাওয়াক্কিলকে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করেন, “আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন?” তিনি বললেন, “অল্প ক’দিন সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে কাজ করেছি, এর কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।”

মুতাওয়াক্কিল বলতেন, “ফাতাহ বিন খাকান ছাড়া আমার চলবে না, আমি তাকে খুব ভালোবাসি।” আল্লাহর কুদরাতে তারা উভয়ে একই স্থানে একই সময়ে নিহত হোন। তার হত্যাকাণ্ডকে নিয়ে কবিরা অনেক শোকগাথা রচনা করেছেন।

ইবনে আসাকির বলেছেনঃ একবার মুতাওয়াক্কিল স্বপ্নে দেখেন যে, আসমান থেকে আমার কাছে এক প্রকার চিনির মোরব্বা এসে পড়ে। এতে লিখা ছিল - জাফর আল মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ তখতে আরোহণের পর আমাকে কি নামে ডাকবে তা নিয়ে লোকেরা চিন্তা ফিকির করতে লাগলো। কেউ মুনতাসির, কেউ অন্য নামের প্রস্তাব করলো। অবশেষে আহমাদ বিন দাউদকে নিজের স্বপ্নের কথা জানালাম। লোকেরা মুতাওয়াক্কিল নামটি পছন্দ করলো।

হিশাম বিন আম্মার কর্তৃক বর্ণিতঃ আমি মুতাওয়াক্কিলকে বলতে শুনেছি (তিনি বলেন), হায়, আমি যদি মুহাম্মাদ বিন ইদরীসের যুগ পেতাম! তবে তাকে দেখতাম আর তার কাছে কিছু পড়তাম। কারণ আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখেছি, তিনি বলেন, লোক সকল, মুহাম্মাদ বিন ইদরীস সত্যের সওগাত। পেছনে তোমরা এক নেককার আলেমকে ছেড়ে এসেছো। তার আনুগত্য কর হিদায়াত পাবে। এরপর মুতাওয়াক্কিল বলেন, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ বিন ইদরীসের উপর রহম করুন। লোকদের মাঝে তার মাযহাবকে সংরক্ষণ করুন আর তার এ মাযহাব থেকে আমাদেরকে ফায়দা হাসিলের তৌফিক দান করুন।

আমার (গ্রন্থকারের) মতে এ কথাটি অলাভজনক। কারণ মুতাওয়াক্কিল শাফী মাযহাবের অনুসারী। খলীফাদের মধ্যে তিনিই প্রথম, যিনি শাফী মাযহাব গ্রহণ করেছিলেন।

আহমাদ বিন আলী বসরী বলেছেনঃ একবার মুতাওয়াক্কিল সকল উলামায়ে কেরামকে একত্রিত করেন। সকলে সমবেত হলে তিনি মজলিসে আসার সময় খলীফার সম্মানার্থে আহমাদ বিন মুআদ্দাল ছাড়া তামাম ওলামায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে যান। ফলে (আহমাদ বিন মুআদ্দালের প্রতি ইশারা করে) মুতাওয়াক্কিল উবায়দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেন, “তিনি কি আমাকে বাইআত দেননি ?” উবায়দুল্লাহ বললেন, “আমিরুল মুমিনীন, তার দৃষ্টিশক্তির মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। তিনি অবশ্যই আপনার বাইআতের অন্তর্ভুক্ত।” এ কথা শুনে আহমাদ বললেন, “আমার দৃষ্টিশক্তির মধ্যে কোনোই ভিন্নতা নেই। আমি খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু হে আমিরুল মুমিনীন, আমি আপনাকে আযাব থেকে বাচাতে চাচ্ছি। কারণ নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোকেরা তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক, তাহলে সে যেন জাহান্নামে নিজের বাসস্থান করে নেয়।” এ কথা শুনে মুতাওয়াক্কিল তার কাছে এসে বসে পড়েন।

মাহলাবী বর্ণনা করেছেনঃ একবার মুতাওয়াক্কিল আমাকে বলেন, "হে মাহলাবী, পূর্ববর্তী খলীফাগণ জনসাধারণের উপর শুধু এজন্য কঠোরতা করতেন, যেন তাদের প্রতি প্রভাব ও দাপট প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমি তাদের উপর নম্রতা করি এজন্য যে, যাতে তারা হাস্যজ্বল চেহারায় আমার আনুগত্য করে।"

ফাতাহ বিন খাকান কর্তৃক বর্ণিতঃ একদিন আমি মুতাওয়াক্কিলকে গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় দেখে তাকে বললাম, "আমিরুল মুমিনীন, এতো কি ভাবছেন ? আল্লাহর কসম, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে বেশী সুখী কেউ নেই।" তিনি বললেন, "সে- ই আমার চেয়ে বেশী সুখী, যে একটি প্রাসাদ আর একজন নেককার স্ত্রীর মালিক, এর সাথে প্রাচুর্য থাকলে আরো সহজ হবে।"

আবুল আয়না বলেছেনঃ এক ব্যক্তি ফজল নামের এক বাঁদি মুতাওয়াক্কিলকে উপহার দেয়। সে বাঁদি কাব্য চর্চা করতো। মুতাওয়াক্কিল তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি কবি ?" বাঁদি বললো, "যে আমাকে বিক্রি করেছে আর যে কিনেছে, তাদের এটাই ধারণা ছিল।" তিনি বললেন, "কিছু শোনাও তো।" সে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো (যার অর্থ হচ্ছে) - "৩৩ হিজরীতে ইমানুল হুদা খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন। সে সময় তার বয়স ২৭ বছর। আমার বিশ্বাস সে বছরই তিনি শাসন করেছেন। আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির দুয়া কবুল করবেন না, যে আমার এ দুয়ায় আমীন বলবে না।"

আলী বিন জাহাম বলেছেনঃ এক ব্যক্তি মুতাওয়াক্কিলকে মাহবুবা নামের এক বাঁদি উপহার দেয়। সে তায়েফে লালিতপালিত হয় আর সেখানেই বিদ্যা অর্জন ও সাহিত্য শিক্ষা করে। সে কাব্য চর্চা করতো। তিনি তাকে খুব ভালোবাসতেন। কোন এক কাজে তিনি তার প্রতি রুষ্ট হয়ে প্রাসাদের অন্যান্য জেননাদের তার সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দেন। একদিন আমি মুতাওয়াক্কিলের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, "আমি আজ স্বপ্নে মাহবুবার সাথে আপোস করেছি।" আমি বললাম, "ভালোই হয়েছে।" তিনি বললেন, "চলো, মাহবুবা কি করছে গিয়ে দেখে আসি।" আমরা তার ঘরের নিকটবর্তী হলাম। সে উদ বাজিয়ে গাইছে - "আমি গোটা প্রাসাদে কাউকে দেখছি না, যাকে নিজের অভিযোগের কথা জানাবো। কেউ আমার সাথে কথা বলে না। আমি এমন গুনাহ করেছি। যার তাওবা কবুল হয় না। এমনকি কেউ নেই যে বাদশাহর কাছে আমার সুপারিশ করবে। কারণ তিনি স্বপ্নে আমার সাথে আপোস করেছেন। এমন কোন প্রভাত নেই যে প্রভাতে তার বিচ্ছেদের দংশন আমাকে হত্যা করে না।" মুতাওয়াক্কিল আওয়াজ দিলেন। মাহবুবা বেরিয়ে এসে তার পদচুম্বন করে বললো, "জনাব, রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি আপনি আমার সাথে সন্ধি করেছেন।" তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, আমিও সেটাই দেখেছি।" এরপর তিনি তাকে পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে নেন। তিনি নিহত হওয়ার পর সে অধিকাংশ সময় কবিতা পড়ে কাটিয়ে দিতো।

হযরত ইমাম আহমাদ বলেনঃ একদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম একজনকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে। আর অদৃশ্য থেকে কেউ বলছে, "এক বাদশাহকে ইনসাফগার বাদশাহর দিকে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যিনি ক্ষমা পরায়ণতায় প্রসিদ্ধ আর অত্যাচারী নন।" পরদিন সকালে সরমান রায় থেকে বাগদাদ পর্যন্ত এ কথা ছড়িয়ে পড়লো যে, মুতাওয়াক্কিল নিহত হয়েছেন।

আমর বিন শায়বান বলেনঃ মুতাওয়াক্কিল যে রাতে নিহত হোন, সেদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম এক ব্যক্তি এ কবিতাটি আবৃত্তি করছে - "হে আমর, শরীরের সাথে যে চক্ষুযুগল ঘুমিয়ে পড়েছে তার জন্য অশ্রু প্রবাহিত করো, তুমি কি দেখোনি, কিছু যুবক হাশেমী আর ফাতাহ বিন খাকানের সাথে কি আচরণ করেছে! আল্লাহর কাছে তারা এ অত্যাচারের জন্য ফরিয়াদ করছে, উপরন্তু তারা আসমানের অধিবাসীদের নিকটও নালিশ জানাচ্ছে। অচিরেই এর ফলাফল অশুভ হবে। অকল্যাণের প্রতিদান অকল্যাণই হয়। জাফরের জন্য কাদো আর তোমার খলীফার শোকগাথা আবৃত্তি করো। কারণ জিন ও ইনসান উভয়ে তাদের জন্য কাঁদছে।"

অতঃপর দুই মাস পর মুতাওয়াক্কিলকে স্বপ্নে দেখে বললাম, "আল্লাহ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন?" তিনি বললেন, "কিছুদিন সুন্নত জীবিত করার জন্য তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন।" আবার বললাম, "আর আপনার হত্যাকারীদের কেমন আচরণ করেছেন ?" তিনি বললেন, "আমি নিজ পুত্র মুহাম্মাদের অপেক্ষা করছি। সে এখানে এলেই তাকে নিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবো।"

মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ

খতীব বলেনঃ মুহাম্মাদ বিন শুজা আল আহমার বর্ণনা করেছেন, মুতাওয়াক্কিল জারীর বিন আব্দুল্লাহর হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে নমনীয়তা থেকে বঞ্চিত, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।" তাবারানী হাদীসটি জারীর থেকে ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আসাকির বলেছেনঃ নযর বিন আহমাদ আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আলী বিন জাহাম বলেছেন - একদিন আমি মুতাওয়াক্কিলের সাথে বসেছিলাম, সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা চলছিলো। তিনি বললেন, "সুন্দর কেশরাজিও সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।" এরপর তিনি বললেন, "আমি মুতাসিম থেকে, তিনি মামুন থেকে, তিনি হারুন রশীদ থেকে, তিনি মাহদী থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন, রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কানের লতির নিচে জুলফ এমনভাবে ঝুলিয়ে থাকতো, যেন মনে হয় সে জুলফে মতি জড়ানো রয়েছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখতে সকলের চেয়ে সুন্দর ছিলেন। আবদুল মুত্তালিব আর হাশিমেরও জুলফ ছিল।"

আলী বিন জাহাম বলেছেনঃ আমি মুতাওয়াক্কিল থেকে, তিনি মুতাসিম থেকে, তিনি মামুন থেকে, তিনি রশীদ থেকে, তিনি মাহদী থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ আর তার দাদা আলী ও আলীর ছেলে থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কানের লতির নিচে এমনই জুলফ ছিল।

তার শাসনামলে যে সকল ওলামায়ে কেরামগণ ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - আবু সুর, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইবরাহীম বিন মুনযির আল খাযায়ী, ইসহাক বিন রাহুয়া, ইসহাক নদম, রুহুল মাকরী, যাহির বিন হারব, শাহনু, সুলায়মান, আবু মাসউদ, আসকারী, আবু জাফর নাকিলী, আবু বকর বিন শায়বা ও তার

ভাই, কবি দেকুলজিন, আব্দুল মালিক বিন হাবীব, আব্দুল আযীয বিন ইয়াহইয়া, আব্দুল্লাহ বিন উমর ফাওয়ারেরী, আলী বিন মাদায়েনী, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নাযীর, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইউসুফ, রাশীর বিন ওলীদ, ইবনে আবু দাউদ, আবু বকর, জাফর বিন হরব, ইবনে কিলাব আল মুকাল্লাম, কাযি ইয়াহইয়া বিন আকতাম, হারিস, ইমাম শাফেঈর ছাত্র ইবনুল সাকীত, আহমাদ বিন মানবাআ, যিননুন মিসরী, আবু তুরাব, আবু উমর, আল মাকরায়ী, কবি ওয়াবল, আবু উসমান প্রমুখ।

আল মুনতাসির বিল্লাহ

আল মুনতাসির বিল্লাহ মুহাম্মাদ আবু জাফর (অথবা আবু আব্দুল্লাহ) বিন মুতাওয়াক্কিল বিন মুতাসিম বিন হারুন রশীদ জায়শা নামের রোমান বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি সুদর্শন, প্রতাপান্বিত, জ্ঞানী, সৎ কাজের অনুরাগী, জুলুম নিঃশেষকারী আর আলী পরিবারের প্রতি দয়ার্দ্র ছিলেন। ইমাম হুসাইনের কবর শরীফ যিয়ারতের অনুমতি দেন আর তার বংশধরদের কাছে ফিদকের বাগান হস্তান্তর করেন।

মুনতাসির তার পিতা নিহত হওয়ার পর ২৪৭ হিজরীর শাওয়াল মাসে খিলাফতের তখতে আরোহণ করে সর্বপ্রথম নিজের দুই ভাই মুতায আর মুঈদকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেন - যাদেরকে মুতাওয়াক্কিল উত্তরাধিকার মনোনীত করেছিলেন।

প্রজাবৃন্দের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে জনগণ তার প্রতাপের প্রতি ঝুকে পড়ে। তিনি উঁচু মাপের ধৈর্যশীল।

তার চয়নকৃত বাণীর মধ্যে এটি একটি - ক্ষমার স্বাদ শাস্তি প্রদানের স্বাদের চেয়ে বেশী মিষ্টি, ভদ্র লোকদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ এক লজ্জাকর কাজ।

খিলাফতের মসনদে সমাসীন হয়ে তুর্কীদের সমালোচনা করেন, তাদের প্রতি খলীফা মুতাওয়াক্কিলকে হত্যার দোষ চাপিয়ে দেন আর এ কারণে তাদের শাস্তি দেন। ফলে তুর্কীরা হতাশ হয়ে পড়ে। কারণ তিনি ধৈর্যশীল, সাহসী ও জ্ঞানী।

অবশেষে তারা মুনতাসিরের চিকিৎসকের কাছে ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঘুষ পাঠায়। চিকিৎসক খলীফার ঔষধে বিষ মাখিয়ে দেয়, এতে তার মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেন, ভুলক্রমে বিষ মিশ্রিত ঔষধ সেবনের ফলে চিকিৎসক নিজেই পরলোকগমন করে। কেউ কেউ বলেন, অন্তিম মুহুর্তে খলীফা মুনতাসির বলেন, “হে আমার মা, দ্বীন- দুনিয়া উভয় জগৎ আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার বাবার ইন্তেকালের কারণ আমি নিজেই।” মুনতাসির ২৪৮ হিজরীর রবিউল আখির মাসের ৫ তারিখে ২৪ বছর বয়সে প্রায় ছয় মাস খিলাফত পরিচালনা করে ইন্তেকাল করেন।

কথিত আছে, একদিন মুনতাসির খেলাধুলার জন্য বসে আছেন। তার বাবার খাযানা থেকে একটি কাপেট সেই মজলিসে পাঠানো হয়। কার্পেটের মাঝে এক আরোহীর চিত্র অঙ্কিত ছিল। আরোহীটি মুকুট পরিহিত ছিলো, এর আশেপাশে ফার্সী ভাষায় কিছু লিখা ছিল। মুনতাসির ফার্সী ভাষায় পারদর্শী একজনকে ডেকে এর ভাবার্থ জানানোর জন্য বললেন। সে একবার পড়ে চুপ হয়ে গেলো। তিনি আবার বললেন, “এর ভাবার্থ কি ?” সে বললো, “এর কোন অর্থ নেই।” তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, “লিখা আছে - আমি শিরওয়া

বিন কিসারা বিন হরমুয। আমি নিজ পিতাকে হত্যা করেছি। কিন্তু ছয় মাসের বেশী রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পাইনি।" এ কথা শুনে স্বর্ণ খচিত থাকার পরও তিনি কার্পেটটি জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

লাতায়িফুল মাআরিফ গ্রন্থে সালাবী লিখেছেনঃ মুনতাসির খিলাফতপ্রাপ্ত হয়ে প্রকৃত খলীফায় পরিণত হোন। কারণ তার বাবা-দাদাসহ পাচজন সকলেই খলীফা ছিলেন। মুনতাসিরের ভাই মুতায আর মুতামাদও প্রকৃত খলীফা ছিলেন। আমি (গ্রন্থকার) বলছি, মুসতাসিমও এমন খলীফা ছিলেন, যাকে তাতাররা শহীদ করে দেয়। তার বাবা-দাদাসহ পূর্বপুরুষও খলীফা ছিলেন।

সালাবী বলেন, "কিসারা বংশে যে বাদশাহ খালেস, তিনি হলেন শিরওয়া। তিনি নিজ পিতাকে হত্যা করেন আর ছয় মাসের বেশী জীবিত ছিলেন না। বনু আব্বাসের মধ্যে খালেস খলীফা মুনতাসির, তিনিও নিজ পিতাকে হত্যা করেন আর ছয় মাসের বেশী জীবিত ছিলেন না।"

আল মুসতায়িন বিল্লাহ

মুতাওয়াক্কিলের ভাই আল মুসতায়িন বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুতাসিম বিন রশীদ ২২১ হিজরীতে মুখারিক নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তার লাবণ্যময় চেহারায় বসন্তের দাগ ছিল। তিনি ছিলেন তোতলা।

মুনতাসিরের ইন্তেকালের পর সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাবৃন্দ পরামর্শক্রমে মুসতায়িনকে খলীফা মনোনীত করেন। তিনি ২৮ বছর বয়সে খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন আর ২৫১ হিজরী পর্যন্ত তার খিলাফত ছিল।

ওসীফ আর বাগা নামক দুই তুর্কী, যারা মুতাওয়াক্কিলের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল, তিনি তাদেরকে পৃথক করে দিলে তুকীরা ভয়ে সামরাহ থেকে বাগদাদে চলে যায়। এরপর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে মুসতায়িনের কাছে দূত পাঠিয়ে সামরাহতে ফিরে আসার অনুমতি চায়। তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তুর্কীদের বন্দী করার ইচ্ছা করলে তারা মুতায বিল্লাহর কাছে বাইয়াত দেয়। মুতায বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসতায়িনের উপর হামলা করেন। মুসতায়িন নিহত হওয়ায় বাগদাদবাসী উত্তেজিত হয়ে পড়ে। উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ লড়াই কয়েক মাস ধরে চলতে থাকে, হতাহত হয় অসংখ্য জনতা, যুদ্ধের দীর্ঘতার কারণে মানুষের জীবন অচল হয়ে পড়ে। অবশেষে মুসতায়িনের বাহিনী সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তিনি সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে ২৫২ হিজরীতে খিলাফত থেকে সরে দাড়ান। এ সন্ধিতে কাযি ইসমাঈল মুসতায়িনের প্রতি কঠোর শর্তাবলী আরোপ করে। অন্যান্য কাযীগণ আরোপিত কঠোর শর্তাবলীকেই সন্ধির শর্তসমূহ হিসেবে চুক্তিপত্রে মোহর এঁটে দেয়।

মুসতায়িন ওয়াসেত শহরে চলে যান। তিনি সেখানে নয় মাস যাবত এক আমীরের নযরবন্দী হিসেবে অবস্থান করেন। এরপর সেই আমীর তাকে সামারাহতে পাঠিয়ে দেয়। মুতায আহমদ বিন তুলুনকে এক লিখিত ফরমানের মাধ্যমে মুসতায়িনকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। প্রতিউত্তরে আহমাদ জানায় - খলীফার বংশধর আমি কখনোই হত্যা করবো না। এরপর এ কাজের জন্য সাইদ হাজেবকে নিয়োগ করা হয়। ২৫২ হিজরীর শাওয়াল মাসের ৩ তারিখে যখন তার বয়স ৩১ বছর, সে তাকে হত্যা করে।

মুসতায়িন সৎ, জ্ঞানী, সাহিত্যিক আর বাগ্মী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম তিন সেলাইবিশিষ্ট জামা ও লম্বা টুপি পড়েন।

তার খিলাফতকালে যে সকল ওলামায়ে কেরাম ইন্তিকাল করেন তারা হলেন - আবদ বিন হামিদ, আবু তাহের বিন আল সরাহ হারেস বিন মিসকীন, আবু হাতিম, জাখাত প্রমুখ।

আল মুতায বিল্লাহ

২৩২ হিজরীতে আল মুতায বিল্লাহ মুহাম্মাদ; ভিন্ন মতে, যাবের আবু আব্দুল্লাহ বিন মুতাওয়াক্কিল বিন রাশীদ 'কাবীহা' নামক রোমান বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

মুসতায়িনকে অপসারণের পর ২৩২ হিজরীতে ১৯ বছর বয়সে খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন। এর আগে এতো অল্প বয়সে কেউ খিলাফত পাননি। তিনি টগবগে যুবক ছিলেন।

মুতাযের হাদীসের উস্তাদ আলী বিন হরব বলেছেন, আমি তার চেয়ে সুন্দর খলীফা আর দেখিনি। তিনিই প্রথম খলীফা, যিনি ঘোড়াকে স্বর্ণের অলংকার পড়ান। পূর্ববর্তী খলিফাগণ নিজ নিজ ঘোড়ার গলায় হাল্কা রৌপ্যের অলংকার পড়াতেন।

মসনদে আরোহণের বছর ওয়াসেক কর্তৃক নিযুক্ত আশনাস নামক রাষ্ট্রের ডেপুটি কর্মকর্তা মারা যায়। তার পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে পঞ্চাশ হাজার দিনার রেখে যায় - যা মুতায হস্তগত করেন। তার মৃত্যুর পর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন তাহেরকে নায়েব মনোনীত করেন। তিনি সর্বদা নিজের কাছে দুটি তলোয়ার বেঁধে রাখতেন। কিছুদিন পর তাকে অপসারণ করে সে স্থানে নিজের ভাই আবু আহমাদকে নিয়োগ করেন। তিনি সোনার মুকুট পড়তেন আর দুটি তলোয়ার বহন করতেন। তাকেও অপসারিত করে ওয়াসেত শহরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর মদ্যপ বাগাকে নায়েবের দায়িত্ব দেয়া হয়। সেও শাহী মুকুট পরতো। সে এক বছর পর মুতাযের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অবশেষে তাকে হত্যা করা হয় আর তার কাটা মাথা মুতাযের সামনে হাজির করা হয়।

এ বছর রযব মাসে তিনি তার ভাই মুঈদ বিল্লাহকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেন, বেত্রাঘাত করান আর বন্দী করে রাখেন। এতে মুঈদ পরলোক গমন করলে মুতায ভয় পেয়ে যান। হত্যার অপরাধে যেন অভিযুক্ত না হোন সে জন্য তিনি কাযীদের ডেকে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কিন্তু এতে কোন আসর হলো না।

মুতায তুর্কীদের, বিশেষ করে সালিহ বিন ওসীফকে দেখে দারুণ ভয় পেতেন। একদিন তুর্কীরা অর্থের বিনিময়ে সালিহকে হত্যার কথা জানালে মুতায তার মায়ের কাছে কিছু অর্থ চাইলে তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সে সময় কোষাগারে কোন অর্থকড়ি ছিল না। ঘুষ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় তুর্কীরা সালিহ বিন ওসীফ আর মুহাম্মদ বিন বাগাকে সাথে নিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে মুতাযকে বেরিয়ে আসতে বলে। তিনি অসুস্থ, বেরিয়ে আসতে পারবেন না - এ কথা জানিয়ে দেন। তারা কোলাহল করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা ভেতরে প্রবেশ করে। মুতাযের পা ধরে বাইরে নিক্ষেপ করে। তাকে মারতে মারতে মুখ লাল করে দেয়া হয়। গরমের সময় ছিল, তুর্কীরা তাকে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখে। তারা মুতাযকে তার বাইআত থেকে সরে যাওয়ার জন্য চাপ দেয়। এরপর কাযী বিন আবু শিওয়ারিবকে ডাকা হয়। তার সামনে তিনি নিজ বাইআত থেকে সরে যান। তারপর মুহাম্মদ বিন ওয়াসেক - যাকে মুতায বাগদাদে পাঠিয়ে

দিয়েছিলো, তিনি বাগদাদ থেকে রাজধানী সামরাহতে এসে পৌঁছলে তিনি তার উপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন আর তার হাতে বাইআত করেন।

এ ঘটনার পাঁচ দিন পর এক দল লোক এসে গোসল করানোর জন্য মুতাযকে হাম্মামে নিয়ে যায়। গোসলের পর তার পিপাসা লাগে। তাকে পানি দেয়া হয়নি। হাম্মাম থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বরফের পানি খাওয়ানো হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইন্তেকাল করেন। তিনিই প্রথম খলীফা, যিনি পিপাসায় কাতর হয়ে ২৫৫ হিজরীর শাওয়াল মাসের ৮ তারিখে পরলোক গমন করেন।

প্রথমে মুতাযের মা কাবীহা তাদের ভয়ে আত্মগোপন করে ছিল। পরে রমযান মাসে বেরিয়ে এসে সালিহ বিন ওসীফকে অনেক ধন- দৌলত অর্থাৎ তের লাখ দিনার আর দুটি জামা দেন, তারমধ্যে একটি জামায় জমরুদ আর অপরটিতে মতি ও ইয়াকুত জড়ানো ছিল। এ দুটি জামার আনুমানিক মূল্য দুই হাজার দিনার। এত সম্পদ দেখে ইবনে ওসীফ বললো, "এতো সম্পদ থাকার পরও পঞ্চাশ হাজার দিনারের জন্য এ নারী তার আপনি ছেলেকে হারিয়েছে।" ইবনে ওসীফ তার কাছ থেকে এগুলো নিয়ে তাকে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দেয়। কাবীহা মুতামাদের খিলাফত পর্যন্ত সেখানেই ছিল। এরপর সে সামরাহ ফিরে আসে আর ২৬৪ হিজরীতে পরলোক গমন করে।

মুতাযের যুগে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - সারী সাকতী, হারুন বিন সাঈদ, মুসনাদের লেখক দারমী, আকবী প্রমুখ।

আল মুহতাদী বিল্লাহ

আল মুহতাদী বিল্লাহ খালীফাতুস সালিহ মুহাম্মাদ আবু ইসহাক; ভিন্ন মতে, আবু আব্দুল্লাহ বিন ওয়াসেক বিন মুতাসিম বিন হারুন রশীদ 'ওরদাহ' নামের বাঁদির গর্ভে ২১০ হিজরীর পর তার দাদার শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ২৫৫ হিজরীর রযব মাসের ১৯ তারিখে তখতে খিলাফতপ্রাপ্ত হোন। মুতায সর্বপ্রথম তাকে বাইআত দেন আর নিজ খিলাফত তার উপর অর্পণ করেন। মুতাযের সামনে তাকে বসানো হয়। মুতায কাযীর সামনে সাক্ষ্য দেন। কাযী বলেন, "মুতায খিলাফত পরিচালনায় অপারগ।" মুতায্য কাযীর কথা স্বীকার করেন। মুহতাদী এ কথা শুনে বাইআতের জন্য নিজের হাত বাড়িয়ে দিলে মুতায সর্বপ্রথম বাইআত করেন। এরপর তিনি মজলিসের মধ্যভাগে এসে উপবেশন করেন।

মুহতাদী সুদর্শন, ইবাদতগুজার, দানশীল, বুদ্ধিমান, আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী চালু করার ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর আর সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তার কোন সাহায্যকারী ছিল না।

খতীব বলেছেন, "মুহতাদী খলীফা হওয়া থেকে আরম্ভ করে নিহত হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন রোযা রাখতেন।"

হাশিম বিন কাসিম বলেছেনঃ আমি একদিন রমযান মাসে মুহতাদীর কাছে বসেছিলাম, আমি উঠে আসার ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে বসিয়ে দিলেন। ইফতার করে তিনি নামায পড়ালেন। এরপর আবার খাবার চাইলেন। এক ডালাভর্তি খাবার এলো। এতে ছিল ময়দার রুটি, এক বাটি সিরকা আর যয়তুন তেল। তিনি আমাকে খেতে বললেন, আমি খেতে আরম্ভ করলাম। আমার মনে হল আরো খাবার আসবে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি রোযা ছিলে না ?" আমি বললাম, "ছিলাম।" তিনি বললেন, "আগামীকাল রোযা রাখবে না ?" আমি বললাম, "রমযান শরীফের রোযা কেন রাখবো না ?" তিনি বললেন, "ভালো করে খাও, তবে আর কোন খাবার আসবে না। আমার কাছে এ ছাড়া আর কোন খাবার নেই।" আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনেক নেয়ামত দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "এটা তুমি ঠিকই বলেছো। আমি বনু উমাইয়্যার খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীযের জীবন নিয়ে চিন্তা করেছি। তিনি স্বল্প ভোজন আর জনগণের চিন্তার কারণে পাতলা ছিলেন, যা তুমি জানো। অতঃপর আমি নিজ খান্দানের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে দারুণ মর্মাহত হয়েছি। লোকেরা আমাদের বনু হাশিম বলে। অথচ তারা যা ছিল না আমরা তা গ্রহণ করেছি, যা তুমি দেখছো।"

জাফর বিন আব্দুল ওহেদ বলেছেনঃ মুহতাদীর সাথে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে আমি বললাম, "ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) এ কথাই বলেছেন এবং আপনার বাবা ও দাদা এ মাসয়ালার উপরই কাজ করেছেন।" তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা ইমাম আহমাদের উপর রহম করুন। আমার পিতার সাথে

সম্পর্কোচ্ছেদ করা জায়েয হলে সঙ্গে সঙ্গে আমি তা করতাম।” এরপর তিনি আমাকে বললেন, “সর্বদা সত্য কথা বলবে। যে সত্য কথা বলে সে আমার দৃষ্টিতে অধিক প্রিয়।”

তাফতুয়া বলেছেন যে, এক হাশেমী বর্ণনা করেছেন, “আমরা মুহতাদীর কাছে একটি পোশাক বক্স দেখেছি, যাতে তিনি একটি জামা আর একটি কম্বল রাখতেন। রাতে তিনি এ দুটো পড়ে নামায আদায় করতেন।”

মুহতাদী লোকদের ক্রীড়া- কৌতুক ও খেলাধুলা করতে নিষেধ করেন, এর সামগ্রীগুলো ফেলে দেন। গান বাজনা হারাম ঘোষণা করেন। প্রশাসকদের অত্যাচার থেকে জনগণকে রক্ষা করেন। তিনি নিজেই বিচারালয়ে বসতেন। তিনি নিজেই কেরানীদের কাছ থেকে হিসাব নিতেন। সোমবার ও বৃহস্পতিবারে অবকাশে থাকতেন। রুসার একটি দলকে বোত্রাঘাত করেন। রাফেয়ী হয়ে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে দারুণ ঘৃণায় তিনি জাফর বিন মাহমুদকে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন।

মুতাযের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মূসা বিন বাগা রায় থেকে একদল সৈন্যসহ খিলাফতের রাজধানী সারমন রায়ে সালিহ বিন ওসীফকে হত্যা করার জন্য আসে। মূসার আগমন সংবাদ পেয়ে জনগণ ওসীফকে লক্ষ্য করে বললো, হে ফিরাউন, তোমার জন্য এক মূসা এসে পড়েছে। মূসা এসে খলীফার কাছে অনুমতি চাইলো, তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। সে সময় তিনি আদালতে বসেছিলেন। মূসা তার উপর জনতাকে লেলিয়ে দিলো। তার সৈন্যরা খলীফাকে একটি দুর্বল ঘোড়ায় উঠিয়ে প্রাসাদ লুণ্ঠন করে। খলীফা বললেন, “মূসা, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। তোমার উদ্দেশ্য কি ?” সে বললো, “আল্লাহর কসম, আমার উদ্দেশ্য ভালো, আপনি আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিন যে, আপনি সালিহ বিন ওসীফের পক্ষপাতিত্ব করবেন না।” মুহতাদী শপথ করলেন। মূসা সদলবলে খলীফার বাইআত করলো। এরপর সালিহ বিন ওসীফের কৃত অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাকে ডাকা হয়। সে আত্মগোপন করে। মুহতাদী তার সাথে সন্ধি করার চেষ্টা শুরু করেন। এতে জনতার কথা বলার সুযোগ হলো যে, সালিহ কোথায় আত্মগোপন করেছে তা খলীফা জানেন। আমিরুল মুমিনীনকে অপসারণের চক্রান্ত হয়। এটা জানোতে পেয়ে মুহতাদী একদিন সকালে তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এসে বললেন, “আমাকে মুসতায়িন আর মুতায ভেবো না। আল্লাহর কসম, আমি রাগান্বিত হলে জীবনের কোনো মায়া নেই। এটা আমার তলোয়ার, এটা আমার হাতে থাকা অবস্থায় হত্যা করেই যাবো; দ্বীন, শরম আর তাকওয়া বলতে কিছু জিনিস রয়েছে। খলীফাদের সাথে শত্রুতা মানে আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা করা। আমার কাছে সালিহ’র কোন সংবাদ নেই।” এ কথা শুনে লোকেরা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়। মূসা বিন বাগা সালিহকে ধরে আনতে পারলে দশ হাজার দিনার পুরস্কার ঘোষণা করে, কিন্তু কেউ তাকে ধরে আনতে পারলো না।

গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড গরমের কারণে এক যুবক একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে ঢুকে পড়ে। সেখানে সালিহকে দেখে সে চিনতে পারে। যুবকটি এসে মূসাকে জানিয়ে দেয়। সে কয়েকজন লোক পাঠিয়ে তার মাথা কেটে আনে। এতে মুহতাদী দারুণ মর্মাহত হোন। মূসা বাকিয়ালের সাথে সন- এ গেলে মুহতাদী মূসাকে হত্যা করার জন্য বাকিয়ালের কাছে লিখিত ফরমান পাঠান। বাকিয়াল তা মূসার সামনে পেশ করলে সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। সে- ই মুহতাদীকে হত্যা করার জন্য ফিরে এলো। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেলো। একদিনেই নিহত

হল চার হাজার তুর্কী, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত খলীফার বাহিনী পরাজিত হলো। তিনি বন্দী হলেন, তাকে মেরে ফেলা হলো।

মুহতাদী ২৫৬ হিজরীর রযব মাসে নিহত হোন। এ হিসাবে তিনি পনেরো দিন কম এক বছর খিলাফতের তখতে সমাসীন ছিলেন। তুর্কীরা যখন মুহতাদীকে আক্রমণ করে, তখন প্রজাবৃন্দ মসজিদগুলোতে এ কথাটি লিখে ঝুলিয়ে দেয় - "হে মুসলমানগণ, উমর বিন আব্দুল আযীযের মতো ন্যায়পরায়ণ খলীফাকে সাহায্য করো এবং তার বিজয়ের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করো।"

আল মুতামাদ আলাল্লাহ

আল মুতামাদ আলাল্লাহ আবুল আব্বাস (আবু জাফর) আহমাদ বিন মুতাওয়াক্কিল বিন মুতাসিম বিন রশীদ ২২৯ হিজরিতে ফিতয়ান নামের রোমান বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

মুতামাদ নিহত হওয়ার সময় তিনি জুসিকে বন্দী ছিলেন। তাকে বের করে লোকেরা তার হাতে বাইয়াত করে। তিনি তার ভাই মোফিক তালহাকে পূর্বাঞ্চলীয় গভর্নর নিয়োগ করেন। পুত্র জাফরকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে মিসর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় গভর্নর পদে নিয়োগ দেন। তার লকব 'মফুয ইলাল্লাহ' রাখা হয়। তিনি আরাম আয়েশ, খেলাধুলা আর মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়লে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হয়ে তার ভাই তালহার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

মুহতামাদের খিলাফতকালে বসরা আর তার পার্শ্ববর্তী জনপদগুলো দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দস্যুরা শহরে নারকীয় তান্ডব চালায়, লুণ্ঠন করে শহরময় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। মুসলিম বাহিনীর সাথে তাদের লড়াই হয়। এরপর ইরাকে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, এতে সহস্রাধিক মাখলুকের প্রাণহানি ঘটে। মহামারির পর ভুমিকম্পেও সহস্রাধিক পশু- প্রাণীর জীবন সাঙ্গ ঘটে।

এদিকে ২৭০ হিজরি পর্যন্ত দস্যুদের সাথে লড়াই চলতে থাকে। এ বছর দস্যু সর্দার বাহবুদ (আল্লাহ তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন) নিহত হয়। সে রিসালাতের দাবী করে বলতো, আমি আলিমুল গায়েব। সে ১৫ লাখ মুসলমানকে হত্যা করেছিলো। সে একদিনে বসরায় ৩ লাখ মুসলমান হত্যা করে। সে মিম্বরে দাঁড়িয়ে উসমান, আলী, মুআবিয়া, তালহা, যুবায়ের আর আয়েশা (রাঃ) কে গালি দিতো। এক এক উলুবিয়া নারীকে ২/৩ দিরহামে নিলামে বিক্রি করতো। এককে দস্যুর কাছে দশজন উলুবিয়া নারী বাঁদি হিসেবে ছিল। এ অসৎ লোকটি নিহত হলে তার কাটা মাথা বর্শায় গেঁথে বাগদাদের পথে ঘোরানো হয়। এতে করে লোকেরা আনন্দ করে আর দস্যুদের সাথে লড়াইরত মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তালহাকে ধন্যবাদ জানায় আর কবিগণ তার প্রশংসায় কাব্য রচনা করেন।

সূলী বলেনঃ এ যুদ্ধে আনুমানিক এক কোটি লোক জড়িয়ে পড়ে।

২৬০ হিজরিতে ইরাকে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, ফলে এক বস্তা গমের দাম একশো দিনারে গিয়ে পৌঁছে। এ বছর রোমানরা লুলু শহর দখল করে নেয়।

২৬১ হিজরিতে পুত্র জাফরকে উত্তরাধিকার আর তারপর ভাই তালহাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। জাফরকে শাম, জাযিরা আর আর্মেনিয়ার গভর্নর পদে নিয়োগ দেন। আর তালহাকে ইরাক, বাগদাদ, হিজায, ফারিস, ইস্পাহান, রায়, খুরাসান, তবরিস্তান, সিজিস্তান ও সনদের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি দুজনের জন্য পৃথক দুটো পতাকা নির্বাচন করেন। সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতিকে ডেকে উভয়ের মাঝে লিখিত চুক্তি

সম্পাদন করেন যে, জাফরের অবর্তমানে তালহার রায় চূড়ান্ত। এ চুক্তিপত্র প্রধান বিচারপতি ইবনে আবু শাওয়ায়িব খানায়ে কাবার দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেন।

২৬৬ হিজরিতে রক্ত ঝরিয়ে দেয়ারে বকর জনপদটি দখল করে নেয়। ফলে জাযিরাবাসী আর মৌসুলবাসী সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এ বছর গ্রাম্য লোকেরা কাবা শরীফের গেলাফ চুরি করে নিয়ে যায়।

২৬৭ হিজরিতে আহমাদ বিন আবদুল্লাহ আল হিজাবী খুরাসান, সিজিস্তান আর কারমান দখল করার পর ইরাক দখলের পাঁয়তারা করলে তার গোলামরা তাকে হত্যা করে।

২৬৪ হিজরিতে মুতামাদের ভাই মুফিক (তালহা) সেনাবাহিনীসহ মুতামাদের উপর আক্রমণ করে। এতে মুতামাদ মর্মাহত ও হতাশ হোন। অবশেষে ২৬৯ হিজরিতে মিসরের ডেপুটি প্রশাসক ইবনে তুলুনের সাথে মুতামাদের পত্রাদি বিনিময়ের মাধ্যমে যে কথা হয়, তার ভিত্তিতে ইবনে তুলুন সসৈন্যে আর মুতামাদ সামরাহ থেকে দামেশকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। এ সংবাদ পেয়ে মুফিক লিখিতভাবে ইসহাক বিন কান্দাজকে জানালো, যে কোনভাবে মুতামাদকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ইসহাক নাসিবীন শহর থেকে মুতামাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মৌসুল আর হাদীসার মধ্যবর্তী স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হলে ইসহাক বললো, "আমিরুল মুমিনীন, আপনার ভাই আপনার দুশমনদের সাথে লড়াই করছে, আর আপনি খিলাফতের রাজধানী ছেড়ে কোথায় চলেছেন ? শত্রুরা জানোতে পেলে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে আপনার বাপ-দাদার সাম্রাজ্য দখল করে নিবে, আর সে সময় আপনার কিছুই করার থাকবে না।"

মুতামাদের গতিবিধির উপর ইসহাক সবসময় নজর রাখার জন্য বিশ্বস্ত কিছু লোক নিযুক্ত করেছিলো। সে মুতামাদকে জানালো, "এ স্থান আপনার জন্য নিরাপদ না, এখান থেকে ফিরে যেতে হবে।" মুতামাদ বললেন, "আমার কাছে শপথ করো যে, তোমরা আমাকে কষ্ট দিবে না আর আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দিবে না।" ইসহাক শপথ করলো, এরপর তিনি সামরাহ'র দিকে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে মুফিকের কেরানি সাদ বিন মুখাল্লাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। মুতামাদকে সাদের কাছে ইসহাক হস্তান্তর করে। সে অন্যত্র চলে যায়। সাদ তাকে রাজধানিতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। সে তাকে আহমাদ বিন খাসীবের বাড়িতে নিয়ে যায় আর পাঁচশো অশ্বারোহী মুতামাদকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য নিযুক্ত রাখে। সংবাদ পেয়ে মুফিক ইসহাককে বৃত্তি ও জায়গীর প্রদান করে আর 'যুল সানাদাইন' উপাধি দেয়। আর সাদকে 'যুল ওয়াযারাতাইন' উপাধি দেয়।

মুতামাদ সাদের হাতে গৃহবন্দী ছিলেন। তার কোন কাজ করার ইখতিয়ার ছিল না। তিনি নিজের এ অপারগতা ও অসহায়ত্বকে উপজীব্য করে একটি কবিতা রচনা করেন - "আশ্চর্য! আমি বাদশাহ, অথচ আমার ইখতিয়ারে কোন জিনিস নেই! আমি বাদশাহ হয়েও আমার লোকবল কম।"

তিনি প্রথম খলীফা - যিনি নিপতিত হোন, তার উপর লোকের পাহারা বসানো হয় আর তার অপবাদ ছড়ানো হয়। এরপর মুতামাদ মধ্যস্থতায় আসেন। এ খবর পেয়ে ইবনে তুলুন বিচারক আর আমীর উমরাহদের ডেকে বললো, মুফিক আমিরুল মুমিনীনকে বন্দী করে রেখেছেন, তাই তার বাইয়াত থেকে পৃথক হওয়া উচিত।

কাযী বাকার বিন কীতীয়াহ ছাড়া সকলেই সমর্থন জানালো। কাযী বাকার বললেন, “তোমরাই প্রথমে আমার সামনে মুতামাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ফরমান পেশ করেছো, যার কারনে তাকে উত্তরাধিকার বানানো হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা স্বয়ং মুতামাদের কাছ থেকে তার পৃথকীকরণের হুকুমনামা না দেখাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অনুমতি দিবো না।” এর জবাব ইবনে তুলুন বললো, “এ মুহূর্তে মুতামাদ বন্দী আর গযবে নিপতিত, এজন্য তিনি ফরমান লিখতে পারবেন না।” কাযী বাকার বললেন, “আমি এ অবস্থায় কোন হুকুম দিতে পারি না।” ইবনে তুলুন বললো, “পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধ যে, কাযী বাকার এতো অনন্য ও অদ্বিতীয় বিচারক, এজন্য তোমার অহংকার হয়েছে। আসলে তোমার বিবেক বৃদ্ধতার দংশনে ক্ষত- বিক্ষত।” এ কথা বলে ইবনে তুলুন কাযী বাকারকে বন্দী করলো আর যতগুলো উপহার সামগ্রী তাকে দেওয়া হয়েছিলো, সবগুলো জব্দ করা হলো। এর আনুমানিক মূল্য ছিল দশ হাজার দিনার। কথিত আছে, এ কথা জানোতে পেরে মুফিক বললো, “তোমরা মিম্বরে আরোহণ করে ইবনে তুলুনকে অভিশাপ দাও।”

২৭০ হিজরিতে মুতামাদ সামরাহতে ফিরে আসেন। এ সময় তার সাথে সবসময় একদল সৈন্য থাকতো, যা দ্বারা মনে হতো তিনি পূর্ণ স্বাধীন। এ বছর ইবনে তুলুনের ইন্তেকাল হয়। মুফিক তদস্থলে নিজের ছেলে আবুল আব্বাসকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করে। আবুল আব্বাস একদল সৈন্যসহ মিসরে যায়। এদিকে খামারিয়া বিন আহমদ বিন তুলুন আগেই বাবার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এতে মিসরবাসীর ললাটে বিজয় চুম্বন করে। এ বছর বাগদাদে দজলা নদীর বাঁধ ফেটে যাওয়া বাগদাদ নগরী প্লাবিত হয়। এতে করে সাত হাজার ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়ে। এ বছর রোমানরা এক লাখ সৈন্য নিয়ে তরতুস আক্রমণ করে। এতে মুসলমানেরা জয়লাভ করে, এ যুদ্ধে প্রচুর গনিমত মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এ বছর আবদুল্লাহ বিন উবায়েদ নিজেকে ইমাম মাহদি বলে দাবী করে। সে এ আকিদার উপর অটল থেকে ২৭৮ হিজরিতে হাজ্জ পালন করতে গেলে কেনানা গোত্রের লোকেরা তার অনুসরণ করে।

সূলী বলেছেন, ২৭১ হিজরিতে হারুন বিন ইব্রাহীম আল হাশেমির নির্দেশে বাগদাদে শুধু পয়সার প্রচলন ঘটে। এ ব্যবস্থা কিছুদিন চালু থাকে।

২৭৮ হিজরিতে নীলনদ শুকিয়ে যাওয়ায় মিসরে দুর্ভিক্ষ হয়। এ বছর মুফিকের পরলোক গমনে মুতামাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস নসীব হয়। এ বছর কুফায় কারমাহ নামক একটি দলের আবির্ভাব ঘটে, এরা ছিল পথভ্রষ্ট ও ফাসিক। তারা ফরয গোসলকে নাজায়েয আর মদ পানকে জায়েয বলতো। তারা আযানের শব্দের মধ্যে এ শব্দটি বৃদ্ধি করেছিলো - ان محمد بن الحنفية رسول الله তারা বছরে দুদিনকে ফরয সাব্যস্ত করতো, বাইতুল মুকাদ্দিসে হাজ্জ করতো, আর তাকেই কেবলা বানিয়েছিলো। এভাবে তারা শরীয়তে অনেক জিনিসের কম- বেশী করে। তাদের মতবাদটি জাহেল, বর্বর ও অসভ্য লোকেরা গ্রহণ করে।

২৭৯ হিজরিতে আবু ফজল বিন মুফিকের প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্য আর নিজের দুর্বলতা ও অপারগতার কারন মুতামাদ নিজের ছেলেকে উত্তরাধিকার থেকে অপসারন করে আবুল ফজল বিন মুফিককে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন আর তাকে ‘মুতাযাদ’ উপাধি দেন। এ বছর মুতাযাদ মিথ্যা গল্প, নোবেল নাটক, দর্শন ও

যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাদি কেনার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এর কয়েক মাস পর ২৭৯ হিজরির রযব মাসের ১৯ তারিখ সোমবারে ২৩ বছর রাষ্ট্র পরিচালনার পর ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তাকে বিশ খাওয়ানো হয়। কারো মতে, রাতের আঁধারে তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।

মুতামাদের যুগে যে সকল ওলামায়ে কেরাম এ নশ্বর জগত ত্যাগ করেন তারা হলেন - ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা, রাবীহুল জায়যী, রাবীহুল মুরাদী, ইউসুফ বিন আবদুল আলী, যাবের বিন বাকার, আবুল ফজল আর রিয়াশী, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া যাহলী, হাজ্জাজ বিন শায়ের আজালী আল হাফেজ, কাযীউল কুযযাত ইবনে আবু শাওয়ায়িব সূসী আল মাকরী, উমর বিন শায়বা, আবু যরআ আর রাযী, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকাম, কাযী বাকার, দাউদ যাহেরী, ইবনে দারাহ, বাঁকা বিন মুখাল্লাদ, ইবনে কুতায়বা, আবু হাতিম আর রাযী প্রমুখ।

আল মুতাযদ বিল্লাহ

আল মুতাযদ বিল্লাহ আহমাদ আবুল আব্বাস বিন মুফিক তালহা বিন মুতাওয়াক্কিল বিন মুতাসিম বিন হারুন রশীদ ২৪২ হিজরির যিলকাদা মাসে, সুলীর মতে ২৪৩ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সাওয়াব বা হরজ বা যরার নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তার চাচা মুতামাদের পর ২৭৯ হিজরিতে তিনি খিলাফতের তখতে উপবেশন করেন।

বনু আব্বাসের খলীফাদের মধ্যে মুতাযদ সুদর্শন, সাহসী, নির্ভীক, জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান। বীরত্বের কারনে তিনি একাই বাঘের সাথ লড়াই করতেন, তিনি রেগে গেলে খুব কম ক্ষমা করতেন, অপরাধীদের জীবন্ত পুঁতে ফেলতেন। তিনি ছিলেন ঝানু রাজনীতিবিদ।

আবদুল্লাহ বিন হামদুন বলেছেনঃ একদিন মুতাযদ শিকার ধরতে যান, আমি সাথে ছিলাম। ক্ষীরা বা শশার ক্ষেত অতিক্রম করার সময় ক্ষেতের পাহারাদাররা ফরিয়াদ জানালো। মুতাযদ বললেন, "কি হয়েছে ?" তারা বললো, "তিনজন গোলাম এসে আমাদের ফসল নষ্ট করে দিয়েছে।" এরপর তিনি গোলামদের ডেকে এনে ক্ষেতের এক পাশে হত্যা করেন। কয়েক দিন পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্য করে বলো তো, লোকেরা কেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট না ?" আমি বললাম, "আপনি রক্ত পিপাসু তাই।" তিনি বললেন, "আল্লাহ'র কসম, আমি খিলাফতের তখতে উপবেশন করার পর থেকে কোনো দিন অবৈধ রক্তপাত করিনি।" আমি বললাম, "আহমাদ বিন তৈয়বকে কেন হত্যা করেছেন ?" তিনি বললেন, "সে আমাকে বক্রতার দিকে আহ্বান করতে চাইছিলো।" আমি বললাম, "সেই তিন গোলামকে কেন হত্যা করলেন ?" তিনি বললেন, "আল্লাহ'র কসম, অনুসন্ধান ছাড়া আমি তাদের হত্যা করিনি, তারা হত্যাকারী আর চোর ছিল।"

কাযী ইসমাইল বলেছেনঃ আমি মুতাযদের কাছে গিয়ে দেখলাম, তার পিছে কয়েকজন রোমান সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। চলে আসার পর তিনি বললেন, "কাযী সাহেব, খারাপ ধারণা করবেন না। আল্লাহ'র কসম, আমি আজ পর্যন্ত কখনোই হারাম কাজের জন্য কোমরের দড়ি খুলিনি।" একদিন আমি তার কাছে গেলাম। তিনি আমার দিকে এক টুকরো কাগজ নিক্ষেপ করলেন। এতে লিখা রয়েছে – "কিছু আলেম এক স্থানে একত্রিত হয়ে হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল ফতোয়া দিয়েছে। বাদশাহ'র অবর্তমানে তারা এর উপর আমল করবে।" আমি বললাম, "তারা বেদ্বীন।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তারা বেদ্বীন নাকি মিথ্যাবাদী ?" আমি বললাম, "যারা মদকে মুবাহ আর মুতাআকে মুবাহ মনে করে না, এবং যারা মুতাআকে মুবাহ আর গানকে মুবাহ বলে না, এরা কি পথভ্রষ্ট নয় ? আর যে ব্যক্তি আলিমদের ত্রুটি নিয়ে উপহাস করবে সে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠা পাবে না।" এ কথা শুনে মুতাযদ সঙ্গে সঙ্গে কাগজটি পুড়ে ফেলার নির্দেশ দেন।

মুতাযদ প্রতিটি রনাঙ্গনে অব্যর্থ ও সফল। লোকেরা তাকে ভয় পেতো। ফলে নতুন ফিতনা মাথাচাড়া দিতে পারতো না, বরং অনেক ফিতনা এমনিতেই প্রতিহত হয়। তিনি খারাজ হ্রাস আর শুল্ক মওকুফ করেন। তিনি সুশাসন ও ন্যায় বিচারের সুবাতাস বয়ে দেন। প্রজাদের উপর আরোপিত অত্যাচার বিদূরিত করেন। বনু

আব্বাসের খিলাফতের ভিত্তি অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। বনু আব্বাসের খিলাফতের ইমারতকে রক্ষা করায় তিনি দ্বিতীয় সাফফাহ নামে পরিচিত।

তিনি পথে ঘাটে গান-বাজনা, পথনাট্য করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তিনি লোকদের ঈদুল আযহার নামায পড়াতেন। তিনি প্রথম রাকআতে ছয় তাকবীর আর দ্বিতীয় রাকআতে এক তাকবীর বলতেন। তবে তিনি নিজে কোন খুৎবা পড়তেন না।

২৮০ হিজরিতে তিনি কায়রো যান আর আফ্রিকার গভর্নরের সাথে তার লড়াই হয়। এ বছর দেবল থেকে সূর্যগ্রহণের সংবাদ আসে। এ বছর শাওয়াল মাসে দেবলে সূর্যগ্রহণ লাগে, ফলে আসর পর্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, এরপর কালো আধার নেমে আসে, যা প্রথম রাত পর্যন্ত ছিল, এরপর ভুমিকম্প হয়। এতে শহরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। বিধ্বস্ত ভবনের নীচ থেকে আনুমানিক লক্ষাধিক বনী আদমকে উদ্ধার করা হয়।

২৮১ হিজরিতে রোমের মুকুরিয়া শহর বিজিত হয়। এ বছর রায় আর তবরিস্তানে পানির সংকট দেখা দেওয়ায় এক রিতল পানির মূল্য দাঁড়ায় এক দিরহাম, লোকেরা দুর্ভিক্ষের কারনে মৃত প্রাণী খেতে শুরু করে। এ বছর তিনি মক্কার দারন নাদওয়া ভেঙে মসজিদে হারামের পাশে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

২৮২ হিজরিতে মুতাযদ কাবীহার রেওয়াজগুলো নিষিদ্ধ করেন। নওরোজের দিন আগুন জ্বালানো আর লোকদের গায়ে পানি ছিটানোর প্রথা রহিত করেন। এটা ছিল অগ্নিপূজকদের রীতি। এ বছর তিনি কতর আল নাদা বিনতে খামারুয়া বিন আহমাদ বিন তুলুনকে বিয়ে করেন। সে রবিউল আউয়াল মাসেই পৃথক হয়ে যায়। বিয়ের সময় কতর আল নাদা পিতার বাসা থেকে চার হাজার কমরবন্দ আর দশ সিন্দুক ভর্তি মণিমুক্তা নিয়ে স্বামীর ঘরে আসেন।

২৮৩ হিজরিতে গরভের বাচ্চাকেও মিরাস প্রদানের নির্দেশ দেন। এ লক্ষ্যে পৃথক একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। এ আইনটি জনতার অভিনন্দন কুড়ায় আর তারা খলীফার জন্য দুয়া করে।

২৮৪ হিজরিতে মিসরে এক প্রকার গভীর লাল বর্ণের প্রকাশ ঘটে। এতে মানুষের চেহারা আর দেওয়ালগুলো পর্যন্ত লাল হয়ে যায়। ফলে তারা খুবই বিনয়ের সাথে এ থেকে পরিত্রাণের জন্য দুয়া করলে এ লাল বর্ণটি আসর থেকে রাত পর্যন্ত থাকে।

ইবনে জারির বলেছেন, ২৮৪ হিজরিতে মুতাযদ মিম্বরে দাঁড়িয়ে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর প্রতি অভিশাপ বর্ষণের জন্য ফরমান জারি করতে চাইলে তার উযীর উবাইদুল্লাহ বাধা দিয়ে বললেন, এতে মুসলিম মিল্লাতের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার হবে। কিন্তু সে তার কথা শুনলো না, আহকাম জারি করলো। হুকুমনামায় সে আলী (রাঃ) এর প্রশংসা আর মুয়াবিয়া (রাঃ) এর দোষত্রুটি বিধৃত করে। এটা দেখে কাযী ইউসুফ বললেন, "আমিরুল মুমিনীন, আপনার এ কাজে ফিতনা সৃষ্টির আশংকা আছে। আপনি এমনটা করবেন না।" সে বললো, "এর উপায় হিসেবে আমার কাছে তলোয়ার আছে।" কাযী সাহবে বললেন, "আর আপনি আলী পরিবারের জন্য কি

উপায় বের করবেন ? তাদের বিচরণ তো জ্ঞানের শেষ সীমানা পর্যন্ত। তারা যদি অধিকারের কথা শুনে লোকদের হাতে তলোয়ার তুলে দেয় ?" এ কথা শুনে সে তার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করলো।

২৮৫ হিজরিতে বসরায় এক প্রকার হলুদ বর্ণের অন্ধকার দেখা যায়। এরপর তা ক্রমান্বয়ে সবুজ আর কালো বর্ণ ধারণ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আকাশ থেকে দেড়শো দিরহাম ওজনের একটি চাদর পড়ে। প্রবল ঝরে পাঁচ শতাধিক বৃক্ষ উপড়ে যায়। তারপর আসমান থেকে সাদা-কালো পাথর বর্ষিত হয়।

২৮৬ হিজরিতে বাহরাইনে আবু সাইদের আবির্ভাব ঘটে, সে হাজরে আসওয়াদ উপড়ে ফেলে। খলীফার সৈন্যদের সাথে তার লড়াই হয়। তারা পরাজিত হলে সে বসরা আর এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো তার হস্তগত হয়।

আবুল হুসাইন আল খারীবী থেকে খতীব আর ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেনঃ একদিন মুতাযদ কাযি আবু হাযিমের কাছে বলে পাঠালেন, "অমুক ব্যক্তি আমার কাছ থেকে কর্জ নিয়েছে। আমি আপনার আদালতের মাধ্যমে আমার পাওনা ফিরে পেতে চাই।" কাযী সাহেব বলে পাঠালেন, "আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহ আপনার হায়াত দারাজ করুন। আপনার মনে আছে যে, আপনি আমার কাঁধে এ দায়িত্ব অর্পণের পর বলেছিলেন, আজ থেকে আদালতের এ কর্তব্য তোমার উপর বর্তাবে। অতএব সাক্ষী ছাড়া আপনার অভিযোগ কিভাবে বিশুদ্ধ হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে ?" তিনি জানিয়ে দিলেন যে, অমুক অমুক আমার সাক্ষী। কাযী সাহেব তাদের পাঠিয়ে দিতে বললেন। খলীফার সাক্ষীদ্বয় কাযীর সামনে এসে ভয়ে বিষয়টি অস্বীকার করলে কাযী সাহেব খলীফার অভিযোগ খারিজ করে দেন।

ইবনে হামদুন নাদিম বলেছেনঃ মুতাযদ তার খাস বাঁদি আর বিশেষ করে তার প্রিয়তমা দারিরাহকে নিয়ে উপসাগরে ষাট হাজার দিনার ব্যয়ে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু কিছুদিন পর দারিরাহ পরলোক গমন করায় তিনি দারুন ব্যথিত হোন।

২৮৯ হিজরিতে মুতাযদ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে রবিউল আখির মাসের ২২ তারিখ সোমবারে ইন্তেকাল করেন।

মাসউদী বলেছেনঃ মুমূর্ষু অবস্থায় একজন ডাক্তার এসে তার নাড়ীতে হাত দিলে তিনি জোরে লাথি দেন। এতে ডাক্তারের মৃত্যুর পরই তার মৃত্যু হয়।

মুতাযদ অনেক কবিতা জানোতেন। তিনি চার পুত্র আর এগারো জন কন্যা রেখে যান।

তার শাসনামলে যে সকল ওলামাগণ ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - ইবনুল মাওয়াযী আল মালেকী, ইবনে আবিদ দুনিয়া, কাযী ইসমাইল, হারেস বিন আবু উসামা, আবুল আইনা মুবাররদ, আবু সাইদ, কবি নাহতারী প্রমুখ।

আল মুকতাফী বিল্লাহ

আল মুকতাফী বিল্লাহ আবু মুহাম্মাদ আলী বিন মুতাযদ ২৬৪ হিজরির রবিউল আখির মাসের মাঝামাঝিতে জীজক নামের তুর্কি বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি দৃষ্টান্তহীন সুদর্শন ছিলেন। পিতা মুতাযদ এর খিলাফতকালেই তিনি উত্তরাধিকার মনোনীত হোন। পিতার অসুস্থতার সময় ২৮৯ হিজরির রবিউল আখির মাসের ১৯ তারিখ আসর নামাযের পর লোকেরা তার বাইয়াত করে।

সূলী বলেনঃ খলীফাদের মধ্যে তার নামটি আলী ছাড়া আর কারো ছিল না। ইমাম হাসান বিন আলী, হাদী আর মুকতাফী ছাড়া 'আবু মুহাম্মাদ' কারো কুনিয়ত ছিল না।

মুতাযদ এর মৃত্যুর সময় মুকতাফী রাকা শহরে অবস্থান করছিলেন। তার অনুপস্থিতিতে উযীর আবুল হাসান কাসিম বিন উবায়দুল্লাহ তার পক্ষ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তাকে খবর দেওয়া হলে তিনি জমাদিউল আখির মাসের ৭ তারিখ দজলা নদী দিয়ে জাহাজ যোগে বাগদাদ এসে পৌঁছান। তার আগমনে বাগদাদবাসী খুশী হয়ে তাকে স্বাগত জানায়। তিনি তখত নসীন হওয়ার পর তার পিতা লোকদের কাছ থেকে যেসব ঘরবাড়ি দখল করেছিলো, তিনি সেগুলো ভেঙে সে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন। যেসব বাগান আর দোকান নেওয়া হয়েছিলো, তিনি তা মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেন। এতে তিনি জনতার চোখে মহানুভবতায় পরিণত হোন। লোকেরা তার জন্য দুয়া করতে থাকে।

এ বছর বাগদাদে প্রচণ্ড ভুমিকম্প হয়, এর প্রকোপ কয়েক দিন পর্যন্ত থাকে। বসরায় তীব্র ঝড়ের কারনে অনেক বৃক্ষ উপড়ে পড়ে, যার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী ইতিহাসে বিরল। ইয়াহইয়া বিন যাকরুয়া কারমতীর সাথে শাহী সৈনিকদের দীর্ঘ যুদ্ধ হয়। অবশেষে ২৯০ হিজরিতে সে মারা গেলে সে স্থানে তার ভাই হুসাইন 'আমিরুল মুমিনীন মাহদি' উপাধি ধারণ করে নেতৃত্ব দেন। তার চেহারায় একটি দাগ ছিল। সেও ২৯১ হিজরিতে নিহত হয়। ২৯১ হিজরিতে ইনতালিয়া প্রচুর গনিমতের মালসহ বিজিত হয়।

২৯৩ হিজরিতে দজলা নদী ফুলে- ফেঁপে এমন তরঙ্গের সৃষ্টি করে, যার আকস্মিক আঘাতে বাগদাদের অধিকাংশ অংশ ধ্বসে পড়ে। সেদিন বাগদাদের রাজপথে ২১ হাত পানি জমা হয়।

সূলী বলেছেনঃ মুকতাফীর কাছ থেকে শুনেছি যে, তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় বলেন, "আল্লাহ'র কসম, আমি সেই সাতশো দিনারের জন্য দারুন ভীত – যা মুসলমানদের সম্পদ আমি ব্যয় করছি। আমার ভয় হচ্ছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ যেন এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না করেন। এ ভুলের জন্য আমি আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

তিনি ২৯৫ হিজরির যিলকাদা মাসের ২২ তারিখ রবিবার রাতে যুবক কালেই ইন্তেকাল করেন। আট ছেলে আর আট মেয়ে রেখে তিনি মারা যান।

তার যুগে যে সকল ওলামা মৃত্যুবরণ করেন তারা হলেন - আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল, ইমামুল আরাবী কানবাল মাকরী, মুফতী আবু আবদুল্লাহ বুসানজী, মুসনাদের লেখক বাযযার, আবু মসনদ আল-কুযী, কাযী আবু হাযিম, সালেহ জুযাহ, মুহাম্মাদ বিন নাসরুল মরুযী, আবু হুসাইন নুরী, আবু জাফর তিরমিযী প্রমুখ।

আবদুল গাফের কতৃক প্রণীত তারিখে নিশাপুর গ্রন্থে মুকতাফীর খিলাফতের তখতে উপবেশন সংক্রান্ত ইবনে আবিদ দুনিয়ার একটি রেওয়ায়েত আমি দেখেছি। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, ইবনে আবিদ দুনিয়া মুকতাফীর যুগে জীবিত ছিলেন।

আল মুকতাদার বিল্লাহ

২৮২ হিজরির রমযান মাসে গারীব নামের রোমান বা তুর্কি বাঁদির গর্ভে আল মুকতাদার বিল্লাহ আবুল ফজল জাফর বিন মুতাযদ জন্মগ্রহণ করেন।

অন্তিম শয্যায় মুকতাফীকে পরবর্তী খলীফা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে মুকতাদার সে সময় বালেগ হওয়ায় তিনি তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। মুকতাদার তের বছর বয়সে খিলাফতের তখতে সমাসীন। তিনিই বয়সের দিক দিয়ে সর্বকনিষ্ঠ খলীফা। উযীর আব্বাস বিন হাসান তাকে বাচ্চা ভেবে তার বাইয়াত থেকে সরে দাঁড়ানোর মতামত ব্যক্ত করলে লোকেরা সমর্থন জানিয়ে আবদুল্লাহ বিন মুতায - এর প্রস্তাব করে। জানোতে পেয়ে আবদুল্লাহ বিন মুতায বলল, রক্ত ঝরার আশংকা না থাকার শর্তে আমি খিলাফত গ্রহণ করবো। সংবাদ পেয়ে মুতাকাদ বিপুল পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে আব্দুল্লাহকে সন্তুষ্ট করায় আবদুল্লাহ খিলাফত প্রত্যাখ্যান করেন।

জনগন এ প্রক্রিয়া মেনে না নেওয়ায় ২৯২ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের বিশ তারিখে ফুটবল খেলারত অবস্থায় জনতা মুকতাদারের উপর আক্রমণ করে বসলে তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করেন। লোকেরা আবদুল্লাহ বিন মুতাযাদকে ডেকে আনলে সামরিক অফিসারগণ, বিচারকমন্ডলী, রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ আর শহরের অভিজাত শ্রেণীর নাগরিকেরা তার হাতে বাইয়াত করেন আর তাকে 'গালিব বিল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এরপর মুহাম্মাদ বিন দাউদ বিন জাররাহকে উযীর আর আবুল মুসনা আহমাদ বিন ইয়াকুবকে কাযি পদে নিয়োগ দিয়ে নতুন খলীফার নামে আহকাম জারি হতে থাকে।

মাআফী বিন যাকারিয়া জারীরী বলেছেন, মুকতাদারকে অপসারন করে ইবনে মুতাযের বাইয়াত গ্রহণের পর লোকেরা মুহাম্মাদ বিন জারীর তাবারীর কাছে এলে তিনি নতুন উযীর আর কাযীর নাম জানোতে চাইলেন। তারা বললো, "মুহাম্মাদ বিন দাউদ বিন জাররাহ হলে উযীর, আর আবুল মুসনা আহমাদ বিন ইয়াকুব হলেন কাযী।" তিনি বললেন, "এ কাজ পূর্ণতা পায়নি।" তার বললো, "আপনি কি এদের যোগ্য মনে করছেন না ?"

বাইয়াতের পর ইবনে মুতায মুকতাদারকে দারুল খুলাফা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে পাঠালে মুকতাদার বললেন, "বিনা চেষ্টায় কেন তা ছেড়ে দিবো ?" মুকতাদার তার পক্ষের কিছু লোককে অস্ত্রসজ্জিত করলেন। আল্লাহ তাআলা ইবনে মুতাযের বাহিনীতে ভীতি ছড়িয়ে দিলেন। ইবনে মুতায তার উযীর আর কাযীকে নিয়ে পালিয়ে গেলো। বাগদাদে কতলে আম (গণহত্যা) শুরু হলো। সেসব ফকীহ আর আমীরগণ মুকতাদারকে অপসারন করেছিলো, তাদের বন্দী করে ইউসুফের কাছে সোপর্দ করা হলে তিনি তাদের মধ্য থেকে চারজন বাদে যাদের মধ্যে কাযী আবু উমর ছিলো, সকলকে হত্যা করেন। ইবনে মুতাযকে বন্দী করে জিন্দানখানায় পাঠানো হয়। কয়েক দিন পর সে লাশ হয়ে বেরিয়ে আসে।

এরপর মুকতাদার আবুল হাসান আলী বিন মুহামাদ বিন ফরাতকে উযির নিয়োগ করেন। তিনি মাজলুমদের পাশে দাঁড়ান, ইনসাফের প্রসার ঘটান আর মুকতাদারকে ইনসাফ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। অল্প বয়স্ক হওয়ার কারনে মুকতাদার সাম্রাজ্যের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব আবুল হাসানের উপর অর্পণ করে তিনি খেলাধুলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এ বছর তিনি ইহুদী আর খ্রিষ্টানদের সেবা গ্রহণ না করার ফরমান জারি করেন। এ বছর পশ্চিমাঞ্চলে মাহদী নামক এক প্রতারকের আবির্ভাব ঘটে। সে ইমামত দখল করে আর খিলাফতের দাবী তোলে, লোকেরা তার সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে আর দূর-দুরান্ত থেকে জনতার ঢল এসে তার পতাকাতলে সমবেত হয়। ধীরে ধীরে পশ্চিমাঞ্চলীয় জনপদগুলো তার কব্জায় আসতে থাকে আর তার ভুখন্ডের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। সে ইমাম মাহদী হওয়ার ব্যাপারে দাবী করে। অবশেষে আফ্রিকার গভর্নর যিয়াদাতুল্লাহ বিন আগলিব পালিয়ে মিসর হয়ে ইরাক পাড়ি জমান। এরপর মুসলিম বিশ্বের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রশাসন বনু আব্বাসের হাত থেকে মাহদীর দখলে চলে যায়।

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এ ঘটনাটি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আর বনু আব্বাসের জন্য একটি মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ক্লান্তিকাল। এ হিসাব মোতাবেক বনু আব্বাসের সাম্রাজ্য মুসলিম বিশ্ব হিসেবে ১৬০ বছরের চেয়ে কিছু বেশী সময় তাদের হাতে পরিচালিত হয়ে আসে। এরপর মুসলিম জাহানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো তাদের হাতছাড়া হতে থাকে।

যাহাবী বলেছেন, “বয়সে ছোট হওয়ার কারনে মুকতাদার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অনেক ভুল ভ্রান্তির জন্ম দেন।”

৩০০ হিজরিতে দায়নুর শহরে একটি পাহাড় ধ্বসে পড়ে আর এর নীচ থেকে এতো পানি বের হয়, যা দ্বারা কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়। এ বছর মাদী খচ্চর পুরুষ খচ্চরে পরিণত হয়। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

৩০১ হিজরিতে আলী বিন ঈসাকে উযীর নিযুক্ত করা হয়। তিনি খুবই ঈমানদারী, ইনসাফ ও তাকওয়ার সাথে কাজ করতেন। তিনি মদপান নিষেধ করে আহকাম জারি করেন। তিনি শুল্কমুক্ত বাণিজ্যিক বাজার গড়ে তোলেন। এ বছর আবু উমরকে দ্বিতীয় বার কাযী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ বছর মুকতাদার সর্বপ্রথম ঘোড়ায় চড়ে নিজের প্রাসাদ থেকে শামাসীয়া শহরে যান আর জনতার সামনে নিজের আত্মপ্রকাশ ঘটান। এ বছর হুসাইন হাল্লাজ মারুফ মানসুর (মানসুর হাল্লাজ - অনুবাদক) উটের পিঠে চড়ে বাগদাদ আসে। সে ‘আনাল্লাহ’ (আমি আল্লাহ) বলে দাবী করতো। বাগদাদে এর প্রসার ঘটে। তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে জানা যায় - কুরআন, হাদিস আর ফিকহ সম্পর্কে তার কোন ধারনাই নেই। এ আকিদা বহনের জন্য তাকে বন্দী করা হয়। অবশেষে ৩০৯ হিজরিতে কাযী আবু উমরের ফতোয়া মোতাবেক তাকে শূলে চড়ানো হয়।

৩০১ হিজরিতে মাহদী চল্লিশ হাজার বারবার সৈন্য নিয়ে মিসর আক্রমণের জন্য যাত্রা করে। পথিমধ্যে নীল নদে প্রবল উত্তাল থাকার কারনে তারা ইসকান্দারিয়ায় ফিরে গিয়ে সেখানে ফিতনা ফাসাদের জন্ম দেয়।

তাদের প্রতিহত করার জন্য শাহী ফৌজ পাঠানো হয়। বরকা অঞ্চলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হলে শাহী বাহিনী পরাজিত হয় আর মাহ্দী ইসকান্দারিয়া ও ফিউম পদানত করে।

৩০২ হিজরিতে মুকতাদার তার পাঁচ পুত্রের খতনা করেন। এ বাবদ তিনি ছয় লাখ দিনার খরচ করেন। পুত্রদের সাথে তিনি অগণন ইয়াতিম শিশুর খতনা করার আর তাদের প্রতি অনেক করুণা করেন। এ বছর মুকতাদার সর্বপ্রথম মিসরের জামে মসজিদে জামায পড়ান।

৩০৪ হিজরিতে বাগদাদে যাবযাব নামক এক ভয়ংকর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে, সে রাতে দুই তলায় উঠে বাচ্চাদের খেয়ে ফেলতো আর নারীদের নিতম্বে আঘাত করতো। লোকেরা তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য থালাবাসন বাজাতো। এ ঘটনা অনেক দিন পর্যন্ত চলে।

৩০৫ হিজরিতে রোমান সাম্রাজ্য মুকতাদারের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে আর সন্ধি করার জন্য উপঢৌকনসহ কিছু লোক তার কাছে পাঠানো হয়। মুকতাদার রোমানদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য শামসীয়া তোরণ থেকে দারুল খুলাফা পর্যন্ত এক লাখ ষাট হাজার বর্ম পরিহিত সৈন্য দাড় করিয়ে দেন। তাদের পিছে ষাট হাজার সেবক আর সাতশো প্রহরী নিয়োগ করেন। দারুল খুলাফায় দেওয়ালগুলোতে গৌরচন্দ্রিকা খাতে আটচল্লিশ হাজার যবনিকা দিয়ে সুসজ্জিত করেন, বাইশ হাজার কার্পেট বিছিয়ে দেন, একশ শিকারী পাখি শিকলে বেঁধে নিজের সামনে রাখেন। এ বছর ওমানের বাদশাহ মুকতাদারের কাছে উপঢৌকন পাঠায়, এর মধ্যে ছিল কালো বর্ণের একটি পাখি – যে তোতা পাখি বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে পার্সি ও হিন্দি ভাষায় কথা বলতো।

৩০৬ হিজরিতে মুকতাদারের মা একটি চিকিৎসালয় গড়ে তুলেন, যার বার্ষিক খরচের পরিমাণ চার হাজার দিনার। এ বছর মুকতাদারের অবহেলার কারণে সাম্রাজ্যের সকল বন্দোবস্ত শাহী হারামের হাতে চলে যায়। মুকতাদারের মা প্রতি জুমআয় ইজলাসের আহবান করতে থাকেন। এতে কাযীগন আর রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিত হওয়ার ফরমান জারি করেন। এ বছর কাসিম মুহাম্মাদ বিন মাহদি মিসরের অধিকাংশ জনপদ দখল করে নেয়।

৩০৮ হিজরিতে বাগদাদে খাদ্যশস্যর দারুন সংকট দেখা দেয়। ফলে প্রজাবৃন্দ অভাব অনটনে নিপতিত হয়। কথিত আছে, বাগদাদে প্রশাসক হামিদ বিন আব্বাসের অত্যাচারে জনগন অস্থির হয়ে লুটপাট শুরু করলে লড়াই বেঁধে যায়। ক্ষিপ্ত জনতা জেলখানায় আগুন ধরিয়ে দিলে কয়েদীরা পালিয়ে যায়। সাম্রাজ্যের উযীরকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হয়। আব্বাসীয় সাম্রাজ্য গোলযোগ পূর্ণ হয়ে উঠলে বাগদাদ পর্যন্ত কোন শস্য পৌছাতো না। এ বছর আল কাসিম জাযীরা কাসসাত শহর দখল করে নিলে মিসরবাসী বিচলিত হয়ে উঠে। তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

৩১১ হিজরিতে তিনি এ আদেশ দেন যে, মুতাযদ এর ফরমান মোতাবেক গর্ভস্থ বাচ্চাকে অবশ্যই সন্তানের ভাগ দিতে হবে।

৩১২ হিজরিতে খোরাসানের আমীরের হাতে ফারগানা বিজিত হয়।

৩১৪ হিজরিতে রোম সাম্রাজ্যের মালতীয়া অঞ্চল তলোয়ার দ্বারা জয় হয়। এ বছর দজলা নদীর পানিতে মৌসুল শহর প্লাবিত হয়।

৩১৫ হিজরিতে রোমানরা দিময়াত শহরে লুটপাট করে আর জামে মসজিদে বাঁশি বাজায়। এ বছর দিলাম গোত্রের লোকেরা রায় ও জাবাল শহরে হামলা করে গভর্নরকে হত্যা আর বাচ্চাদেরকে যবেহ করে।

৩১৬ হিজরিতে কারমাতী দারুল হিজরত নামে একটি ভবন তৈরি করায় বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মুসলমানদের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে সে অনেক জনপদ দখল করে। তার সহচরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তার সৈন্যরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খিলাফতের ভিত্তি কেঁপে উঠে। মুকতাদার তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য কয়েবার সেনাবাহিনী পাঠান, কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। তাদের ভয়ে হাজ্জ বন্ধ হয়ে যায়, মক্কাবাসী মক্কা শরীফ ছেড়ে পালিয়ে যায়। রোমানরা খাল্লাত আক্রমণ করে সেখনাকার জামে মসজিদের মিম্বর বের করে সে স্থানে ক্রুশদণ্ড স্থাপন করে।

৩১৭ হিজরিতে মুনিস ভেবেছিলো, "মুকতাদার আমাকে বাদ দিয়ে হারুন বিন গারীবকে আমিরুল উমারা বানাতে চান", এ জন্য সে বিদ্রোহ করে। মুহাররম মাসে শুক্লা পক্ষে এশার পর সকল সৈন্য ও আমীরকে নিয়ে দারুল খুলাফা আক্রমণ করে। এ দৃশ্য দেখে মুকতাদারের প্রাণ উড়ে যায়। সে সময় তিনি নিজের মা, খালা আর স্ত্রীকে নিয়ে সরে পড়েন। তার ঘর থেকে ছয় লাখ দিনার লুট করে নেয়। লোকেরা তার অপসারণের উপর সাক্ষ্য দেয়। মুনিস আর আমীরগণ মুহাম্মাদ বিন মুতাযদকে 'আল কাহির বিল্লাহ' লকব দিয়ে তাকে বাইয়াত দেন। আবু আলী বিন মুকালার উপর উযীরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এটা ছিল জুমআর দিন। রবিবারে আল কাহির বিল্লাহ ইজলাস করেন। সোমবারে উযীর এ সংবাদ সকল রাজ্য প্রশাসকদের কাছে সরবরাহ করে। সেদিন সৈন্যরা তাদের বেতন-ভাতাদি প্রার্থনা করে। সে সময় মুনিস উপস্থিত ছিল না। ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সৈন্যরা দিরহানকে হত্যা করে, মুনিসের ভবনে হামলা চালায় আর মুকতাদারের অনুসন্ধান করে। অবশেষে তারা মুকতাদারকে কাঁধে করে দারুল খুলাফায় নিয়ে আসে আর আল কাহির বিল্লাহকে ধরে এনে তার সামনে পেশ করে। সে সময় আল কাহির কাঁদছিলেন, অন্তর আল্লাহ আল্লাহ করছিলো। মুকতাদার তাকে বললেন, "ভাই, ভয় পেয়ো না। তোমার কোন অপরাধ নেই। তুমি আমার কোন অসম্মান করোনি। আল্লাহ'র কসম, আমি আপনাদের কিছুই বলবো না।" এ ঘটনা দেখে লোকেরা নীরব নিস্তব্ধ হয়। আগের উযীরকেই আবার নিয়োগ করেন। রাজ্যগুলোতে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়। মুকতাদার খলীফার আসনেই অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি সৈন্যদের পুরস্কৃত করেন।

এ বছর মুকতাদার হাজীদের সাথে মানসুর দালমীকে পাঠান। যিনি হাজীদের নিরাপদে মক্কা শরীফে পৌঁছে দেন। ৮ই জিলহাজ্জ তারিখে আল্লাহ'র দুশমন আবু তাহির কায়মতী মক্কায় গিয়ে মসজিদে হারামের হাজীদের হত্যা করে আর লাশগুলো জমজম কূপে ফেলে দেয়। লৌহদণ্ডের আঘাতে হাজরে আসওয়াদ ভেঙে গুরিয়ে দেয় আর খানায়ে কাবার দেওয়াল থেকে তা পৃথক করে ফেলে। এগারো দিন পর্যন্ত হাজরে আসওয়াদ

এভাবেই পড়ে ছিল। এরপর সে তা নিয়ে চলে যায়। বিশ বছরের বেশী সময় পর্যন্ত সেটি তার কব্জায় ছিল। পঞ্চাশ হাজার দিনারের বিনিময়ে তা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা হলেও পরবর্তীতে সে তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে মতির খিলাফতকালে হাজরে আসওয়াদটি আনা হয়।

কথিত আছে, হাজরে আসওয়াদটি মক্কা শরীফ থেকে দারুল হিজরাতে নিয়ে যাওয়ার সময় যে উট একে বহন করেছে সে উটই মারা গেছে। এভাবে পথিমধ্যে চল্লিশটি উট মারা যায়। আর ফিরিয়ে আনার সময় হাজরে আসওয়াদ বহনকারী দুর্বল উটটি মোটাতাজা হয়ে যায়।

মুহাম্মাদ বিন রবী বিন সুলায়মান বলেছেন, কারামতের এ বছরে আমি মক্কা শরীফে ছিলাম। এক ব্যক্তি কাবা শরীফের সাদের নালা খুলে ফেলার জন্য সাদে উঠলে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। আমি দুয়া করলাম, "হে আল্লাহ, আপনি বড়ই সহনশীল। কিন্তু এ জুলুম আমার মোটেও সহ্য হয় না।" লোকটি সাথে সাথে সাদ থেকে পড়ে মারা গেলো।

কারমতী কাবার দরজায় উঠে এ কবিতাটি পাঠ করে - "আমি আল্লাহ'র সাথে রয়েছি। আল্লাহ'র কসম, আমিই সৃজনশীলতাকে সৃষ্টি করি আর ধ্বংস করি।" এরপর এ জালিম লোকটি বেশী দিন অবকাশ পায়নি, সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ বছর বাগদাদে একটি বড় ফিতনা সৃষ্টি হয় এ আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে -

عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

"অচিরেই তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিবেন।" (সূরাহ আল- ইসরা, ১৭ : ৭৯)

হানাবিলা সম্প্রদায়ের দাবী, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামকে আরশে পাকে সমাসীন করবেন। আর অপর পক্ষের বক্তব্য হলো, এর অর্থ এটা নয়। এ থেকে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শাফাআত উদ্দেশ্য। এ ফিতনায় অনেক লোক প্রাণ হারায়।

৩১৯ হিজরিতে কারমতী কুফায় এসে ধমক দিলে বাগদাদবাসী বাগদাদ দখলের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। লোকেরা এ থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে অত্যন্ত বিনয় জড়িত কান্নার সাথে প্রার্থনা করে। এ বছর দীলাম গোত্রের লোকেরা দিনুর অঞ্চল দখল করে সেখানকার অনেক লোককে বন্দী আর হত্যা করে।

৩২০ হিজরিতে মুনিস বারবার জাতি নিয়ে গঠিত এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মুকতাদারকে আক্রমণ করতে এলে তিনিও সসৈন্যে ময়দানে আসেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে এক বারবার ফৌজের বর্শার আঘাতে মুক্তাদার যমিনে পড়ে গেলে সে তার তলোয়ার দিয়ে খলীফার মাথা কেটে ফেলে। তার কাঁটা মাথা বর্শার আগায় গেঁথে তার উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় আর তার লাশটি উলঙ্গ করে দূরে ফেলে দেয়। লোকেরা খড়কুটো আর বর্জ্য দিয়ে তার লজ্জাস্থান ঢেকে দেয় আর সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। এটা ৩২০ হিজরির শাওয়াল মাসের ২৭ তারিখ সোমবারের ঘটনা।

মুকতাদার বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি শাহওয়াত আর শরাব থেকে অপারগ ছিলেন। তার সাথে অপচয় পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করতো। নারীরা তার উপর পেরেশান ছিল। তিনি তাদের মাঝে খিলাফতের সকল জওহর বিলিয়ে দেন। তিনি এতিমদের তিনগুন বেশী দান করতেন। অনন্য ও অদ্বিতীয় একটি জওহরের তাসবিহ তিনি এক দারোগাকে দান করেন। তার কাছে রোমান, সাকালাবী আর হাবশি গোলাম ছাড়াও এগারো হাজার হিজড়া গোলাম ছিল।

মুকতাদারের বারো পুত্রের মধ্যে রেজা, মুত্তাকী আর মতি - এই তিনজন খলীফা হোন। আবদুল মালিকের চার পুত্র খলীফা হয়েছিলেন, যার দৃষ্টান্ত বিরল। এটা যাহাবির অভিমত। তবে আমার (গ্রন্থকারের) মতে, আমার যুগ পর্যন্ত মুতাওয়াক্কিলের পাঁচ জন আওলাদ আল মুসতাইন আব্বাস, আল মুতাযদ দাউদ, মুসতাকফী সুলায়মান, আল কায়িম হামযা আর আল মুসতানজিদ ইউসুফ খলীফা হোন, যার উপমা নেই।

লতীফাহ লাতাইফুল মাআরিফ সাআলাবীর মধ্যে রয়েছে, মুতাওয়াক্কিল আর মুকতাদার ছাড়া কারো নাম জাফর ছিল না। উভয়ে নিহত হোন। মুতাওয়াক্কিল সোমবার আরতে আর মুকাতাদার সোমবার দিনে মারা যান।

তার শাসনামলে যে সকল ওলামায়ে কেরামগণ ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - মুহাম্মাদ বিন আবু দাউদ যাহির, কাযী ইউসুফ বিন ইয়াকুব, শাফেয়ী মাযহাবের শায়খ ইবনে শারীহ, যিনদ, দানশীল আবু উসমান জিরী, আবু বকর দাইযী, জাফর কারয়ানী, কবি ইবনে বাসাস, সুনানের লেখক নাসাঈ, সুনানের লেখক হাসান বিন সুফিয়ান, মুতাযালাদের শায়খ জায়া জায়ায়ী, নাহুদবি ইয়ামুত বিন মারযা, ইবনে জাল্লা, মুসনাদের লেখক আবুল আলী মৌসুলী, মিশরের সম্মানিত ক্বারি ইশনানীল মাকরী বিন ইউসুফ, মিসরের প্রখ্যাত ক্বারি ইবনে ইউসুফ, মুসনাদের লেখক আবু বকর রুয়ানী, ইমাম ইবনে মুনযির, ইবনে জারীর তাবারী, নাহুবিদ যিজাজ, ইবনে খুযাইমা, ইমাম যাকারিয়া তৈয়ব, বিনানুল জামাল, আবু বকর বিন আবু দাউদ সিজিস্তানি, নাহুবিদ ইবনে সারাজ, আবু আওয়ানা, মুসনাদের লেখক আবুল কাসিম বাগবী, আবু উবাইদা বিন হারবূয়া, মুতাযালাদের শায়খ কাবী, কাযী আবু উমর, কাদামা প্রমুখ।

আল কাহির বিল্লাহ

আল কাহির বিল্লাহ আবু মানসুর মুহাম্মাদ বিন মুতাযদ বিন তালহা বিন মুতাওয়াক্কিল 'ফিতনাহ' নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

মুকতাদার নিহত হওয়ার সময় লোকেরা তাকে আর মুহাম্মাদ বিন মুকতাফীকে নির্বাচন করে। তারা খিলাফত গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে ইবনে মুকতাফীর কাছে গেলে তিনি তা গ্রহনে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, "খিলাফতে আমার প্রয়োজন নেই, কারন আমার চাচা কাহির খিলাফতের বেশী হকদার।" কাহির খিলাফত গ্রহণ করলে বাইয়াত হয়ে যায়। ৩১৭ হিজরিতে তাকে আল- কাহির উপাধি দেওয়া হয়।

তিনি খিলাফতে আসীন হয়ে সর্বপ্রথম মুকতাদারের আওলাদদের উপর জরিমানা আরোপ করেন আর এতে তারা অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরিস্থিতি এমন হয় যে, মুকতাদারের মা ধুকেধুকে ইন্তেকাল করেন।

৩২১ হিজরিতে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে মুনিস আর ইবনে মুকালাহসহ কিছু লোক কাহিরকে খিলাফতচ্যুত করে ইবনে মুকতাফীকে তখতে বসানোর চেষ্টা চালায়। জানোতে পেয়ে কাহির একটি ফাঁদ পাতেন। তিনি তার বিরোধী সকলকে বন্দী করে হত্যা করেন আর ফৌজদের উপহার- উপঢৌকন দিয়ে হাত করে নেন। এভাবে তিনি প্রজাদের অন্তরে মর্যাদার আসন করে নেন। তিনি তার লকবের সাথে 'আল মুনতাকিম মিন আদায়াদ্বীনিল্লাহ' - এতটুকু বৃদ্ধি করেন।

এ বছর তিনি গায়িকা বাঁদিদের রাখা নিষিদ্ধ করেন। মদ দূরে ফেলে দেন, গায়কদের বন্দী করেন, হিজড়াদের নির্বাসনে পাঠান, খেলাধুলার সামগ্রী ভেঙে ফেলেন। যারা উত্তেজনাকর গান গাইতো আর যারা ঠাণ্ডা সঙ্গীত পরিবেশন করতো না, তাদের বিক্রি করে দেওয়ার নির্দেশ দেন, অথচ তিনি নিজেই অসম্ভব রকম জ্ঞান শুনতেন আর মদ পান করে বুদ হতে থাকতেন।

৩২২ হিজরিতে দায়লম আলী বিন বূয়ার সহযোগিতায় ইস্পাহানের উপর আক্রমণ চালায়। সে সম্পদের পাহাড় গড়েছিলো। খলীফার নায়েবের সাথে মিলে মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুবকে পরাজিত করে আর ইবনে বূয়া পারস্যের দিকে দৃষ্টি দেয়। তার পিতামাতা ছিল হতদরিদ্র, তারা মাছ শিকার করতো। একদিন সে স্বপ্নে দেখলো, তার পেশাবের রাস্তা দিয়ে এক খণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়ে পৃথিবী আলোকিত করে ফেলেছে। সে নিজেই এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলো এভাবে যে, তার আওলাদ বাদশাহ হবে, আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে ততদূর পর্যন্ত তার রাজ্যের সীমানা যুদ্ধের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হবে।

ইবনে বূয়া অনেক মাল জমা করে আর অধিকাংশ শহর তার পদানত হয়। খুরাসান আর পারস্য খিলাফত থেকে বেরিয়ে ইবনে বূয়ার অধীনে চলে যায়। এ বছর ইসহাক বিন ইসমাইলকে কাহির কুপের মধ্যে লটকিয়ে হত্যা করে। তার অপরাধ ছিল - সে খিলাফত লাভের আগে কাহিরের এক বাদিকে কাহিরেরে চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে কিনেছিলো।

এ বছর ইবনে মুকালা আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে এসে সেনাবাহিনীতে এ অপপ্রচার চালায় যে, সৈন্যদের বন্দী করে রাখার জন্য কাহির ভুগর্ভস্থ কক্ষ নির্মাণ করেছেন। এ কথা শুনে তারা কোষমুক্ত তলোয়ার নিয়ে কাহিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সে পালিয়ে যায় আর ৩২২ হিজরির হামাদিউল আখির মাসের ছয় তারিখে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের হাতে বন্দী হোন।

আব্বাস মুহাম্মাদ বিন মুকতাদারের কাছে জনগন বাইয়াত করে এবং 'আর রাযী বিল্লাহ' উপাধি দিয়ে তার উপর খিলাফত চাপিয়ে দেয়। এরপর লোকেরা উযীর, আবুল হাসান বিন কাযী আবু উমর, হাসান বিন আবদুল্লাহ বিন আবুল শাওয়ারিব, আবু তালিব বিন বহলুলকে কাহিরের কাছে পাঠায়। তারা তাকে বললো, "এখন আপনি কি করতে চান ?" তিনি বললেন, "তোমরা আমার কাছে বাইয়াত করেছো, আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট নই। তোমরা আমার আনুগত্য করবে আর অন্যদেরকেও আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করবে।" এর জবাবে উযীর কাহিরকে অপসারণের অভিমত ব্যক্তি করে চলে যায়।

কাযী আবুল হাসান বলেছেনঃ আমি রাযীর কাছে গিয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বললাম, "আমার দৃষ্টিতে তার আমানত ফরয।" রাযী বললেন, "তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।" আমি সেখান থেকে চলে আসার পর কাহিরের চোখে সীসা ঢেলে দেওয়া হয়, ফলে তিনি চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যান।

মাহমুদ ইস্পাহানী বলেছেনঃ দুশ্চরিত্র আর রক্ত ঝরানোর প্রতি অসম্ভব নেশার কারণে কাহিরকে অপসারন করা হয়। তিনি পদচ্যুত হতে অসম্মতি জানালে তার চোখ দুটো খুলে নেওয়া হয়।

সূলী বলেছেনঃ কাহির ছিল রক্ত পিপাসু, দুশ্চরিত্র, স্বতন্ত্র মেজাজের আর মদ্যপায়ী। প্রহরী পছন্দ না হলে তিনি তার বংশের পর বংশ হত্যা করতেন। তিনি বর্শা হাতে নিলে কাউকে না কাউকে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হতেন না।

আলী বিন মুহাম্মাদ খুরাসানী বলেছেনঃ একদিন আমি কাহিরের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে একান্তে ডেকে নিলেন। সে সময় তার সামনে বর্শা রাখা ছিল। তিনি আমাকে বনু আব্বাসের খলীফাদের বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করতে বললেন।

আমি বলতে লাগলাম - "সাফফাহ রক্ত পিপাসু ছিলেন। তার দেখাদেখি তার প্রশাসকবৃন্দও তার অনুসরণ করে। তবুও তিনি ছিলেন দানশীল।

মানসুর সর্বপ্রথম আব্বাস আর আবু তালিব উভয় বংশে অনৈক্যের জন্ম দেন, যা আগে ছিল না। তিনি কবিদের সভাসদের পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সর্বপ্রথম সুরিয়ানী আর অনারব ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি, যেমন - কালীলাহ, দিমনাহ, উকলীদস, গ্রীক দর্শনের বিপুল বই পুস্তক ইত্যাদি অনুবাদ করান। সেগুলোর প্রতি লোকদের আকর্ষণ প্রবল হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা প্রকৃত জ্ঞানচর্চা ছেড়ে দেয়। ফলে সে সময় মুসলিম উম্মাহ'র বুদ্ধিবৃত্তিক এ নাজুক মুহূর্তে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক মাগাযী আর সিরাতের গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। মানসুর প্রথম খলীফা, যিনি আরবে গোলামদের বিচারকদের পদে নিয়োগ করেন।

মাহ্দি খুবই ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও ইনসাফগার ছিলেন। তার বাবা যেটুকু আত্মসাদ করেছিলেন, তিনি তা লোকদের ফিরিয়ে দেন। হত্যাযজ্ঞ ঠেকাতে তিনি জীবনভর অসম্ভব রকম চেষ্টা করেছেন। তিনি মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী আর মসজিদে আকসার উন্নয়নমূলক কাজ করেন।

হাদী জালেম আর অহংকারী। তার কর্মকর্তারা তার দৃষ্টিভঙ্গির উপর কাজ করতো।

হারুন রশীদ জীবনের অধিকাংশ সময় হাজ্জ আর জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। তিনি মক্কা যাবার পথে বিশ্রামাগার আর পানির বড় বড় হাউজ নির্মাণ করেন। আযনা, তারতুস, মাসীসা, মারআশ প্রভৃতি জনপদ আবাদ করেন। তিনি জনসাধারণের প্রতি অনেক ইহসান করেন। তার যুগে মক্কাবাসী উরুজ করতো। তিনি প্রথম খলীফা, যিনি বনু আব্বাসের খলীফাদের মধ্যে সর্বপ্রথম দাবা ও তাস খেলেন।

আমীন বড়ই উদার ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তবে তিনি স্বাদে- গন্ধে লিপ্ত হওয়ায় ফিতনা ফাসাদে জড়িয়ে পড়েন।

মামুন জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনে প্রভাবিত হোন। তিনি ছিলেন দয়ার্দ্র, উদার ও ধৈর্যশীল। মুতাসিম মামুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন। তবে অনারব বাদশাহদের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক ছিল। তিনি অনেক যুদ্ধ করেন আর অনেক বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

ওয়াসেক বাবার অনুসরণে চলেন।

মুতাওয়াক্কিল ছিলেন মামুন আর মুতাসিমের বিপরীত, এমনকি আকিদাগত দিক থেকেও। তিনি মুনাযারা (বিতর্ক) বন্ধ করে দেন, অপরাধীদের শাস্তি নির্ধারণ করেন। হাদিস পঠন আর শ্রবণের নির্দেশ দেন। খলকে কুরআনের বিরোধীতা করেন।”

এরপর আমি অবশিষ্ট খলীফাদের বিবরণ পেশ করলাম। তিনি বললেন, “তুমি বাস্তব ও স্বচ্ছ বর্ণনা বিধৃত করেছো।”

মাসউদী বলেছেনঃ মুনিসের অনেক সম্পদ কাহির ছিনিয়ে নিয়েছিলো। খিলাফত থেকে অপসারিত হওয়ার পর অন্ধ হয়ে গেলে জনগন তাদের হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার চাপ দিলে তিনি তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তারা বিভিন্নভাবে তাকে কষ্ট দিতে থাকে। অবশেষে রাযী বিল্লাহ তাকে ডেকে এনে বলেন, “আজ আমজনতা নিজেদের অর্থ- সম্পদ ফিরে পেতে চায়। আমার কাছে এমন কোন ভাণ্ডার নেই, যা দিয়ে তাদের দাবী মেটাতে পারবো। ভালো হবে যদি তুমি বলে দাও যে, সেই ধনরাজ কোথায় গোপন করে রেখেছো।” কাহির বললেন, “বাগানে পুঁতে রেখেছি, (কাহির শখ করে বাগানটি লাগিয়েছিলেন। এতে ছিল বারোটি নদী আর প্রাসাদসমূহ) বাগান খনন করলে পাবে।” রাযী এ বাগানের সৌন্দর্যে বিমোহিত ছিলেন। তিনি বাগান খনন করতে চাইছিলেন না। ফলে রাযী বললেন, “একটি নির্দিষ্ট স্থানের কথা বলো।” কাহির বললেন, “আমি অন্ধ, নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে দিতে পারবো না। তবে কয়েক জায়গায় খনন করো, ধনরাজির সন্ধান পাবে।” রাযী বাধ্য হয়ে খনন কাজ শুরু করে। প্রাসাদের ভিত্তিমূলে খনন করা হয়, বৃক্ষ নিধন হয়, কিন্তু

ধন-সম্পদের কোন হদিস মিললো না। আবার কাহিরকে বলা হলো, "সর্বশেষ সম্পদ তুমি কোথায় রেখেছো?" কাহির বললেন, "আমার কাছে মূলত কোন সম্পদই নেই। এ বাগানে তুমি সুখের জীবন অতিবাহিত করবে, আর আমি দেখবো, তা যেন না হয় সে জন্য বাহানা করে বাগানের লাবণ্য বিনষ্ট করেছি।" এ কথা শুনে রাযী ভীষণ লজ্জা পেয়ে চলে যান আর ৩৩৩ হিজরিতে তাকে বন্দী করা হয়। এরপর তাকে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়।

কাহির ৩৩৯ হিজরির জামাদিউল আউয়াল মাসের শেষের দিকে ৫৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি আব্দুস সামাদ, আবুল কাসিম, আবুল ফজল আর আবদুল আযীয নামের চার পুত্রের জনক।

হানাফী মাযহাবের শায়খ ইমাম তহাবী, ইবনে দরীদ, আবু হাশিম বিন হায়া প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম তার যুগে ইন্তেকাল করেন।

আর রাযী বিল্লাহ

আর রাযী বিল্লাহ আব্বাস মুহাম্মাদ বিন মুকতাদর মুতাযদ বিন তালহা বিন মুতাওয়াক্কিল ২৯৭ হিজরিতে জুলুম নামক এক রোমান বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

কাহিরকে অপসারণ করার পর তিনি তখতে উপবেশন করেন। মসনদে আরোহণের পর তিনি ইবনে মুকালাকে নির্দেশ দেন যে, কাহিরের ভুলক্রটিগুলো পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করে মানুষদের তা শুনিয়ে দাও।

৩২২ হিজরিতে মুরওয়াদিজের সিপাহসালার দীলম ইস্পাহানে মারা যায়। তার রাজ্যের সীমানা এতোই সম্প্রসারিত হয়েছিলো যে, লোকেরা বলতো, দীলম বাগদাদ আক্রমণের ইচ্ছা করছে। দীলম বলতো, আরব সাম্রাজ্য ভেঙে আজমী সাম্রাজ্যে গড়ে তোলাই আমার লক্ষ্য।

এ বছর আলি বিন বূয়া রাযীর কাছে বলে পাঠালো যে, যে শহরগুলো আমার করতলগত, সেগুলোর জন্য বার্ষিক এক কোটি দিরহাম কর আমাকে দিতে হবে। রাযী সাথে সাথে তা পাঠিয়ে দিলে ইবনে বূয়া সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রজাদের উপর বল প্রয়োগ করা ছেড়ে দেয়।

এ বছর মাহদীর দাবীদার পশ্চিমাঞ্চলে পচিশ বছর রাজত্ব করার পর মারা যায়। সে মিসরের ফাতেমী খলীফাদের একজন। কথিত আছে, সে হযরত আলীর উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত। সে ইমাম মাহদীর দাবী করে বলতো, আমি আলীর বংশধর। মূলত তার দাদা অগ্নিপূজক ছিল।

কাযী আবু বকর বাকলানী বলেছেনঃ মাহদী দাবীদার লোকটির লকব ছিল উবায়দুল্লাহ, তার দাদা অগ্নিপূজক। সে পশ্চিমাঞ্চলে এসে মাহদির দাবী করে বলে, আমি হযরত আলীর বংশধর। কিন্তু কোন আলেম তার দাবির সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করেননি। বস্তুত সে ছিল গোপন শয়তান। ইসলামকে মিতিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। তার আওলাদেরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তারা মদ ও যিনাকে বৈধ ঘোষণা করে। রাফেযী সম্প্রদায়ের মতকে তারা প্রাধান্য দিতো। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র আল কায়িম বি আমরিল্লাহ আবুল কাসিম মুহাম্মাদ তার সাথে স্থলাভিষিক্ত হয়।

এ বছর মুহাম্মাদ বিন আলী নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করে। সে মৃতকে জীবিত করার কথা বলে। তাকে হত্যা করে তার লাশ শূলে উঠানো হয়। তার সাথে তার সহচরদেরও হত্যা করা হয়। এ বছর জাফর শাজারী নামের এক প্রহরী ১৪০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে। জীবিত থাকাকালে তার পূর্ণ জ্ঞান ছিল। এ বছর থেকে ৩২৭ হিজরি পর্যন্ত বাগদাদের অধিবাসীদের হাজ্জ পালন বন্ধ হয়ে যায়।

৩২৩ হিজরিতে রাযী শাসনভার নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হোন। তার দুই ছেলে আবুল ফযল আর আবু জাফর পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এ বছর জামাদিউল আউয়াল মাসে এক প্রকার

বিশেষ অন্ধকার গোটা পৃথিবীকে গিলে ফেলে, এটি আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিলো। এ বছর যিলকাদা মাসের সকল রাতে আকাশের বড় বড় নক্ষত্রগুলো ভেঙে ভেঙে পড়তে থাকে।

৩২৪ হিজরিতে মুহাম্মাদ বিন আমির রায়েক ওয়াসেত আর এর পার্শ্ববর্তী শহরগুলো দখল করে নেয়। শয়রগুলতে মুহাম্মাদের ফরমান জারি হয়, উযীরগণকে বরখাস্ত করা হয়। রাজ্যের সকল মাল তার কাছে এসে জমা হতে থাকে, বায়তুল মাল শূন্য হয়ে পড়ে। রাযী খেলার তাসে পরিণত হোন। নামমাত্র খিলাফত তার হাতে থাকে।

২২৫ হিজরিতে মুসলিম সাম্রাজ্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রথমে বিদ্রোহীরা শহর দখল করে, এরপর প্রশাসকবৃন্দ। অধিকৃত শহর, নগর আর জনপদ থেকে কেন্দ্রীয় কশাগারে খারাজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। চারিদিকে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদ ও এর পার্শ্ববর্তী জনপদ ছাড়া রাযির হাতে আর কিছুই রইলো না। এরপরও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাযীর হাতে ছিল না, ছিল ইবনে রায়েকের ইখতিয়ারে। এ সময় খিলাফত নামসর্বস্ব হয়ে পড়ে। এতে দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ঘটে। আব্বাসীয় রাজত্ব নামেমাত্র দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে উমাইয়া বংশীয় স্পেনের বাদশাহ আমীর আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদের সাহস বেড়ে যায়। তিনি নিজের নামের সাথে আমিরুল মুমিনীন নাসিরুদ্দীনীল্লাহ উপাধি লাগিয়ে দাবী করেন, আমিই খিলাফতের বেশী হকদার। স্পেনের অধিকাংশ তার পদানত ছিল। তিনি সাহসী, জিহাদ প্রিয় মুজাহিদ আর স্বচ্ছ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি মুতাগাল্লেবীনদের শিকড় উপড়ে ফেলেন আর সত্তরটি দুর্গ জয় করেন।

এটি ছিল দারুন বিস্ময়ের যুগ। পৃথিবীতে মুসলিম দুনিয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তিন ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীন দাবী করে তিনজনই খিলাফতের দাবী করেন। রাযী বাগদাদে, আমীর আব্দুর রহমান স্পেনে আর মাহদী কায়রোয়ানে।

৩২৬ হিজরিতে বুহকিম আলী বিন রায়েককে আক্রমণ করে। আলী আত্মগোপন করে। বুহকিম বাগদাদে প্রবেশ করলে রাযী তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তাকে আমীরুল উমারা খিতাব দেন। অনেক সম্মান আর মর্যাদা প্রদানের পর তাকে বাগদাদ আর খুরাসানের আমীর নিযুক্ত করেন।

৩২৭ হিজরিতে আবু আলী উমর বিন ইয়াহইয়া তার বন্ধু কারমাতীকে এ মর্মে পত্র লিখলো যে, "জনপ্রতি পাঁচ দিনার আদায়সাপেক্ষে হাজীদের রাস্তা খুলে দাও আর হাজ্জ করার অনুমতি দাও।" সে অনুমতি দিলো, লোকেরা হাজ্জ আদায় করতে লাগলো। এটাই প্রথম বছর, সে বছর হাজীদের থেকে ট্যাক্স আদায় করা হয়।

৩২৮ হিজরিতে দজলা নদীর পানি ফুলে ১৯ হাত খাড়া হয়ে যায়। এতে গোটা বাগদাদ প্লাবিত হয়, মানুষ আর প্রাণীকুল ডুবে যায়, ভবনগুলো ভেঙে পড়ে।

৩২৯ হিজরিতে রাযী অসুস্থ হয়ে পড়লে রবিউল আউয়াল মাসে ৩১ বহচর ৬ মাস বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি দানশীল, জ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি, বাগ্মী আর ওলামা- মাশায়েখপ্রিয় ছিলেন। বাগবীর কাছে তিনি হাদিস শরীফ শুনতেন।

খতীব বলেছেনঃ রাযীর অনেক ফাযাইল আছে। তিনিই সর্বশেষ খলীফা - যার কবিতাগুলো প্রেমের রসে সিক্ত, যিনি সেনাবাহিনীর ভাতা নির্ধারণের রীতিনীতি প্রণয়ন করেন, যিনি জুমার খুৎবা পাঠ করেন, যিনি সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ সভায় বসতেন, যিনি পূর্ববর্তী খলীফাদের রীতি অনুযায়ী উপঢৌকন প্রদান করতেন, যিনি সময় অনুপাতে নিজের পোশাক নির্ধারণ করেন।

আবুল হাসান ইবনে জারকাবী বর্ণনা করেছেনঃ ঈদের রাতে ইসমাইল খাতবী রাযীর কাছে গেলে রাযী তাকে বললেন, "আমি আগামীকাল ঈদের নামায পড়াবো, নামাযের পর কোন দুয়াটি করবো ?" ইসমাইল বললেন - আমিরুল মুমিনীন, কুরআন শরীফে এ দুয়ার কথা উল্লেখ আছে -

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ

"...... হে আমার রব, আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে আর আমার পিতামাতাকে দান করেছেন ......" (সুরাহ আন- নামল, ২৭ : ১৯; সূরাহ আল- আহ্কাফ, ৪৬ : ১৫)

এ দুয়াটি পড়বেন। রাযী বললেন, "তুমি সত্যিই বলেছো। এ দুয়াটি আমার খুবই প্রিয়।" এরপর চারশো দিনার আর একটি গোলাম তাকে উপহার দিলেন।

তার খিলাফতকালে যে সকল ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - তাফতুয়া, ইবনে মুজাহিদ, আল মাকরী বিন কাস হানাফী, 'আল আকদ' এর লেখক ইবনে আবদ, শাফেঈ মাযহাবের শায়েখ ইসতাখরী, ইবনে মানবুয আবু বকর প্রমুখ।

আল মুত্তাকী লিল্লাহ

আল মুত্তাকীলিল্লাহ আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন মুকতাদার বিন মুতাযদ বিন মুফিক তালহা বিন মুতাওয়াক্কিল তার ভাই রাযীর মৃত্যুর পর খিলাফতের তখতে আসীন হোন। সে সময় তা বয়স ৩৪ বছর। তার মায়ের নাম খুলুব, ভিন্ন মতে যহরা। তার মা বাঁদি ছিলেন। তিনি কথার খেলাফ করতেন না, বাঁদি ব্যবহার করতেন না। অনেক রোযা রাখতেন আর ইবাদাত করতেন। তিনি কখনোই শরাব স্পর্শ করেননি। তিনি বলতেন, কুরআন ছাড়া কোন ঐশী গ্রন্থ আমার প্রয়োজন নেই।

মুসলিম বিশ্বের রাজনীতি নিয়ে পূর্ব থেকে তিনি জড়িত থাকায় রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব ছিল আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন আলী আল কুফীর উপর। এ ক্ষেত্রে তিনি হলেন নামসর্বস্ব। তিনি যে বছর মসনদে আরোহণ করেন, সে বছর মদিনা শরীফের সবুজ গম্বুজ ভারী বর্ষণ আর বজ্রপাতের আওয়াজে ভেঙে যায়। এ গম্বুজকে বাগদাদের মুকুট মনে করা হতো। মূলত এটি খলীফা মানসুর নির্মাণ করেন। এ জন্য বনু আব্বাসের খলীফাদের কাছে এর একটি আলাদা গুরুত্ব ছিল। এ গম্বুজের উচ্চতা ৮০ গজ আর নিম্নাংশের দৈর্ঘ্যতা ২০ গজ। গম্বুজের উপরাংশে বর্শা হাতে এক অশ্বারোহীর ছবি অংকিত ছিল। এ ছবির বৈশিষ্ট্য হল, যে দিক থেকে শত্রুরা আক্রমণের জন্য আসতো, এ ছবির মুখ এমনিতেই সে দিকে ঘুরে যেতো।

এ বছর বুহকিম তুর্কি নিহত হওয়ায় তার স্থানে কুর্তগীনকে আমিরুল উমারা নিয়োগ করা হয়। মুত্তাকী বুহকিমের যে সম্পদ বাগদাদে ছিল, তা ক্রোক করে নেন। এর মূল্য দুই লাখ দিনারের বেশী।

এ বছর ইবনে রায়েক আক্রমণ করে। কুর্তগীন প্রতিহত করতে গিয়ে পরাজিত হয়ে লজ্জায় আত্মগোপন করলে ইবনে রায়েক তার সাথে আমিরুল উমারা হয়ে যায়।

৩৩০ হিজরিতে বাগদাদে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এক বস্তা গমের মূল্য দাঁড়ায় ৩১৬ দিনার। এ দুর্ভিক্ষে লোকেরা মৃত প্রাণী খায়। এর আগে বাগদাদে এমন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব কখনোই হয়নি।

এ বছর আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ ইয়াযিদী হামলার মোকাবিলা করতে গিয়ে খলীফা মুত্তাকী আর ইবনে রায়েক পরাজিত হয়ে মৌসুলে চলে যান। ফলে বাগদাদ আর দারুল খুলাফা লুণ্ঠিত হয়। খলীফা তাক্রীয়ত শহর পৌঁছুলে সেখানে সাইফুদ্দৌলা আবুল হাসান আলী বিন আবদুল্লাহ বিন হামদান আর তার ভাই হাসানের সাথে সাক্ষাৎ হয়। ইবনে রায়েককে ধোঁকায় ফেলে হত্যা করা হয়। তার জায়গায় খলীফা হাসান বিন হামদানকে নাসিরুদ্দৌলা উপাধি দিয়ে সাইফুদ্দৌলা আর নাসিরুদ্দৌলা দুই ভাইকে নিয়ে খলীফা বাগদাদে রওনা করেন। খবর পেয়ে ইয়াযিদী ওসেত শহরে পালিয়ে যায়।

যিলকাদা মাসে ইয়াযিদী কর্তৃক বাগদাদ আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে জনগণের মাঝে ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বাগদাদের অভিজাত লোকেরা চারিদিকে পালিয়ে যায়। খলীফা নাসিরুদ্দৌলাকে নিয়ে বাগদাদ থেকে বের হোন। ওদিকে সাইফুদ্দৌলা মাদায়েনের কাছে ইয়াযিদীর মোকাবেলা করেন। তীব্র লড়াই

হয়। অবশেষে ইয়াযিদী পরাজিত হয়ে ওসেতে পালিয়ে যায়। সাইফুদ্দৌলা সেখান থেকেও তাকে বিতাড়িত করলে সে বসরায় গিয়ে অবস্থান করে।

৩৩১ হিজরিতে রোমানরা আরযান শহরে চড়াও হয়ে সেখানে গণহত্যা চালায়। আরযানের গির্জায় একটি রুমাল ছিল। এ রুমাল সম্পর্কে খ্রিস্টানদের আকিদা ছিল, ঈসা (আঃ) এ রুমাল দিয়ে নিজের পবিত্র চেহারা মুছেছিলেন। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ শর্তে রুমালটি হস্তান্তর করা হয় যে, তারা সকল বন্দীকে মুক্তি দিবে।

এ বছর ওসেত- এ উমারা সাইফুদ্দৌলার উপর আক্রমণ চালায়। সাইফুদ্দৌলা প্রথমে বরীদ অঞ্চলে পালিয়ে যায়, এরপর বাগদাদে ফেরার ইচ্ছা করে। ভাইয়ের পলায়নে আতঙ্কিত হয়ে নাসিরদ্দৌলা মৌসুলে চলে যায়। ওদিকে তওযুন ওয়াসেতা থেকে বাগদাদে এলে সাইফুদ্দৌলা মউসুলে চলে যায়। তওযুন রমযান মাসে বাগদাদ আসে। মুত্তাকী তাকে আমিরুল উমারা খেতাব দেয়। কিছুদিন পর উভয়ের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় তওযুন আবু জাফর বিন শিরযাদকে বাগদাদে ডেকে পাঠায়। সে ওয়াসেতা থেকে বাগদাদে পৌঁছুলে তারা দুইজন মিলে বাগদাদ পদানত করে। মুত্তাকী ইবনে হামদানের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখলে সে এক সুবিশাল বাহিনী নিয়ে এসে পড়ায় ইবনে শিরযাদ ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। মুত্তাকী পরিবারসহ তাকরীয়ত অঞ্চলে চলে যান। নাসিরুদ্দৌলা আরবী আর কুর্দিদের নিয়ে গঠিত সুশিক্ষিত এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তরযুনের মোকাবেলায় রওয়ানা দেয়। আকবারা নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। ইবনে হামদুন প্রতিহত করতে না পেরে খলিফাকে নিয়ে মৌসুলে চলে যায়। পথিমধ্যে তওযুন আবার আক্রমণ করে। নাসীবীনদের কাছে তারা পরাজিত হয়। খলীফা অপারগ হয়ে মিসরের আমীর আখশাদের সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখায় বনু হামদুন রেগে যায়। অবশেষে খলীফা তওযুনকে সন্ধি করার প্রস্তাব দিলে সে তা গ্রহণ করে আর সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়।

একদিকে সন্ধির প্রক্রিয়া চলছে, অন্যদিকে মিসরের আমীর আখশাদ খলীফা নিজের সাহায্যার্থে যাকে আহবান করেছিলেন, তিনি মিসর থেকে আসার পথেই সন্ধির কথা জানোতে পারেন। অবশেষে তিনি রুকায় এসে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, “আমিরুল মুমিনীন, আমি আপনার গোলাম আর গোলামের পুত্র গোলাম, এ সন্ধি পরিত্যাজ্য, মর্মান্তিক ও বিশ্বাসঘাতকতার নমুনা হিসেবে সাক্ষরিত হয়ে চলেছে। আপনি আমার সাথে মিসরে চলুন, আপনার মঙ্গল হবে। আপনি সেখানে নিশ্চিন্ত মনে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।” কিন্তু তিনি শুনলেন না। আখশাদ মিসরে ফিরে গেলেন।

৩৩৩ হিজরির মুহাররম মাসের ৪ তারিখে মুত্তাকী রুকা থেকে বাগদাদে উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তওযুন খলিফাকে সাগত জানাতে বাইরে আসে। আনবার ও হাইয়াব - মধ্যবর্তী স্থানে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তওযুন ঘোড়া থেকে নেমে মাটি চুম্বন করে খলীফার বাহনের রেকাব নিজ হাতে নিয়ে চলতে থাকে। মুত্তাকী বারবার তাকে ঘোড়ায় চড়ার কথা বললেও সে তা মানলো না। এভাবে সে খলীফার জন্য স্থাপিত শিবির পর্যন্ত এলো। মুত্তাকী সেখানে আরাম করে বসলেন। তওযুন খলীফা আর ইবনে মুকালা - সে খলিফার সাথে ছিল,

দুইজনকেই সে বন্দী করে খলীফার চোখ দুটো উপড়ে ফেলে তাকে বাগদাদে পৌঁছে দেয়। সেখানে তার আংটি, চাদর আর লাঠি ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

এরপর তওযুন বাগদাদে এসে আবদুল্লাহ বিন মুকতাফীর কাছে খিলাফতের বাইয়াত করে আর তাকে মুসতাকফী বিল্লাহ লকব দেওয়া হয়। মুত্তাকী নিজেও ক্ষতবিক্ষত হয়ে তাকে বাইয়াত দেয়। এটি ৩৩৩ হিজরির মুহাররম মাসের বিশ তারিখে, ভিন্ন মতে সফর মাসের ঘটনা।

কাহির এ সংবাদ শুনে খুশী হয়ে এ কবিতাটি পাঠ করেন - “আমি আর ইব্রাহীম দুজনে অন্ধ আর বৃদ্ধ, দুই বৃদ্ধের জন্য একাকীত্বই শ্রেয়। তাওযুনের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত আর সর্বদা সেনাপতিত্ব তার আনুগত্য করবে। আমরা দুজনে অন্ধ হয়েছি, আমাদের সাথে তৃতীয় জনের প্রয়োজন।” কিছুদিন পর মুসতাকফীও তাদের অন্তর্ভুক্ত হোন।

এরপর এক বছর না যেতেই তাওযুন ইন্তেকাল করে। সনদপার নিকটবর্তী এক দ্বীপে মুত্তাকীকে বন্দী রেখে ২৫ বছর পর ৩৫৭ হিজরির শাবান মাসে তিনি মুক্তি পান।

হামদী বিখ্যাত এক চোরের নাম। ইবনে শিরযাদ বাগদাদ দখলের পর সে হামদী চোরের সম্পদের উপর মাসিক পঁচিশ হাজার দিনার কর দন্ড আরোপ করে। এ লোকটি জ্যোৎস্না রাতে মশাল হাতে নির্দ্বিধায় মানুষের ঘরে প্রবেশ করে চুরিত করতো। ৩৩৩ হিজরিতে দায়লামী বাগদাদেড় দারোগা থাকা অবস্থায় সে তাকে ধরে এনে বেত্রাঘাত করে।

মুত্তাকীর যুগে যে সকল ওলামাগণ ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - আবু ইয়াকুব নহরযুরী, খলীফা জুনাইদ বাগদাদী, কাযী আবদুল্লাহ মুহামলী, আবু বকর ফরগানী, হাফেজ আবুল আব্বাস বিন উকাদাহ, ইবনে ওলাদ প্রমুখ।

আল মুসতাকফী বিল্লাহ

আল মুসতাকফী বিল্লাহ আবদুল কাসিম আবদুল্লাহ বিন মুকতাফী বিন মুতাযদ 'ইমলাহুননাস' নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

মুত্তাকী অপসারিত হওয়ার পর ৩৩৩ হিজরির সফর মাসে ৪১ বছর বয়সে তিনি খিলাফত লাভ করেন। এ বছরেই তাওযুন ইন্তেকাল করলে তারই সহচর আবু জাফর বিন শিরযাদের মধ্যে সাম্রাজ্য দখলের লোভ সৃষ্টি হয়। এ লক্ষ্যে সে ফৌজদের প্রতিশ্রুতিও গ্রহণ করে। খলীফা তাকে খিলআত প্রদান করেন। এরপর আহমাদ বিন বূয়া বাগদাদে এলে ইবনে শিরযাদ আত্মগোপন করে। ইবনে বূয়া বিনা বাধায় দারুল খুলাফায় প্রবেশ করে খলীফার সামনে গিয়ে বসে পড়ে। খলীফা তাকে মাযাদ্দৌলা লকবসহ খিলআত প্রদান করেন। এরপর তিনি তার দ্বিতীয় ভাই আলীকে ইমাদুদ্দৌলা আর তৃতীয় ভাই হাসানকে রুকনদ্দৌলা উপাধি দেন, আর তিনি ইমামুল হক লকব ধারণ করে ফরমান জারি করেন।

কিছুদিন পর প্রশাসন মাযাদ্দৌলার হাতে জিম্মি হয়ে পড়লে সে খলীফার দৈনিক খরচের জন্য পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দেয়। মাযাদ্দৌলা দায়লামীদের মধ্যে সাম্রাজ্যের প্রথম নায়েব। সে-ই সর্বপ্রথম খারাজ আদায়ের জন্য লোক নিয়োগ করে। সে লোকদের মাঝে সন্তরণ বিদ্যার খাহেশ পয়দা করে। সে নৌকা চালনা প্রতিযোগীতার প্রবর্তন করে।

কিছুদিন পর খলীফা সম্পর্কে মাযাদ্দৌলার খারাপ ধারণা জন্ম নেয়। ৩৩৪ হিজরির জামাদিউল আখির মাসের কোন একদিন দরবার বসলো, সভাসদবর্গ নিজ নিজ আসলে উপবেশনরত। তখত অলংকৃত করে বসে আছেন খলীফা মুসতাকফী। দায়লামী সম্প্রদায়ের দুইজন লোক তখতের দিকে এগিয়ে গেলো। হাতে চুমু দিবে ভেবে খলীফা তাদের দিকে হাত প্রসারিত করলে হাত ধরে টেনে তারা খলিফাকে নিচে ফেলে দিলো। এরপর তারা তার পাগড়ী দিয়ে খলিফাকে বেঁধে রেখে অন্দর মহল অবাধে লুণ্ঠন করে।

ওদিকে মাযাদ্দৌলা স্বীয় আলয়ে অবস্থান করে। তারা মুসতাকফীকে পায়ে হেঁটে আপন কক্ষে নিয়ে যায়। এরপর তাকে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়াতে বলে আর তার চোখ দুটো খুলে নেয়। সে সময় তার খিলাফতের বয়স হয়েছিলো এক বছর চার মাস।

এরপর লোকেরা ফজল বিন মুকতাদরের কাছে বাইয়াত করলে অপারগ হয়ে তিনি তার উপর খিলাফত সোপর্দ করেন। এরপর মুসতাকফীকে বন্দী করা হয়। ৩৩৮ হিজরিতে তিনি জেলখানায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মুসতাকফীর ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, তিনি ছিলেন শিয়া।

আল মতি বিল্লাহ

আল মতি বিল্লাহ আবুল কাসেম আল ফজল বিন মুকতাদর বিন মুতাযদ ৩০ হিজরিতে মাশগালা নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

৩৩৪ হিজরিতে তিনি মসনদে আরোহন করেন। মাযাদ্দৌলা দৈনিক ভাতা হিসেবে একশো দিনার খলিফার জন্য নির্ধারণ করে দেয়।

এ বছর বাগদাদে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লোকেরা মৃত প্রাণী আর পশুর বিষ্ঠা খেয়ে জীবন রক্ষার চেষ্টা চালায়। ক্ষুধার জালায় অনেকেই পথের ধারে মরে পড়ে থাকতো। জঠরজ্বালা নিবারনের জন্য অনেকেই কুকুরের গোশত খেতো, রুটি, বাগান আর জমি বিক্রি হতো। মাযাদ্দৌলার জন্য এক বস্তা আঁটা কেনা হয়। আর দামেশকে এক বস্তার বাজার দর ১৯ দিনার। এ বছর মাযাদ্দৌলা আর নাসিরুদ্দৌলার মধ্যে লড়াই হয়। মতি মাযাদ্দৌলার সাথে রনাঙ্গনে যান। ফেরার পথে মতি বন্দীদের সাথে ছিলেন।

এ বছর মিসরের আমীর আখশীদ মৃত্যুবরণ করে। তার আসল নাম মুহাম্মদ বিন তফহ ফারগানী। আখশীদের অর্থ শাহানশাহ (টীকাঃ শাহানশাহ নাম রাখা বা উপাধি দেওয়া হারাম)। ফারগানের সকল বাদশাহকে এ লকবে ভূষিত করা হতো। যেমন তরিস্তানের বাদশাহদের ইস্পাহান্দ, জুরজানের সূল, তুর্কীদের খাকান, আশরুসানের আফসীন আর সমরকন্দ বাদশাহদের লকব সামান। আখশীদ খুবই সাহসী লোক ছিলেন, কাহিরের যুগে তিনি মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ হোন। তার আট হাজার গোলাম ছিল।

এ বছর পশ্চিমাঞ্চলীয় শাসনকর্তা কায়েম উবায়দী মারা যায়, তার স্থানে তার উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত পুত্র মানসুর বিল্লাহ নিযুক্ত হয়। সে তার পিতা থেকেও বেশী অভিশপ্ত ছিল। সে নবীদের শানে গালি দিতো। সে আলিমদের হত্যা করে।

৩৩৫ হিজরিতে মাযাদ্দৌলা মতির কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাকে দারুল খুলাফায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। এ বছর মাযাদ্দৌলা আব্বাসীয় খিলাফতের দরবারে অনুরধ জানায় যে, তার ভাই ইমাদুদ্দৌলাকে তার সহযোগী হিসেবে তাকে দেওয়া হোক, আর তার মৃত্যুর পর যেন তার ভাইকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। মতি তার আবেদন মঞ্জুর করেন। কিন্তু ইমাদুদ্দৌলা এ বছরেই মারা যাওয়ায় মতি তার আরেক ভাই রুকনদ্দৌলঙ্কে তার সহকারী বানিয়ে দেন।

৩৩৯ হিজরিতে হজরে আসওয়াদ স্ব স্থানে স্থাপন করা হয় আর এর চারপাশে সাত হাজার সাতশো সাড়ে সত্তর দিরহাম ওজন সমপরিমাণ রৌপ্য দিয়ে বাঁধাই করা হয়।

মুহাম্মাদ বিন নাফে খাযায়ী বলেছেন, হজরে আসওয়াদ স্থাপনের পূর্বে আমি খুব ভালো করে দেখেছি যে, এর উপরটি কালো আর বাকি অংশ সাদা, এটি লম্বায় এক হাত।

৩৪১ হিজরিতে একটি কওমের আবির্ভাব ঘটে, যারা মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল। তাদের মধ্যে একজন এ দাবী করেছিলো যে, আমার মধ্যে আলি (রাঃ) এর রূহ দেওয়া হয়েছে। তার স্ত্রী দাবী করতো, তার মধ্যে ফাতিমা (রাঃ) এর রূহ দেওয়া হয়েছে। জিবরাঈল (আঃ) এর রুহের দাবী করতো আরেকজন। জনতার হাতে তারা প্রহৃত হয়।

এ বছর পশ্চিমাঞ্চলীয় শাসনকর্তা মানসুর উবায়দী তার প্রবর্তিত মানুরীয়া শহরে ইন্তেকাল করেন। তার উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত ছেলে সাদ 'মযদ্দীন' লকব ধারণ করে তখতে নসিন হয়ে কাহেরা শহররে গোরাপত্তন করেন। মানসুর নেককার লোক ছিলেন। তার পিতার সময় যারা অত্যাচারিত হয়েছিলো, তিনি তাদের খুঁজে বের করেন। লোকেরা তাকে বন্ধুভাবাপন্ন মনে করতো। তার ছেলে সাদও নেককার ছিলেন। তার সময় গোটা পশ্চিমাঞ্চল তার অধীনে চলে আসে।

৩৪৩ হিজরিতে খুরাসানের শাসনকর্তা মতির নামে খুৎবা পাঠ করেন। এ খবর পেয়ে মতি তাকে খিলআত প্রদান করেন।

৩৪৪ হিজরিতে মিসরের ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়, এতে অনেক ভবন বিধ্বস্ত হয়। এর স্থায়িত্ব ছিল তিন ঘণ্টা। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য লোকেরা খুবই বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করে।

৩৪৬ হিজরিতে সমুদ্রের পানি আশি হাত উঁচু হয়ে যায়। ফলে পর্বতগুলো দ্বীপে পরিণত হয়। রায় আর এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ভূমিকম্প হয়। ফলে তালকান শহর সমূলে বিধ্বস্ত হয়। এতে ত্রিশজন লোক ছাড়া শহরের সকলে নিহত হয়। রায় এর উপকণ্ঠে দেড় শত গ্রাম লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। হালওয়ানের অধিকাংশ ধ্বসে পড়ে। মৃত মানুষের হাড়ে সয়লাব হয়ে যায় নগর জনপদ। মাটি ফেটে ঝর্ণাধারার সৃষ্টি হয়। রায় এর একটি পাহাড় ভেঙে খানখান হয়ে যায়। জায়গায় জায়গায় জমিন ফেটে চৌচির হয়ে যায় আর গর্তের সৃষ্টি হয়। এসব ফাটল আর গহ্বর থেকে পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি বের হয়। আবার কোনগুলো থেকে শুধু ধোঁয়া নির্গত হতে থাকে। এটি ইবনে জাওজি কতৃক বর্ণিত।

৩৪৭ হিজরিতে আবার ভুমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি আর প্রাণহানির ফলে পৃথিবীতে রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

৩৫০ হিজরিতে মাযাদ্দৌলা বাগদাদে এক সুবিশাল প্রাসান নির্মাণ করেন। এর ভীত ছিল ছত্রিশ হাত নিচে প্রোথিত। গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এ বছর আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন শাওয়ারিব বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ বছর রোমানরা আফরিতশ দ্বীপটি দখল করে নেয়, যা ২৩০ হিজরী থেকে মুসলমানরা শাসন করতো। এ বছর স্পেনের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীনিল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তার স্থানে তার ছেলে তখতে আরোহণ করেন।

৩৫১ হিজরিতে শিয়ারা মসজিদের দরজায় দরজায় এ কথাগুলো লিখেছিলো - মুয়াবিয়া'র উপর অভিশাপ, যারা ফাতিমার হক ফিদকের বাগান আত্মসাৎ করেছে তাদের প্রতি অভিশাপ, যারা ইমাম হাসানকে

রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) পাশে দাফন হতে দেয়নি তাদের উপরও অভিশাপ, যারা আবু যরকে বহিস্কার করেছে তাদের প্রতিও অভিশাপ। (نعوذ با لله من هذ الكفر)

রাতে কোন এক ব্যক্তি এ লেখাগুলো মিশে দেয়। সকালে মাযাদ্দৌলা আবার এগুলো লিখতে চাইলে উযীর মাহলাবী বললো, কথাগুলো এমন হওয়া উচিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিবারের উপর অত্যাচারকারীদের প্রতি আল্লাহ'র অভিশাপ বর্ষিত হোক, আর মুয়াবিয়া'র উপর স্পষ্টভাবে অভিশাপ বর্ষণের কথা লিখতে বললো, বস্তুত সেটাই লিখা হলো।

৩৫২ হিজরিতে মাযাদ্দৌলা আশুরার দিন দোকানপাট বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়। বাবুর্চিদের রান্নাবান্না করতে নিষেধ করে। মেয়েরা মাথার চুল খুলে নিজের মুখে আঘাত করে 'হায় হোসেন' বলে মাতম করে। বাগদাদে এটাই প্রথম দিন, যেদিন সর্বপ্রথম সেখানে বিদআত হয়। কিছু দিন তা চালু ছিল। সংবাদ পেয়ে খলীফা মতি জানাযায় অংশগ্রহণ করতে মাযাদ্দৌলার বাসভবনে হাওজায় আরোহণ করে আসে। এ কথা জেনে মাযাদ্দৌলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে তিনবার চুমু দিয়ে খলিফাকে কষ্ট করে এসে জানাজায় শরীক হতে বারণ করেন। ফলে খলীফা প্রাসাদে ফিরে যান। এ বছর ১২ যিলহজ্জ তারিখে জাকজমকভাবে বাঁশি বাজিয়ে ঈদ করা হয়।

৩৫৩ হিজরিতে সাইফুদ্দৌলার জন্য ২৪/২৫ হাত উঁচু তাঁবু নির্মাণ করা হয়।

৩৫৪ হিজরিতে মাযাদ্দৌলার বোন ইন্তেকাল করেন। এ বছর রোমান সম্রাট ইয়াকুব মুসলমানদের শহরের পাশে কায়সারীয়া শহর আবাদ করেন।

৩৫৬ হিজরিতে মাযাদ্দৌলার অন্তর্ধানে তার ছেলে বখতিয়ারকে 'আযযাদ্দৌলা' উপাধি দিয়ে তদস্থলে নিয়োগ করা হয়।

৩৫৭ হিজরিতে কারমতী দামেশক দখল করে। সিরিয়া ও মিসরের লোকদের হাজ্জ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবার মিসর আক্রমণের পরিকল্পনা করলে বনূ উবায়েদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিহত করার আগেই তারা মিসর দখল করে। এদিকে শিয়ারা আকলীম, মিশর আর ইরাকে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারা খুৎবা থেকে বনু আব্বাসের নাম বাদ দেয়, কালো কাপড় পড়তে মানা করে, খতীবদের সাদা কাপড় পড়তে আদেশ করে আর এ শব্দগুলো দিয়ে খুৎবা পাঠ করে –

اللهم صلى على محمد المصطفي وعلي على المرتضي وعلي فا طمة البتول وعلي الحسن وعلي الحسين سط الر سول وصل علي ا لائمة اباء امير المئو منين المعز با لله

৩৫৯ হিজরিতে মিসরে আযানের মধ্যে حي علي خير العمل - এ শব্দটি বৃদ্ধি করা হয়। এ বছর জামে আযহারের ভিত্তি দেওয়া হয়, আর সেটা ২৬১ হিজরির রমযান মাসে শেষ হয়। এ বছর ইরাকে একটি তারকা বিকট আওয়াজে পতিত হয় আর পৃথিবীময় সূর্যের ন্যায় আলো ছড়িয়ে পড়ে।

৩৬২ হিজরিতে ইখতিয়ার খলীফার উপর কর আরোপ করে। এ কথা শুনে খলিফা মতি, ইখতিয়ারকে বললেন, "তুমি যদি এটাই চাও যে তাহলে আমি স্বেচ্ছায় নিজের ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকবো আর সর্বস্ব বর্জন করবো।" এরপরেও মতি খলীফার প্রতি চাপ অব্যাহত রাখে। ফলে খলীফা নিজ ঘরের আসবাবপত্র বেঁচে চার লাখ দিরহাম মতির হাতে তুলে দেন। এ কথা জনতার মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তারা বলতে থাকে, খলীফাকেও কর দিতে হচ্ছে। এ বছর ইখতিয়ারের গোলাম নিহত হওয়ায় তার উযীর আবুল ফজল শিরাযী এর বদলাস্বরূপ বাগদাদের এক দিকে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে অনেক ঘরবাড়ি, সম্পদরাজি আর বনি আদম পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, এই অভিশপ্ত উজিরও আগুনে পুড়ে মারা যায়। এতো ভয়াবহ অগ্নিকান্ড বাগদাদে আর কখনোই হয় নি।

৩৬৩ হিজরিতে মতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন শায়বান হাশিমিকে কাযীউল কুযযাতের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহনে অসম্মতি জানান। মতি শর্তাবলীর দীর্ঘ ফিরিস্তি প্রস্তুত করেন। এ পদের কোন পারিশ্রমিক তিনি নিবেন না। কোন প্রকার খিলাফত গ্রহণ করবেন না। শরীয়ত বিরোধী সুপারিশও তার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তার কেরানীর জন্য মাসিক তিনশো দিনার, পুলিশের জন্য দেড়শো দিনার, আহকাম জারিকারির একশো দিরহাম, কোষাগার ও দফতরীর জন্য সাতশো দিরহাম বেতন দেওয়া হয়। তিনি যে ফরমান জারি করেন সেটা এমন –

আমিরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ আল ফজল আল মতিবিল্লাহ'র পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ স্বপদে থাকাকালীন আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সকল শহর, নগর ও জনপদের বিচারব্যবস্থা দেখাশোনা করতেন। তিনি বিচারক ও বিচারপতিদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি বিভিন্ন প্রদেশে বিচারক নিয়োগ দিতেন। শরীয়তসম্মতভাবে যেন বিচারকার্য পরিচালিত হয় সেদিকে গভীর দৃষ্টি রাখতেন। নেক নিয়্যত, আমানতদার, পরহেযগার, শরীয়তের পাবন্দ, মুত্তাকী, আলেম, জ্ঞানবান, নরম কাপড় যে পরিধান করে না। সাদা কাপড় পড়ে, স্বচ্ছ লেনদেন, আল্লাহকে ভয়কারী, কুরআনসম্মত ফয়সালা দানকারী, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের পথপ্রদর্শক, ইজমায়ে উম্মত মীমাংসাকারী, আইম্মায়ে রাশেদিনের অনুসারী, ইনসাফ আর ন্যায়বিচারকারী। গরীবেরা তার অত্যাচারকে ভয় পাবে না – তিনি এমন লোকদের নিয়োগ দিতেন।

৩৬৩ হিজরিতে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে মতির কথায় জড়তার সৃষ্টি হয়। ইখতিয়ার তার প্রহরী সবক্তগীন মারফত বলে পাঠায় যে, তিনি যেন খিলাফতের দায়িত্ব তার ছেলে আল তয়েলিল্লাহ'র উপর অর্পণ করেন, তিনি সেটাই করেন। ৩৬৩ হিজরির যিলকাদা মাসের ২৩ তারিখে বুধবারে মতি তার পুত্র তয়ে'র উপর খিলাফত অর্পণ করেন।

মতি ২৯ বছর বয়সে কয়েক মাস রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, এরপর প্রধান বিচারপতি শায়খুল ফাযেল লকব দিয়ে মতিকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

যাহাবি বলেছেন, মতি আর তার ছেলে বনু যুয়ার হাতে খেলার তাসে পরিণত হয়েছিলো। মুকতাফী লিল্লাহ পর্যন্ত এ অবস্থাই ছিল। তারপর এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

মতি তার ছেলে নিয়ে ওসেত যায়। সেখানে ৩৬৪ হিজরির মুহাররম মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইবনে শাহিন বলেছেন, “আমি খুব ভালো করে তাহকিক করেছি যে, মতি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছেন।”

খতীব বলেছেন, “ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলতেন - জনতার বন্ধুর অন্তর্ধান হলে তখন তার অভাব অনুভূত হতো।”

মতির যুগে সেসকল ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন – খারকী শায়খে হাম্বলী, আবু বকর শিবলী, ইবনে কাযী, আবু রাযা, আবু বকর সূলী, হাসিম বিন কালীব, আবু লতীব, আবু জাফর, আবু নসর ফারাবী, আবু ইসহাক মরুযী, আবুল কাসেম, দিনুরী, আবু বকর যবয়ী, আবুল কাসেম তুনুখী, ইবনে হুদা, আবু আলি বিন আবু হুরায়রা, আবু উমর, মাসউদী, ইবনে দরসতুয়া, আবু আলী তাবারী, ফাকেহী, কবি মুতানাব্বী, ইবনে হিব্বান, ইবনে শাবান, আবু আলী আল কানী, আবুল ফরাহ প্রমুখ।

আত তয়ে লিল্লাহ

আত তয়েলিল্লাহ আবু বকর আবদুল করীম বিন মতি 'হাযার' নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ৪৩ বছর বয়সে খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন। খিলাফত লাভের পর দিন খিলাফতের চাদর উড়ে ফৌজ পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি অশ্বারোহণে বের হোন। সেদিনই সবক্তগীনকে শাহী পোশাক আর ঝারল প্রদান করা হয় আর নাসরুদ্দৌলা উপাধি দেওয়া হয়।

কিছুদিন পর আযযুদ্দৌলা আর সবক্তগীন মাঝে বিবাদের সৃষ্টি হয়। সবক্তগীন তুর্কীদের সাথে নিয়ে তার সাথে মরণপণ লড়াই এ অবতীর্ণ হয়।

৩৬৩ হিজরিতে হারামাইন শরিফাইনে আল- মুযযাল উবায়দীর নামে খুৎবা পাঠ করা হয়।

৩৬৪ হিজরিতে সবক্তগীনকে প্রতিহত করার জন্য আযদুদ্দৌলা আযযুদ্দৌলার সাহায্যার্থে বাগদাদে আসে। আযদুদ্দৌলার কাছে বাগদাদ নগরী পছন্দ হওয়ায় তিনি বাগদাদে নিজের বলয় প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন, তিনি ফৌজদের উপঢৌকন দিয়ে হাত করেন। তারা আযযুদ্দৌলার উপর চড়াও হয়। আযযুদ্দৌলা দরজা লাগিয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আযদুদ্দৌলা তায়ে- এর রাজ্যগুলোতে এ বার্তা পাঠিয়ে দিলো যে, আযদুদ্দৌলা সাম্রাজ্যের নতুন নায়েব নিযুক্ত হয়েছেন। এজন্য তায়ে আর আযদুদ্দৌলা উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। এতে আযদুদ্দৌলার জয় হওয়ায় খুৎবা থেকে তায়ে এর নাম উঠিয়ে দেওয়া হয়। ২০ শে জামাদিউল আখির থেকে ৩৬৪ হিজরির ১০ ই রজব পর্যন্ত কোথাও কোন খুৎবায় তার নাম পড়া হয় নি। এ বছর রাফেযিদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। মিসর, শাম, ইরাক আর পশ্চিমাঞ্চলে তারা এতোই শক্তিশালী হয় যে, তারা তারাবীহ'র নামায বন্ধ করে দেয়।

৩৬৫ হিজরিতে রুকনদ্দৌলা বিন বূয়া তার পদানত রাজ্যগুলো তিন সন্তানের মধ্যে বন্টন করে দেন। পারস্য ও কারমান আযদুদ্দৌলাকে, রায় আর ইস্পাহান মুঈদদ্দৌলাকে আর হামদান ও দিনুর ফখরুদ্দৌলাকে দেওয়া হয়। এ বছর রজব মাসে আযযুদ্দৌলার বাসভবনে ইজলাস বসে। সেখানে কাযীউল কুযযাত বিন মারুফ উপস্থিত ছিলেন। তিনি নির্দেশ করেন যে, আযযুদ্দৌলাকে অনুরোধ করা হচ্ছে তিনি এ মজলিসে এসে নিজ চোখে পর্যবেক্ষণ করুন কিভাবে বিচারকার্য সম্পাদন হচ্ছে।

এ বছর আযদুদ্দৌলা আর আযযুদ্দৌলার মধ্যে লড়াই হয়। এতে আযযুদ্দৌলার এক তুর্কি গোলাম বন্দী হয়। এজন্য তিনি দারুন মর্মবেদনায় ভোগেন। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেন, শোকের কবিতা আবৃত্তি করেন, বাইরে বের হওয়া ছেড়ে দেন। কান্না ছাড়া আর কোন কাজ তার ছিল না। এমনকি ইজলাসও বর্জন করেন। গোলামকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আযদুদ্দৌলার কাছে বার্তা পাঠালেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে আযযুদ্দৌলা বন্দী গোলামের পরিবর্তে দুজন বাঁদি পাঠান। এদের মধ্যে একজনকে এক লাখ দিনারে কেনা হয়েছিলো। যাওয়ার সময় তিনি দুতকে বলে দেন যে, "আযদুদ্দৌলা বন্দী গোলামের পরিবর্তে যা চাইবে,

সাথে সাথে রাজি হয়ে যাবে। এতে আমার অনুমতি রইলো, যদি আমাকে দুনিয়াও ছেড়ে দিতে হয়।" পরিশেষে আযদুদ্দৌলা গোলামকে ফিরিয়ে দেন।

এ বছর কুফায় আযযুদ্দৌলার নামের পরিবর্তে আযদুদ্দৌলার নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। এ বছর মিসরের শাসনকর্তা আলমুযালিদ্বীনিল্লাহ উবায়দী ইন্তেকাল করেন। তার স্থানে তার পুত্র আযীয নিযুক্ত হোন।

৩৬৬ হিজরিতে উমাইয়া বংশীয় স্পেনের বাদশাহ আল মুসতানসির বিল্লাহ আল হাকিম বিন নাসিরুদ্দীনিল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তার শূন্য আসনে তদীয় পুত্র লুমুঈদ বিল্লাহ হিশাম সমাসীন হোন।

৩৬৭ হিজরিতে আবার আযযুদ্দৌলা আর আযদুদ্দৌলার মধ্যে যুদ্ধ হয়। আযদুদ্দৌলা জয় লাভ করেন। আযদুদ্দৌলা বন্দী হলে তাকে হত্যা করা হয়। খলীফা আযদুদ্দৌলাকে শাহী পোশাক, জওহরের তাজ আর স্বর্ণের মালা নিজ হাতে তার গলায় পড়িয়ে দেন। সাথে প্রদান করা হয় তলোয়ার আর স্বর্ণ ও রৌপ্যের দুটো পতাকা। যা ওলী এ আহাদদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। আজ পর্যন্ত আযদুদ্দৌলা ছাড়া এভাবে আর কাউকে খলীফা কতৃক রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান করা হয়নি। এছাড়াও তার জন্য উত্তরাধিকারের একটি প্রতিশ্রুতিপত্র প্রণয়ন করা হয়। যা হাযেরীনে মজলিসের সামনে পড়ে শোনানো হয়। এটা শুনে উপস্থিত জনতা কিঙ্করতব্বমিমুর হয়ে পড়ে। কারন আজ পর্যন্ত ওলী- এ- আহাদ বা উত্তরাধিকার সম্পর্কে এ রেওয়াজ চলে আসছিলো যে, খলীফার পুত্র বা তার নিকটাত্মীয়রাই ওলী- এ- আহাদ হবে। এ প্রতিশ্রুতিপত্র আযদুদ্দৌলার হাতে প্রদানের সময় খলীফা বললেন, "এটা আমার প্রতিশ্রুতি, এ অনুযায়ী কাজ করবে।"

৩৬৮ হিজরিতে খলীফার পক্ষ থেকে এ ফরমান জারি করা হয় যে, সকাল, সন্ধ্যা ও ঈশার সময় আযদুদ্দৌলার বাসভবনে ডংকা বাজানো হবে আর মিম্বরে দাঁড়িয়ে খতীবগণ খুৎবার মাধ্যমে তার নাম পাঠ করবে।

ইবনে জাওযী বলেনঃ এটা এমন এক বিষয়, যা ইতিপূর্বে কখনোই দেয়া হয়নি। ওলী- এ- আহাদরাও ডংকা বাজানোর অনুমতি পেলেন না। একবার মাযাদ্দৌলা মদিনাতু সালামে ডংকা বাজানোর অনুমতি প্রার্থনা করলে খলীফা মতি তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ আযদুদ্দৌলাকে সেই অনুমতি দেওয়া হয়। আর এভাবেই খিলাফতের বন্ধন আস্তে আস্তে কমজোর আর দুর্বল হতে থাকে।

৩৬৯ হিজরিতে মিসরের ওলী আযীযের দূত বাগদাদে আসে আর তয়ে'র কাছে আযদুদ্দৌলা আবেদন করে যে, তার লকবের সাথে তাজুল মিল্লাত লকবতি বৃদ্ধি করে তার খিলআত নবায়ন করা হোক। তার আবেদন গৃহীত হয়। তয়ে তখতে উপবেশন করেন। তার আশেপাশে একশো লোক তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে রাখা হয় উসমান গনী (রাঃ) এর নিজ হাতে লিখিত পবিত্র কুরআন শরীফ। কাঁধে চাদর শরীফ, হাতে লাঠি আর গলায় ঝোলানো হয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহৃত তলোয়ার। আযদুদ্দৌলা কতৃক প্রেরিত পর্দাটি টানানো হয়, যাতে লোকেরা আযদুদ্দৌলার পূর্বে তয়েকে দেখতে না পায়। তুর্কি আর দায়লামী বংশীয় লোকেরা বিনা অস্ত্রে দণ্ডায়মান থাকে। দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ ও সভাসদবৃন্দ। এরপর আযদুদ্দৌলাকে আহবান করা হয়। তার আগমন মুহূর্তে পর্দা সরে যায়।

তিনি খলিফার খিদমতে যমীন চুম্বন করেন আর সামরিক অফিসার বৃন্দ ও অগণন ফৌজ দেখে ঘাবড়ে যান। তয়ে বললেন, "সংশয় সংকোচ করো না। আল্লাহ'র শান কি তোমার দৃষ্টিগোচর হয় না ?" আযদুদ্দৌলা বললেন, "নিশ্চয়ই আপনি ইহধামে আল্লাহ'র খলীফা।" এরপর তিনি ধীরে ধীরে সামনে এগুতে থাকেন আর সাত বার জমিন চুম্বন করেন। তয়ে বললেন, "সামনে এসো।" তিনি এগিয়ে যান আর পদচুম্বন করেন। তয়ে তাকে আসনে বসার নির্দেশ দেন। কিন্তু খলীফার সামনে চেয়ারে বসা তার সাহসে কুলায় না। তিনি বারবার বলার পরও তিনি বসলেন না। অবশেষে তিনি কসম করলে তিনি আসনে চুম্বনপূর্বক উপবেশন করলেন। এরপর তিনি তাকে বললেন, "আল্লাহ কাজ করার জন্য যতো লোক আমাকে দিয়েছেন, আর আমার অধীনে যতগুলো রাজ্য রয়েছে, এগুলো দেখভালের জন্য আমি তোমাকে মনোনীত করছি। তুমি তা গ্রহণ করো।" আযদুদ্দৌলা বললেন, "আমার মওলা আমিরুল মুমিনীনের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ আমাকে তাওফিক দান করুন আর এতে তিনি আমাকে সহায়তা দান করুন, আমি তা গ্রহণ করছি।" এরপর খলীফা তাকে শাহী পোশাক পড়িয়ে দিলেন।

(গ্রন্থকার) বলেনঃ একটু লক্ষ্য করে দেখুন, খলীফা তয়ে কিভাবে খিলাফতের কাজকে দুর্বল করে ফেলেছেন। এ খলীফার যুগে খিলাফতের কাজ যতটুকু ক্ষীণ আর শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তা আর কোন খলীফার যুগে হয়নি। আর সে সময় সাম্রাজ্যের নায়েব আযদুদ্দৌলার যতটুকু শক্তি ছিল, কোন সময় কোন নায়েবের এতটুকু শক্তি কখনোই ছিল না। আমার যুগে অবস্থা এমন চরমে গিয়ে পৌঁছে যে, খলীফা স্বয়ং নায়েবকে মাসের শুরুতে নতুন মাসের শুভেচ্ছা জানাতে আসতেন। অধিকাংশ সময় নায়েব পরামর্শ সভায় বা ইজলাসে মধ্যমণি হয়ে বসতো। এরপর সভাকক্ষে খলীফা আসলে নায়েব তার আসন থেকে নেমে আসতো আর আবার দুজনে একই স্থানে গিয়ে উপবেশন করতো। খলীফা সাধারণ প্রজার মতো সভাকক্ষ ত্যাগ করতেন আর তার নায়েব পূর্বের মতোই বসে থাকতো। কারো জন্য কোন যবনিকার ব্যবস্থা ছিল না। একদিন এক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করলেন, সাম্রাজ্যের ডেপুটি সুলতান কোন যুদ্ধে গেলে খলীফা প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে তাকে সঙ্গ দিতেন। সকল বীরত্ব, সাহসিকতা এবং সম্মান ও মর্যাদার সবতুকুই ছিল নায়েবের প্রাপ্য। খলীফা ছিলেন সরদারের মতো, যিনি নায়েবের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন।

৩৭০ হিজরিতে আযদুদ্দৌলা হামদান থেকে বাগদাদ এলে তয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বাগদাদ থেকে বাইরে আসেন, যা আজ পর্যন্ত আর কখনোই হয়নি। কোন খলীফা কাউকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বের হোননি। তয়ে'র যুগে আযদুদ্দৌলা তয়ের কাছে দূত পাঠাতেন, আর খলীফা দূতের আগমনে দাঁড়িয়ে যেতেন।

৩৭৬ হিজরিতে আযদুদ্দৌলার ইন্তেকাল হলে তার জায়গায় তার পুত্র সিমসামুদ্দৌলাকে শামসুল মিল্লাত লকব দিয়ে নিয়োগ করা হয় আর খলীফা তাকে সাতটি খিলআত, একটি মুকুট আর দুটো পতাকা প্রদান করেন।

৩৭৩ হিজরিতে আযদুদ্দৌলার ভাই মুঈদুদ্দৌলার মৃত্যু হয়।

৩৭৫ হিজরিতে সিমসামুদ্দৌলা বাগদাদের আশেপাশে উৎপন্ন কাপড় শিল্পের উপর করারোপের ইচ্ছা করেন। এ করের পরিমাণ ছিল বার্ষিক দশ লাখ দিরহাম। বিষয়টি জানোতে পেয়ে জনতার দল মানসুর জামে মসজিদে সমবেত হয়ে এখানে জুমআর নামায পড়তে না দেওয়ার ঘোষণা দেয়। ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সিমসাবুদ্দৌলা তার ইচ্ছা প্রত্যাহার করলে পরিস্থিত শান্ত হয়।

৩৭৭ হিজরিতে সিমসামুদ্দৌলার উপর তার ভাই শরফুদ্দৌলা আক্রমণ করে। সিমসামুদ্দৌলা পরাজিত হয়। শরফুদ্দৌলা ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেলে। সকল ফৌজ শরফুদ্দৌলার পতাকা তলে সমবেত হয়। এরপর শরফুদ্দৌলা বাগদাদে প্রবেশের সময় তয়ে তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তিনি তাকে ডেপুটি সুলতান নিয়োগ করেন আর একটু মুকুট পড়িয়ে দেন। এরপর একটি আহাদনামা লিখে শরফুদ্দৌলার সামনে পাঠ করা হয়। সে সময় তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

৩৭৮ হিজরিতে শরফুদ্দৌলা মামুনের মতো সৈন্যদের ব্যবহৃত শস্যাগার নির্মাণ করেন। এ বছর বাগদাদে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এতে অনেক লোকের মৃত্যু হয়। বসরায় প্রচণ্ড তাপদাহে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। অবিরাম লু হাওয়া বইতে থাকে। অন্ধকার নেমে আসে। দজলা নদীর তোড়ে যমীন প্লাবিত হয়। অনেক জাহাজ ডুবে যায়।

৩৭৯ হিজরিতে আযদুদ্দৌলা ইন্তেকাল করে আর তার ভাই আবু নসরকে নিজের স্থানে বসিয়ে দিয়ে যায়। তয়ে সমবেদনা জানানোর জন্য তার বাসভবনে যান, আবু নসর কয়েকবার তার খিদমতে জমিন চুম্বন করেন। এরপর সে তয়ে'র কাছে গেলে তিনি রাষ্ট্রের কর্মকর্তা বৃন্দের সামনে এমন সাতটি খিলআত প্রদান করেন, যার মধ্যে উন্নতমানের কালো উবা (আরব দেশের বিশেষ এক ধরণের পোশাক - অনুবাদক) আর কালো পাগড়ী, গলায় মালা ও হাতে কংকন পড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রহরীগণ তলোয়ার নিয়ে সামনে দিয়ে মার্চ করে। আবু নসর যমীন চুম্বন করে, আসনে উপবেশন করে। আহাদনামা পাঠ করা হয়। তয়ে তাকে 'বাহাউদ্দৌলা যিয়াউল মিল্লাত' উপাধি দেন।

৩৮১ হিজরিতে বাহাউদ্দৌলা তয়েকে বন্দী করে। এ ঘটনাটি এমন - তয়ে বাহাউদ্দৌলার এক প্রিয়জনকে বন্দী করেন। খলীফা ছায়াময় শীতল স্থানে উপবেশনরত। বাহাউদ্দৌলা যমীন চুম্বন করে চেয়ারে বসে। ঠিক এ মুহূর্তে বাহাউদ্দৌলার লোকেরা এসে পড়ে। তারা তয়েকে টেনে তখত থেকে নিচে নামিয়ে দেয় আর কাপড় দিয়ে বেঁধে প্রাসাদে পাঠিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে এ ঘটনা শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। বাহাউদ্দৌলা তয়েকে লিখে জানালো যে, আপনি নিজের পদ থেকে সরে গিয়ে সে স্থানে আপনার ছেলে কাদেরবিল্লাহকে তখত প্রদান করুন। এ পত্রে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের স্বাক্ষর ছিল। এটা ২৮১ হিজরির ১৯ শাবানের ঘটনা। সে সময় কাদেরবিল্লাহ বাতীহা শহরে ছিলেন। তাকে ডেকে এনে তার হাতে বাইয়াত করা হয়। তয়ে তাদের বিল্লাহ'র কাছে অতি সমাদরের সাথেই থাকতেন।

তয়ে ৩৯৩ হিজরির ঈদুল ফিতরের শেষ রাতে নশ্বর জাহান ছেড়ে পরপারে পারি জমান। কাদের বিল্লাহ তার জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। শরীফ রেযা তার শোকগাঁথা লিখতে গিয়ে বলেন, "তয়ে আবু তালিবের

বংশধরের মধ্যে অধিক বক্র ছিলেন। তার শাসনামলে লোকদের মন থেকে ভয়ভীতি উঠে যায়। এমনকি কবিগণও তার সমালোচনামূলক শ্লোক রচনা করতো।”

তার যুগে যেসব ওলামা ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - হাফেয ইবনে সানা, ইবনে আদী, কাবির, নাহুবিদ সিরানী, আবু সোহেল, আবু বকর রারী হানাফী, ইবনে খালুয়া, ইমামুল লুগাত যহরী, দেওয়ানুল আদবের লেখক আবু ইবরাহীম ফারাবী, কবি রিফা, আবু যায়েদ আল উমুরী শাফী, দারকী, আবু বকর আবহারী শায়খুল মালিকী, ইমামুল হানাফিয়া আবুল লাইস সমরকন্দী, নাহুবিদ আবু আলী আল কারসী, ইবনে হাল্লাব মালিকী।

আল কাদের বিল্লাহ

আল কাদের বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন ইসহাক বিন মুকতাদার 'মওসুমা তামান্না' বা 'দিমনা' নামক বাঁদির গর্ভে ৩৩৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

তয়ে অপসারিত হওয়ার পর তিনি তখতে আরোহণ করেন। তয়ে অপসারিত হওয়ার সময় তিনি বাগদাদে ছিলেন না। ১০ই রমযানে তাকে ডেকে আনা হয়। ১১ ই রমযানে সাধারণ পরিষদের সামনে তিনি মসনদে উপবেশন করেন। কবিগণ তার শানে কবিতা আবৃত্তি করেন। কবি শরীফ রেযা বলেন, "হে বনু আব্বাস, আজ আবার খিলাফতের মর্যাদাকে আবুল আব্বাস পুনর্জীবন দান করলেন। ঐক্যের মাধ্যমে এ শক্তিকে যুগ যুগ ধরে কায়েম রাখতে হবে।"

খতীব বলেছেনঃ কাদের বিল্লাহ খুবই সাধু, সুবিবেচক, ঝানু রাজনীতিবিদ, তাহাজ্জুদগুজার ও সদকা-খয়রাতকারী ছিলেন, তিনি সুপথপ্রাপ্ত হিসেবে প্রসিদ্ধ। তিনি আল্লামা আবু বশর হারবী শাফীর কাছে ফিকহ অর্জন করেন

فضائل صحابه تکفیر معتزله قائلین خلق القرآن

একটি কিতাব লিখেন, যা প্রতি জুমআয় মুহাদ্দিসদের সামনে মাহদী জামে মসজিদে পাঠ করা হতো। (ইবনুস সালাহ, তবকাতুস শাফীয়াহ)

যাহাবী বলেছেনঃ খিলাফত লাভের প্রথম বর্ষের শাওয়াল মাসে একটি আড়ম্বরপূর্ণ সভার আহবান করা হয়। এতে কাদের বিল্লাহ আর বাহাউদ্দৌলা প্রতিজ্ঞা রক্ষার শপথ করে এবং কাদের বিল্লাহ নিজের প্রাসাদ ছাড়া গোটা সাম্রাজ্য তার উপর সোপর্দ করেন।

এ বছর মক্কা শরীফের শাসনকর্তা আবুল ফুতুহ আল হাসান বিন জাফর উলুবী লোকদের থেকে নিজের বাইয়াত নিয়ে রাশেদবিল্লাহ লকব ধারণ করে। খিলাফত তার হস্তগত হয়। মিসরশাহীর শাসন মকায় পরাভূত হয়। কিছুদিন পর আবুল ফুতুহ দুর্বল হয়ে পড়লে মিশরের বাদশাহ আযীয উবায়দীর বশতা মেনে নেয়।

৩৮২ হিজরিতে উযীর আবু নসর করখ অঞ্চলে একটি ভবন নির্মাণ করেন। এর নাম রাখা হয় দারুল ইলম। এতে একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা কায়েম করা হয়। বিপুল পরিমাণে ক্রয়কৃত গ্রন্থাদি এতে ছিল। ওলামাদের বিদ্যা অর্জনের জন্য এটি ওয়াকফ করা হয়।

৩৮৪ হিজরি ইরাক, সিরিয়া আর ইয়েমেনের লোকেরা হাজ্জ করতে গিয়ে রাস্তা থেকে ফিরে আসে, কারন এ বছর ত্যাক্স ছাড়া হাজ্জ করতে যেতে বাধা দেওয়া হয়। এ বছর শুধু মিসরবাসীরাই হাজ্জ করতে পারে।

৩৮৭ হিজরিতে সুলতান ফখরুদ্দৌলার তিরোধানে তার চার বছরের শিশু তদস্থলে নিয়োগ হয়। কাদের বিল্লাহ তাকে মাজদুদ্দৌলা উপাধি দেন।

যাহাবি বলেছেনঃ ৩৮৭/৩৮৮ হিজরিতে নয়জন বাদশাহ পরলোক গমন করেন। এদের মধ্যে মা- ওরাউন নহরের বাদশাহ মানসুর বিন নূহ, রায় এবং জাবালের শাসক ফখরুদ্দৌলা আর মিসরের আযীয উবায়দী অন্তর্ভুক্ত। কবি আবু মানসুর আবদুল মালিক এই নয়জনকে নিয়ে একটি শোকগাঁথা রচনা করেছেন।

যাহাবী বলেছেনঃ ৩৮৬ হিজরিতে মিসরশাহী আযীয মৃত্যুবরণ করে। সে তার বাবার থেকে প্রাপ্ত রাজ্যের সাথে হামস, হামাত আর হলব – এই তিনটি শহর জয় করে অন্তর্ভুক্ত করে। মৌসুল আর ইয়েমেনে তার নামে খুৎবা পড়া হতো। তার রাজ্যে তার নামে পয়সা চালু করা হয়েছিলো। পতাকায় তার নাম লিখা থাকতো, মার মৃত্যুর পর তদস্থলে তার পুত্র মানসুর আল হাকিম বিআমরিল্লাহ উপাধি দিয়ে সমাসীন হয়।

৩৯০ হিজরিতে সিজিস্তানে স্বর্ণের খনি বের হলে লোকেরা মাটি খনন করে স্বর্ণ উত্তোলন করে।

৩৯৩ হিজরিতে দামেশকের নায়েব আসওয়াদ পশ্চিমাঞ্চলীয় এক লোককে ধরে গাধার পিঠের উপর তুলে ঘুরানো হয়। সে সময় ঘোষক বলতে থাকে – এ হল সে ব্যক্তি, যে আবু বকর (রাঃ) আর উমর (রাঃ) কে ভালোবাসে। এরপর তাকে হত্যা করা হয়। আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন আর তাকে হত্যাকারী ও এই বাদশাহকে কিয়ামতের দিন অপমান করুন।

৩৯৪ হিজরিতে বাহাউদ্দৌলা শরীফ আবু আহমাদ হুসাইন বিন মুসাকে কাযি- উল- কুযযাতের সাথে হাজ্জ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসহ শিরাজ নগরী পর্যন্ত তার এলাকা বৃদ্ধি করে দেয়। কিন্তু কাদের বিল্লাহ এতে অনুমোদন না দেওয়ায় সে কোন দায়িত্ব পালন করতে পারেনি।

৩৯৫ হিজরিতে হাকিম মিসরে একদল ওলামাকে হত্যা করে। মসজিদের দেওয়ালে দেওয়ালে এবং পথ-প্রান্তরে সে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের কুৎসা লেখে। সে হুকুম জারি করে – সাহাবীদের গালি দাও। কুকুর লালনপালন কারীদের হত্যা করো। ফাকাআ (নিশামুক্ত শরতে) আর মালুখীয়া (এক প্রকার ঔষধ) নিষিদ্ধ করে। চামড়াহীন মাছ খেতে নিষেধ করা হয়। এছাড়াও কেউ তা বিক্রি করলে তাকে হত্যা করো।

৩৯৬ হিজরিতে হাকিম মিশর আর হারামাইন শরিফাইনে (মক্কা শরীফ আর মদিনা শরীফ) এ ফরমান জারি করে, যে কোনো স্থানে বা মজলিসে আমার নাম উচ্চারিত হলে শ্রবণকারী আমার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাবে আর সিজদা করবে।

৩৯৮ হিজরিতে শিয়া সুন্নি দ্বন্দ্ব হয়। দীর্ঘদিন এ লড়াই চলতে থাকে। এতে শায়খ আবু হামিদ আসফারানী নিহত হোন। রাফেযীরা বাগদাদে হে হাকিম, হে মানসুর বলে চিৎকার করতে থাকে। এতে কাদের বিল্লাহ রেগে যান। তিনি এ বিশৃঙ্খলা দমন করেন। তিনি একদল অশ্বারোহী ফৌজ সুন্নতের অনুসারীদের সাহায্যার্থে পাঠান, যারা খুবই নির্মমভাবে শিয়াদের গর্দান উড়িয়ে দেয়।

এ বছর হাকিম বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে নির্মিত কামামার গির্জা ভেঙে ফেলে। মিসরের সকল গির্জা ধ্বংস করে। খ্রিস্টানদের গলায় এক হাত লম্বা আর পাঁচ রিতিল ওজনের ক্রিশ পড়ার নির্দেশ দেয়। ইহুদীদের গলায় লাল বর্ণের একই ওজনের ক্রুশ পড়ার আর কালো পাগড়ী বাধার হুকুম দেয়। এ কারণে অনেক ইহুদী ও খ্রিস্টান মুসলমান হয়। কিছুদিন পর সে আবার এই আইন বাতিল করে গির্জা পুনর্নির্মাণ এবং যারা অপারক হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো তাদেরকে স্বধর্মে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

৩৯৯ হিজরিতে বসরার কাযী আবু আমরকে অপসারন করে আবুল হাসান বিন শাওয়ারিবকে কাযী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ বছর স্পেনের উমাইয়া বংশীয় সুলতান দুর্বল হয়ে পড়ায় রাষ্ট্র শক্তিহীন হয়ে পড়ে আর তার ব্যবস্থাপনা হাতছাড়া হয়ে যায়।

৪০০ হিজরিতে দজলা নদীর পানি এতোটাই কমে যায়, যা এর আগে আর কখনোই হয়নি। ফলে দজলার চর ভারা দেওয়া হয়।

৪০২ হিজরিতে হাকিম খেজুর ও আঙ্গুর বিক্রি করে দেয় এবং অনেক আঙ্গুরের গাছ ধ্বংস করে।

৪০৪ হিজরিতে রাত- দিন যে কোন মুহূর্তে মেয়েদের রাস্তায় বের হতে মানা করে। এ ফরমান তার মৃত্যু অবধি অব্যাহত ছিল।

৪১১ হিজরিতে হাকিম মিসরের হাল ওয়ান নামক গ্রামে নিহত হয়। আল্লাহ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, তার স্থানে তার পুত্র আল যাহের লা আযাযুদ্বীনিল্লাহ উপাধি ধারণ করে সমাসীন হয়।

৪২২ হিজরির যিলহাজ্জ মাসের ১১ তারিখ সোমবার রাতে কাদের বিল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

তার শাসনামলে যে সকল ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন, তারা হলেন - আবু আহমাদ আসকারী আদীব, রুমানী নাহুবিদ, আবুল হাসান, মাসরজসী, আবু আবদুল্লাহ মরযুবানী, মুঈদুদ্দৌলার উযীর সাহেব বিন উবাদা, হাফেজ দারা কুতনি, ইবনে শাহীন, আবু বকর আওদী ইমামুশ শাফিয়া, ইউসুফ, ইবনে সিরানী, ইবনে রুলাক আল মিসরি, ইবনে আবি যায়েদ আল মালিকী, কওতুল কুবের লেখক আবু তালিব আল মালী, ইবনে বাততা আল হাম্বলী, ইবনে শামউন খাতায়ী, খাতেমিল লগবী, আওফু আবু বকর, ইবনে গালবুন আল মাকরী, কাশমিহনা, মাআনী বিন যাকারিয়া আন নাহরুয়ানী, ইবনে খুওয়ায মিন্দাদ, ইবনে জনা, সহীদ এর লেখক জওহরী, আল জামালের লেখক ইবনে ফারেস, ইবনে মান্দাত আল হাফেজ ইসমাইল শায়খে শাফিয়াহ, আসবানা বিনিল ফারাজ শায়খে মালিকীয়া, বদিউযযামান (যিনি সবপ্রথম মাকামাত লিখেছেন), ইবনে লাল, ইবনে আবী যাযনীন, আবু হায়ান আত তাওহিদী, কবি আলওয়াদ, আল ফারিবিনের লেখক আল হারবী, কবি আবুল ফাতাহ আল বাসনী, হালিমী শায়খে শাফিয়াহ, ইবনুল ফারিয, আবুল হাসান আল কালবেসী, কাযী আবু বকর বাকলানী, আবু তবীব সালুকী, ইবনে আকফানী, আল খুতব এর লেখক ইবনে নাযাতাহ, সামিরী শায়খে শাফিয়াহ, মুসতাদরাকের লেখক হাকিম ইবনে কুজ, শায়খ আবু হামেদ, ইবনে ফুরাক, শরীফ রেযা, আবু বকর আর রাযী, হাফেয আবদুল গেনা বিন সাঈদ, ইবনে মারদুয়া, হাফতুল্লাহ বিন

সালামা, ইবনুল বাওয়াব, আব্দুর রহমান, মুহামেলী, আবু বকর আল কাফাল, ইবনুল ফুখার, আলী বিন ঈসা প্রমুখ।

যাহাবি এছাড়াও অসংখ্য মনীষীর নাম উল্লেখ করেছেন।

আল কায়িম বি আমরিল্লাহ

আল কায়িম বি আমরিল্লাহ আবু জাফর আবদুল্লাহ বিন আল কাদের বিল্লাহ ৩৯১ হিজরির যিলকদ মাসের মাঝামাঝিতে উম্মে ওলাদ মাসুমা বদরুদ্দোজা, ভিন্ন মতে কতরুননিদা নামক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি পিতার জীবদ্দশায় ওলিয়ে আহাদ ছিলেন। তিনিই তাকে কায়েম বি আমরিল্লাহ খেতাব দেন। পিতার ইন্তেকালের পর ৪২২ হিজরিতে তিনি খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন।

ইবনে আসির বলেছেন, "তিনি খুবই সুদর্শন, সংযমী, ইবাদাতকারী, দানশীল, আলেম, আল্লাহ'র উপর ভরসাকারী, ধৈর্যশীল, সুসাহিত্যিক, সদা প্রফুল্ল, ইনসাফকারী আর অভাব পূরণকারী ব্যক্তি ছিলেন। কোন কিছু চাইলে তিনি কাউকে বঞ্চিত করতেন না।

খতীব বলেছেনঃ মুসলিম সাম্রাজ্যে বসাসিরী অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিংস্র হয়ে উঠে। তাকে প্রতিহত করার মতো কেউ ছিল না। আরবে আযমে সকলেই তার ভয়ে কাঁপতো। তার থেকে পরিত্রাণের জন্য দুয়া করা হতো। সে লোকদের সম্পদ আত্মসাৎ করতো, গ্রামের পর গ্রাম লুট করতো। কায়িম তাকে প্রতিহত করেন। প্রথমে উভয়ের মধ্যে প্রীতিকর সম্পর্ক ছিল, পরবর্তীতে সম্পর্কে চিড় ধরলে বসাসিরী দারুল খুলাফা লুণ্ঠন আর খলিফাকে বন্দী করার ষড়যন্ত্র করে। ফলে খলীফা রায়ের শাসনকর্তা আবু তালিব মুহাম্মাদ বিন মাকয়ালের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রায়ের শাসনকর্তা টগর বেগ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সে ৪৪৭ হিজরিতে এসে বসাসিরীর বাসগৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে রহবা শহরে পালিয়ে যায়। তুর্কীরা বসাসিরীর পতাকা তলে সমবেত হয়। সে খলীফাদের বিরুদ্ধে মিসর শাসনকর্তার সাহায্য চাইলে সে তাকে অর্থ সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করে। এরপর সে টগর বেগের ভাই টপালকে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য আহবান জানায়। সে তাকে লোভ দিয়ে এ মর্মে পত্র লিখে যে - আমি বিজিত হল তোমাকে রায়ের শাসনকর্তা বানাবো। লোভে পড়ে টপাল টগর বেগের উপর আক্রমণ করলে বসাসিরী ৪৫০ হিজরিতে বাগদাদের দিকে কুজ করে। খলীফা বাগদাদের বাইরে এসে তার সাথে লড়াই করেন। মানসুর জামে মসজিদে মিসর শাসনকর্তার নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। আযানে এ শব্দগুলো বৃদ্ধি করা হয় - حي علي خير العمل সে সময় খলীফা নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছাড়া সর্বত্র তার নামে খুৎবা পাঠ করা হতে থাকে। এক মাস পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকে। যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে সে খলীফাকে বন্দী করে গানায় নিয়ে গিয়ে কয়েদ করে রাখে।

ওদিকে টগর বেগ তার ভাইকে পরাজিত ও হত্যা করে গানার প্রশাসককে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে খলীফাকে দারুল খুলাফায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য পত্র লিখে। সে তা-ই করে। ৪৫১ হিজরির যিলকদ মাসের পাঁচ তারিখে খলীফা এসে পৌঁছেন। সে সময় তিনি খুব খোশহাল অবস্থায় ছিলেন। এরপর টগর বেগ সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে বসাসিরীর উপর হামলা করে। যুদ্ধে বসাসিরী পরাজিত হয়। সে তাকে হত্যা করে তার কাটা মাথাটি বাগদাদে পাঠিয়ে দেয়।

খলীফা দারুল খুলাফায় ফিরে এসে জায়নামাযে ঘুমাতেন। দিনে রোযা রাখতেন, রাতে নামায পড়তেন। যারা তাকে কষ্ট দিতো তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন। তিনি তার লুণ্ঠিত সম্পদ মূল্য প্রদান ছাড়া ফেরত নিতেন না। তিনি বলতেন, "সব বিষয়ের সওয়াব আমি আল্লাহ'র কাছ থেকে নিবো।" তিনি বালিশে মাথা রাখতেন না। কথিত আছে, তার প্রাসাদ লুণ্ঠিত হওয়ার সময় খেলাধুলার কোন আসবাবপত্র পাওয়া যায়নি। এটা তার বুজুর্গির উন্নত দলীল।

বর্ণিত আছেঃ বসাসিরী তাকে কয়েদ করে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি এ দুয়াটি লিখে কাবাঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দেন - "বান্দা মিসকিনের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ'র দরবারে, হে ত্রিভুবনের শাহানশাহ, আপনি তো মনের গোপন অভিব্যক্তি সম্পর্কেও জানেন। অন্তরের অবস্থা আপনার সামনে দিবাকরের মতোই ভাস্বর। হে মাবুদ, আপনার অপার জ্ঞানভাণ্ডার নিজের সৃজনশীলতার ব্যাপারে সম্যক অবগত। ইলাহি, আপনার এ বান্দা আপনার নিয়ামত অস্বীকার করেছে, কৃতজ্ঞতা আদায় করেনি, নিয়ামতরাজির উপর নির্ভর করেনি। আপনার হুকুম মানার ক্ষেত্রে অমনোযোগী হয়েছে। ফলে আমার উপর এক বিদ্রোহীকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাদের সাথে আমার দুশমনি, হে প্রতিপালক। সাহায্য কমে গিয়েছে আর অত্যাচার বেড়ে গিয়েছে। হে পালনকর্তা, আপনিই প্রত্যেক বিষয়ে অবিসংবাদিত, পরিজ্ঞাত, নিয়ন্ত্রক আর বিচারক। আপনারই সমীপে ফরিয়াদ, প্রত্যাবর্তন আর পানাহ চাইছি। হে দয়াময়, আপনার মাখলুক আমার উপর প্রভুত্ব করছে। আমি আপনার কাছেই ফরিয়াদ করছি। আমি আপনার ইনসাফপ্রার্থী। আপনি আমার উপর থেকে অন্ধকারের যবনিকা অপসৃত করুন। আপনার দয়া আর মমতার দুয়ার অবারিত করুন। আমাদের মাঝে ইনসাফ করুন। আপনিই খাইরুল হাকেমীন।"

৪২৮ হিজরিতে মিসর শাসনকর্তা আয যাহের উবায়দী আট বছর চার মাস রাজত্ব করে মারা যায়। তার স্থানে তার পুত্র আল মুসতানসির সাত বছরের জন্য কায়েম থাকে।

যাহাবি বলেছেন, "তার শাসনামলে মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যার তীব্রতা একমাত্র ইউসুফ (আঃ) এর যুগের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এ দুর্ভিক্ষ সাত বছর স্থায়ী হয়। লোকেরা একে অপরকে কেটে খেয়ে ফেলতো। সে সময় একটি রুটি পঞ্চাশ দিনারে বিক্রি হয়।"

৪৪৩ হিজরিতে মুয়ায বিন নাদিস খুৎবা থেকে উবায়দীদের নাম বাদ দিলে পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে বনু আব্বাসের নাম পঠিত হতে থাকে।

৪৫১ হিজরিতে গাযনার বাদশাহ সুলতান ইব্রাহীম মাহমুদ বিন সবক্তগীন আর টগর বেগের ভাই খুরাসানের শাসনকর্তা জাফর বেগ বিন সালজুকের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। পড়ে উভয়ের মাঝে সন্ধি হয়। এর এক বছর পর জাফর বেগ ইন্তেকাল করেন। তার স্থানে তার পুত্র তখত নশীন হয়।

৪৫৪ হিজরিতে খলীফা নিজ কন্যাকে টগর বেগের সাথে বিয়ে দেন, যা কখনোই এমনটা হয়নি। বনু আব্বাস নিজের বংশের ছাড়া কোথাও (কন্যা) বিয়ে দেয় নি। এমনকি বনু যুয়া, যারা খলীফাদের উপর হুকুমত

চালিয়েছে, তাদেরকেও বনু আব্বাস কন্যা দেয়নি। আর আমার (গ্রন্থকারের) যুগে খলীফা তার মেয়েকে ডেপুটি সুলতানের গোলামের সাথে বিয়ে দেন।

৪৫৫ হিজরিতে টগর বেগ খলীফার মেয়েকে নিয়ে বাগদাদে এসে মাওয়ারিস আর খারাজ ফিরিয়ে দেয়। এরপর বাগদাদের উপর দেড় লাখ দিনার ট্যাক্স বসিয়ে রায়ে চলে যায়। সেখানে পৌঁছে সে মারা যায়। আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করবেন না। তার শূন্য পদে তার ভাতিজা খুরাসানের শাসনকর্তা ইরসালান অধিষ্ঠিত হয়। খলীফা তার কাছে খিলাআত পাঠান।

যাহাবি বলেছেনঃ ইরসালান সর্বপ্রথম বাগদাদে মিম্বরে আরোহণ করে নিজের উপাধি সুলতান হিসেবে ঘোষণা করে। সে অন্যান্য সুলতানের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হওয়ায় খ্রিষ্টানদের অধিকাংশ শহর, নগর, জনপদ দখল করে নেয়। সে নিযামুল মুলুককে উযির নিয়োগ করে। উমায়দুল মুলুকসহ সভাসদদের বরখাস্ত করে। সে শাফি মাযহাবের মদদদাতা। হারামাইন শরিফাইনের ইমাম আর আবু কাসিম আল কুশায়রীকে খুবই সমাদর আর সম্মান করতো। সে মাদ্রাসায়ে নিযামিয়ার ভিত্তি স্থাপন করে। বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রথম ফিকহ এর জন্য এ মাদরাসার ভিত্তি দেওয়া হয়।

৪৫৮ হিজরিতে দুই চেহারা বিশিষ্ট এক কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। এ বছর আকাশে চাঁদের সমান একটি তারকা দেখা দেয়, এ থেকে তীব্র তাপদাহ নির্গত হয়। এ দৃশ্য দেখে লোকেরা ভীষণ ভয় পায়। দশরাত পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল। পড়ে তা আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে যায়।

৪৫৯ হিজরিতে মাদরাসা নিযামিয়ার কাজ সমাপ্ত হয়। শিক্ষক হিসেবে শায়খ আবু ইসহাক শিরাজী নিয়োগ পান। চারিদিক থেকে ছাত্ররা আসতে থাকে। এমন সময় শায়খ আবু ইসহাক শিরাজী চলে যান। তার সাথে ইবনে সবাগ সাহেবে কামেল দরস দিতে শুরু করেন। এরপর লোকেরা শায়খ আবু ইসহাক শিরাজীকে বুঝিয়ে নিয়ে এলে পরে তিনি দরস- তদরিসের কাজ শুরু করেন।

৪৬০ হিজরিতে রমলায় বড় ধরণের ভূমিকম্প হয়। এতে রমলা সমূলে বিধ্বস্ত হয়। পঁচিশ হাজার লোক নিহত হয়।

৪৬১ হিজরিতে দামেশকের জামে মসজিদে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে কারুকার্য ও স্বর্ণ- রৌপ্য খচিত সাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়।

৪৬২ হিজরিতে মক্কার আমীরের দূত এসে সুলতান আলব আরসালানকে এ সংবাদ দেয় যে, মক্কা শরীফে মুসতানসিরের নামে খুৎবা বন্ধ হয়ে বনু আব্বাসের নামে খুৎবা পড়া শুরু হয়েছে। আযান থেকে এ শব্দগুলো বাদ পড়েছে - حي علي خير العمل এ কথা শুনে সুলতান দূতকে খুশী হয়ে ত্রিশ হাজার দিনার আর খিলআত প্রদান করেন। সে সময় মিসরীয় সালতানাত দুর্ভিক্ষে দুর্বল হয়ে পড়ে। কারন এ দুর্ভিক্ষ সাত বছর স্থায়ী হয়েছিলো। মানুষ মানুষের গোশত খেতো। স্বর্ণের সমপরিমাণে খাদ্য কেনা হতো। একটি কুকুর পাঁচ দিনার আর একটি বিড়াল তিন দিনারে বিক্রি হতো। কথিত আছে, এক নারী এক ঝুড়ি মণি- মুক্তা নিয়ে

কায়রো থেকে এই উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয় যে, সে এক ঝুড়ি মণি-মুক্তার বিনিময়ে এক ঝুড়ি খাদ্য চায়। কিন্তু সে তা পায়নি।

৪৬৩ হিজরিতে বনু আব্বাস ও সুলতান আলব আরসালানের শক্তি আর মুসতানসিরের সালতানাতের পতন দেখে লোকেরা বনু আব্বাসের নামে খুৎবা পাঠ করতে থাকে। এ বছর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে রোমানরা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে সুলতান আরসালান স্বয়ং সেনাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করেন আর রোম সম্রাটকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। এরপর মোটা অংশের মুক্তিপণ নিয়ে রোম সম্রাটকে ছেড়ে দেওয়া হয় আর পঞ্চাশ বছর মেয়াদী উভয়ের মাঝে এক সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়।

৪৬৪ হিজরিতে ছাগলের মাঝে মরণ ব্যাধি রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াপালের পর পাল ছাগল মরে সাফ হয়ে যায়।

৪৬৫ হিজরিতে আলব আরসালান নিহত হয়। তার জায়গায় পুত্র মূলক শাহ অধিষ্ঠিত হয়। তাকে জালালুদ্দৌলা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সে নিযামুল মূলককে কলমদানি ও দোয়াত উপহার দেয়। এরপর সে তাকে আতা বেগ, যার অর্থ আমিরুদ্দৌলা উপাধি দেয়। ইনি প্রথম ব্যক্তি যাকে তিনি সর্বপ্রথম উপাধি প্রদান করেন।

৪৬৬ হিজরিতে দজলা নদীর ত্রিশ হাত খাড়া পানিতে বাগদাদ প্লাবিত হয়। এতে প্রচুর জানো আর মালের ক্ষতি হয়। লোকেরা জাহাজে আশ্রয় নেয়। দুটো জুমআর নামায জাহাজেই হয়। খলীফা খুবই বিনয়ের সাথে আল্লাহ'র দরবারে দুয়া করেন। এক লাখের বেশী ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়ায় বাগদাদ বিরান ভূমিতে পরিণত হয়।

৪৬৭ হিজরিতে পঁয়তাল্লিশ বছর খিলাফত পরিচালনার পর তিনি শাবান মাসের ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে জগতের মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমান।

তার খিলাফতকালে যে সব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - আবু বকর ইয়ুরকানী, আবুল ফজল ফালকী, সাআলাবী, কুদদারী শায়খে হানাফীয়া, দার্শনিক ইবনে সিনা, কবি মিহয়ার, আবু নাঈম, আবু যায়েদ, তাহযীবের লেখক বুরুয়ী মালিকী, আবুল হাসান বসরী মুতাযানী, মক্কী, শায়খ আবু মুহাম্মাদ জুবিনী, মাহদী সাহেবে তাফসীর, আকলিলী, সুমানিনী, ইরশাদের লেখক আবু আমর দাদানী জালিল, সালিম রাযী, আবুল আলা মুফযী, আবু উসমান সাবুনী, বুখারি শরীফের ব্যাখ্যাকার ইবনে বাত্তাল, কাযী আবু তৈয়ব তাবারী, ইবনে শায়তী মাকরী, মাদরদী শাফী, ইবনে বাব শাদ, নাহুবিদ শিহাব বিন বুরহান, ইবনে হাযাম যাহেরি, বায়হাকী, ইবনে সাইয়েদাহ, আবু ইয়ালা বিন ফারার শায়খে হানাবালা, শাফি হাযালী, শায়খে বাগদাদি ইবনে রাশীক, উমদাহ বিন আবদুল বার প্রমুখ।

আল মুকতাদি বি আমরিল্লাহ

আল মুকতাদী বি আমরিল্লাহ আবুল কাসিম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন কায়িম বি আমরিল্লাহ গর্ভে থাকাকালীন তার পিতার মৃত্যু হয়। বাবার ইন্তেকালের ছয় মাস পরে তিনি এক দাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হোন।

দাদার মৃত্যুর পর তিনি ১৯ বছর তিন মাস বয়সে খিলাফতে আসীন হোন, তাকে মুকুট পড়ানোর অনুষ্ঠানে শায়খ আবু ইসহাক শিরাজী, ইবনে সবাআ আর ওমানী উপস্থিত ছিলেন।

তার খিলাফতকালে শহরগুলতে অনেক নেক কাজ হয়। খিলাফতের সীমানা বৃদ্ধি পায়। তার খিলাফত ছিল পূর্ববর্তী খিলাফতের বিপরীত। বাগদাদে গান-বাজনা নিষিদ্ধ হয়, গায়ক-গায়িকাদের বাগদাদ থেকে বের করে দেওয়া হয়। পর্দা বিনষ্ট না হওয়ার জন্য হাম্মামের সিঁড়িগুলো ভেঙে ফেলেন। বনু আব্বাসের মধ্যে তার খিলাফত ছিল খুবই দ্বীনদার, খুব নেককার আর প্রতাপান্বিত। তার খিলাফতের প্রথম বছর থেকেই পবিত্র মক্কা শরীফে উবায়দীদের নামে খুৎবা পাঠ করা হতে থাকে।

এ বছর নিযামুল মুলুক তারকা বিশেষজ্ঞদের সমবেত করে সূর্যাস্তের পর থেকে নববর্ষের সূচনা হিসেবে গণ্য করা হয়। আগে সূর্যোদয় থেকে দিনের শুরু হতো।

৪৬৮ হিজরিতে দামেশকে মুকতাদীর নামে খুৎবা দেওয়া শুরু হয়। আযান থেকে এ শব্দগুলো বাদ পড়ে - حي علي خير العمل এতে লোকেরা খুশী হয়।

৪৬৯ হিজরিতে আবু নসর বিন উস্তাদ আবুল কাশিম কাশিরী আশআরী বাগদাদের মাদসারা নিযামিয়ায় এসে ওয়াজ করেন। এতে হানাবেলারা রেগে যাওয়ায় এক বড় ফিতনার সৃষ্টি হয়। উভয় পক্ষের দল ভারী হতে থাকে। ফলে এক দল আরেক দলের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। এ বছর গোঁড়া হাম্বলি হওয়ার কারণে মুকতাদীর উযির ফখরুদ্দৌলা বিন জহিরকে বরখাস্ত করা হয়।

৪৭৫ হিজরিতে মুক তাদি সুলতানের কাছে আবু ইসহাক সিরাজিকে পাঠিয়ে উমায়েদ আবুল ফাতাহ এর অভিযোগ দায়ের করেন।

৪৭৬ হিজরিতে দুর্ভিক্ষ উঠে যাওয়ায় শহরগুলোতে ফসলাদি উৎপাদিত হয়। এ বছর মুকতাদী আবু শুজা মুহাম্মাদ বিন হাসানকে কলমদানী, দোয়াত আর যহিরুদ্দীন লকব প্রদান করেন। আমার মতে এ শব্দে এটাই প্রথম লকব।

৪৭৭ হিজরিতে কগুনীয়া আর আকসার শাসনকর্তা সৈন্যসহ সিরিয়ায় যান আর ইন্তাকিয়া শহর দখল করেন, যা ৩৫৮ হিজরি থেকে রোম সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। সুলতান মূলক শাহ এ কাজের জন্য তাকে অভিনন্দন জানান।

যাহাবি বলেছেন, রোমান সাম্রাজ্যের শহরগুলোর শাসনকর্তা সালজুক বংশীয়।

৪৭৮ হিজরিতে বাগদাদে অন্ধকার নেমে আসে, বিদ্যুৎ চমকায়। আকাশ থেকে বালু বর্ষিত হয়। কিছু কিছু স্থানে চড়ক পড়ে। এ দুর্যোগ দেখে লোকেরা ভেবেছিলো কিয়ামত বুঝি সমাগত। ইমাম আবু বকর তরতুসী নিজ চোখে এ দৃশ্য দেখে আমালি নামক গ্রন্থে এর বিবরণ পেশ করেন।

৪৭৯ হিজরিতে সুবতা ও মুরাকিশের শাসনকর্তা ইউসুফ বিন তাশফিনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে মুকতাদী তাকে তার অধীনস্থ রাজ্যগুলো প্রদান করে আমিরুল মুসলিমীন উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি তার কাছে খিলআত আর পতাকা পাঠান। এতে পশ্চিমাঞ্চলীয় ফকিহগণ আনন্দিত হোন। ইউসুফ মুরাকিশ শহরের প্রবর্তন করেন। এ বছর সর্বপ্রথম সুলতান মূলক শাহ বাগদাদে এসে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় অবস্থান করে আর খলীফার সাথে পোলো খেলে ইস্পাহানে ফিরে যায়। এ বছর থেকে হারামাইন শরীফাইন উবায়দীদের নাম রহিত করে খুৎবায় খলীফার নাম পাঠ করা হয়।

গাযানার শাসনকর্তা আল মুঈদ ইব্রাহীম বিন মাসউদ বিন মাহমুদ সবক্তগীন ৪৮১ হিজরিতে ইন্তেকাল করলে তার স্থানে তার ছেলে জালালুদ্দীন মাসউদ তখত নশীন হয়।

৪৮৩ হিজরিতে তাজুল মূলক মুসতাওয়াফিদ্দৌলা বাগদাদের বাবুল আবযারে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আবু বকর শাশী এখানে শিক্ষকতা শুরু করেন।

৪৮৪ হিজরিতে ফিরিঙ্গীরা গোটা সাকলীয়া উপদ্বীপ দখল করে নেয়। মুসলমানরা ২০০ হিজরিতে এ দ্বীপটি পদানত করেছিলো। আগলিবের বংশধররা খলীফার পক্ষ থেকে এটি শাসন করতো। তাদের থেকে উবায়দী মাহদীরা এটি দখল করে আর ফিরিঙ্গীরা তাদের থেকে তা ছিনিয়ে নেয়। এ বছর মূলক শাহ বাগদাদে এসে একটি বৃহৎ জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। এর আশেপাশে আমীর- উমারাগণ নিজেদের বাস ভবন তৈরি করে। এরপর মূলক শাহ ইস্পাহানে ফিরে যায়।

৪৮৫ হিজরিতে সুলতান মূলক শাহ আবার বাগদাদে এসে খলীফাকে অতিসত্বর বাগদাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার সংবাদ দেয়। খলীফা কিছুটা সময় প্রার্থনা করেন। সে তার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর খলীফা সুলতান মূলক শাহ'র উযীরের কাছে সময় চাইলে সে মাত্র দশ দিন সময় দেয়। কিন্তু দশ দিন অতিক্রান্ত না হতেই সুলতান রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়। লোকেরা এটাকে খলীফার কারামত হিসেবে উল্লেখ করে।

কথিত আছে, খলীফা মুকতাদী সময় লাভের দিনগুলোতে রোযা রাখতে শুরু করেন। ইফতারের মুহূর্তে ছাইয়ের উপর বসে সুলতান মূলক শাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য খুবই বিনয়ের সাথে আল্লাহ'র কাছে দুয়া করতেন, আল্লাহ তার দুয়া কবুল করেন।

সুলতান মূলক শাহ'র মৃত্যু সংবাদ তার স্ত্রী গোপন রেখে আমীর উমারাদের কাছ থেকে তার পাঁচ বছরের শিশু সন্তান মাহমুদের জন্য উত্তরাধিকারের (ওলী আহাদের) শপথ নেয়। এরপর সে তাকে সুলতান মনোনীত করার জন্য খলীফার কাছে আবেদন জানায়। খলীফা তা মঞ্জুর করেন আর তাকে নাসিরুদ্দীন ওয়া দুনিয়া

উপাধি দেন। কিছুদিন পর মাহমুদের ভাই বরকিয়ারুক হামলা চালায়। খলীফা তাকে সুলতান বানিয়ে রুকনদ্দৌলা উপাধি দেয়। এটি ৪৮৭ হিজরির মুহাররম মাসের ঘটনা।

এ ঘটনার পরদিন শামসুন নাহার নামক বাঁদির বিষ প্রয়োগে খলীফা মুকতাদী ইন্তেকাল করেন।

তার খিলাফতকালে যেসকল ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - আবদুল কাহের জুরজানী, আবুল ওয়ালিদ বাজী, বিখ্যাত নাহুবিদ আবু ইসহাক শিরাজি, শামেলের লেখক ইবনে সবাআ, ইমামুল হারামাইন আল মুতাওয়াল্লী, আদ দামগানী হানাফি, ইবনে ফাযাল মুজাশায়ী, বুয়ুদী শায়খে হানাফী প্রমুখ।

আল মুসতাযহার বিল্লাহ

আল মুযতাযহার বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুকতাদী বিল্লাহ ৪৭০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

তার পিতার মৃত্যুর পর ষোলো বছর বয়সে তিনি তখতে আরোহণ করেন।

ইবনে আসির বলেছেন, "তিনি খুবই কোমলমতি, উন্নত চরিত্র, নেককার আর সদা লাস্যমান। অনেক বিষয়ে তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন, যা তার ব্যাপক জ্ঞান ভাণ্ডারের অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি দানশীল, উদার আর ওলামা প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

এ খলীফার খিলাফতে অসুন্দরের কোন নমুনা পাওয়া যাবে না। খিলাফতের দিনগুলো তার যুদ্ধ- বিগ্রহের কারণে সর্বদা উদ্বিগ্ন অবস্থায় কেটেছে। খিলাফত লাভে প্রথম বছর মিসরের শাসনকর্তা মুসতানসির উবায়দীর মৃত্যুর পর তার ছেলে তখত নসীন হয়। এ বছর রোমানরা বলনসীয়াহ শহর দখল করে নেয়।

৪৮৮ হিজরিতে সমরকন্দের বাদশাহ আহমদ খা নিহত হয়। লোকটি বদদ্বীন ছিল। উমারাগন তাকে বন্দী করে আর মুফতিগণ তাকে হত্যার ফতোয়া দেন। তার স্থানে উমারাগন তার চাচাতো ভাইকে উপবেশন করায়।

৪৮৯ হিজরিতে একমাত্র শনিগ্রহ ছাড়া সকল গ্রহপুঞ্জ আর নক্ষত্ররাজি বুরজে হুতে মীন রাশি জমা হলে জ্যোতিষীরা ঐক্যমত্য হতে ভবিষৎবাণী করলো - অচিরেই নূহ (আঃ) এর যুগের মতো তুফান হবে। কিন্তু একটি প্লাবন ছাড়া আর কিছুই হয়নি। হাজীগন বাইতুল্লাহ শরীফে সমবেত হলে অধিকাংশ হাজী এ প্লাবনে ভেসে যায়।

৪৯০ হিজরিতে খুরাসানের শাসনকর্তা সুলতান আরসালান আরগোয়ান বিন আলব আরসালান সারজুকী নিহত হয়। সুলতান বুরকীয়ারুক তার রাজ্যগুলো পদানত করে আর শহরের লোকেরা এসে তার সাথে মিলিত হয়। এ বছর হলব, ইনতাকিয়া, মুরাহ আর শিরাজ শহরে এক মাস পর্যন্ত উবায়দীদের নামে খুৎবা পড়া হয়। এরপর আবার আব্বাসিয়দের নামে খুৎবা পাঠ শুরু হয়। এ বছর ফিরিঙ্গীরা এসে সর্বপ্রথম তায়কীয়া শহর দখল করে তাদের মর্জি মোওয়াফেক শহরে কুফর জারি করে। তারা পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতে লুটতরাজ করে। ফিরিঙ্গীরা প্রথমে সিরিয়ায় অবস্থান করেছিলো। কুসতুনতুনিয়া পানিপথে ফৌজি বাহিনী নিয়ে আসে। বাদশাহ আর প্রজাবৃন্দের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ তারা গ্রহণ করে। কথিত আছে, সালজুকীদের শক্তি আর প্রতিপত্তি দেখে মিসরের বাদশাহ'র চিঠি কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে তারা সিরিয়ায় হামলা চালায়। লোকেরাও তাদের প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

৪৯২ হিজরিতে ইস্পাহানে বতনিয়্যূরা শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ বছর ফিরিঙ্গীরা দেড় মাস দুর্গে আবদ্ধ থাকার পর বাইতুল মুকাদ্দীস দখল করে আর আলেম- ওলামা, ইবাদাতকারী ও দানশীলদের এক বড় জামাতাকে হত্যা করে। নিহতদের সংখ্যা আনুমানিক সত্তর সহস্রাধিক, সত্যবাদীদের ধ্বংস করে। ইহুদীদেরকে গির্জায়

একত্রিত করে পুড়ে ফেলে, বাকিরা বাগদাদে পালিয়ে যায়। এ অত্যাচারের বিবরণ শুনে যে কোন চক্ষু অশ্রু ঝরাবে। কবিরা কবিতার তুলিতে এ পৈশাচিকতার করুন কাহিনী তুলে ধরেছেন। সুলতানগণ অপারক হয়ে সম্মিলিতভাবে ফিরিঙ্গীদের উপর হামলা চালিয়ে বাইতুল মুকাদ্দিস ছিনিয়ে নেয়।

এ বছর মিসরে এতোই অন্ধকার নেমে আসে যে, নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যেতো না। আকাশ থেকে অবিরাম বালু বর্ষিত হয়। এ অবস্থা দেখে লোকেরা ভাবে, ধ্বংসের সময় সমাগত প্রায়। এরপর কিছুটা আলোর কণা দেখা দেয়। এরপর পূর্ণ উজ্জ্বলতা বিকশিত হয়। আসর থেকে মাগরিবের পর পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান ছিল।

এ বছর ফিরিঙ্গী আর স্পেন শাসনকর্তা ইবনে নাশিকীনের মধ্যে লড়াই হয়। মুসলমানরা জয়লাভ করে। অনেক ফিরিঙ্গী নিহত ও বন্দী হয়। বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। অনেক বড় বড় বীর বাহাদুর ফিরিঙ্গীরা পরপারের যাত্রী হয়।

৫০৭ হিজরিতে মৌসুলের বাদশাহ মওদুদ ফিরিঙ্গীদের বাদশাহ'র সাথে যুদ্ধ করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দীস যান। সেখানে তুমুল যুদ্ধ হয়। এরপর মওদুদ দামেশকে এসে জামে মসজিদে জুমার নামায পড়ে বের হওয়ার সময় এক বাতনীর অতর্কিত আক্রমনে আহত হোন আর সে দিনেই তিনি মারা যান। ফিরিঙ্গীদের বাদশাহ দামেশকের শাসনকর্তার কাছে এ মর্মে পত্র লিখলো - তোমাদের এক আদনা গোলাম তোমাদের ঈদের দিন তোমাদের বাদশাহকে আল্লাহ'র ঘরে হত্যা করেছে। লজ্জার কথা যে, তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

৫১১ হিজরিতে প্রাকৃতিক প্লাবনে বুখার আর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো ডুবে যায়। এতে অনেক জানোমালের ক্ষতি হয়। এ বছর সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যু হয়। তার সাথে তার ছেলে মাহমুদ চৌদ্দ বছর বয়সে সুলতান হয়।

৫১২ হিজরিতে খলীফা মুসতাযহার বিল্লাহ ১৩ই রবিউল আউয়াল মঙ্গলবারে পঁচিশ বছর খিলাফত পরিচালনার পর জগতের মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। ইবনে আকীল শায়খে হানাবালা তাকে গোসল করান আর তার ছেলে আল মুসতারশিদ জানাযায় নামায পড়ান। এর অল্প কিছুদিন পর জাওয়ান নামক খলীফার দাদী ইন্তেকাল করেন। যাহাবি বলেন, আমার জানা মতে একমাত্র মুকতাদীর দাদী ছাড়া কেউ নাতির খিলাফতকাল দেখে যেতে পারেনি। মুকতাদীর দাদী, নাতি আর নাতির ছেলের যুগেও জীবিত ছিলেন।

মুসতাযহার কবিতা জানোতেন। তার অনেক কবিতা প্রসিদ্ধতা অর্জন করেছে।

সালাফি বলেছেন, আবুল খাত্তাব বিন জাররাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেনঃ আমি রমযান মাসের একদিন নামাযের ইমামতি করলাম। মুসতাযহারের রেওয়ায়েত অনুযায়ী কেরাতে সূরাহ ইউসুফের মধ্যে -

إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ

- (১২ - ৮১) আয়াতটি তিলাওয়াত করলাম। সালাম ফিরিয়ে মুসতাযহার বললেন, এটিই অধিকতর সঠিক কিরাত, কারন এর মাধ্যমে পয়গম্বরগণ ভ্রম থেকে দূরে বুঝায়।

তার যুগে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - আবুল মুতফার সামআনী, নাসরুল মুকাদ্দাসী, আবুল ফরজ, রুয়ানী, খতীব তিবরিযী , কিয়ার হারায়ী, ইমাম গাযালী, মুসতাযহারের প্রশংসা মূলক জীবনী লেখক শাশী, আয়বরদী আল লগবী প্রমুখ।

আল মুসতারশিদ বিল্লাহ

আল মুসতারশিদ বিল্লাহ আবু মনসুর আল ফজল বিন আল মুসতাযহার বিল্লাহ ৪৮৫ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর ৫১২ হিজরির রবিউল আখির মাসে তিনি তখতে সমাসীন হোন। তিনি বীর, সাহসী, বিজ্ঞ আর বিচক্ষণ। খিলাফতের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করতেন। খিলাফতের দেহে পুনর্জীবন দান করেন। খিলাফতকে সুসংহত ও সুদৃঢ়করণে বিস্তর অবদান রাখেন। শরীয়তের আরকানগুলো মজবুত করেন। তিনি স্বশরীরে যুদ্ধ করতেন। কয়েকবার হালা, মৌসুল আর খুরাসান যুদ্ধেও যান। শেষে হামদানের নিকটবর্তী রনাঙ্গনে তার ফৌজরা পরাজিত হয় আর তাকে বন্দী করে আযারবাইজানে পাঠানো হয়।

তিনি আবুল কাসেম বিন বয়ান আর আবদুল ওহাব বিন হাবতীল্লাহ আস সুবতীর কাছে হাদিস শ্রবণ করেন। মুহাম্মাদ ইবনে উমার বিন মক্কী আল আহওয়াযী, তার উযীর আলি বিন তারাদ, ইসমাইল বিন তাহের আল মৌসুলী তার থেকে রেওয়ায়েত করেন। (এটি সাআনীর বর্ণনা)

তার ইলম ও মর্যাদার ব্যাপারে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইবনে সাল্লাহ তার স্বরচিত তবকাতে শাফিয়াহ গ্রন্থে লিখেছেন, আবু বকর আশ শাশী তার নামানুসারে একটি ফিকহ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তিনি ‘উমদাতুত দুনিয়া ওয়াল আখিরা’ খেতাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইবনে সুবকী তবকাতে শাফিয়া গ্রন্থে লিখেছেনঃ মুসতারশিদ বিল্লাহ আবেদ আর দানশীল ছিলেন, পশমের পোশাক পড়তেন। ইবাদত করার জন্য নিজ আলয়ের একটি স্থান নির্ধারণ করেছিলেন।

পিতার খিলাফতকালে তার বাবা তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে তার নাম খোদিত পয়সা চালু করেন। সুন্দর হস্তাক্ষরের ক্ষেত্রে বনু আব্বাসের সকল খলীফার মধ্য থেকে তিনি অগ্রজ। অধিকাংশ লেখক তার কাছে ভুল সংশোধন করতো। তার সাহসিকতা, প্রতিপত্তি, বীরত্ব, অগ্রগামিতা ছিল দিবাকরের মতো ভাস্বর, তবে তার সাশনামল ছিল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বিরোধীরা তার উদয়াচলকে বিষণ্ণ করে তুলেছিলো। এ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিপন্ন অবস্থাকে কাটিয়ে উঠার জন্য তিনি নিজেই রণাঙ্গনে যান। সর্বশেষ তিনি ইরাকে গিয়ে পরাজিত হয়ে বন্দী হোন আর শাহাদাতের শরাব পান করেন।

যাহাবী বলেছেনঃ ৫২৫ হিজরিতে সুলতান মাহমুদ বিন মূলক শাহ নিহত হোন। তার ছেলে দাউদ সুলতান হয়। কিছুদিন পর তার চাচাতো ভাই মাসউদ বিন মুহাম্মাদ দাউদের উপর হামলা করে। উভয়ের মাঝে তুমুল লড়াই হয়। অবশেষে সালতানাতের অংশীদারিত্বের উপর সন্ধি হয়। বাগদাদে খুৎবায় মাসউদের নাম পাঠ করা হতে থাকে। কয়েক দিন পর মাসউদ আর খলীফার মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মাসউদ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়, খলীফাও তার ফৌজ নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু খলীফার সৈন্যরা বিশ্বাসঘাতকতা করে। অধিকাংশ সিপাহী

খলীফার সঙ্গ বর্জন করে। ফলে মাসউদ জয়লাভ করে। খলীফা একদল অভিজাত লোকসহ বন্দী হোন। হামদানের নিকটবর্তী এক দুর্গে তাদের কয়েদ করে রাখা হয়।

এ খবর জানার পর বাগদাদের আবালবৃদ্ধবণিতা গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। সেদিন মানুষ এতোটাই স্তব্ধ হয়ে যায় যে, সেদিন নামায আর খুৎবা বন্ধ ছিল। ইবনে জাওজি বলেন, সেদিন বাগদাদে ভূমিকম্প হয়েছিলো, যা পাঁচ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রতিদিন পাঁচ ছয়বার করে ভুকম্পন হতো। এতে লোকেরা ভীষণ ভয় পেয়ে খুবই বিনয়ের সাথে দুয়া করে।

সুলতান সিনজর তার ভাতিজা মাসউদের কাছে দূত পাঠিয়ে বললো, “তুমি খলীফার কাছে যাও। নিজেকে পাপী বলে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অন্ধকার, বিদ্যুৎ আর ভূমিকম্পে সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ও বিষণ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলো আসমান আর যমীনের ভয়ংকর আলামত, যা দেখার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই। ফলে মসজিদগুলোতে নামায আর খুৎবা না হওয়া কতোই না গজব আর বিপজ্জনক কথা। তুমি অবিলম্বে আমিরুল মুমিনীনের কাছে হাজির হও। তাকে খুবই মর্যাদার সাথে দারুল খুলাফায় পৌঁছে দাও, যা আমাদের পূর্ব পুরুষেরা করতো। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে তুমি সেবার চাদর শরীরে জোড়াও।”

মাসউদ সুলতান সিনজরের কথা মান্য করে। সে যমীনে খিদমত চুম্বন করে আর ক্ষমা প্রার্থনা করে। এরপর সুলতান সিনজর খলীফাকে সসম্মানে নিয়ে আসার জন্য মাসউদের কাছে দূতসহ একদল সৈন্য পাঠায়। এ সৈন্য দলের মধ্যে সতের জন বাতেনী (সম্প্রদায়ের লোক, যারা খিলাফত বিরোধী) ঢুকে পড়ে, যা সুলতান আর মাসউদ কেউই জানোতো না। কেউ কেউ বলেন, মাসউদ নিজেই তাদের লেলিয়ে দিয়েছিলো। অবশেষে তারা খলীফার তাঁবুতে ঢুকে অভিজাত লোকগুলোসহ খলীফাকে হত্যা করে। বাকি ফৌজরা যখন এ কথা জানোতে পারলো, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। পরিশেষে তাদের বন্দী করে হত্যা করা হয়। আল্লাহ তাদের উপর অভশাপ বর্ষণ করুন।

প্রজাবৃন্দ এ কথা জানোতে পেরে কিয়ামত দিবসের মতো শোরগোল শুরু করে। এ খবর বাগদাদ পৌঁছলে হাশরের দৃশ্য নেমে আসে। জনতা উলঙ্গ শরীরে কাপড় পড়তে পড়তে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসে, নারীরা খোলা চুলে শোকগাঁথা গাইতে থাকে। কারন মুসতারশিদ বীরত্ব, ইবাদত আর নমনিয় মেজাজের কারণে সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন। ৫২৯ হিজরির যিলকদ মাসের ষোলো তারিখ সোমবারে তিনি শহীদ হোন।

মুসতারশিদের কবিতাগুলর মধ্যে একটি হলো এটি, যা বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি আবৃত্তি করেন - “এটা বিস্ময়ের কোন কারন নয়, যদিও কুকুর বাঘের উপর বিজয় অর্জন করে। কারন ওয়াহশী তো হামযা (রাঃ) আর ইবনে মূলজেম তো আলী (রাঃ) কে শহীদ করেছিলো।”

পরাজিত হওয়ার মুহূর্তে লোকেরা মুসতারশিদকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। যাহাবি বলেছেন, মুসতারশিদ তার বাবার শান অনুযায়ী ঈদুল আযহায় সুন্দর একটি খুৎবা পাঠ করেন। উযির জালালুদ্দীন আল হাসান বিন আলী সদকাহ খলীফা মুসতারশিদের প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেন।

৫২৪ হিজরিতে মুসতারশিদের যুগে মৌসুলে আকাশ থেকে আগুন বর্ষিত হয়। এ বছর মিসরের শাসনকর্তা আল আমর বি আহকামিল্লাহ মানসুর নিহত হলে তার চাচাতো ভাই হাফেয আবদুল মজিদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুনতাসির ওলী হয়।

মুসতারশিদের শাসনামলে যে সকল ওলামায়ে কেরামগন ইন্তিকাল করেন তারা হলেন - শামসুল আইম্মা আবুল ফজল ইমামে হানাফিয়া, আবুল ওফা বিন আকিল হাম্বলী, কাযিউল কুযযাত আবুল হাসান আল দামগানী বিন বিলমাতুল মাকরী, আইম্মাতুল আজালের লেখক তগরায়ী, আবু আলী সিদফী হাফেজ, আবু নসর কুশায়রী বিন কাতা আল লগবী, মহিউসসুন্নাহ আল বাগবী, ইবনুল হায আল মাকরী, মাকামাতের লেখক হারীরী, আমসালের লেখক ময়দানী, আবুল ওলীদ বিন রুশদ আল মালিকী, ইমাম আবু বকর তরতুসী, আবুল হুজ্জাজ সয়কতী ইবনে সায়্যেদ যাতলুসী সী, আবু আলী আল ফারুকী শাফি বিন খাত তুরুত, ইবনে বাযশ, কবি জাফর, আবদুল্লাহ গাফফার প্রমুখ।

আর রাশেদ বিল্লাহ

আর রাশেদ বিল্লাহ আবু জাফর মানসুর বিন মুসতারশিদ ৫০২ হিজরিতে এক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, জন্মের সময় তার পায়খানার রাস্তা বন্ধ ছিল। চিকিৎসকগণ পরামর্শক্রমে স্বর্ণের রাগ দিয়ে পায়খানার রাস্তা চিড়ে দিলে পরবর্তীতে তা ভালো হয়ে যায়।

৫১৩ হিজরিতে তার পিতা মুসতারশিদ তার শাসনামলে তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। পিতার মৃত্যুর পর ৫২৯ হিজরির যিলকাদা মাসে তিনি খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন।

রাশেদ ছিলেন মিষ্টভাষী, সাহিত্যিক, কবি, বীর, প্রাজ্ঞ, দানশীল, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ আর ঝগড়া ফাসাদকে ঘৃণাকারী।

সুলতান মাসউদ বাগদাদে আসার সময় খলীফা মৌসুলে চলে যান। মাসউদ বাগদাদে এসে বিচারক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আর ওলামাদের সমবেত করে অনেক লোকের সাক্ষ্যর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র তাদের সামনে তুলে ধরলো। রাশেদ এই অত্যাচার করেছেন, অমুকের অমুকের সম্পদ গ্রাস করেছেন, রক্তের শরাব পান করেছেন। এ ক্ষেত্রে আপনারা ফতোয়া দিন যে, এ খলীফাকে অপসারণ করা নায়েবে সালতানাতের জন্য জায়েয কিনা। এ মুহূর্তে তার ইমামত কি সহিহ হবে ? সুলতানগণ তার স্থানে অন্য খলীফা নির্বাচন করেছেন।

ওলামাগণ তাকে অপসারণের ফতোয়া দিয়ে দেন। মজলিসে ওলামাদের মধ্যে কাযী শহর ইবনে কুরখীও উপস্থিত ছিলেন। লোকেরা সাথে সাথে তার চাচা মুহাম্মাদ বিন মুসতাযহারকে আল মুকতাযা লি আমরিল্লাহ উপাধি দিয়ে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। এটা ৫৩০ হিজরির যিলকদ মাসের ষোলো তারিখের ঘটনা।

সংবাদ পেয়ে রাশেদ বিপুল অর্থ- সম্পদের লোভ দিয়ে এক দল সৈন্য নিয়ে আজারবাইযান চলে যান। সৈন্যরা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এরপর হামদান গিয়ে সেখানেও নারকীয় তান্ডব চালায়। অনেক লোককে হত্যা, অনেককে শুলেতে চড়ানো আর বহু আলিমের দাঁড়ি কামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ইস্পাহান অবরোধ করে শহরে ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

৫৩২ হিজরির রমযান মাসের ষোলো তারিখে এক আযমী লোক তার তাঁবুতে ঢুকে ছোরা দিয়ে তাকে হত্যা করে। তার সাথে খলীফার সহচরদেরও সে হত্যা করে। খবর পেয়ে বাগদাদবাসী এক দিন মাতম করে।

উম্মাদ কাতেব বলেছেন, রাশেদ ছিলেন ইউসুফ (আঃ) এর লাবণ্য আর দানশীলতার সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব।

চাদর আর ছরি মৃত্যু পর্যন্ত রাশেদের কাছেই ছিল। মৃত্যুর পর সেগুলো মুকতাফীর কাছে পৌঁছে যায়।

আল মুকতাফী লি আমরিল্লাহ

৪৮৯ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখে আল মুকতাফী লি আমরিল্লাহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আল মুসতাযহার বিল্লাহ এক হাবশি বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

রাশেদকে অপসারণের পর চল্লিশ বছর বয়সে তিনি খিলাফতের তখতে বসেন।

আল মুকতাফী লি আমরিল্লাহ উপাধি ধারণ করার কারন হলো, তিনি খলীফা হওয়ার ছয় দিন আগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, অচিরেই তুমি খিলাফত পাবে, তুমি আল মুকতাফী লি আমরিল্লাহ লকব ধারণ করবে। ফলে তিনি সেটাই করেন।

মুকতাফী তখতে আরোহণ অন্তে ইনসাফ ও সুবিচারের মাধ্যমে গোটা বাগদাদ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেললে সুলতান মাসউদ দারুল খুলাফার সকল আসবাবপত্র যেমন চতুষ্পদ প্রাণী, গৃহের সহজ সরঞ্জাম স্বর্ণ, রৌপ্য, পর্দা ইত্যাদি নিয়ে নেয়। খিলাফতের আস্তাবলে চারটি ঘোড়া আর আটটি গাধা ছাড়া আর কিছুই সে রেখে যায়নি। কথিত আছে, বাইয়াতের সময় মুকতাফীর সাথে মাসউদের এমন শর্তই ছিল।

এরপর ৫৩১ হিজরিতে সুলতান মাসউদ কয়েকটি বাগান ছাড়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত সকল জিনিসপত্র নিজের অধীনে নেয়, এরপরও সে খলীফার কাছ থেকে এক লাখ দিনার নিয়ে আসার জন্য নিজের উযিরকে পাঠায়। মুকতাফী বললেন, বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, তোমরা জানো মুসতারশিদ নিজের সকল সম্পদ নিয়ে মাসউদের কাছে চলে গিয়েছিলেন। এতে যে অবস্থা হয় তা দুনিয়াবাসী জানে। এরপর রাশেদ খলীফা হয়ে যা করেছেন তা দিবালোকের মতো উজ্জ্বল। এরপরেও যা ছিল ঘরের জিনিসপত্রসহ মাসউদ নিজেই সেগুলো নিয়ে গেছে। মাসউদ উক্ত দুই খলীফার ধনাগারও লুণ্ঠন করেছে। এখন আমি তোমাকে কোথা থেকে সম্পদ এনে দিবো ? বর্তমানে শুধু এতটুকুই বাকি আছে যে, নিজের ঘরবাড়ি তোমাদের ছেড়ে দিয়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাবো। আমি আল্লাহ'র সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আমি মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে একটি দানাও আদায় করবো না।

এ কথা শুনে মাসউদ নিজের অভিপ্রায় প্রত্যাহার করে। কিন্তু সে সম্পদ আরোহণের জন্য লোকদের উপর কঠোরতা আরোপ করতে থাকে। ব্যবসায়ীদের উপর ট্যাক্সের বড় বড় বোঝা চাপিয়ে দেয়।

এ বছর রমযান মাসের ২৯ তারিখ চাঁদ দেখা না যাওয়ায় আহলে বাগদাদ রোযা রাখে, সন্ধ্যায় ৩০ তারিখেও চাঁদ দেখা গেলো না, যা এর আগে হয় নি।

৫৩৩ হিজরিতে বিহতারাহ শহরে এক লাখ আশি হাজার ফুট পর্যন্ত ভয়ংকর ভূমিকম্পে অনেক মানুষ হতাহত হয়। শহরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর এর মাটি ফেটে কালো পানি বেরিয়ে আসতে থাকে। এ বছর শহরগুলো

খলীফার নিয়ন্ত্রণে আসে। মাসউদ দুর্বল, অসহায় আর নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সুলতান সিনজরেরও একই অবস্থা হয়। আল্লাহ তাদের দুজনকে অপমানের মাধ্যমে মুকতাফীকে সম্মানিত করেন আর তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। খিলাফতের সীমানার মধ্যে খলীফার প্রতাপ বৃদ্ধি পায় আর বনু আব্বাসের রাজত্বের সংশোধনের সূত্রপাত হয়। (الحمد الله على ذلك)

৫৪১ হিজরিতে মাসউদ বাগদাদে এসে মুদ্রা প্রস্তুতকারী কারখানার ভিত্তি দেয়। এ কারখানায় মুদ্রা তৈরির কারিগরদের খলীফা বন্দী করেন। মাসউদ খলীফার প্রহরীকে গ্রেফতার করায় খলীফা রেগে যান। তিনদিন পর্যন্ত মসজিদগুলোর দরজা বন্ধ ছিল। অবশেষে বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এ বছর ইবনে উবাবী ওয়াজের মজলিসে বসে আসেন। সুলতান মাসউদ সেই মাহফিলে হাযির ছিল। ইবনে উবাবী সুলতান কর্তৃক জনগণের উপর অত্যাচারের বিবরণদানে মাসউদকে বললেন, "শুল্ক আদায়কারী অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করে, আর আপনি সেই আদায়কৃত কর একই রাতে গায়কদের দিয়ে দেন; অথচ আপনার তো আল্লাহ'র দরবারে শুকরিয়া করা উচিত।" মাসউদ এ নসিহত গ্রহণ করে শহরময় এলান করে জানিয়ে দেয় যে, আর কেউ করারোপ করবে না। এ ঘোষণাটি কাঠের ফলকে লিখে তা অত্যন্ত শান শওকতের সাথে গোটা শহর প্রদক্ষিণ করানোর পর এক জায়গায় পুঁতে দেওয়া হয়। এ ফলকটি আন নাসর লি দ্বীনিল্লাহ'র যুগ পর্যন্ত প্রোথিতই ছিল। কিন্তু তিনি এই বলে তা তুলে ফেলেন - অনারবদের রীতি আমার প্রয়োজন নেই।

৫৪৩ হিজরিতে ফিরিঙ্গীরা দামেশক অবরোধ করলে হলবের শাসনকর্তা নুরুদ্দিন মাহমুদ বিন জঙ্গি আর তার ভাই তাদের মোকাবিলা করেন। আলহামদুলিল্লাহ্, মুসলমানগণ বিজয় অর্জন করেন। নুরুদ্দিন জঙ্গি ফিরিঙ্গীদের সাথে লড়াই করতেই থাকেন। অবশেষে তিনি সকল শহর, নগর, জনপদ উদ্ধার করেন - যা মুসলমানদের হাত থেকে ফিরিঙ্গীরা ছিনিয়ে নিয়েছিলো।

৫৪৪ হিজরিতে মিসরের শাসনকর্তা আল হাফিয আদ্দীনিল্লাহ মারা যায়। তার স্থানে তার পুত্র আয- যাহের ইসমাইল উপবেশন করে। এ বছর বাগদাদে ভুমিকম্প আর দশবার বন্যা হয়। সে সময় হিলওয়ানের একটি পাহাড় ভেঙে পড়ে।

৫৪৫ হিজরিতে ইয়েমেনে রক্তের বৃষ্টি হয়। কয়েক দিন পর্যন্ত যমীন লাল হয়ে ছিল। লোকদের কাপড় লাল হয়ে যায়।

৫৪৭ হিজরিতে সুলতান মাসউদ মারা যায়।

মুকতাফীর উযির ইবনে হুবায়রাহ বলেছেন, মাসউদ জনসাধারণ আর মুকতাফীর প্রতি জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ করলে প্রকাশ্যে এর মোকাবিলা করার মতো শক্তি আমাদের ছিল না। ফলে আমি আর মুকতাফীর মধ্যে পরামর্শ হয় যে, একমাস অবিরাম আমরা মাসউদের জন্য বদদুয়া করবো। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিআল আর যাকওয়ান (দুটি আরব কবিলার নাম - অনুবাদক) এর জন্য একমাস

বদদুয়া করেছিলেন। আমরা জমাদিউল আউওাল মাসের ২৯ তারিখ রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে খুবই গোপনীয়তার সাথে বদদুয়া করতে শুরু করলাম। একমাস পূর্ণ হলে মাসউদ মারা যায়।

মাসউদের পরলোক গমনের পর সেনাবাহিনী মূলক শাহ'র বিষয়ে একমত হয়। ফলে মূলক শাহ সুলতান মনোনীত হয়। কিন্তু খাস বেগ তার উপর হামলা চালিয়ে তাকে বন্দী করে। এরপর খাস বেগ তার ভাই মুহাম্মাদকে খুযস্তান থেকে ডেকে এনে তার উপর সালতানাত সোপর্দ করে। সে দিন থেকে মুকতাফী মুক্ত স্বাধীন খলীফা হিসেবে পরিণত হোন। সাম্রাজ্যের সর্বত্রই খলীফার আহকাম জারি হয়। সুলতান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাদরাসা নিযামিয়া থেকে অপসারণ করেন। এমন সময় ওয়াসেতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গোলযোগের সংবাদ পেয়ে খলীফা নিজেই সসৈন্যে তাদের দমন করে হিল্লা আর কুফা পদাবনত করে বাগদাদে ফিরে আসেন। সেদিন বাগদাদ নগরী অপরূপ সাজে সুসজ্জিত হয়েছিলো।

৫৪৮ হিজরিতে তুর্কীরা সিনজরের উপর হামলা চালিয়ে তাকে বন্দী করে। তারা তাকে অপমান করে আর তার রাজত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তবে রাজত্ব ছাড়া নবাবের মতো তখনো তার নাম খুৎবায় পড়া হতো। অবশেষে সে অনুতপ্ত হলে নামেমাত্র সুলতান উপাধি দিয়ে ঘোড়া চালকের সমান তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়।

৫৪৯ হিজরিতে আয যাহের বিল্লাহ উবায়দী নিহত হওয়ায় তার ছেলে আল ফায়েয ঈসা তার স্থানে সমাসীন হয়। ঈসার বয়স অল্প হওয়ায় রাষ্ট্রীয় কাজে সে অনেক ভুলত্রুটি করে ফেলে। সুযোগ দেখে মুকতাফী নুরুদ্দিন জঙ্গিকে মিসর অধিকার করার জন্য লিখিতভাবে জানান। নুরুদ্দিন জঙ্গি সে সময় ফিরিঙ্গীদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এ যুদ্ধ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া সঙ্গত মনে করলেন না। কারন দামেশকে অনেক শহর আর দুর্গ তিনি জয় করেছিলেন, এতে সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরপরও রোমান শহরগুলো তিনি দখল করেছিলেন। তার বীরত্বের কাহিনী দূর প্রাচ্যের অন্তরেও গেঁথে গিয়েছিলো। অবশেষে বাধ্য হয়ে মুকতাফীর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মিসরে যান। খলীফা তাকে মুলকুল আদেল উপাধিতে ভূষিত করেন। এ সময় মুকতাফীর শান শওকত বেড়ে যায়। বিরোধীরা তার প্রভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তিনি জিহাদের মাধ্যমে শত্রুদের প্রতিহত করেন আর তার সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়তেই থাকে। তিনি ৫৫৫ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ৬ তারিখে রবিবার রাতে ইন্তেকাল করেন।

যাহাবি বলেছেন, মুকতাফী খলীফাদের মুকুট, আলেম, সাহিত্যিক, ধৈর্যশীল, বাহাদুর, চরিত্রবান, বিশ্বস্ত আর খেলাফত পরিচালনায় দক্ষ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আইম্মাদের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল। তার খিলাফতকালে সততা, সুবিচার আর আমানত খেয়ানতের কোন দৃষ্টান্ত নেই।

মুকতাফী তার উস্তাদ আবুল বারাকাত বিন আবুল ফরজ বিন আসসিন্নীর কাছে হাদিস শুনেছেন। ইবনে সুমআনী বলেছেন, আর কিছু (হাদিস) তিনি তার ভাই মুসতারশিদের সাথে আবুল কাসিম বিন বয়ানের থেকেও শুনেছেন। আর তার কাছ থেকে ইমাম আবু মানসুর আল জাওয়ালিকা লাগবী আর তার উযির ইবনে হুবায়রাহ হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন।

মুকতাফী কাবা শরীফের একটি নতুন দরজা নির্মাণ করেন। নিজের দাফনের জন্য আকিক পাথরের শববাহী খাট তৈরি করেন। তিনি নেক স্বভাব, সাম্রাজ্যের গর্ব, দ্বীনদার, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ অভিমত পোষণকারী আর রাজনীতিবিদ খলীফা ছিলেন। তিনি খিলাফতকে পুনর্জীবন দান করেন। খিলাফতের রীতিনীতি পুনরায় জারি করেন। রাষ্ট্রীয় কাজ তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন, রণাঙ্গনে সশরীরে উপস্থিত হতেন। তার খিলাফতকালে আল্লাহ প্রচুর বরকত দান করেছিলেন।

আবু তালিব আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুস সমী হাশেমী স্বরচিত 'মানাকিবুল আব্বাসিয়া' নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ ইনসাফ আর নেক কাজের কারণে মুকতাফির যুগ ছিল সবুজ- শ্যামল। তিনি খলীফা হওয়ার পূর্বে অধিকাংশ সময় ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি দ্বীনের কাজ, কুরআন তিলাওয়াত আর ইলম অর্জনে ব্যস্ত ছিলেন। খলীফা মুতাসিমের পর এমন নরম দিল, চরিত্রবান, বীর, সাহসী ও নির্ভীক কোন খলীফা অতবাহিত হননি মুসতাকফী ছাড়া। তার বীরত্ব, সাহসিকতা আর নির্ভীকতার মধ্যে ইবাদত আর পরহেযগারের সংমিশ্রণ ছিল। তার সৈনিকেরা যেখানে যেতো, সেখানেই সর্বদা বিজয় ছিনিয়ে আনতো। তিনি কোথাও পরাজিত হতেন না।

ইবনে জাওযী বলেছেন, মুকতাফীর খিলাফতকালে বাগদাদ ও ইরাক আবার খলীফার হাতে আসে। সে সময় কোন লোক ঝগড়া করতো না। মুকতাযদের যুগ থেকে মুকতাফীর খিলাফতের সূচনালগ্ন পর্যন্ত বাগদাদ ও ইরাক নামমাত্র খলীফার অধীনে ছিল, নায়েবে সালতানাতই প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ হয়ে জেঁকে বসেছিলো। মুকতাফীর নায়েব হলেন খুরাসানের শাসনকর্তা সিনজর আর শামের শাসনকর্তা নুরুদ্দিন জঙ্গি। মুকতাফী খুবই দানশীল, দয়ার্দ্র, হাদিসের উপর আমলকারী, তিনি নিজে আলিম আর আলিমদের মর্যাদা দানকারী।

একদিন মুকতাফী ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য আবু মনসুরকে আহ্বান জানালেন। তিনি এসে ভাবে সালাম দিলেন – السلام على امير المؤمنين ورحمة الله

সে সময় তবীব ইবনে তিলমিয নাসরানী দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবু মানসুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শায়খ, এটাই কি সালামের রীতি ?" ইমাম আবু মানসুর খলীফাকে বললেন, "আমিরুল মুমিনীন, এ সালাম নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নত।" এরপর তিনি এর সমর্থনে একটি হাদিস পাঠ করে শুনালেন। এরপর বললেন, "কোন ইহুদী আর খ্রিস্টান ইলম অর্জন করতে পারবে না, যদি কেউ এ কথার উপর কসম করার পর তা ভেঙে দেয়, তাহলে সে কসমের কাফফারা দিতে হবে না। কারন তাদের ভিতর কোন ঈমান নেই। আল্লাহ তাদের অন্তরে সিল এঁটে দিয়েছেন।" মুকতাফী বললেন, "আপনি সত্যিই বলেছেন। ইবনে তিলমিয যদিও জ্ঞানী আর সুসাহিত্যিক, তবুও (খ্রিস্টান হওয়ার কারণে - অনুবাদক) তার মুখে পাথরের লাগাম লাগান।"

তার শাসনামলে যেসব ওলামা ইন্তেকাল করেছেন তারা হলেন – ইবনুল আবরাশ নাহুবী, ইউসুফ বিন মুগীস, জালালুল ইসলাম বিন মুসলিম আশ শাফি, তাহযিবের লেখক আবুল কাসিম ইস্পাহানী, ইবনে বুরজানো, মারযী মালিকী, যমখশরী, ইমামে হানাফি রিশা তঈ, ইবনে আতীয়া, আবুস সায়াদাত বিন শাজ্জারী, ইমাম

আবু বকর বিন আরাবী, কবি নাসিহুদ্দীন আরজানী, কাযী আয়ায, হাফেজ আবু লায়দ বিন দাবাগ, আবুল আসআদ হাত্তার রহমান আল কাশিরী, ইবনে আলাম আল ফরশ আল মাকরী, কবি রিফা, শহর সিতানী, কবি কিসরানী, ইমাম গাযালীর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, আবুল ফজল বিন নাসের আল হাফেজ, আবুল কারাম শহরুযী আল মাকরী, কবি আলওয়া, ইবনুন নখল ইমাম শাফীয়া প্রমুখ।

আল মুসতানজিদ বিল্লাহ

আল মুসতানজিদ বিল্লাহ আবুল মুযাফফর ইউসুফ বিন আল মুকতাফী ৫১৮ হিজরিতে গিরজিস্তানের তাউস নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

৫৪৭ হিজরিতে মুকতাফী তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। মুকতাফীর মৃত্যুর পর তার কাছে বাইয়াত করা হয়।

মুসতানজিদ ইনসাফ, সুবিচার ও নমনিয় স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি অনেক শুল্ক ক্ষমা করে দেন। ইরাকের সমস কর মাফ করেন। বখাটে ও সন্ত্রাসী লোকদের সাথে তিনি কঠোর আচরণ করতেন। এক লোক মানুষের ক্ষতি করতো, তাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়। আরেক লোক তার মুক্তিপণ হিসেবে দশ হাজার দিনার দেওয়ার প্রস্তাব দিলে খলীফা তা প্রত্যাখ্যান করেন আর বলেন, “এ লোকটিকে বন্দী করতে পারলে আমিই দশ হাজার দিনার পুরস্কার দিবো।”

ইবনে জাওযী বলেছেন, মুসতানজিদ বিল্লাহ উজ্জ্বল প্রাজ্ঞতা, নির্ভুল অভিমত, সঠিক বিচার, প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর দয়ার্দ্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উপমাহীন পদ্য আর বাকবিদগ্ধ গদ্য রচনা করেন। ইলম ও বীরত্বে তার দক্ষতা প্রসিদ্ধ। তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন।

খিলাফত লাভের প্রথম বছর অর্থাৎ ৫৫৫ হিজরিতে মিসর শাসনকর্তা আল ফায়েয মারা গেলে তার ছেলে আযদলিদ্বীনিল্লাহ তখতে উপবেশন করেন। তিনি হলেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলীফা।

৫৬২ হিজরিতে সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গি আমীর আসাদউদ্দিনকে দুই হাজার অশ্বারোহী দিয়ে মিসরে পাঠান। আসাদউদ্দিন দুইমাস পর মিসর অবরোধ করে রাখেন। মিসরের শাসনকর্তা ফিরিঙ্গীদের সাহায্য প্রার্থনা করে। দিময়াত থেকে সাহায্য এসে পৌঁছলে আসাদউদ্দিন সাইদ শহরে চলে যান। সেখানে মিসরীদের সাথে যুদ্ধ হয়। শত্রু বাহিনীর তুলনায় নিজের সৈন্য সামান্য হওয়ার পরও আসাদউদ্দিন বিজয় অর্জন করেন, সহস্রাধিক ফিরিঙ্গী ভূগর্ভস্থ কক্ষে শায়িত হয়। যুদ্ধ শেষে তিনি সাইদ শহরের খারাজ মাফ করে দেন। এরপর ফিরিঙ্গীরা ইস্কান্দারিয়া আক্রমণ করতে চাইলে তা আগেই আসাদউদ্দিনের ভাতিজা সালাহুদ্দিন ইউসুফ বিন আইয়ুব দখল করে নিয়েছিলেন। ফিরিঙ্গীরা চার মাস ইস্কান্দারিয়া অবরোধ করে রাখে। সংবাদ পেয়ে আসাদউদ্দিন ধেয়ে এলে তারা পালিয়ে যায়। তিনি সসৈন্যে সিরিয়ায় ফিরে আসেন।

৫৬৪ হিজরিতে ফিরিঙ্গীরা বিশাল বাহিনী নিয়ে মিসরে হামলা করে। মিসরের শাসনকর্তা ভয় পেয়ে কাহেরা শহরে আগুন লাগিয়ে দেয় আর সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গির সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠায়। সাহায্য করতে আসাদউদ্দিন এগিয়ে যান। খবর পেয়ে তারা পালিয়ে যায়। মিসরের শাসনকর্তা তাকে কলম, দোয়াত আর খিলআত প্রদান করেন। তিনি তা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু জীবন তাকে ছাড় দেয়নি। ৫৬৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। এরপর মিসরের শাসনকর্তা তার ভাতিজা সালাহউদ্দিন ইউসুফ বিন আইয়ুবকে উযির

নিয়োগ করে মুলকুন নাসের উপাধি দেয়। সালাহুদ্দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত এখানেই মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। ৫৬৬ হিজরির রবিউস সানি মাসের আট তারিখে খলীফা মুসতানজিদ ইন্তেকাল করেন।

যাহাবি বলেছেন, মুসতানজিদ অসুস্থ অবস্থা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে আকাশ লাল হয়ে ছিল, যার আলো আর লাল বর্ণ দেওয়ালে দেখা যেতো।

তার শাসনামলে যেসকল ওলামায়ে কেরামগণ ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - মুসনাদ আল ফিরদাউসের লেখক দায়লামী, আল বয়ান শাফীয়ার লেখক উমরানী, ইবনে বাযযারী শাফী, উযির ইবনে হুবায়রাহ, শায়খ আবদুল কাদির জিলানী, ইমাম আবু সাইদ সুমআনী, ইবনে নাজীব সহরওয়ারদী, আবুল হাসান বিন হাযীল আল মাকরী প্রমুখ।

আল মুসতাযা বি আমরিল্লাহ

আল মুসতাযা বি আমরিল্লাহ আল হাসান বিন আল মুসতানজিদ বিল্লাহ ৫৩৬ হিজরিতে আর্মেনীয় গোযযা নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার ইন্তেকালের পর তিনি তখতে আরোহণ করেন।

ইবনে জাওযী বলেছেনঃ তিনি সরকার প্রধান হওয়ার পর সকল শুল্ক মওকুফ করে দেন, এতে করে জুলুমের গতিরুদ্ধ হয়, চারদিকে ইনসাফের শীতল বাতাস ছড়িয়ে পড়ে। আমি নিজের জীবনে কখনোই এমনটা দেখিনি। হাশেমী, উলুববী, ওলামায়ে মুদাররিসীন আর ইমামদের পিছনে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন, তিনি সর্বদা অর্থ ব্যয় করতেন। তার দৃষ্টিতে অর্থের কোন মূল্য ছিল না। তিনি খুবই নম্র আর দয়ার্দ্র ছিলেন। তিনি খলীফা হওয়ার সময় সকল সুলতানদের খিলাআত প্রদান করেন। মাখযিন ওয়ারযী বলেন, সে সময় তিনি লোকদের মাঝে এক হাজার তিনশো রেশমের কাবা (আলখেল্লা) বন্টন করেন। বাগদাদে তার নামে খুৎবা পাঠ করা হলে তিনি অনেক দিনার সদকা করে দেন। রূহ বিন হাদিসিকে কাযিউল কুযযাত মনোনীত করে তাকে সতেরোটি গোলাম দান করেন।

ইবনে জাওযী বলেছেনঃ তিনি অধিকাংশ লোক থেকে পর্দা করতেন। খাদেম ছাড়া তিনি সওয়ার হতেন না আর সেবকগণ ছাড়া তার কাছে কেউ যেতে পারতো না।

কবি হায়েস বায়েস তার শানে দীর্ঘ কবিতা রচয়া করেছেন। তার খিলাফতকালে উমাইয়া বংশীয় শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মিসরে তার নামে খুৎবা দেওয়া আর মুদ্রায় তার নাম খোদাই করা হয়। লোক মারফত এ সংবাদ বাগদাদে পৌঁছুলে একাধিক বাতির সমাহারে তীব্র আলোর ঝলকানিতে বাজার ঝলমল করে উঠে। ইবনে জাওযী বলেন, আমি এ ঘটনাকে নিয়ে 'আল নসর আলাল মিসর' নামে পৃথক একটি বই লিখেছি।

যাহাবি বলেছেনঃ ৫৬৭ হিজরিতে বাগদাদে রাফেযিদের প্রভাব একেবারেই নিঃশেষিত হয়। লোকদের নিরাপত্তা নসীব হয় আর সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ইয়ামান, বুরকা, তুরিয, মিসর আর উসওয়ান পর্যন্ত তার নামে খুৎবা পাঠ হতে থাকে। অধিকাংশ বাদশা তার ফরমানগত হয়ে পড়ে।

উবাদ কাতেব বলেছেনঃ ৫৬৭ হিজরিতে সুলতান সালাহুদ্দীন বিন আইয়ুব মিসরের জামে মসজিদে আনুগত্যের উপর বয়ান করেন। প্রথম জুমআয় মিসরে তিনি বনু আব্বাসের নামে খুৎবা পাঠ করেন, এতে বিদআত নাস্তানাবুদ হয় আর শরীয়ত হয় স্পষ্ট। দ্বিতীয় জুমআয় তিনি বনু আব্বাসের নামে কাহেরায় খুৎবা দেন। এরপর আশুরার দিন মিসরের শাসনকর্তা আল আযদ বিল্লাহ মারা যায়। সালাহুদ্দীন তার সকল পরিত্যক্ত সৌখিন আসবাবপত্র হস্তগত করেন, এর মধ্যে মূল্যবান ও পছন্দনীয় জিনিশগুলো রেখে তিনি সবগুলো বিক্রি করে দেন। এগুলো বিক্রি করতে লেগেছিল দশ বছর। সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গি এ সুসংবাদ দিয়ে শিহাবুদ্দিন আল মুযাফফর বিন আল আল্লামা বিন আবি উসরুনকে বাগদাদে পাঠান আর আমাকে (উবাদ কাতেব) খোশখবরীনামা লিখার নির্দেশ দেন। আমি লিখলাম –আল্লাহ তাআলা সত্যকে জয়যুক্তকারী,

তিনি সত্যকে প্রকাশ আর ভ্রষ্টতাকে ধ্বংস করেছেন। তার করুনায় আমরা কৃতজ্ঞ। শহর নগর জনপদের এমন কোন মিম্বর নেই, যেখানে আমাদের ইমাম মুসতাযা বি আমরিল্লাহ আমিরুল মুমিনীনের নামে খুৎবা পড়া হয়নি। সকল মসজিদ ইবাদতারী আর দানশীলদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। বিদআতের মারকাযগুলো ভেঙে পড়েছে। আল্লাহ আমাদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের জন্য যমীনকে বিস্তৃত করেছেন। আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদেরকে আল হাদ আর রাফেযদের উৎখাত করার তাওফিক দিয়েছেন। আমরা তদের ধ্বংস করতে পেরেছি। (হে আল্লাহ,) আব্বাসীয় রাজত্ব সত্যের উপর সুপ্রতিষ্থিত করার তৌফিক আমাদের দিন।

এ চিঠিসহ বাগদাদে দূত পৌঁছালে খলীফা সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গি আর সালাহুদ্দীনকে খিলআত ও মর্যাদাবান বস্তু আর উম্মাদ কাতেবের জন্য খিলআত ও একশো দিনার পাঠিয়ে দেন।

ইবনে আসির বলেছেনঃ সুলতান সালাহুদ্দীন মিসরের শাসনক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নিলে আযিদ দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গি সুলতান সালাহুদ্দীনকে খুলাফায়ে বনু আব্বাসের নামে খুৎবা পাঠ করতে বললেন। কিন্তু তিনি মিসরবাসীর অবাধ্যতার আশংকায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নুরুদ্দিন জঙ্গি খুৎবা পড়ার জন্য আবার তাকীদ দিলেন। ফলে তিনি আমীর উমারাদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন। কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে মতামত তুলে ধরলো। এমন সময় আমিরুল আলিম নামের মিসরের এক আজমী লোক এসে বললো, আমি সর্বপ্রথম এ কাজ শুরু করবো। অতএব মুহাররম মাসের প্রথম জুমআয় সে ইমামের পূর্বে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খলীফার জন্য দুয়া করে। লোকেরা বাধা দিলো না। দ্বিতীয় জুমআয় সালাহুদ্দীন আযীদের নামীয় খুৎবা বর্জনের নির্দেশ দেন। হুকুম তামিল করা হলো। লোকেরা কোনই কথা বলল না। সে সময় আযীদের অসুস্থতা দিন দিন বেড়েই চলেছিলো। অবশেষে সে আশুরার দিন মারা যায়।

৫৬৯ হিজরিতে সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গি উপহারস্বরূপ খলীফার কাছে একটি গাধা পাঠান। এর শরীরে অক্ষরিক দাগ ছিল, একে উতাবী গাধা বলা হতো। এ বছর দজলা ও ফোরাতের পানিতে বাগদাদ প্লাবিত হয়। এ বছর দামেশকের শাসনকর্তা সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গির ইন্তেকালে তার ছেলে মুলকুস সালেহ ইসমাইল তখতে নসীন হয়। এ বছর ফিরিঙ্গীরা হামলা করতে এলে অনেক ধনদৌলত দিয়ে তাদের সাথে সন্ধি করা হয়। এ বছর উমাইয়া বংশীয় হিতাকাঙ্ক্ষীরা বনু উমাইয়ার সালতানাত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। সুলতান সালাহুদ্দীনের আমীরগণও এ চক্রান্তে যোগ দেয়। সংবাদ পেয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন তাদের সকলকে বন্দী করে শূলে চড়ান।

৫৭২ হিজরিতে সুলতান সালাহুদ্দীন মিসর আর কাহেবার পাশে প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ দেন। এ কাজ বাহাউদ্দিনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইবনে আসির বলেছেন, এ প্রাচীর ছিল উনত্রিশ হাজার তিনশো হাত। এ বছর তিনি জাবালে মুকতমে একটি দুর্গ নির্মাণের আদেশ দেন। কিন্তু তিনি এর শেষ দেখে যেতে পারেননি। এ বছর তার ইন্তেকাল হয়। তার ভাতিজা সুলতান মুলকুল কামেল এ কাজটি সমাপ্ত করেন। এ বছর সুলতান সালাহুদ্দীন ইমাম শাফির কবরে মাযার তৈরি করেন।

৫৭৪ হিজরিতে বাগদাদে অন্ধকার নেমে আসে আর আকাশে আগুনের মিনার দেখা দেয়।

৫৭৫ হিজরির শাওয়াল মাসের শেষে মুসতাযা ইন্তেকাল করেন।

তার খিলাফতকালে যে সকল ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - নাহুবিদ ইবনে খুশাব, মুলকুল নাজ্জাত আবু নাজ্জার আল হাসান বিন সাফী, হাফেজ আবুল আল্লামা হামদানী, নাহুবিদ নাসিহুদ্দিন বিন দিহান, ইমাম শাফির আওলাদ হাফেজ আল কাবির আবুল কাসিম বিন আসাকির, কবি কায়েস বায়েস, হাফেজ আবু বকর বিন খায়রু প্রমুখ।

আন নাসর লিদ দ্বীনিল্লাহ

আন নাসর লিদ্বীনিল্লাহ আহমাদ আবুল আব্বাস বিন আল মুসতাযা বি আমরিল্লাহ ৫৫৩ হিজরির রযব মাসে যুমরাদ নামক তুর্কি বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

৫৭৫ হিজরির যিলকদ মাসের চাঁদনী রাতে তিনি তখতে আরোহণ করেন।

মুহাদ্দিসীনদের একটি জামাত তাকে হাদিস বর্ণনা করার অনুমতি দেন। সেই মুহাদ্দিসিনদের মধ্যে আবুল হুসাইন আবদুল হক আল ইউসুফী আর আবুল হাসান আলী বিন আসাকির আলবাহাতী প্রমুখ অন্যতম। তিনি নিজেও এক জামাতকে হাদিস বর্ণনা করার ইজাযত দেন। তার শাসনামলে লোকেরা তার থেকে সনদ ছাড়া বর্ণনা করাকে গর্বের বিষয় মনে করতো।

যাহাবী বলেছেন, এতো দীর্ঘ সময় ধরে কোন খলীফা খিলাফতের কাজ পরিচালনা করেননি। তিনি ৪৭ বছর তখতে নসীন ছিলেন। তিনি সারা জীবন ইজ্জত ও সম্মানের সাথে বেঁচে ছিলেন। তিনি সকল শত্রুদের মূলোৎপাটন করেন। সকল সুলতান প্রকাশ্যে তার আনুগত্য ঘোষণা করে। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সাহস কারো ছিল না। তার উপর হামলা করার ধৃষ্টতাও কেউ দেখায়নি। যদি কেউ হামলা করেছে তো সাথে সাথে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন বিরোধী চক্র মাথা তুললে সাথে সাথে তা দমন করা হয়। কেউ তার অনিষ্ট করতে চাইলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিতেন। তিনি নিজ পিতামহের মতো কল্যাণধর্মী কাজে খুবই যত্নবান ছিলেন। তার ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন। তিনি প্রজা হিতৈষী মানুষ ছিলেন। প্রত্যেক শহরে সংবাদ সরবরাহের কাজে একাধিক লোক নিয়োগ ছিল। তারা সকল সুলতানের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সংবাদ লিখে জানাতো। তিনি রাজনৈতিক কূটচাল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছিলেন অবিসংবাদিত।

খলীফা আন নসর গায়েবের খবর জানোতেন না। একবার খাওয়ারিযম শাহীর দূত একটি মোহর আটানো পত্র নিয়ে বাগদাদে আসে। খলীফা তাকে বললেন, "তুমি ফিরে যাও, পত্রের বিষয়বস্তু আমার অজানা নয়।" দূত ফিরে গেলো।

যাহাবি বলেছেন, লোকদের ধারণা - খলীফার বশে জীন ছিল। খুরাসান আর মাওরাউন নাহারের বাদশাহ খাওারিযম লোকদের উপর অত্যাচার করতো, প্রতাপশালী রাজাদের হাত করেছিলো, শহরের পর শহর লুণ্ঠন করতো আর মুসলিম বিশ্বে বনু আব্বাসের নাম খুৎবা থেকে বাদ দেওয়া হয়। সে বাগদাদ দখলের জন্য হামদান শহরে পৌঁছুলে ২০ দিন পর বিরামহীন বরফ বর্ষিত হয়। ফলে সে আর সামনে এগুতে পারে না। এ পরিস্থিতিতে তার সাথীরা মন্তব্য করলো, খলীফার উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে বিধায় আল্লাহ এ গযব নাযিল করেছেন। অবশেষে সে ফিরে যায়।

আন নাসর যখন লোকদের শাস্তি দিতেন, তখন দারুন কঠোরতা অবলম্বন করতেন। আর কাউকে দান করলে নিশ্চিতভাবে তার দুস্থতা ও দারিদ্রতা কেটে যেতো। এক ব্যক্তি ভারত থেকে খলীফার জন্য একটি তোতা পাখি

এনেছিল। পাখিটি قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ পড়তে পারতো। বাগদাদ পৌঁছে সেদিন পাখিতি মারা যায়। সকালে লোকটি দারুন বিচলিত হয়ে পড়ে। এমন সময় খলীফার খাদেম এসে বললো, “পাখিটি কোথায় ?” সে বললো, “মারা গেছে।” খাদেম বললো, “বলতো, কতটুকু পুরস্কার পাওয়ার আশায় তুমি খলীফার জন্য পাখিটি এনেছিলে ?” সে বললো, “পাঁচশো দিনারের আশা ছিল।” খাদেম তার কাঙ্ক্ষিত অর্থ তাকে দিয়ে বললো, “এগুলো খলীফা তোমাকে দিয়েছেন। তুমি ভারত যাওয়ার পর থেকেই খলীফা এ ব্যাপারে জানোতেন।”

একবার সদরে জাঁহার সাথে অনেক মুফতি বাগদাদে আসেন। এদের মধ্যে একজন ফকিহ তার নিজের ঘোড়ায় চড়ে নিজ বাসস্থান সমরকন্দ থেকে বাগদাদে আসার সময় তার স্ত্রী ঘোড়াটি রেখে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বললো, “এতো সুন্দর ঘোড়াটি তুমি নিয়ে যেও না, খলীফা দেখলে কেড়ে নিবেন।” মুফতি সাহেব বললেন, “খলীফার এতোটা দুঃসাহস হবে না।” এর মধ্যেই বিষয়টি খলীফার কানে পৌঁছে যায়। তিনি তার শাহী বাবুর্চিকে বাগদাদে এলে সেই মুফতি সাহেবের ঘোড়াটি কেড়ে নেওয়ার আদেশ দেন। সেটাই হলো। শখের ঘোড়াটি হাতছাড়া হওয়ায় ফকিহ দারুন বেদনায় হতবিহবল হয়ে পড়লেন। সদরে জাঁহা ফিরে যাওয়ার সময় খলীফা সকল মুফতির খিলআত প্রদান করলেন, সেই মুফতিও খিলআত প্রাপ্ত হোন। খিলআত হিসেবে খলীফা তাকে তার অনিন্দ সুন্দর শখের প্রিয় ঘোড়াটি প্রদান করলেন। প্রদানের সময় খলীফা তাকে বললেন, “তোমার ঘোড়াটি কেড়ে নেওয়ার মতো দুঃসাহস এই খলীফার না থাকলেও তারই এক নিম্নস্তরের গোলাম তা ছিনিয়ে নিয়েছিলো।” এ কথা শুনে মুফতি সাহেব বিসসয়াবিভুত হয়ে পড়েন আর খলীফার কারামতের কায়িলে পরিণত হোন।

আল মুফিক আবদুল লতিফ বলেছেন, মানুষের অন্তরে খলীফার ভয় জেঁকে বসেছিলো। বাগদাদের লোকদের মতোই ভারত আর মিসরের জনগন তাকে ভীষণ ভয় পেতো। খলীফা মুতাসিমের পর যে বীরত্ব, নির্ভীকতা আর সাহসিকতার অপমৃত্যু ঘটেছিলো, তিনি তা পুনর্জীবিত করেন। এরপর তার অন্তর্ধানে খিলাফতের সেই দুর্দমনীয় প্রতাপেরও মৃত্যু হয়। বড় বড় শক্তিধর বাদশাহ যেমন শাম আর মিসরের সুলতানগণ নিজের দরবারেও তার দুরজয় প্রতাপের কারণে ধীরে ধীরে খলীফার নাম নিতো।

একবার সোনালি কাজ করা দিমআতের বিখ্যাত চাদরের বোঝা নিয়ে বাগদাদ আসে। নগর শুল্ক আদায়কারীরা তার পণ্যের কর চাইলে সে প্রত্যাখ্যান করে বললো, আমার কাছে মন কিছু নেই যার শুল্ক দিতে হবে। খাজনা আদায়কারীরা তার পণ্যের বিবরণ দিতে লাগলো। এরপরও সে অস্বীকার করলো। এরপর খিলাফত কর্তৃক অবহিতকরণ বিষয়টি সম্পর্কে তারা বলল, “তুমি কি তোমার অমুক তুর্কি গোলামকে দিমআত শহরে অমুক অপরাধের কারণে হত্যা করোনি, আর তাকে অমুক স্থানে দাফন দাওনি - যার কথা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না ?” এ কথা শুনে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো আর কর আদায় করলো।

ইবনে বুখার বলেন, আন নাসরের কাছে সুলতানগণ আসতো। তারা খলীফার আনুগত্য প্রকাশ করতো। যারা বিরুদ্ধাচরণ করতো, তারা অসামান্য অপদস্থ হতো। অহংকারী ও নাফরমানকারীদের গর্দানের খুনে তার তলোয়ার রঞ্জিত হতো। তার দুশমনদের পদযুগল সর্বদা প্রকম্পিত ছিল। তার বিজয়ের দুরন্ত ঘোড়াটি বনু

আব্বাসের রাজত্বের সীমান্ত অতিক্রম করেছিলো। চীন আর স্পেনের শহরগুলোতে তার নামে খুৎবা পড়া হতো। তিনি বনু আব্বাসের সকল খলীফার মধ্যে কঠোর। তার বীরত্বে পর্বতশৃঙ্গ কেঁপে উঠতো। তিনি চরিত্রবান, শক্তিশালী, বাগ্মী, স্পষ্টভাষী ও সাহিত্যের জগতে অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার যুগটি ছিল আলোকিত ও গর্বিত।

ইবনে ওয়াসিল বলেছেনঃ আন নসর খুবই বুদ্ধিমান, চালাক, বীর, চিন্তাশীল, নির্ভুল অভিমত পেশকারী আর ঝানু রাজনীতিবিদ। কূটনৈতিক তৎপরতায় তিনি খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। তার গুপ্তচররা মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল প্রান্তে চষে ফিরতো। সমাজের গুরুত্বহীন সংবাদও তারা যত্নসহকারে বাগদাদে সরবরাহ করতো। একদিন এক ব্যক্তি তার বাড়িতে কিছু লোককে দাওয়াত দেয়। মেজবান নিজেই মেহমানের আগে হাত ধুয়ে ফেলে। গুপ্তচরেরা এ বিষয়টিও খলীফাকে জানিয়ে দেয়। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, "মেহমানের আগে হাত ধোঁয়া আদবের খেলাফ।" এ কথা শুনে লোকটি হতবিহ্বল হয়ে পড়ে।

ইবনে ওয়াসিল বলেন, আন নাসর প্রজাদের অধিকারের ব্যাপারে ভালো ছিলেন না। তিনি অত্যাচারের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এমনকি তার সাম্রাজ্যের অধিকাংশ লোক নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। আর তিনি তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হস্তগত করেন। তার কাজ কিছুটা উল্টা ছিল। কখন কখন তার বাপ-দাদার বিরোধী আকিদা পোষণ করতেন। শিয়া মতবাদের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। একবার তিনি ইবনে জাওযীকে প্রশ্ন করে বসেন, "রাসুলুল্লাহ'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ?" তিনি আবু বকর (রাঃ) এর কথা বুঝাতে সক্ষম না হওয়ায় ভাসা ভাসা কথায় জবাব দিয়ে বললেন, তার সাথে তার মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

ইবনে আসির বলেছেনঃ আন নসরের চারিত্রিক গুণাবলী অনেক বেশী খারাপ ছিল। তার রুসমাত আর ট্যাক্সের ভারে গোটা ইরাক বিধ্বস্ত হয়। তিনি লোকদের সম্পদ নিজের রক্ষিত মালের সাথে একীভূত করতেন। কেউ কোন কথা বললে তিনি অবশ্যই এর উল্টোটা বলতেন।

আল মুফিক আবদুল লতিফ বলেছেনঃ তার শাসনামলের মধ্যবর্তী যুগে তার মাঝে হাদিস সংগ্রহের প্রবল ইচ্ছা জাগে। তিনি দূর-দারাজ থেকে মুহাদ্দসীনদের ডেকে এনে হাদিস শোনার ও তার বর্ণনা করার অনুমতি লাভ করতেন। এরপর তিনি অধিকাংশ সুলতান আর ওলামাদের হাদিস বর্ণনার ইজাযত দেন। তিনি একটি কিতাবে ৭০ টি হাদিস লিখে হলব শহরে পাঠিয়ে দেন। সেখানে লোকেরা সে হাদিসগুলো শ্রবণ করতো। যাহাবি বলেন, আন নাসর অনেক ওলামা সাংসদকে হাদিস বর্ণনা করার অনুমতি দেন। তাদের মধ্যে ইবনে সাকীনা, ইবনে আহযর, ইবনে বুখার, ইবনুদ দিমগানি প্রমুখ।

আল মুযাফফর বলেছেনঃ ইবনে জাওযী প্রমুখ লিখেছেন - শেষ বয়সে আন নাসরের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। কেউ বলেন, তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বাড়ির লোকজন আর নিজের উযির ছাড়া আর কাউকে তিনি চিনতে পারতেন না। তিনি নিজের এক বাদিকে হাতের লেখা অনুশীলন করান, বাঁদিটি অবিকল খলীফার হাতের লেখার অনুরূপ লিখতো। তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার পর সেই বাঁদিকে দিয়ে হুকুম-আহকাম

লিখাতেন। অথচ কেউই বুঝতে পারতো না যে, এটা খলীফার লেখা নয়। শামসুদ্দীন জরযী বলেন, খলীফা আন নাসর ৬২২ হিজরির রমযানের শেষ শনিবারে ইন্তেকাল করেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির লকব ছিল আল মূলক আন নাসর। ৫৭৭ হিজরিতে খলীফা তাকে জানান যে, তুমি জানো আমার উপাধি আন নাসর লিদ্বীনিল্লাহ। এ ক্ষেত্রে তোমার উপাধি আল মূলক আন নাসর হয় কি করে ?

৫৮০ হিজরিতে তিনি আহকাম জারি করলেন, যে ব্যক্তি ইমাম মুসার শহীদ হওয়ার স্থানে এসে আশ্রয় নিবে, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। অধিকাংশ অপরাধিরা এসে সমবেত হতে লাগলো। ফলে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়।

৫৮১ হিজরিতে ঈশ শহরে এক কানবিশিষ্ট এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে। এ বছর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরগুলোতে খলীফার নামে খুৎবা পাঠ করা হয়।

৫৮২ হিজরিতে সাতশো তারকা একত্রিত হতে দেখে জ্যোতিষীরা বললো, জামাদিউল আখির মাসের নবম রাতে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসবে, এতে গোটা শহর বিধ্বস্ত হওয়ার আশংকা আছে। এ কথা শুনে লোকেরা গর্ত খুঁড়ে বাংকার তৈরি করে খাবার- পানিসহ সেখানে অবস্থান নেয়। সে রাতটি তাড়া উদ্বেগের সাথে পার করে। কওমে আদের মতো জমকালো অন্ধকার নেমে আসবে বলা হলেও সে রাতের মৃদু হাওয়ায় কুপিও নিভেনি। ফলে জ্যোতিষীরা উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়। অনেক কবি তাদের সমালোচনায় কবিতা রচনা করেন।

৫৮৩ হিজরির প্রথম সপ্তাহের প্রথম দিন শনিবারে শামস এবং সালে ফারসীরও প্রথম দিন ছিল। এ বছর অনেক বিজয় অর্জিত হয়। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি শাম মুলুকের অধিকাংশ শহরগুলো দখল করে নেন। এগুলোর মধ্যে সবচাইতে বড় ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়, যা ফিরিঙ্গীরা ৯১ বছর শাসন করেছে। ফিরিঙ্গীরা এখানে যে গির্জা নির্মাণ করেছিলো, তিনি তা ভেঙে দিয়ে সেখানে একটি মাদরাসা শাফিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কিমামা উমর (রাঃ) এর অনুসরণে স্বস্থানে রেখে দেন, কারন বাইতুল মুকাদ্দিস দখলের পর উমর (রাঃ) ও সেটা সেভাবেই রেখে দেন। কবি মুহাম্মাদ বিন আসদ বাইতুল মুকাদ্দিসের বিজয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন।

ইবনে বুরজানো সূরা রোমের তাফসীরে লিখেছেন, ৫৮৩ হিজরি পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দিস রোমানদের অধীনে থাকবে, এরপর তারা পরাজিত হবে। মুসলমানগণ বিজয় অর্জন করবে আর ইন শা আল্লাহ, বাইতুল মুকাদ্দিস অনন্তকাল দারুল ইসলামে পরিণত হবে।

আবু শুমামা বলেন, ইবনে বুরজানো এক আশ্চর্যজনক তাফসীর পেশ করেছেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দিস বিজয়ের আগেই ইন্তেকাল করেন।

৫৮৯ হিজরিতে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ইন্তেকাল করেন। এক দূত তার ব্যবহৃত একটি বর্শা, একটি ঘোড়া, এটি দিনার আর কিছু দিরহাম নিয়ে বাগদাদে আসে। এছাড়া তার আর কোন সম্পদ ছিল না। তার মৃত্যুর পর তদীয় ছেলে ইমামুদ্দীন উসমানুল মূলক আল আযিয মিসরের, দ্বিতীয় পুত্র আল মুলকুল আফযল নুরুদ্দিন আলী দামেশকের এবং তৃতীয় পুত্র আল মুলকুল যাহের গিয়াসুদ্দিন গাজী হলবের সুলতান মনোনীত হোন।

৫৯০ হিজরিতে সালজুল বংশীয় সর্বশেষ বাদশাহ সুলতান টগর- ল- বেগ শাহ বিন আরসালান বিন টগর- ল- বেগ বিন মুহাম্মাদ বিন মূলক শাহ মারা যায়। যাহাবি বলেন, এ বংশে বিশজন বাদশাহ অতিক্রম করে। এদের মধ্যে প্রথম বাদশাহ টগর- ল- বেগ। সে খলীফা কায়িস বি আমরিল্লাহ'র যুগে জীবিত ছিল। এ বংশের বাদশাহগণ ১৬০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

৫৯২ হিজরিতে পবিত্র মক্কা নগরী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, লোকদের প্রতি লাল বালু বর্ষিত হয়, রুকনে ইয়ামানের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। এ বছর খাওয়ারিজম শাহ খিলাফতের বিরুদ্ধে সৈন্যসমাবেশ ঘটায়, যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

৫৯৩ হিজরিতে বড় একটি নক্ষত্রের পতনে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। লোকেরা কিয়ামত সমাগত ভেবে খুবই বিনয়ের সাথে দুয়া করতে থাকে।

এ বছর আল মূলক আল আযিয মিসরে মারা গেলে তার স্থানে তার পুত্র মানসুর তখত নসীন হয়। কিন্তু আল মূলকুল আদেল সাইফুদ্দিন আবু বকর বিন আইয়ুব তার উপর হামলা চালিয়ে তার মুকুট আর তখত ছিনিয়ে নেয়। তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মুলকুল কামেল মিসরের বাদশাহ মনোনীত হয়।

৫৯৬ হিজরিতে নিল নদের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লোকেরা প্রকাশ্যে মৃত প্রাণী খেতো। এ দুর্ভিক্ষের করুন চিত্র বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। লোকেরা কবর থেকে লাশ তুলে তা খেতো। মিসরের গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। চোখের পলকে জীবন প্রদীপ নিভে যায়। গ্রামের পর গ্রামে কোন চুলায় আগুন জ্বলতো না। বাড়িগুলো লাশে ভরে উঠে। যাহাবি এ দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। এ দুর্ভিক্ষ ৫৯৮ হিজরি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

৫৯৭ হিজরিতে মিসর, শাম আর জাযিরায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। এতে বহু ভবন আর দুর্গ বিধ্বস্ত হয় এবং বসরার নিকটবর্তী একটি গ্রাম ধ্বসে পড়ে।

৫৯৯ হিজরির মুহাররম মাসের শেষ রাতে আবার নক্ষত্রের পতন ঘটে।

৬০০ হিজরিতে ফিরিঙ্গীরা নীলনদের পথ ধরে রাশেদের উপর হামলা করে। শহর দখলের পর তারা সেখানে লুটতরাজ করে আর হত্যাযজ্ঞ চালায়।

৬০১ হিজরিতে ফিরিঙ্গীরা কাসতানতুনিয়া শহর দখল করে আর সেখান থেকে রোমানদের বের করে দেয়। ইসলামের পূর্বে এ শহরটি রোমানদের অধীনে ছিল। ৬৬০ হিজরি পর্যন্ত শহরটি ফিরিঙ্গীদের কব্জায় থাকে, এরপর আবার রোমানদের হস্তগত হয়। এ বছর এক নারীর গর্ভে দুই মাথা আর চার পা বিশিষ্ট সন্তান প্রসবিত হয়। কিন্তু সে জীবিত ছিল না।

৬০৬ হিজরিতে তাতারিদের তৎপরতা শুরু হয়। যার বিশদ বিবরণ আমরা সামনে পেশ করবো।

৬১৫ হিজরিতে ফিরিঙ্গীরা দিময়াত রাজ্যের শহরগুলো দখল করতে থাকে।

৬১৬ হিজরিতে ফিরিঙ্গীরা দিময়াত শহর যুদ্ধের মাধ্যমে দখল করে। মুলকুল কামেল দারুণভাবে পরাজিত হয়। ফিরিঙ্গীরা দিমায়াতের জামে মসজিদ ভেঙে সেখানে গির্জা নির্মাণ করে। এ বছর দামেশকের শাসনকর্তা মূলক মুয়াজ্জম কাযিউল কুযযাত রুকনউদ্দিন যাহেরের কাছে বিশ মিশ্রিত কাবা পাঠিয়ে নির্দেশ জারি করে যে, এটি পড়ে তাকে ইজলাসে বসতে হবে। সে তা পড়ার সাথে সাথে মৃত্যু হয়। লোকেরা তার মৃত্যুতে বেদনাহত হয়।

৬১৮ হিজরিতে ফিরিঙ্গীরা দিমআত শহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়।

৬২১ হিজরিতে কাহেরা শহরে প্রাসাদের পাশে আল কামেলা নামক একটি দারুল হাদিস নির্মিত হয়। আবু খাত্তাব বিন ওহয়া এর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হোন।

খলীফা মামুনের যুগ থেকে এ পর্যন্ত রেশমের শ্বেত কাপড়ের চাদর দিয়ে কাবা শরীফ আচ্ছাদিত করা হতো। খলীফা আন নাসরুদ্দীনিল্লাহ রেশমের সবুজ চাদরে কাবা শরীফ ঢেকে দেন, এরপর কালো পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে।

তার শাসনামলে অনেক বরেণ্য ওলামায়ে কেরামগণের ইন্তেকাল হয়, তাদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন – রওযুল আনফ গ্রন্থের লেখক আবু যায়েদ আল সুহায়লী, হাফেয আবু মুসা আল মাদানী, জামেউল কবীর গ্রন্থের লেখক আবুল কাসিম আল বুখারি আল উসমানি, বুরহান, হিদায়া গ্রন্থের লেখক মুরগনীয়ানী, ফতোয়ায়ে হানাফির গ্রন্থকার কাযী খান, উলমে ফালসাফা গ্রন্থকার আবুল অলীদ বিন রশিদ, ডাক্তার আবু বকর বিন যহর, উম্মাদ কাতেব, ইবনে আযমীয়া মাকরী, ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী, জামেউল উসুল আর নিহায়াতুল গরব গ্রন্থাকার ইবনে আসির, ফখরুদ্দিন বিন আসাকির প্রমুখ।

আয যাহের বি আমরিল্লাহ আবু নসর

আয যাহের বি আমরিল্লাহ আবু নসর মুহাম্মাদ বিন আন নাসের লিদ দ্বীনিল্লাহ ৫৭১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতার শাসনামলে তিনি উত্তরাধিকার মনোনীত হোন। পিতার পর তিনি তখতে আরোহণ করেন।

৫২ বছর বয়সে তিনি তখত নসীন হোন। প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ রাজ্য জয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করার কারন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "ক্ষেত শুকিয়ে গেছে। এখন আর সেখানে কি রোপণ করা যেতে পারে ?" তারা বললো, "আল্লাহ আপনার জীবন দীর্ঘায়ু করুন।" তিনি বললেন, "আসরের পর দোকান খুললে সে কতটুকুর মুনাফা করতে পারে ?" তিনি প্রজাবৃন্দের সাথে করুণাসূচক আচরণ করেন, সকল ট্যাক্স ক্ষমা করেন, অত্যাচার প্রতিহতকরণের ব্যবস্থা নেন আর প্রচুর দান করেন। (আবু শামাহ)

ইবনে আসির বলেন, "আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আর উমর ফারুক (রাঃ) কতৃক প্রবর্তিত ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নীতিগুলো তিনি ছাড়া কোন খলীফা অনুসরণ করেননি। তবে এটা যদি বলা হয়, উমর বিন আবদুল আযিযের পর সেই নীতি অনুসরণের কোন খলীফা ছিল না, তবে সেটা হবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ অভিমত।"

তার পিতা আর পিতামহ যে ভুখন্ড আর সম্পদ কুক্ষিগত করেছিলেন, সেগুলো তিনি হকদারদের ফিরিয়ে দেন। সাম্রাজ্যের সকল কর তিনি মাফ করে দেন। তিনি খাজনা আদায়ে পুরানো নীতি অনুসরণের আহকাম জারি করেন। প্রাচীন প্রথায় ইরাকের শুল্ক আদায়ের নির্দেশ দেন। পুরানো খলীফাদের যুগে ইরাকে বিশ হাজার দিনার আদায় করা হতো। তার পিতার যুগে আশি হাজারে উন্নতি হয়। তিনি পুরানো হিসাব অনুযায়ী দশ হাজার ক্ষমা করে দশ হাজার আদায়ের নির্দেশ দেন। এরপরও প্রজাবৃন্দের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সতেজ বৃক্ষের খাজনা আদায়ের হুকুম দেন।

এ ইনসাফের পরও রাষ্ট্রীয় ধনাগারে সম্পদ জমা দেওয়ার সময় ওজনে কম নিয়ে বেশী দেওয়ার খলীফা কর্তৃক লিখিত নির্দেশ জারি হওয়ায় উযির বললো, "এভাবে ওজন দিলে পঁয়ত্রিশ হাজার দিনার জনগণের মাঝে চলে যাবে।" খলীফা বললেন, "পঁয়ত্রিশ কোটি দিনার চলে গেলেও আপত্তি নেই।"

তার ন্যায়বিচারের আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ওসেতা শহরের এক সরকারি অফিসারের কাছে এক লাখ দিনার ছিল, যা সে অন্যায়ভাবে উপার্জন করেছিলো। দারুল খিলাফতের নির্দেশে সেগুলো হকদারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

জনগণের মধ্যে যারা খাজনা অনাদায়ের দায়ে বন্দী ছিল, তিনি দশ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে বিচারককে তাদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন।

ঈদুল আযহার রাতে তিনি ওলামা আর সাথীদের মধ্যে এক লাখ দিনার বণ্টন করেন। লোকেরা বললো, "আপনার মতো আর কোন বাদশাহ এতোটা ব্যয় করেনি।" তিনি বললেন, "সন্ধ্যার সময় আমি দোকান খুলেছি, পরপারের সওয়াব অর্জনের জন্য আমার হাতে যথেষ্ট সময় কোথায় ?" তিনি সরকারপ্রধান হওয়ার পর সরকারি অফিসগুলোতে অসংখ্য কাগজের টুকরো পাওয়া যায়। লোকেরা বললো, "কেন আপনি সেগুলো খুলে দেখছেন না ?" তিনি বললেন, "দেখে কি হবে ? সেগুলোতে কোন না কোন পরনিন্দা লেখা আছে।" (ইবনে কাসির)

সুবত ইবনে জাওযী বলেছেনঃ খলীফা ধনাগারে প্রবেশ করলে খাদেম বললো, "আপনার পিতার যুগে এ কোষাগার ধন রত্নে পরিপূর্ণ ছিল।" জবাবে তিনি বললেন, "আমি কোষাগার ভরপুর করার জন্য আসিনি, আল্লাহ'র পথে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে চাই। ধন- রত্ন সংগ্রহ ও জমা করা সওদাগরের কাজ।"

ইবনে ওয়ায়েল বলেছেনঃ আয যাহের ন্যায়বিচার করতেন আর শুল্ক মাফ করেন। তিনি জনগণের সাথে উঠা বসা করতেন, আর তার বাবা এ ক্ষেত্রে পর্দার সাহায্য নিতেন।

৬২৩ হিজরির রযব মাসের ১৩ তারিখে এ মহামতি খলীফার ইন্তেকাল হয়। তিনি নয় মাস কয়েক দিন খিলাফত পরিচালনা করেন। তিনি তার পিতার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করার অনুমতি লাভ করেন। আর আবু সালিহ নসর বিন আব্দুর রাযযাক বিন শায়েখ আবদুল কাদির জিলানী তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেন।

তার মৃত্যুর বছর দুবার চন্দ্রগ্রহণ হয়। মৌসুলের শাসনকর্তা তার প্রসংশাগাঁথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল মুসতানসির বিল্লাহ জাফর

আল মুসতানসির বিল্লাহ আবু জাফর মানসুর বিন আয যাহের বি আমরিল্লাহ ৫৭৭ হিজরির সফর মাসে এক তুর্কি বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতার পর ৬২৩ হিজরির রজব মাসে তিনি তখতে আরোহণ করেন।

তিনি প্রজাগণের মধ্যে ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দেন, বিচার ব্যবস্থায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। ওলামা আর দ্বীনদারদের উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। মসজিদ, মাদরাসা ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন। দ্বীনকে শক্তিশালী করেন, শত্রুদের ধ্বংস করে দেন, সুন্নতের প্রসার ঘটান, ফিতনা দমন করেন, সুন্নতের উপর চলার তাকীদ দেন। জিহাদের সুন্দর ব্যবস্থাপনা তৈরি করেন, ইসলামের সাহায্যার্থে ফৌজি সমাবেশ ঘটান, অধিকাংশ দুর্গ দখল করেন।

মুফিক আবদুল লতিফ বলেছেন, "তিনি সুন্দর আখলাক গ্রহণের মাধ্যমে মসনদে আরোহণ করেন। তিনি বিদআত বন্ধ করেন। দ্বীনদার সভাসদ নিয়োগ, ইসলামকে শক্তিশালী, বিলুপ্তপ্রায় দ্বীনের কাজ পুনঃপ্রবর্তন আর লোকদের অন্তরে সে কাজগুলোর প্রতি ভালোবাসার সৃষ্টি করেন। মুখে মুখে তার প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে। তার ত্রুটিগুলো দৃষ্টির আড়ালে পড়ে থাকে।

হাফেজ যাকীউদ্দীন আবদুল আযিম মুনযেরি বলেছেন, "মুসতানসির নেককার আর নেক কাজের প্রতি খুবই নিষ্ঠাবান। তিনি মাদরাসা আল মুনতাসিরীয়া নামক একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। এখানে মোটা অংকের ভাতা প্রদান সাপেক্ষে আহলে ইলমদের আহবান জানানো হয়।

ইবনে ওয়াসেল বলেন, মুনতাসির দজলা নদীর তীরে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ধরণের উন্নত প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে আর একটিও ছিল না। তৎকালীন যুগে এহেন ছাত্রসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল দুনিয়াতে বিরল। এ প্রতিষ্ঠানে চার মাযহাবের চার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এতে একটি হাসপাতালও ছিল। ফকিহদের জন্য ছিল একটি বাবুর্চিখানা। পর্যাপ্ত ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা ছিল। ফকিহদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা, যানবাহন, তেল, প্রদীপ, কাগজ ইত্যাদির সরবরাহ ছিল অফুরন্ত। এরপরও ফকিহদের এক দিনার করে মাসিক ভাতা দেওয়া হতো। তাদের জন্য হাম্মামখানাও নির্মাণ করা হয়। পূর্ববর্তী যুগে যার কোনই দৃষ্টান্ত ছিল না। খলীফার সেবায় নিয়োজিত থাকা বিশাল সেনাবাহিনী, তার পিতা ও দাদারও এতো সুবিশাল বাহিনী ছিল না। তিনি নিজেও একজন সাহসী, নির্ভীক, বীর- বাহাদুর লোক ছিলেন। তাতাররা তার রাজ্যগুলোতে আক্রমণ করলে তার বাহিনী রুখে দাঁড়ায়। ফলে তাতাররা লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়। খিফাজী নামক খলীফার এক ভাই ছিলেন, তিনি একজন নির্ভীক যোদ্ধা। তিনি বলতেন, "আমি খলীফা হলে জীবনসাগর পাড়ি দিয়ে তাতারদের সাথে এক বিশাল ফৌজবাহিনী নিয়ে লড়াই করে তাদের মূলোৎপাটন করতাম। কেড়ে নিতাম তাদের সকল ভূখণ্ড।" মুনতাসিরের মৃত্যুর পর তার দুর্ভাগ্য তাকে নিদারুনভাবে জড়িয়ে ধরে। আত্মম্ভরিতা, মদ্যপান আর

কর্কশ স্বভাবের কারণে লোকেরা তার বাইয়াত গ্রহণ না করে মুসতানসিরের ছেলে আবু আহমাদের হাতে বাইয়াত করে। আবু আহমাদ ছিলেন শান্ত প্রকৃতির খলীফা।

যাহাবি বলেন, মাদরাসা মুসতানসারীয়ার বাজেট ছিল সত্তর মিসকাল। মাদরাসার ভিত্তি দেওয়া হয় ৬২৫ হিজরিতে, আর এ কাজ শেষ হয় ৬৩১ হিজরিতে। এতে একটি গ্রন্থাগার ছিল। ১৬০ উট বহনযোগ্য গ্রন্থাদি সমৃদ্ধ এ পাঠাগারে চার মাযহাবের ২৪৮ জন ছাত্র জ্ঞান চর্চা করতো। এতে হাদিস, নাহু (আরবি ব্যাকরণ), চিকিৎসা বিদ্যা ও দর্শনের পৃথক অনুষদ ছিল। তাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাওয়ার সুব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়াও এ মাদরাসায় তিনশো এতিম ছাত্র জ্ঞান অর্জন করতো। যাহাবি এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ওকফকৃত গ্রাম আর ভূখণ্ডের বিশদ বিবরণ পেশ করেছেন। এ মাদরাসার শিক্ষাবর্ষ শুরু হতো রযব মাসে। বর্ষ শুরু সময় বিচারপতিগণ, শিক্ষকমন্ডলি, মন্ত্রী পরিষদ আর সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ অফিসারদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হতো।

৬২৮ হিজরিতে দামেশকের শাসনকর্তা মূলক আশরাফ দারুল হাদিস আশরাফিয়া নামক এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি দেয়, যা ৬৩২ হিজরিতে শেষ হয়।

৬৩২ হিজরিতে প্রচলিত স্বর্ণের ক্ষুদ্রাংশে নির্মিত মুদ্রার পরিবর্তে মুসতানসির চাদীর মুদ্রা তৈরি করেন।

৬৩৫ হিজরিতে কাযী শামসুদ্দিন আক্ষাদ আল জুফী দামেশকের বিচারক মনোনীত হোন। তিনি সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সর্বপ্রথম একটি ঘর নির্মাণ করেন। আর আগে সাক্ষ্যদানের জন্য আদালতে হাজির হতে হতো। এ বছর দামেশকের শাসনকর্তা আশরাফ মারা যায়। এর দুই মাস পর মিসরের শাসনকর্তা কামেলও মারা যায়। এরপর মিসরে কামেলের ছেলে তখতে উপবেশন করে, তার উপাধি ছিল আদেল সুলতান। কিছুদিন পর তাকে অপসারণ করে তার জায়গায় তার ভাই আস সালিহ আইয়ুব নাজমুদ্দীনকে বসানো হয়।

৬৩৭ হিজরিতে শায়খ আযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম দামেশকের খতীব মনোনীত হোন। এ বছর ইয়ামানের শাসনকর্তা নুরুদ্দীন উমর বিন আলী বিন রসূল আল তুর্কমানীর দূত খিলাফতের দরবারে এসে মিসরের সালতানাত প্রার্থনা করে।

৬৩৯ হিজরিতে মিসর শাসনকর্তা আস সালিহ প্রাসাদে একটি মাদরাসা আর প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু ৬৫১ হিজরিতে তার গোলাম সেগুলো নষ্ট করে ফেলে।

৬৪০ হিজরির জামাদিউল আখির মাসের শুক্রবারে মুসতানসির ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে কবিগণ শোকগাঁথা রচনা করেন।

মুসতানসিরের শাসনামলে যেসব ওলামা ইন্তেকাল করেছেন তারা হলেন – ইমাম আবুল কাসিম আর রাফী, জামালুল মিসরী, ইবনে মাযুর আন নাহবী, ইয়াকুব আল হুমুবী, আল মিফতা গ্রন্থকার সিকাকী, হাফেজ আবুল হাসান বিন কিতান, মুফিক আবদুল লতিফ বাগদাদী, হাফেজ আবু বকর ইবনে নুকতা, আযুদ্দীন আলি বিন আসির – যিনি তারিখ, ইনসাব আর আসবুল গাবা'র গ্রন্থকার, কবি ইবনে গানাবী, সাইফুল আমাদী, ইবনে ফুযলান, তায়িয়ার লেখক উমর বিন আল ফারিয, আওয়ারিফুল মাআরিফ গ্রন্থের লেখক শিহাবুদ্দীন

সহরওয়ারদি, আল মাওলুদুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর লেখক বাহামা বিন শাদ্দাদ আবুল আব্বাস উফী, আল্লামা আবুল খাত্তাব বিন ওহয়া, ইকতেফা ফিল মাগাযী গ্রন্থকার হাফেজ আবু রবী বিন মুসলিম, কবি ইবনে শুরা, জামালুল হাযরামী শায়খে হানাফী যিয়া বিন আসির প্রমুখ।

আল মুসতাসিম আবু আহমাদ

আল মুসতাসিম বিল্লাহ আবু আহমাদ আবদুল্লাহ বিন আল মুসতানসির বিল্লাহ ইরাকের শেষ খলীফা। তিনি ৬০৯ হিজরিতে 'হাজের' নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতার মৃত্যুর সময় তিনি খিলাফতে আরোহণ করেন।

তিনি ইবনুল বুখার আল মুঈদুত তাওসী, আবু রুহুল হরবী, আন নাজমুল বাদরায়ী, শরফুদ দিময়াতী প্রমুখদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করার সনদ ও ইযাজত লাভ করেন। দিময়াতী তাকে চল্লিশটি হাদিস লিখে দিয়েছিলেন, যে হাদিসগুলো আমি নিজেও দেখেছি। তিনি ছিলেন উদার, ধৈর্যশীল, স্বচ্ছ মনের আর দ্বীনদার ব্যক্তি।

শায়খ কুতুবুদ্দিন বলেছেন, তিনি তার বাবা ও দাদার মতো সুন্নতের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে তাদের মতো যুদ্ধের প্রতি সচেতনতা, সাবধানতা আর বীরত্ব ছিল না। খলীফা মুসতানসিরের খুফাযী নামক এক ভাইয়ের মধ্যে সকল গুণাবলীর সমাবেশ ছিলো। তিনি ছিলেন বীর ও সচেতন। তদনিন্তন যুগে তার সাহসিকতা ছিল প্রসিদ্ধ। তিনি অধিকাংশ সময় বলতেন, আল্লাহ আমাকে খিলাফত দান করলে আমি সসৈন্যে জায়হুন সানার গাড়ি দিয়ে তাতারদের উপর আক্রমণ করে তাদের রাজ্য দখল করে নিতাম। খলীফা মুনতাসিরের মৃত্যুর পর বনু আব্বাসের মদ্যপ সভাসদবর্ণা খুফাযির ভয়ে তার হাতে বাইয়াত না করে নিজেদের প্রভাব অটুট রাখার হীন মানসে কুফাযির চেয়ে তুলনামূলক নরম মেজাজের হীন মানসে মুসতাসিমের কাছে বাইয়াত করে। তিনি রাফেযী সম্প্রদায়ভুক্ত মঈদুদ্দীন আনকামীকে উযির নিয়োগ করেন। এই কমবখত লোকটি গোটা খিলাফত ধ্বংস করে ফেলে। সে খলীফাকে হাতে রেখে পর্দার আড়ালে তাতারদের সাথে মিলিত হয়। সে খিলাফতের গোপন সংবাদ পৌঁছে দিতো। সে তাদের বাগদাদ আসার মতামত পেশ করে। বাগদাদ দখলের জন্য সেই তাদের উত্তেজিত করে। সে বনু আব্বাসের রাজত্বের মূলোৎপাটনের সহায়ক হিসেবে কাজ করতে থাকে। সে আলি (রাঃ) এর আওলাদদের উপর খিলাফত অরপনের চেষ্টা করেছিলো। তাতারদের কোন গুপ্ত সংবাদ বাগদাদে এসে পৌঁছুলে সে তা গোপন করে ফেলতো। এর ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছিলো।

৬৪৭ হিজরিতে ফিরিঙ্গীরা দিময়াত শহর দখল করে নেয়। সে সময় সুলতান মূলকুস সালিহ অসুস্থ ছিল। পরবর্তীতে শাবান মাসের মাঝামাঝিতে সে মারা যায়। এ ঘটনায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উম্মে খলিল মুসুমা শাজরুদ দারাজ নামের তার এক বাঁদি মুলকুস সালিহ'র পুত্র শাহ মুলকুল মুয়াযযমকে দিময়াত শহরে ডেকে পাঠায়। কিন্তু ৬৪৮ হিজরির মুহাররম মাসে তার বাবার এক গোলাম তাকে হত্যা করে। এরপর তাজরুদ দারাজ নায়েবে সালতানাত আযুদ্দীন আইবেগ তুর্কামানীর কাছ থেকে হলব নেয় আর আমিরদের খিলআত ও উপহার প্রদান করে। আযুদ্দীন রবিউল আখির মাসের শেষ দিকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হয়। সে আল মুয়ায উপাধি ধারণ করে। সে নিজেই জনগণের উপর অসন্তুষ্ট হয়। ফলে সৈন্যরা আট বছর বয়সী মুলকুল আশরাফ বিন

সালাহুদ্দিন ইউসুফ বিন মাসউদুল কামেলের কাছ থেকে হলব নেয়। এভাবে এক রাজ্যে দুই সুলতান তখতে উপবেশন করে। দুজনের নামেই খুৎবা পাঠ করা হয় আর দুজনের নামেই খোদিত মুদ্রা চালু থাকে।

৬৪৮ হিজরিতে মুসলমানরা আবার দিময়াত শহর ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

৬৫২ হিজরিতে আদন শহরে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে। রাতে এর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সাগরের দিকে ছুটে যায় আর দিনে সাগর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। এ বছর মুয়ায মুলকুল আশরাফকে প্রতিহত করে নিজেই সুলতান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

৬৫৪ হিজরিতে মদিনা শরীফেও ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে। আবু শামা বলেন, মদিনা শরীফ থেকে আমাদের কাছে এ মর্মে একটি চিঠি আসে যে, জামাদিউল আখির মাসের ৩ তারিখ মঙ্গলবার রাতে বজ্রপাতের বিকট আওয়াজ শোনার পর কিছুক্ষন পর পর ভূমিকম্প হতেই থাকে। ৫ তারিখ পর্যন্ত এ ভূকম্পন অনুভূত হয়। এরপর শক্ত পাথুরে যমীনে আর নদীর পাশে ভয়ংকর আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। আমরা মদিনা শরীফে ছিলাম। মনে হলো, আমাদের পাশেই কোথাও যেন আগুন ধরেছে। আমরা দেখলাম, একটি পাহাড় আগুন হয়ে তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ভবনগুলো জ্বলে উঠলো। মক্কাবাসীও এ আলোর তীব্রতা দেখতে পায়। লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাযার শরীফে এসে সমবেত হয় আর তাওবা-ইস্তিগফার পড়তে থাকে। এ অবস্থা এক মাসের বেশী সময় ধরে অব্যাহত ছিল।

যাহাবি বলেছেনঃ মদিনা শরীফে অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি অসংখ্য ও অগণিত লোকের সাক্ষ্য প্রদানে প্রমাণিত, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। এ অগ্নিকান্ডের বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, “বসরার উটগুলোর গর্দান দেখা যাবে – এমন অগ্নিকান্ড হিজাযে না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।” যারা সে সময় বসরায় ছিল তাদের অধিকাংশরাই বলেছেন যে, রাতে মদিনার সেই তীব্র আগুনের আলোতে বসরার উটগুলোর গর্দান দেখা গিয়েছিলো।

৬৫৫ হিজরিতে মিসর সুলতান আল মুয়ায আয়বেগকে তার স্ত্রী শাজরুদ দার হত্যা করে। এরপর তার ছেলে আল মানসুর তখতে আরোহণ করে।

এরই মধ্যে তাতারিদের বিশৃঙ্খলার আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খলীফা আর তার মন্ত্রী পরিষদ প্রজাদের বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়েন। মুসলিম সাম্রাজ্যের অভিশপ্ত উযির আব্বাসীয় রাজত্ব ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতায় আর উমাইয়া রাজত্ব প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখে। সে তাতারিদের সাথে গোপনে আঁতাত করে। সে খলীফাকে ভুল পরামর্শ দিয়ে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। খলীফা তার পরামর্শে তাতারিদের রসদ সরবরাহ আর সম্মান প্রদান করেন। তার পরামর্শে খলীফা সৈন্য রাহ করেন। উযির আলকামী সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর বাগদাদ দখলের আহ্বান জানায়। এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণের শর্তে - সে হবে বাদশাহ’র নায়েব।

তাতারিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মুফিক আবদুল লতিফ লিখেছেনঃ ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশের লোক হওয়ায় তাতারিদের ভাষা অনেকটাই ভারতীয়দের ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তাতার থেকে মক্কা চার মাসের পথ। তাতাররা তুর্কীদের মতো চওড়া চেহারা, প্রশস্ত বুক, পাতলা কোমর আর বাদামী রঙের লোক ছিল। এরা দ্রুততার সাথে নিজেদের অভিমত তুলে ধরতো আর ক্ষিপ্রতার সাথে চলাফেরা করতো। ভিনদেশের সংবাদ তারা পেয়ে যেতো, কিন্তু তাদের রাজ্যের কোন খবর কেউ জানোতে পারতো না, কারন তাদের রাজ্যে ভিনদেশী গুপ্তচরের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। যার ফলে সেখানে সহজেই অপরিচিত লোকদের সনাক্ত করা যেতো।

এরা কোন যুদ্ধে গেলে নিজেদের ইচ্ছার কথা কাউকে জানাতো না, গোপন করে রাখতো। তারা হঠাৎ অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালাতো, লোকেরা তাদের হামলা টের পেতো যখন তারা শহরময় ছড়িয়ে পড়তো। তাদের কোন সিপাহি এ কথা বিশ্বাস করতো না যে, সে শত্রুর হাতে বন্দী হতে পারে। তাদের এ প্রবল আত্মবিশ্বাসের কারণে শত্রুরা তাদের সামনে থেকে কোন দিকেই পালিয়ে যেতে পারতো না। তারা শত্রুদের সকল পথ বন্ধ করে দিতো। তাদের নারীরাও তাদের সাথে লড়াই করতো। তারা অসি আর তীর চালনায় পুরুষদের থেকে কম যেতো না। তারা সকল প্রাণীর গোশত খেতো, কোন বিষয়ে তাদের বাছবিচার ছিল না। নির্বিচারে তারা আবাল বৃদ্ধবণিতা হত্যা করতো, হত্যাযজ্ঞে তারা কোন প্রকার ছাড় দিতো না। তারা বংশের পর বংশ মানুষ হত্যা করতো একটি সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করার জন্য। তাদের ইচ্ছাই ছিল পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলা, সম্পদ ও রাজত্ব দখল তাদের ইচ্ছা ছিল না।

কিছু বর্ণনাকারীর বিবরণ হচ্ছে, তাতারিদের জনপদ ছিল চীনা সাম্রাজ্যের সাথে সম্পৃক্ত। তৎকালীন যুগে তারা জঙ্গি, পামর ও ধরপাকড় কারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের আত্মপ্রকাশের ঘটনাটি এমন –

বিশাল চীনা সাম্রাজ্যটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছয়টি রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই ছয় রাজ্যের একই বাদশাহ ছিল, তার নাম ইলকানে আকবর। সে তিমগাজ শহরে বসবাস করতো। মুসলিম জাহানের মতো তার ছয়টি রাজ্যের ছয়জন নায়েবের মধ্য থেকে একজনের নাম দুশ খান – যে চেঙ্গিস খানের ফুফুকে বিয়ে করেছিলো। দুশ খান মারা যাওয়ার পর চেঙ্গিশ খান কিশলু খানকে নিয়ে তার ফুফুকে দেখতে যায়। তার ফুফু কিশলু খানকে জানায়, দুশ খানের কোন সন্তান নেই। এজন্য চেঙ্গিস খান তখতে আরোহণ করুক। ফলে সে মসনদে উপবেশন করে আর তার জয়কৃত জনপদগুলো এর সাথে একীভূত করে ফেলে। এরপর বিশাল উপহার সামগ্রীসহ কয়েকজন দূত কর্তৃক সে ইলকানে আকবরকে বিষয়টি অবহতি করে।

এ সংবাদ পেয়ে ইলকানে আকবর গর্জন করে উঠলো। তার অনুমোদন ছাড়া চেঙ্গিশ খানের তখত গ্রহণের বিষয়টি তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো চেঙ্গিশ খানের ঘোড়াগুলো আর দূতদের সে হত্যা করে। খবর পেয়ে চেঙ্গিস খান আর কিশলু খান ইলকানে আকবরের বিরুদ্ধে শপথ করে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। সকল তাতারি তাদের পতাকা তলে এসে সমবেত হয়। তাদের শক্তিমত্তা ও সৈন্য সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি

পেতে থাকে। ইলকানে আকবর তাদের দুর্দমনীয় প্রতাপ দেখে বিচলিত হয়ে উঠে। লোক পাঠিয়ে সে তাদের শাসিয়ে দেয়। কিন্তু কোন কাজ হল না।

অবশেষে উভয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রচণ্ড তীব্রতার সাথে শুরু হয় মরণপণ লড়াই। অনেক প্রাণহানি ও রক্তপাতের পর ইলকানে আকবর পরাজিত হয়। চেঙ্গিস খান আর কিশলু খান তার গোটা সাম্রাজ্য পদানত করে নেয়। তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। চেঙ্গিস খান ও কিশলু খান উভয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকে। এরপর তারা চীনের শাকু শহর অস্ত্রের মুখে দখল করে নেয়। এরই মধ্যে কিশলু খান মারা গেলে তার ছেলে তার স্থানে আসে। প্রথমে কৌশলে তারা শক্তি দুর্বল করার পর হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে আর চেঙ্গিস খান একচ্ছত্র অধিপতিতে পরিণত হয়। তাতারিরা প্রথম থেকেই তাকে নিবিড় সঙ্গ দিয়ে আসছিলো। তারা চেঙ্গিস খানের ভীষণ আনুগত্যশীল ছিল। তারা তাকে আল্লাহ ভাবতে বসে। তারা আনুগত্যের সীমানা পেরিয়ে তার তাবেদারি করতে থাকে।

৬০৬ হিজরিতে চেঙ্গিস খান সর্বপ্রথম নিজ রাজ্য থেকে মামালিকে তরক, ফারগানা আর খুরাসানের শাসনকর্তা খাওয়ারিজম শাহ মুহাম্মাদ বিন তশ এর উপর হামলা চালায়, যার বিবরণ পূর্বে বিধৃত হয়েছে। খাওারিজম শাহ অনেক বড় বাদশাহ'র সাথে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলো। কিন্তু তাতারিদের তার রাজ্যের দিকে আসতে দেখে সমরকন্দ পালিয়ে যায়।

৬১৫ হিজরিতে তাতারিরা বিভিন্ন জনপদে ব্যাপক লুটতরাজ করে। এরপর চেঙ্গিস খান বিপুল উপঢৌকন সম্ভারসহ খাওারিজম শাহ এর কাছে দূত পাঠায়। দূত গিয়ে খাওারিজম শাহকে বললো, ইলকানে আযম (চেঙ্গিস খান) আপনাকে সালাম জানিয়েছে আর বলেছে - আপনি আমার শান- শওকত, প্রভাব- প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সম্পর্কে জানেন। আমাদের মাঝে আপোষকামিতার কল্যাণ আমি দেখতে পাচ্ছি। তাই আমাদের মধ্যে পুনঃমিলনের সন্ধি হওয়া প্রয়োজন। আপনি আমার কাছে আমার আওলাদ অপেক্ষা প্রিয়। আপনি সব বিষয়ে চিন্তামুক্ত থাকতে পারেন। আপনি জানেন আমি গোটা চীন দখল করে নিয়েছি। সেখানে সিপাহী আর ঘোড়ার কোন ঘাটতি নেই। সেখানে রয়েছে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি। সকল জিনিসের মালিক হওয়ার কারণে চীনা লোকেরা অন্য দেশের সাথে দোস্তি পাতে না। যদি ভালো মনে করেন, তবে বন্ধুত্বের শপথ গ্রহণ করুন আর পদানত রাজ্যগুলোতে ব্যবসায়ীদের অবাধে যাতায়াতের অনুমতি দিন।

খাওারিযম শাহ তার প্রস্তাব গ্রহণ করায় চেঙ্গিস খান আনন্দিত হয়। সন্ধিপত্রের ক্ষমতাবলে ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতা এসে যায়। এ মিত্রতা অনেক দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

খাওারিযম শাহ এর মামা মাওরান নাহার, যার বিশ হাজার অশ্বারোহী ছিল, তার জনপদে অবস্থানরত চীনা ব্যবসায়ীদের মতগতি নিরক্ষন করে খাওারিযম শাহকে এ মর্মে পত্র লিখলো যে, চেঙ্গিস খানের দেশ থেকে আমার শহরের আগত লোকেরা পোশাক- আশাকে ব্যবসায়ী, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য গুপ্তচরবৃত্তি। তোমার অনুমতি পেলে তাদেরকে চোখে চোখে রাখবো।

খাওারিযম শাহ তাকে সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়। কিন্তু সে তাদেরকে বন্দী করে আর তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। চেঙ্গিস খান সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে দূত পাঠিয়ে খাওারিযম শাহকে জানিয়ে দিলো - আপনি প্রথমে ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, এরপর এ ব্যাপারে কৌশলের ফাঁদ পাতলেন। প্রতিটি অবস্থায় কৌশল ভালো নয়, আর যখন তা হবে মুসলিম বাদশাহ কর্তৃক, তখন সেটা হবে খুবই লজ্জাজনক। আপনার মামা যা করেছে সে সম্পর্কে আপনি না জানোলে আর যদি সে আপনার অনুমতি ছাড়া এ কাজ করে থাকে, তবে তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। নাহলে আমার তলোয়ার আপনাকে যা দেখাবে তা আপনার অজানা নয়।

এ কথা শুনে খাওারিজম শাহ এর চৈতন্য লোপ পায় আর দারুন বিচলিত হয়ে পরে। সে তড়িঘড়ি করে চেঙ্গিস খানের দূতদের হত্যা করে, এর ফলাফল হয় ভয়ংকর। দুতের এক ফোঁটা রক্তের পরিবর্তে বইয়ে দেওয়া হয় মুসলমানদের এক সাগর রক্ত। চেঙ্গিস খান সসৈন্যে ধেয়ে আসে। তারা খুনের নেশায় পাগল হয়ে জীহুন সাগর পারি দিয়ে হামদান শহরে পৌঁছে। তাতারিদের ভয়ে সে হামদানের বুরুজে আশ্রয় নেয়। তাতারিরা তাকে ঘেরাও করে ফেলে আর একে একে তার সব সাথীদের হত্যা করে। খাওারিজম শাহ একা কোন রকম জীবন নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে দ্বীপে পালিয়ে যায়। সেখানে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। নির্জন দ্বীপে সাহায্যকারীর অভাবে সে মারা যায়। তার সাথে পরনের যা কাপড় ছিল, সেগুলোই হয় রার কাফন আর এগুলো পড়িয়েই তাকে ৬১৭ হিজরিতে সেখানেই দাফন করা হয়। তার সকল রাজ্য তাতারিরা দখল করে নেয়।

সিলবত ইবনে জাওযী বলেছেনঃ ৬১৫ হিজরিতে তাতারিরা সর্বপ্রথম মাওরাউন নাহার শহরে আত্মপ্রকাশ করে আর বুখারা ও সমরকন্দ দখল করে নেয়। এর অধিবাসীদের হত্যা করে, এরপর খাওারিযম শাহকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। এরপর সাগর পার হয়ে চেঙ্গিস খান খুরাসান লুট করে আর সেখানে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়।

ইবনে আসির স্বরচিত আল কামিল ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, এই রক্তপাগল তাতারদের নারকীয় পৈচাশিকতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয়। দুনিয়ার কোনো সৃষ্টির সামনে এমন মুসীবত আর কখনোই আসে নি, বিশেষত মুসলমানদের সামনে তো নয়- ই। যদি কেউ এ কথা বলে - আবহমানকাল থেকে আজ পর্যন্ত এতো মুসীবত আর কখনোই আসেনি, তবে তা হবে সম্পূর্ণ সঠিক। ঐতিহাসিকগণ তাদের দৃষ্টান্ত পেশ করতে অক্ষম।

ঐতিহাসিকগণ বাইতুল মুকাদ্দিসে বখত নসর কর্তৃক বনি ইসরাইলের উপর নির্যাতনকে অধিক বর্বর হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই অভিশপ্ত চেঙ্গিস খান কর্তৃক মুসলমানগণ অত্যাচারিত হওয়ার মাত্রা বখত নসরের জুলুমের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বখত নসর কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দিসের ঘটনা আর চেঙ্গিস খানের হাতে মুসলমানদের নির্যাতন অভিন্ন ছিল না। মুসলমানরা তাদের দেশেই এই অভিশপ্ত লোকটির দ্বারা অত্যাচারিত হয় আর তার হাতে যতো মুসলমান নিহত হয়, বখত নসরের হাতে ততো বনি ইসরাইল নিহত হয়নি। এ দুর্ভাগ্যটি একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা বৃদ্ধি পেতেই থাকে আর টর্নেডোতে রূপ নেয়। তাতারিরা ছিল এমন এক ঝড়ো হাওয়া, যা খুবই ক্ষিপ্রতার সাথে বইয়ে বেড়াতো। তারা চীন থেকে বেরিয়ে তুর্কীস্তানের কাশআর, শাগরীক ইত্যাদি শহর ধ্বংস করে বুখারা ও সমরকন্দ এসে পৌঁছে। তারা সেখানে লুটতরাজ করে।

এরপর তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক খুরাসানে গিয়ে সেখানেও তারা ধংস্প ও হত্যার সফল স্বাক্ষর রেখে যায় আর হামদান শহরে গিয়ে লুট, ধ্বংস ও হত্যার রাজ্য কায়েম করে। এরপর ইরাক সীমান্তে হানা দিয়ে আযারবাইজানে যাত্রা করে। এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে তারা নিদারুন নিষ্ঠুরতার চিহ্ন রেখে যায়। একই বছরে তারা বর্ণিত সকল রাজ্য মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত অনেক কম।

তাতারিরা আযারবাইজানো থেকে দর বনদ, শিরাওয়া, লান, লিকয, কিফজানো, গজনী, সিজিস্তান, কারমান প্রভৃতি শহর একের পর এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। যার নজির ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাদশাহ ইস্কিন্দার দুনিয়ার অধিকাংশ ভূখণ্ড শাসন করতো। সেও তাতারিদের ক্ষিপ্রতার তুলনায় ছিল অতি নগণ্য। বাদশাহ ইস্কিন্দারের দখলকৃত রাজ্যগুলোতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সময় লেগেছিল কমপক্ষে দশ বছর। আর বাদশাহ ইস্কিন্দার রাজ্য জয় করতে গিয়ে শুধু হত্যা ও ধ্বংসের পথকেই বেছে নেয়নি, শক্তি প্রদর্শন ছাড়াও সে বহু রাজ্য জয় করেছেন। অনেক জনপদে তার তলোয়ার বনি আদমের খুনে রঞ্জিত হয়নি। পক্ষান্তরে, চেঙ্গিস খান এক বছরেই রক্তের সাগর বইয়ে দিয়ে সকল রাজ্য জয় করে আর রাজ্যগুলোতে ভীতির সঞ্চার ঘটায়। যুদ্ধজয়ের ক্ষেত্রে তাদের কোন সাহায্য ও রসদের প্রয়োজন ছিল না। সকালে উদিত সূর্যকে তারা সিজদাহ করতো, এটা ছিল তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি। তাদের কাছে কোন জিনিস হারাম ছিল না। সকল প্রাণী, এমনকি মানুষের গোশত ও তারা খেতো। তাদের মধ্যে কোন বিয়ের ব্যবস্থা ছিল না। একজন নারী কয়েকজন পুরুষকে সন্তুষ্ট রাখতো।

৬৫৬ হিজরিতে হালাকু খান দুই লাখ সৈন্য নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করে। খলীফার সৈন্যরা তার মোকাবিলায় ব্যর্থ হওয়ায় লুটেরার দল ১০ই মুহাররমে বাগদাদে প্রবেশ করে। খলীফা মুসতাসিমের অভিশপ্ত উযির খলীফাকে তাতারিদের সাথে সন্ধি করার পরামর্শ দিয়ে বললো, "আপনার সিপাহসালাররা তাতারিদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। আমি তাদের সাথে লোক মাধ্যমে সন্ধির আলোচনা করছি।" এ কথা বলে বিশ্বাসঘাতক উযির নিজেই তাদের কাছে গিয়ে নিজের নিরাপত্তা লাভের বিষয়টি নিশ্চিত করে খলীফার কাছে ফিরে এসে বললো, "তাতারদের বাদশাহ নিজের মেয়েকে আপনার ছেলে আমীর আবু বকরের সাথে বিয়ে দিতে চায়। তার ইচ্ছা, আপনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকুন। সালজুকদের মতো নায়েবে সালতানাতের পদ নিয়ে তারা ফিরে যেতে চায়। তাদেরকে সন্তুষ্ট করাই মঙ্গলজনক। এছাড়া মুসলমানদের রক্তপাত এড়ানোর আর কোনোই পথ ও পন্থা নেই। এরপরেও আপনার ইখতিয়ার আছে, আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। তবে হালাকু খানের কাছে যাওয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ।" এ কথা শুনে খলীফা গোটা সভাসদবর্গ নিয়ে হালাকু খানের কাছে গিয়ে একটি তাবুর মধ্যে সকলের সাথে বসেন।

এদিকে খলীফার উযির আগেই পৌঁছেছিলো। সে সন্ধিপত্র প্রস্তুত করার জন্য সর্বপ্রথম ওলামা ও ফুকাহাদের আহবান জানায়। তারা সেখানে পৌঁছামাত্র তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর মুসলিম উম্মাহ'র একটি প্রতিনিধি দলকে অভিন্ন কৌশলে ডেকে এনে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। এভাবে যখন সকল ওলামা, উমারা আর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দকে শেষ করার পর রাস্তা পরিস্কার হয়ে যায়, নরপিচাশ তাতারিদের তরবারিগুলো খাপমুক্ত হয়ে ঝলসে উঠে, সৃষ্টি হয় রক্তের সাগর। লাগাতার চল্লিশ দ্বীন তাদের তলোয়ারগুলো খাপবদ্ধ

হয়নি। লক্ষ লক্ষ আদম সন্তানের জীবন প্রদীপ নিভে যায়, যারা কূপ বা অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে ছিল, একমাত্র তারাই প্রাণে রক্ষা পায়। আর ভাগ্য বিড়ম্বিত অসহায় খলীফা ধাক্কা ও লাথি খেতে খেতেই ইন্তেকাল করেন।

যাহাবি বলেছেন, আমার মতে বেচারা মসু তাসিমের ভাগ্যে দাফন জোটেনি। তার সাথে তার অনেক আওলাদ আর আত্মীয়- পরিজন নিহত হয়। আবার কাউকে কাউকে তারা বন্দী করে নিয়ে যায়। এর আগে এমন ফ্যাসাদ মুসলমানদের ভাগ্যে আর কখনো আসেনি। বিশ্বাসঘাতক উযির চক্রান্ত করে সফল হয়নি। সে তাতারিদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। এ ঘটনার কিছু দিন পরেই মৃত্যু এসে উযিরকে নিয়ে যায়। কবিগণ বাগদাদ সম্পর্কে অনেক শোকগাথা রচনা করেছেন।

বাগদাদে পঠিত সর্বশেষ খুতবাটি খতীব সাহেব এভাবে শুরু করেছিলেন - সকল প্রশংসা সেই প্রতিপালকের, যিনি মজবুত ইমারত ধ্বংস করে দিয়েছেন, যিনি শহরবাসীর মূলোৎপাটনের ফরমান জারি করেছেন আর আজ পর্যন্ত যিনি তলোয়ার খাপবদ্ধ করেননি।

হালাকু খান বাগদাদে হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর ইরাকে তার নায়েব মনোনীত করে। আলী (রাঃ) এর পরিবার থেকে কাউকে খলীফা মনোনয়ন নিয়ে দিতে ইবনে আলকামী ব্যর্থ হয়। তাতারিরা তাকে কুকুরের মতো ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়। আদনা গোলামের মতো সে তাদের সাথে মিলে থাকা অবস্থায় মারা যায়। আল্লাহ যেন এ কমবখতের উপর রহম না করেন আর এ নিমকহারামের গুনাহ যেন ক্ষমা না করেন।

এরপর হালাকু খান দামেশকের শাসনকর্তা নাসিরের কাছে পরপর তিনটি চিঠি পাঠিয়ে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়।

৬৫৭ হিজরির প্রারম্ভে পৃথিবী খলীফার শাসনমুক্ত ছিল। সে সময় তাতাররা আমিদ শহরের দিকে ধাবিত হয়। তখন মিসরের শাসনকর্তা আল মানসুর আলী বিন মাআয বয়সে অনেক ছোট। তাকে পরিচালিত করতো তার বাবার গোলাম আমীর সাইফুদ্দিন কতনুল মাআযী, সুলতান কামালুদ্দীন আদিমী তাতারিদের প্রতিহত করার জন্য আমীর সাইফুদ্দিনের সাহায্য চাইলে সে সকল উমারা আর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমবেত করে। সেখানে শায়খ আয়ুদ্দীন বিন আব্দুস সালামও উপস্থিত ছিলেন। তার কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে তিনি বললেন, “দুশমন আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করা পৃথিবীর সবার জন্য ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণের রণপ্রস্তুতির জন্য বাইতুল মাল শূন্য করে দেওয়াও বৈধ। এ জন্য উন্নত মানের ঘোড়া, অস্ত্রসহ সমরসামগ্রী কেনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তোমরা আর জনসাধারণ একই বরাবর। ফৌজদের কাছে কোন রসদ না থাকায় তা জনসাধারণের কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করায় কোন ক্ষতি নেই।”

এর কয়েকদিন পর আমীর সাইফুদ্দিন ওলামাদের কাছে বললো, “এ মুহূর্তে বাদশাহ তো শিশু হয়ে আছেন। তাছাড়া তিনি খুবই লজ্জাশীলও। ফলে এখন একজন সাহসী ও নির্ভীক বাদশাহ’র তখতে আরোহণ করা প্রয়োজন, যিনি জিহাদ করবেন।” আমীর সাইফুদ্দীনই অবশেষে বাদশাহ মনোনীত হয়। সে আল মুলকুল মুযাফফর উপাধি ধারণ করে।

৬৫৮ হিজরির শুরু দিকে কোন খলীফা নির্ধারিত হয়নি। তাতাররা ফোরাত নদী পাড়ি দিয়ে হলব শহরে এসে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এরপর তারা দামেশকে যায়। এদিকে তাতারিদের মোকাবিলা করার জন্য শাবান মাসে মিসরী সৈন্যরা এগিয়ে গেলে আল মূলকুল মুযাফফরও সসৈন্যে এগিয়ে যায়। তার সিপাহ সালারের নাম রুকনদ্দীন বিবরস। সে সময় তাতারিরা জালুত নদীর উপর ছিল। ৬৫৮ হিজরির রমযান মাসের পনেরো তারিখ শুক্রবারে উভয় বাহিনীতে তুমুল লড়াই হয়। এতে তাতারিরা পরাজিত আর মুসলমানগণ বিজিত হয়। এ যুদ্ধে অনেক তাতার সৈন্য নিহত হয়। আর বাকিরা পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করে। আল মুযাফফর দামেশকে অবস্থান করছিলেন। তার কাছে এ বিজয় সংবাদ পৌঁছানো হয়, জনতার দল আনন্দে নেচে উঠে। লোকেরা মুযাফফরের জন্য দুয়া করে আর তাকে ভালবাসতে থাকে। সিপাহসালার রুকনুদ্দিন বিবরস তাতারিদের পসচাদ্ধাবন করে। তাদেরকে হলব ইত্যাদি শহর থেকে বের করে না দেওয়া পর্যন্ত মুসলিম সিপাহসালার তাদের ধাওয়া করতেই থাকে।

সুলতান মুযাফফর রুকনুদ্দিন বিবরসকে এ বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য হলব শহর প্রদানের ওয়াদা করেছিলো, কিন্তু কার্যসিদ্ধির পর নিয়্যত পরিবর্তন হয়। এ খবর বিবরস জানার পর তার ব্যথিত হওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাতারিদের অবশিষ্টাংশ উৎখাত করার জন্য মুযাফফর হলবে যায়। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ফলে বিবরসের বিষণ্নতা আর তার বিরুদ্ধাচরণের কথা জানোতে পেরে সে পথ পরিবর্তন করে মিসরে চলে যায় আর খুবই গোপনভাবে বিবরসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগে। এদিকে বিবরসও মিসরে আসে। উভয়ে নিজ নিজ হিতাকাঙ্ক্ষীদের সাথে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে থাকে।

অবশেষে ৬৫৮ হিজরির যিলকদ মাসের ষোলো তারিখে আমীর উমারাদের সমর্থন নিয়ে বিবরস মুযাফফরকে হত্যা করে। সে আল মুলকুল কাহির উপাধি ধারণ করে তখতে আরোহণ করে। মুযাফফর তার শাসনামলে যে অত্যাচার করেছে, সে তার অবসান ঘটায়। সে যীনুল মিল্লাত ওয়া দ্বীন ইবনে যুবাইরকে উযির মনোনীত করে। সুযোগ বুঝে উযির একদিন বিবরসকে বললো, "আল কাহির উপাধি ধারণকারী কোন বাদশাহ সফলকাম হয়নি, তাই এ উপাধি পরিবর্তন করাই শ্রেয়। দেখুন, আল কাহির বিন আল মুতাযদ এ উপাধি ধারণ করেছিলো। কিছুদিন পর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার চোখ দুটো উপড়ে ফেলা হয়। মৌসুলের শাসনকর্তাও আল কাহির উপাধি ধারণ করেছিলো, তাকেও বিষ খাওয়ানো হয়।" এ কথা শুনে সে কাহির উপাধির পরিবর্তে যাহির উপাধি ধারণ করে।

বর্ষপরিক্রমায় ৬৫৯ হিজরি আসে। পৃথিবীতে তখনো কোন খলীফা ছিল না। রযব মাস পর্যন্ত দুনিয়ায় খলীফার শাসন মুক্ত ছিল। অবশেষে সাড়ে তিন বছর পর খিলাফত ব্যবস্থা শূন্য থাকার পর মিসরে মুসতানসিরের খিলাফত কায়েম হয়। এর বিবরণ আমরা সামনে পেশ করবো।

খলীফা মুসতাসিমের শাসনামলে যেসকল ওলামায়ে কেরামগণ ইন্তেকাল করেন তারা হলেন – হাফেজ তাকিউদ্দিন সারিফীনী, হাফেজ আবুল কাসিম বিন আল তায়লিসান, হানাফি মাযহাবের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব শামসুল আইম্মা আল কুর্দি, শায়খ তকিউদ্দিন বিন সালাহ, ভাশাবিদ ও ঐতিহাসিক হাফেজ মুহিবুদ্দিন বিন বুখার, মুনতাখিবুদ্দীন, নাহুদিব ইবনে ইআইশ, দানশীল আবুল হুজ্জাজ আল আকসারী, নাহুবি আবু আলী

সারবিনী, ইবনে বায়তার, ইমাম আল্লামা জালালুদ্দীন আল হাজিব, আবুল হাসান বিন দিবাহ, তারিখুল নুহাত গ্রন্থকার কাফীতী, আফযালুদ্দীন, হাফেজ ইউসুফ বিন খলীল, বাহার বিনতুল হুমায়রী, জামাল বিন উমরাওয়ান, গ্রন্থকার রেজা, মাআনী, বয়ান, ইযাযুল কুরআন প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক কামাল আবদুল ওহেদ যিমলেকারী, মজদ বিন তাইমিয়া, মারাতুস যামান বইয়ের লেখক ইউসুফ সবত ইবনে জাওযী ইবনে বাতিশ শাফী, সাহেবে তাফসীর আবুল ফজল আল মরসী প্রমুখ।

খিলাফত শূন্য সময়ের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - যাকী আবদুল আযীম আল মুনসারী, শায়খ আবুল হাসান শাযলী, শায়খ তয়েফা, শুবাতুল মাকরী, আশ শাতিবা গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার ফাসী, কবি সাদুদ্দীন, কবি সরসরী, স্পেনের ঐতিহাসিক ইবনুল আবার প্রমুখ।

আল মুসতানসির বিল্লাহ আহমাদ

আল মুসতানসির বিল্লাহ আহমাদ আবুল কাসিম বিন যাহির বিন বি আমরিল্লাহ আবু নসর মুহাম্মাদ বিন নসর লিদ্দীনিল্লাহ আহমাদ।

শায়খ কুতুবুদ্দীন বলেছেনঃ আল মুসতানসির বিল্লাহ বাগদাদে বন্দী ছিলেন। তাতারিদের ফিতনার সময় জিন্দানখানা থেকে পালিয়ে পশ্চিম ইরাকে চলে যান। বিবরস সুলতান হওয়ার পর তিনি বনু মিহারিশ গোত্রের দশজন প্রতিনিধি নিয়ে সুলতানের কাছে আসেন। সুলতান বিচারক ও উচপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে কায়রোতে নিয়ে আসে। প্রধান বিচারপতি তাজুদ্দীন বিন বিনতুল ইআয তার বংশ পরম্পরা সাবেত করেন।

৬৫৯ হিজরির রজব মাসের তেরো তারিখে সর্বপ্রথম সুলতান তার হাতে খিলাফতের বাইয়াত করে। এরপর প্রধান বিচারপতি তাজুদ্দিন, এরপর শায়খ আযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, এরপর রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এরপর একে একে সকলেই তার হাতে বাইয়াত করে।

তার নামে খোদিত মুদ্রা চালু হয় আর তার নামে খুৎবা পাঠ শুরু হয়। তিনি তার ভাইয়ের উপাধি আল মুসতানসির ধারণ করেন। জনগন তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

তিনি জুমার দিন শোভাযাত্রার মাধ্যমে ঘোড়ায় চড়ে জামে মসজিদে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা পাঠ করতেন। তিনি খুৎবার মধ্যে সর্বপ্রথম বনু আব্বাসের মর্যাদা আর শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ দিয়ে সুলতান আর সকল মুসলমানের জন্য দুয়া করতেন। এরপর নামায পড়াতেন, নামাযের পর পুরানো রীতি অনুযায়ী সুলতানকে খিলআত প্রদান করতেন। তিনি কায়রোর বাইরে একটি শিবির স্থাপন করেন।

৬৫৯ হিজরির শাবান মাসের চার তারিখে সোমবারে তিনি সুলতানকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সেখানে যান। উযির, উমারা আর বিচারপতিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা নিজ হাতে সুলতানকে খিলআত আর মালা পড়িয়ে দেন। ফখরুদ্দিন বিন লুকমান মিম্বরে আরোহণ করে খলীফার ফরমান পাঠ করে শুনান। খিলআত গ্রহণ করে সুলতান তার উপদেষ্টাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে চলে যেতো, আর তার সাথে পদব্রজে চলতো আমিরদের একটি বড় জামাআত। তিনি কায়রোকে অলংকৃত করেন। সুলতান খলীফার জন্য একজন উপদেষ্টা, দূত, বাবুর্চি, প্রহরী, কোষাধ্যক্ষ, পত্র লেখক নিয়োগ করে। গোটা রাজ্য তার হাতে অর্পণ করে। তাকে দেওয়া হয় একশোটি ঘোড়া, ত্রিশটি খচ্চর, দশ কাতার উট ইত্যাদি।

যাহাবি বলেছেনঃ খলীফা মুসতানসিরের ভাতিজা মুত্তাকীর তার খিলাফত আর কারো হস্তগত হয়নি, তবে হলবের শাসনকর্তা আমীর শামসুদ্দীন আফরাশ আল হাকিম বি আসরিল্লাহ উপাধি ধারণ করে খিলাফতের দাবী করেন আর হলবে খিলাফত কায়েম করায় তার নামে মুদ্রা ও খুৎবা পাঠ শুরু হয়।

কিছু দিন পর খলীফা আল মুসতানসির ইরাক যাওয়ার ইচ্ছা করেন। সুলতান তাকে দামেশ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য দামেশক পর্যন্ত যায়। দামেশকে গিয়ে সুলতান খলীফা আর মৌসুলের শাসনকর্তার আওলাদদের এক লাখ দিনার আর ৬৬ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। এরপর খলীফা শরক, ওলীয়ান, মৌসুল, বুকারা আর জাযীরার বাদশাহদের নিয়ে হলবে যান। হলবের শাসনকর্তা নিজের খিলাফত ত্যাগ করে খলীফার আনুগত্যে চলে আসেন আর নম্রতা প্রদর্শন করেন। এরপর খলীফা সামনে অগ্রসর হয়ে হাদীসা দখল করে নেন। তাতারিরা এসে তাদের উপর হামলা চালায়। এতে অনেক মুসলমান শহীদ হোন আর খলীফা নিরুদ্দেশ হোন। কেউ কেউ বলেন, তিনিও শহীদ হোন। এটাই মনে হয় বিশুদ্ধ অভিমত। কেউ কেউ বলেন, তিনি পালিয়ে যান, পরবর্তীতে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটি ৬৬০ হিজরির মুহাররম মাসের তিন তারিখের ঘটনা। এ হিসাব অনুযায়ী তিনি মাত্র ছয় মাস খিলাফত পরিচালনা করেছেন, তার পর আল হাকিম যিনি হলবে খিলাফতের দাবী করেছিলো, সে আল হাকিম বি আমরিল্লাহ উপাধি ধারণ করে খিলাফতের তখতে আরোহণ করে।

আল হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস

আল হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আবু আলী হোসেন আবকী বিন আলী বিন আবু বকর বিন খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহ বিন মুসতাযহার বিল্লাহ।

বাগদাদে হত্যাযজ্ঞের সময় আত্মগোপনের কারণে তিনি প্রানে রক্ষা পান। তিনি এক দল লোক নিয়ে বাগদাদ থেকে বনু খিফাজা গোত্রের আমীর হুসাইন বিন ফালাহ'র কাছে চলে যান। তার কাছে কিছুদিন থেকে আরবীদের সাথে দামেশকে আমীর ঈসা বিন মাহনার কাছে যান। দামেশকের শাসনকর্তা আন নাসর তাকে ডেকে পাঠায়। তিনি তখনো যাননি। এরই মধ্যে তাতাররা আক্রমণ করে। আল মুলকুল মুযাফফর দামেশকে তাতারিদের সাথে লড়াই শেষে আমীর ফালাজ বাগদাদীর হাতে আবার তাকে দামেশকে ডেকে পাঠায়। জনসাধারণ তার হাতে বাইয়াত প্রদান করে। আরবের এক দল উমারা তাকে সমর্থন জানায়। তিনি তাদের সহচরত্বে ঘানা, হাদীসা, হাইবত, আনবার প্রভৃতি শহর দখল করেন। এরপর তাতারিদের সাথে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

এরপর মূলকুয জাহেরের আহবান সম্বলিত দামেশকের নায়েব আলাউদ্দিন তোবায়রিসের চিঠি তার কাছে পৌঁছে। অবশেষে সফর মাসে তিনি দামেশকে পৌঁছলে দামেশকের নায়েব আলাউদ্দিন তাকে সুলতান আল মূলকুয যাহিরের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তিনি কায়রোতে পৌঁছার তিনদিন পূর্বেই সেখানে মুসতানসিরের বাইয়াত সম্পন্ন হয়। এজন্য তিনি বন্দী হওয়ার আশংকায় হলবে ফিরে যান। হলবে সেখানকার শাসনকর্তা আর সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাকে বাইয়াত দেন। বাইয়াতকারীদের মধ্যে ছিলেন আবদুল হালিম বিন তাইমিয়া। বাইয়াতকারীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

তিনি ঘানায় যান। মুসতানসির ঘানায় গেলে তিনি তার আনুগত্য গ্রহণ করেন। মুসতানসির তাতারিদের সাথে যুদ্ধে নিখোঁজ হওয়ায় রুহবার প্রশাসক ঈসা বিন মাহনার কাছে যান। সেখান থেকে আল মূলকুয যাহির বিবরস তাকে ডেকে পাঠায়। তিনি নিজ সন্তানদের সাথে একদলসহ কায়রোতে পৌঁছান। যাহির তাকে খুবই সমাদর করে আর তার কাছে খিলাফতের বাইয়াত করে। যাহির দুর্গের শিখরে আরোহণ করে। তিনি সেখানে কয়েকবার খুৎবা দেন।

শায়খ কুতুবুদ্দিন বলেন, ৬৬১ হিজরির মুহাররম মাসের আট তারিখ বৃহস্পতিবারে সুলতান একটি আম মজলিশের ইন্তেজাম করে। হামিক বি আমরিল্লাহ কিলআতুল জাবালের বড় প্রাসাদে গিয়ে সুলতানের সাথে উপবেশন করেন। সুলতান তার সম্মানে যমীন চুম্বন করে আর বাইয়াত করে। খলীফা সুলতানকে খিলাআত প্রদান করায় তার লোকেরা একের পর এক বাইয়াত করতে থাকে। পরের দিন জুমায় তিনি খুৎবা পাঠ করেন। হামদ আর সালাতের পর জিহাদ ও ইমামতের গুরুত্ব তুলে ধরে খিলাফতের বেইজ্জতির কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি খুৎবায় এভাবে আল্লাহ'র প্রশংসা করেন – "সেই প্রতিপালকের প্রশংসা, যিনি বনু আব্বাসের সাহায্যকারী।" খুৎবা শেষে তার বাইয়াতের ঘোষণা দেওয়া হয়।

৬৬১ হিজরিতে এ ঘটনার পর তাতারিরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। আশ্রয়কারী হয়ে তারা মুসলিম সাম্রাজ্যে নীরবতার সাথে বসবাস করতে থাকে। তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়। এভাবে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমতে থাকে।

৬৬২ হিজরিতে কাসরিয়ীন শহরে মাদরাসা যাহিরিয়া নির্মিত হয়। শাফী মাযহাবের ফিকাহশাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য তাকী বিন যারির আর হাদিসের শিক্ষক হিসেবে শরফ দিময়াতীকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ বছর মিসরে শক্ত ভুমিকম্প হয়।

৬৬৩ হিজরিতে স্পেনের বাদশাহ সুলতানুল মুসলিমীন আবু আবদুল্লাহ বিন আল আহমর ফিরিঙ্গীদের পরাজিত করে বাতিস শহর ছিনিয়ে নেন। এ বছর কায়রো শহরের বিভিন্ন ভবনে অগ্নিসংযোগ হয়। এ বছর সুলতান উমারাদের সাথে নিয়ে আশমুন সাগর খনন কাজে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেন। এ বছর তাতারিদের সর্দার হালাকু খান মারা যায়। তার স্থানে তার ছেলে আবগা বাদশাহ হয়। এ বছর সুলতান তার চার বছরের পুত্র সন্তান মূলক আল সাইদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে। এ বছর মিসরে প্রত্যেক মাযহাবের চার বিচারক নিয়োগ করা হয়। এ বছর রমযান মাসে সুলতান খলীফাকে পর্দার আড়ালে রাখে।

৬৫৫ হিজরিতে হাসিনাহ শহরে সুলতান একটি জামে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। ৬৬৭ হিজরিতে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এ মসজিদে হানাফী মাযহাবের খতীব নিয়োগ পান।

৬৭৪ হিজরিতে সুলতান নূবা এবং দানকিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করে নূবার বাদশাহকে যাহিরের সামনে হাজির করা হয়, আর দানকিলার অধিবাসীদের উপর যিজিয়া কর আরোপ করা হয়।

যাহাবি বলেছেনঃ ৩৩ হিজরিতে সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ বিন আবু সুরাহ পাঁচ হাজার ঘোড় সওয়ার নিয়ে নূবা আক্রমণ করেও বিজয় ছিনিয়ে আনতে না পেরে সন্ধি করেন। এরপর হিশামের যুগেও হামলা চালানো হয়, কিন্তু বিজয় আসেনি। এরপর যথাক্রমে মানসুর, নাসিরুদ্দৌলা বিন হামদান আর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির ভাই তুরান শাহ ৫৬৮ হিজরিতে লড়াই করেও বিজয়মাল্য পড়তে পারেনি। আর তা এ বছর বিজিত হয়। এ বিজয়কে নিয়ে ইবনে আব্দুয যাহির একটি কবিতা লিখেছেন যার অর্থ হল – “এটা এমন এক বিজয়, যা কখনো শুনিনি, দেখিনি আর লোকেরাও এর বিবরণ দেয়নি।”

৬৭৬ হিজরির মুহাররম মাসে সুলতান মুলকুয যাহির ইন্তেকাল করে। তার স্থানে ১৮ বছর বয়সে তার ছেলে সাইদ মুহাম্মাদ উপবেশন করে। এ বছর তাকি বিন রাযি মিসর আর কায়রো উভয় শহরের বিচারপতি মনোনীত হোন। এর আগে শহর দুটোতে পৃথক পৃথক বিচারপতি ছিলেন।

৬৭৮ হিজরিতে সাইদ মুহাম্মাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় আর সে এ বছর বজ্রপাতে মারা যায়। তার স্থানে তার ভাই বদরুদ্দিন শালামাশ সুলতান হয়ে মিসরে সাত বছর দায়িত্ব পালন করে। তার উপাধি ছিল মূলকুল আদেল। আমীর সাইফুদ্দীন কালাদুন (কালদুয) তার অভিভাবকত্বের দায়ভার গ্রহণ করে। দুদিকে দুজনের

নাম খোদিত মুদ্রা চালু হয়। খুৎবায় দুজনের নাম পাঠ করা হয়। রযব মাসে শালামাশকে সরিয়ে কালাদুন আর মুলকুন মানসুর উপাধি নিয়ে একচ্ছত্র বাদশাহ হয়ে যায়।

৬৭৯ হিজরিতে আরাফার দিন শিলা ও বজ্রপাত হয়।

৬৮০ হিজরিতে তাতারিরা সিরিয়ায় এসে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলে সুলতান তাদের সাথে যুদ্ধ করলে মুসলমানরা বিজিত হয়।

মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলে তারাবালাস শহর বিজিত হয়। ৫০৩ হিজরিতে খ্রিষ্টানরা তা ছিনিয়ে নেয়। ৬৮৮ হিজরিতে তা আবার পুনঃদখল হয়।

৬৮৯ হিজরির যিলকদ মাসে সুলতান কালাদুনের ইন্তেকাল হয়। তার স্থানে তার ছেলে আল মুলকুল আশরাফ সালাহুদ্দীন খলীল সুলতান হয়।

৬৯১ হিজরিতে সুলতান রোমের দুর্গ অবরোধ করে।

৬৯৩ হিজরিতে সুলতান নিহত হয়। তার ভাই মুহাম্মাদ বিন মানসুর নয় বছর বয়সে আল মূলকুন নাসর উপাধি নিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করে।

৬৯৪ হিজরিতে মুহাররম মাসে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে কিতবাগা আল মানসুর মুলকুল আদেল লকব ধারণ করে তখতে উপবেশন করে। এ বছর তাতারিদের বাদশাহ ফাযান বিন আওগুন বিন আব- না বিন হালাকু খান ইসলাম গ্রহণ করায় মুসলমানরা খুশী হয় আর তার সৈন্যদের মাঝে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।

৬৯২ হিজরিতে সুলতান মুলকুল আদেল দামেশক গেলে সফর মাসে লাজীন জবরদস্তীমূলক আমীর-উমারাদের থেকে আনুগত্যের শপথ আদায় করে। খলীফা তাকে খিলআত প্রদান করেন। মুলকুন আদেল সরহদে পালিয়ে যায়।

অবশেষে ৬৯৮ হিজরিতে লাজীন নিহত হয়। এরপর ক্ষমতাচ্যুত মুলকুন নাসর মুহাম্মাদ বিন মানসুর কালাদুন আবার সুলতান হয়। খলীফা তাকেও খিলআত প্রদান করেন। আর আল মুলকুল আদেল নায়েবে সালতানাত হয়ে হাম্মাত শহরে যান। সে মৃত্যু অবধি ৭০২ হিজরি পর্যন্ত সেখানেই ছিল।

৭০১ হিজরির জামাদিউল আউয়াল মাসের ১৮ তারিখ জুমআর রাতে খলীফা হাকিম বি আমরিল্লাহ ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন। আসরের সময় দুর্গের নিচে সওকে খায়েল এ তার জানাযার নামায পড়ানো হয়। খলীফার আত্মীয় স্বজন আর সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ রক্ষী- প্রহরীসহ জানাযার নামাযে শরীক হোন। তাকে সাইয়েদাহ নাফীসার কাছে সমাহিত করা হয়। তিনি প্রথম খলীফা, যাকে সর্বপ্রথম এখানে দাফন করা হয়েছিলো। তখন থেকে আজ পর্যন্ত তার বংশধরকে এখানেই দাফন করা হয়।

খলীফা হাকিম তার শাসনামলে নিজের পুত্র আবু রবিয়া সুলায়মানকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেছিলেন।

তার যুগে যেসব ওলামাগণ ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - শায়খ আযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম, দানশীল আবু কাসিম কুবারী, যীন খালিদ নাবলুসী, হাফেজ আবু বকর বিন সুদ্দী, ইমাম আবু শামা, তাজ বিন বিনতুল আ- আয, আবুল হাসান বিন আদলান, মজদ্দীন বিন দাকিকুল ঈদ, নাহুবিদ আবুল হাসান বিন আসফুর, আব্দুর রহীম বিন ইউনুস, বিখ্যাত মুফাসসীর (সাহেবে তাফসীর) আল্লামা কুরতুবি, শায়খ জালালুদ্দীন বিন মালিক, তার ছেলে বদরুদ্দীন, দর্শন জগতের সম্রাট তাসির তুসী, শায়খ মহিউদ্দিন নূরী, হানাফী ইমাম সুলায়মান, বুরহান বিন জামাআত, ঐতিহাসিক তাজ বিন মায়াসসার, মুফাসসির কাওয়াশী, নাহুবিদ ইবনে ইয়াদ আবদুল হালিম বিন তাইমিয়া, ইবনে জাওয়ান, নাসিরুদ্দিন ইন মুনির, ইলমুল কালাম (অলংকার শাস্ত্রের) রূপকার নজম বিন বারযী বুরহানুল নফসী, রেযা শাতবী, জামাল শুয়াইশী, কবি আফীফ, তাজ বিন ফুররাহ, যায়েদ বিন মুরহিল, মুহিব তবরী, রেযা কাসতানতিনী প্রমুখ।

আল মুসতাকফী বিল্লাহ আবু রাবীআ

আল মুসতাকফী বিল্লাহ আবু রাবীআ সুলায়মান বিন হাকিম বি আমরিল্লাহ ৬৮৪ হিজরির মুহাররম মাসের মাঝামাঝিতে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতার খিলাফতকালে তিনি উত্তরাধিকার মনোনীত হওয়ায় পরবর্তীতে খলীফা হোন।

৭০১ হিজরির জামাদিউল আউয়াল মাসে মিসর আর সিরিয়ার মিম্বরগুলোতে তার নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। এর সুসংবাদ মুসলিম সাম্রাজ্যের চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। খিলাফতের খান্দানরা আস্তাবলে থাকতেন। সুলতান তাদের দুর্গে ডেকে এনে তাদের পৃথক পৃথক করে দেয়।

৭০২ হিজরিতে তাতাররা সিরিয়ার উপর হামলা চালায়। খলীফা আর সুলতান যৌথভাবে মোকাবিলা করলে তারা পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে অনেক তাতার সৈন্য নিহত হয়। এ বছর মিসর আর শামে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়, ফলে বিধ্বস্ত বাড়ির নিচে অনেক মানুষ চাপা পড়ে মারা যায়।

৭০৪ হিজরিতে আমীর বিবরস জামে মসজিদে হাকিম- এ দরস তদরীস (শিক্ষা দিক্ষা) শুরু করেন। তিনি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি চারজন কাযী নিয়োগ করেন। ফিকহের দুজন শিক্ষক, সাউদুদ্দিন হারেসী হাদিসের জন্য আর আবু হায়ানকে আরবি ব্যাকরণের উস্তাদ পদে নিয়োগ দেন।

৭০৮ হিজরির রমযান মাসে সুলতান আল মুলকুন নসর মুহাম্মাদ বিন কারাদুন হজ্জব্রত পালনের জন্য মিসর থেকে এক জামাআত আমীর- উমারাসহ যাত্রা করে। পথিমধ্যে এ সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মাহত হয়ে সে মিসরে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার সংবাদ পাঠালে ৭০৮ হিজরির শাওয়াল মাসের ২৩ তারিখে রুকুনদ্দৌলা বিবরস তার স্থানে অধিষ্ঠিত হয়। সে মুলকুল মুযাফফর উপাধি ধারণ করে। খলীফা তাকে খিলআত আর পাগড়ি প্রদান করেন। এরপর খলীফার একটি ফরমান নিয়ে সে সিরিয়া যায়। শাহী ফরমানে লিখা ছিল –

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

৭০৯ হিজরিতে আল মূলকুন নাসর আবার সালতানাতের দাবী করলে আমীর উমারাদের একটি জামাআত তাকে সমর্থন জানায়। শাবান মাসে দামেশকে আসে আর ঈদুল ফিতরের দিন সে মিসরের দুর্গে প্রবেশ করে। মুলকুল মুযাফফর পালিয়ে যায় আর পরবর্তীতে তাকে হত্যা করা হয়।

এ বছর তাতারিদের বাদশাহ ফুবন্দ তার রাজ্যে রাফেযিদের অনুরূপ খতীবদের আলি (রাঃ), আহলে বাইত আর তার আওলাদ ছাড়া খুৎবায় কারো নাম উল্লেখ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে। তার মৃত্যু পর্যন্ত, অর্থাৎ ৭১৬ হিজরি পর্যন্ত এ নির্দেশ বহাল ছিল।

তারপর তার ছেলে আবু সাইদ ক্ষমতায় আরোহণ করলে চারদিকে ইনসাফ ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সুন্নতকে কায়েম করেন। খুৎবায় যথাক্রমে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), উমর ফারুক (রাঃ), উসমান গনী (রাঃ) আর আলি মুর্তজা (রাঃ) এর নাম জারি করেন। তার প্রশাসনিক নীতি সকল (তাতারি) বাদশাহদের নীতি অপেক্ষা শ্রেয়, বলিষ্ঠ ও উত্তম ছিল। তিনি সুন্নতের অনুসারী ছিলেন। মৃত্যু অবধি তিনি এই অভিন্ন তরিকার উপর অটুট ছিলেন। ৭৩৬ হিজরিতে তার মৃত্যুর পর তাতারিদের সালতানাত দুর্বল হয়ে পড়ে।

৭১৭ আর ৭২৭ হিজরিতে নীল নদের পানিতে পার্শ্ববর্তী জনপদগুলো প্লাবিত হয়।

৭২৮ হিজরিতে পবিত্র মক্কা শরীফের মসজিদে হারাম আর তার দরজা নির্মাণ করা হয়, আর দরজার একটি অংশ বাবে বনু শায়বা পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

৭৩০ হিজরিতে মাদরাসা সাহিলিয়ায় জুমআর নামায কায়েম করা হয়। এ বছর কুসুন একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। সেখানে সুলতান আর পদস্থ অফিসারগণ একত্রিত হয়ে প্রধান বিচারপতি জালালুদ্দীনকে খতীব নিয়োগ করা হয়। এরপর ফখরুদ্দীন বিন শুকর স্থায়ী খতীব হিসেবে নিয়োগ পান।

৭৩৩ হিজরিতে সুলতান আবনুস গাছের কাঠ দিয়ে কাবা শরীফের দরজা তৈরি করে। এর উপর একটি রৌপ্য লাগানো হয়, যার অর্জন পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ মিসকাল। পুরানো দরজায় ইয়ামনের শাসনকর্তার খোদিত নামটি তুলে ফেলা হয় আর এর কাঠগুলো বনু শায়বার লোকেরা চেয়ে নেয়।

৭৩৬ হিজরিতে সুলতান খলীফাকে কেল্লার এক শীর্ষ প্রকোষ্ঠে নজরবন্দি করে। লোকদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৭৩৭ হিজরির যিলহাজ্জ মাসে আত্মীয়- স্বজনসহ খলীফাকে কুসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাকে নিয়মিত ভাতা দেওয়া হতো। অবশেষে খলীফা ৫০ বছর বয়সে ৭৪০ হিজরির শাবান মাসে ইন্তেকাল করেন। তাকে সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

ইবনে হাযার ‘আদ- দর’ গ্রন্থে লিখেছেনঃ খলীফা মুসতাকফি জ্ঞানী, উদার আর বীর বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন। তার হস্তাক্ষর ছিল অপূর্ব। বন্দুকের গুলি ছোঁড়া আর পোলো খেলার ক্ষেত্রে তাকে উস্তাদ মনে করা হতো। তিনি ওলামা আর সাহিত্যিকদের সহচরত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আদের খুবই শ্রদ্ধা আর সমাদর করতেন। তার শাসনামলে, নজরবন্দী থাকাকালীন, এমনকি কুসে অবস্থান করার সময় সর্বদা তার নামে খুৎবা পাঠ করা হতো। প্রথমে খলীফার সাথে সুলতানের মধুর ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তারা একসাথে ভ্রমনে বের হতেন, পোলো খেলতেন আর উভয়ের মাঝে ভাতৃত্বের সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। একদিন খলীফার একটি চিঠি পড়ে সুলতান তার উপর অসম্ভব রাগ করে। এ চিঠিটি খলীফা এক লোকের কাছে লিখেছিলেন। এতে লেখা ছিল - মজলিশের প্রারম্ভে আমি সুলতানকে অমুক লেনদেনের কারণে পেশ করতে চাই। এরপর সুলতান তাকে কুসে পাঠিয়ে দেয় আর তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেয়। খলীফার সম্মান মিসরের চেয়েও কুসে বেশী ছিল।

ইবনে ফাযলুল্লাহ 'আল মাসলিক' গ্রন্থের অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেনঃ খলীফা মুসতাকফী খুবই নম্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তার যুগে যেসব ওলামা ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - কাযি উল কুযযাত তাকিউদ্দিন বিন দাকিকুল ঈদ, শায়খ যীনুদ্দিন আল ফারুকি, হাফেজ শরফুদ্দীন, যিয়াউত তুসী, হানাফি ইমাম আর হিদায়ার ব্যাখ্যাকার শামসুস সুরুজী, শাফি ইমাম নজমুদ্দীন বিন রিফা, মক্কার মুহাদ্দিস ফখরুস সুরী, শাইখুল হাদিস সদরুদ্দীন বিন ওকীল, মক্কার ইমাম রেযা আবারী, শায়খ তাকিউদ্দিন বিন তাইমিয়া প্রমুখ।

আল ওয়াসিক বিল্লাহ ইব্রাহীম

আল ওয়াসিক বিল্লাহ ইব্রাহীম বিন ওলীয়ে আহাদ আল মুসতামসিক বিল্লাহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমেদের দাদা হালিমের ছেলে মুহাম্মাদকে আল মুসতামসিক বিল্লাহ উপাধি দিয়ে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। তবে তিনি পিতার সামনে ইন্তেকাল করায় হাকিম তার নাতি ইব্রাহীমকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। হাকিমের ধারণা ছিল, ইব্রাহীমের মধ্যে খিলাফত পরিচালনার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নিজেই বুঝতে পারেন যে, ইব্রাহীম এ কাজের যোগ্য নন। কারন তিনি খেলাধুলা প্রিয় আর চরিত্রহীন লোকদের সহচর ছিলেন। হাকিম তার সংশোধনে অপারগ হয়ে তাকে উত্তরাধিকার থেকে অপসারণ করে ইব্রাহীমের চাচা মুসতাকফীকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। ফলে ইব্রাহীম খলীফা আর সুলতানের মধ্যে মনোমালিন্যের বীজ বপন করেন। যে ইতিহাস দুনিয়াবাসির অজানা নয়।

মুসতাকফী মৃত্যুর সময় পুত্র আহমাদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। কিন্তু সুলতান এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ না করায় জনগণ ইব্রাহীমের কাছে বাইয়াত করে আর তাকে 'আল ওয়াসিক বিল্লাহ' উপাধি দেয়। মৃত্যুর সময় সুলতান এ কাজে দারুন অনুতপ্ত হয় আর ৭৪২ হিজরির মুহাররম মাসের শেষে ইব্রাহীমকে অপসারণ করে আহমাদকে 'হাকিম বি আমরিল্লাহ' উপাধি দিয়ে খলীফা নির্ধারণ করে দেয়।

আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানি বলেছেন, "লোকেরা ইব্রাহীমের অনৈতিক কাজগুলোর অভিযোগ জানালেও সুলতান তাদের কথায় কোন প্রকার কান দেয়নি, উপরন্তু তারই হাতে বাইয়াত হয়।"

ইবনে ফাজলুল্লাহ 'আল মাসালিক' গ্রন্থে লিখেছেনঃ খিলাফতের যোগ্যতা এসে যাবে ভেবেই হাকিম ইব্রাহীমকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু তিনি সৎ লোকের সহচরে না গিয়ে মন্দ মানুষের সংস্পর্শে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। মুসতাকফীর মৃত্যুর সময় তার ছেলের প্রতি করুণা করার প্রেক্ষিতে খলীফার সাথে সুলতানের সম্পর্কে ভাটা পড়ে, যার বিবরণ আমরা আগেই পেশ করেছি। এর সূত্র ধরে সুলতান ইব্রাহিমকেই মনোনীত করে। যেহেতু ইব্রাহীমের দাদা হাকিম তাকে উত্তরাধিকার বানিয়েছেন মুসতাকফী তার ছেলে আহমাদকে মনোনীত করার আগেই। প্রধান বিচারপতি আবু উমর বিন জামাত সুলতানের বিরোধীতা করেন। কিন্তু তার অভিমতটিই প্রাধান্য পেয়ে যায়। খুৎবায় তার পরিবর্তে সুলতানের নাম উল্লেখ হয়। মুসতাকফীর মৃত্যুর পর থেকে খুৎবায়, মিম্বরে আর দুয়ার মজলিসে খলীফাদের নাম বিলুপ্ত হয়ে যায় আর সুলতানদের নাম বাকি থেকে যায়। সুলতানের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। মৃত্যুর কড়াঘাতে শংকিত সুলতানের তখন দৃষ্টি খুলে যায়। খলীফা মুসতাকফীর ওসীয়ত মোতাবেক খিলাফত বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সুলতান এবার উঠে পড়ে লাগে। সে তার আগের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় আর ইব্রাহীমকে অপসারণ করে।

আল হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস

আল হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আল মুসতাকফী।

কুস শহরে ইন্তেকালের সময় মুসতাকফী হাকিমকে উত্তরাধিকার মনোনীত করলে সুলতান আল মুলকুন নাসর হাকিমের চাচাতো ভাই ইব্রাহীমকে নির্বাচন করে। ইব্রাহীমের চরিত্র ভালো না হওয়ার কারণে কাযী আযুদ্দীন বিন জাআমত সুলতানের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তা কোন কাজেই আসেনি। সুলতান ইব্রাহীমের কাছেই বাইয়াত করে। অবশেষে মৃত্যুর সময় সুলতানের বোধ দয় হয়। সে ইব্রাহীমকে অপসারণ করে আহমাদের (হাকিমের) কাছে বাইয়াত গ্রহণের জন্য আমীর- উমারাদের ওসীয়ত করে। সুলতানের মৃত্যুর পর আল মানসুর আবু বকর বিন নসর সুলতান হয়।

৭৪১ হিজরির যিলহজ মাসের এগারো তারিখ মঙ্গলবারে নতুন সুলতান একটি মজলিশের আয়োজন করে। এ মজলিসে ইব্রাহীম আর হাকিম উভয়কেই ডেকে আনা হয়। ভরা মজলিসে কাযিদের জিজ্ঞাসা করে, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে খিলাফতের হকদার কে ? কাযী আযুদ্দীন বিন জামাত বললেন, খলীফা মুসতাকফী মৃত্যুর সময় কুস শহরে পুত্র আহমাদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। এ কাজের সত্যতা প্রমাণের জন্য খলীফা কুস শহরের চল্লিশজন ইনসাফগার সাক্ষীও রেখে গেছেন। এরা আমার নায়েব কুস শহরের কাযীর কাছে সাক্ষীও দেখেছে। উপরন্তু আমি নিজেও এর সাক্ষী, এ কথা শুনে সুলতান সাথে সাথে ইব্রাহীমকে অপসারণ করে আহমাদের কাছে বাইয়াত করে আল হাকিম বি আমরিল্লাহ উপাধি দেয়।

ইবনে ফাযলুল্লাহ 'মাসালিক' গ্রন্থে লিখেছেনঃ হাকিম বি আমরিল্লাহ হলেন আমাদের যুগের ইমাম (মহান নেতা) আর আমাদের দেশের জন্য রহমতের বারিধারায় সিক্ত বাদশাহ, তার পক্ষ থেকে শত্রুর প্রতি ক্রোধ আর মিত্রের প্রতি প্রশান্তি পৌঁছে যেতো। সারা জীবনে কল্যাণকর কাজ করার কারণে তার প্রতি সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নত হয়ে যেতো। তিনি খিলাফতের রীতিনীতিগুলোকে পুনর্জীবন দান করেন। তার বিরুদ্ধবাদীদের কাউকে তিনি শাস্তি দেননি। তিনি বাপ দাদার পদাঙ্ক অনুসরণে চলতেন। নিজ পরিজনের মধ্যে বিরাজিত হতাশা আর মতভেদ দূর করে দেন। সকল মিম্বরগুলতে তার নামে খুৎবা পাঠ হতে থাকে।

আল্লামা ইবনে হাযার বলেন, "প্রথমে তার উপাধি আল মুসতানসির নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে আল হাকিম লকব হয়ে যায়।"

শায়খ যায়নুদ্দীন ইরাকী বলেন, হাকিম মুতাআখখিরীনদের কাছে হাদিস শুনেছেন। ৭৫৩ হিজরির মধ্যবর্তীতে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

তার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে - সুলতান মানসুরের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা আর মদ পানের দায়ে তাকে অপসারণ করা হয়। কথিত আছে যে, তার বাবার স্ত্রীদেরও ছাড়তো না। তাকে কুসে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর ওখানেই সে নিহত হয়। বস্তুত এটা ছিল আল্লাহ'র পক্ষ থেকে তার কৃত

অপরাধের প্রতিদান – যা তার পিতা খলীফা মুসতাকফীর সাথে করেছিলো। যারাই বনু আব্বাসকে কষ্ট দিয়েছে, তারাই সাথে সাথে শাস্তি পেয়েছে - আল্লাহ'র এই আদত সর্বদা চালু ছিল।

মানসুর অপসারিত হওয়ার পর তার ভাই আল মুলকুল আশরাফ সুলতান হয়। তাকেও তখত থেকে নামিয়ে দেওয়ার পর তার ভাই আহমাদ নসর লকব ধারণ করে মসনদে আরোহণ করে। ৭৪৩ হিজরিতে আহমাদকেও ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তার স্থানে তার ভাই ইসমাইল সালিহ উপাধি নিয়ে সুলতান হয়। ৭৪৬ হিজরিতে ইসমাইল সালিহের মৃত্যু হলে খলীফা তার ভাই শাবানকে আল কামিল উপাধি দিয়ে সুলতান মনোনীত করেন। ৭৪৭ হিজরিতে কামিল নিহত হলে তার ভাই আমীর হাজ আল মুযাফফর উপাধি নিয়ে তখত নসীন হয়। তাকেও ৭৪৮ হিজরিতে অপসারনের পর তার ভাই হোসেনকে নসর উপাধি দিয়ে সুলতান বানানো হয়।

৭৪৯ হিজরিতে ভয়াবহ প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

৭৫২ হিজরিতে হোসেন ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ালে তার ভাই সলিহ সুলতান মনোনীত হয়। আন নাসর মুহাম্মাদ বিন কালাদুনের আওলাদ থেকে আটজন সুলতান মনোনীত হয়।

তার যুগে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - হাফেজ আবুল হাজ, তাজ আবদুল বাকী ইয়াযনী, শামস আবদুল হাদী, ইবনুল ওয়ারদী, আবু হিয়ান, ইবনুল লুবান, ইবনে আদলান, ইবনে ফযলুল্লাহ, ইবনে কায়্যিম জাওযী প্রমুখ।

আল মুতাযদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ

আল মুতাযদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ আবু বকর বিন আল মুসতাকফী তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর ৭৫৩ হিজরিতে লোকেরা জ্ঞানীদের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তার হাতে বাইয়াত হয়।

তিনি ৭৬৩ হিজরির জমাদিউল উলা মাসে ইন্তেকাল করেন।

৭৫৫ হিজরিতে সুলতান সালিহ অপসারিত হলে আন নসর হাসান সুলতান মনোনীত হয়।

৭৫৬ হিজরিতে নতুন পয়সা বাজারে ছাড়া হয়। ২৪ টি পয়সা এক দিরহামের সমান ওজন হয়। আগে এক দিরহামে দেড় রিতিল প্যসা হতো।

৭৬৬ হিজরিতে আন নসর হাসান নিহত হওয়ায় তার ভাতিজা মুহাম্মাদ বিন মুযাফফর আল মানসুর উপাধি নিয়ে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে।

আল মুতাযদের যুগে যেসব ওলামা ইন্তেকাল করেছেন তারা হলেন - সিরিয়ার বিচারপতি শায়খ তাকিউদ্দিন সবুকী, সামীন, বাহা বিন আকীল, সালাহুল আলাযী, জামাল বিন হিশাম, হাফেজ মোগলতাঈ (বিশিষ্ট সিরাত গবেষক), আবু উমামা বিন নাকাস প্রমুখ।

আল মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ আবু আবদুল্লাহ

আল মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আল মুতাযদ সর্বশেষ খলীফাদের পিতা। তিনি প্রথমে উত্তরাধিকার মনোনীত হয়েছিলেন। তার পিতার মৃত্যুর পর ৭৬৩ হিজরির জমাদিউল উলা মাসে তিনি খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন। তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। এর মধ্যে সেই সময়টুকুও অন্তর্ভুক্ত, যে সময়ে তিনি অন্তরীন ছিলেন। এর বিবরণ আমরা সামনে পেশ করবো।

তিনি অনেক আওলাদ রেখে যান। কথিত আছে, তিনি ছিলেন একশো সন্তানের জনক। এদের মধ্যে কেউ গর্ভে, প্রসবের সময় আর শৈশবে মারা গেছে। আর অধিকাংশরা পরিণত বয়সে পরলোক গমন করে। এদের থেকে পাঁচজন খিলাফতপ্রাপ্ত হোন, যার নজির অন্য খলীফাদের মধ্যে বিরল। তারা হলেন - আল মুসতাইন আল আব্বাস, আল মুতাযদ দাউদ, আল মুসতাকফী সুলায়মান, আল কায়িম হামযা, আল মুসতানজিদ ইউসুফ।

খলীফা মুতাওয়াক্কিলের জীবিত আওলাদের মধ্যে একমাত্র মুসা- ই বাকি থাকে, যে চারিত্রিক দিক থেকে ইব্রাহীম বিন মুসতাকফীর অনুরূপ ছিল। সে সময় বনু আব্বাসের যতগুলো লোক ছিল, মুতাওয়াক্কিলের আওলাদই ছিল ততগুলো।

৭৬৪ হিজরিতে আল মানসুর মুহাম্মাদ অপসারিত হলে শাবান বিন হুসাইন বিন নসর বিন মুহাম্মাদ বিন কালাদুন ‘আশরাফ’ উপাধি নিয়ে সুলতান মনোনীত হয়।

৭৭৩ হিজরিতে অভিজাতবর্গকে সহজে নির্ণয়ের জন্য সুলতান তাদেরকে সবুজ পাগড়ী বাধার নির্দেশ দেয়। এটা ছিল একটি অভিনব কাজের আদেশ।

এ বছর উদ্ধত তাইমুর লং আক্রমণ চালিয়ে শহরগুলো ধ্বংস করে ফেলে, অনেক বনি আদমকে হত্যা করে আর আল্লাহ’র যমিনে ফিতনা ছড়িয়ে দেয়। আল্লাহ এই অভিশপ্তকে ৮৭৩ হিজরিতে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেন। তাইমুর লং দিহ্কানের বাসিন্দা ছিল। সে চুরি রাহাজানির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর খায়ল শহরের সুলতানের কাছে চলে যায়। সুলতানের মৃত্যু হলে সে তার স্থানে বসে। আস্তে আস্তে সে এমন বেড়ে যায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসে তার নাম রয়ে যায়। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তাইমুর লং সর্বপ্রথম কতো সালে হামলা করে ? সে জবাব দেয়, শাস্তির বছর। কারন আরবী বর্ণমালার মান- নির্ণয় অক্ষরের বিন্যাস প্রণালীর দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্তি (عذابِ) এর সংখ্যাগত মান ৭৭৩।

৭৭৫ হিজরির রমযান মাসে সুলতানের সামনে কেল্লার মধ্যে বুখারী শরীফের ক্লাস শুরু হয়। প্রথমে হাফেজ যাইনুদ্দিন ইরাকি, পরবর্তীতে শিহাবুদ্দিন ইরয়ানী ক্বারি নিযুক্ত হোন।

৭৭৮ হিজরিতে আশরাফ শাবান নিহত হলে তার ছেলে আলী আল মানসুর উপাধি নিয়ে তখত নসীন হয়। এ বছর শাবান মাসের ১৪ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ আর ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়।

৭৭৯ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ৪ তারিখে আতা বেগ আল আসাকির যাকারীয়া বিন ইব্রাহীম বিন আল মুসতামসিক বিন খলীফা হাকিমকে খিলআত প্রদান করে আর খলীফা বানিয়ে দেয়। অথচ কেউ তার কাছে বাইয়াত করেনি আর কেউ তার বিষয়ে ইজমাও করেনি। যাকারিয়া বিন ইব্রাহীম আল মুসতাযদ উপাধি ধারণ করে খলীফা মুতাওয়াক্কিলকে কুস শহরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। আশরাফ নিহত হওয়ার সময় আতাবেগের অন্তরে খলীফার প্রতি জিঘাংসার সৃষ্টি হয়। মুতাওয়াক্কিল কুসে গেলে রবিউল আউয়ালের বিশ তারিখে মুসতাযদ পনেরো দিনের জন্য খলীফা হয়ে সেও অপসারিত হয়।

৭৮২ হিজরিতে নামাজের সময় এক লোক চিল্লাচিল্লি করলে নামায শেষে তাকে শুকরের সুরতে দেখা গেলো।

৭৮৫ হিজরির সফর মাসে মানসুর নিহত হলে তার ভাই হাজী বিন আশরাফ সালিহ উপাধি নিয়ে সুলতান মনোনীত হয়। ৭৮৪ হিজরির রমযান মাসে সালিহ অপসারিত হয় এবং যাহির উপাধি নিয়ে বরকুক বাদশাহ হয়।

৭৮৫ হিজরির রজব মাসে বরকুক খলীফা মুতাওয়াক্কিলকে জাবাল দুর্গে বন্দী আল ওয়াসিক বিল্লাহ উপাধি দিয়ে মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আল মুসতামসিক বিন হাকিমের হাতে বাইয়াত করে নেয়। মুহাম্মাদ ৭৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করলে লোকেরা মুতাওয়াক্কিলকে পুনরায় খলীফা মনোনীত করার জন্য অনুরোধ জানালে বরকুক তা প্রত্যাখ্যান করে। সে তার ভাই মুহাম্মাদ যাকারিয়াকে ডেকে এনে খলীফা বানায়। সে ৭৯১ হিজরি পর্যন্ত খলীফা ছিল। অবশেষে বরকুক লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে মুতাওয়াক্কিলকে মুক্তি দেয় আর তাকে আবার খলীফা মনোনীত করে, আর যাকারিয়াকে অপসারণ করা হয়। সে স্বেচ্ছায় গৃহজীবন বেছে নেয় আর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। আর মুতাওয়াক্কিল মৃত্যু অবধি খলিফাই থাকেন।

এ বছর জামাদিউল আখির মাসে সালিহ হাজী নিজের উপাধি পরিবর্তন করে আল মানসুর উপাধি ধারণ করে বরকুককে করগ শহরে বন্দী করে। এ বছর মুয়াযযিনরা আযানের মধ্যে একটি নতুন শব্দ - الصلوة والتسليم علي النبي صلي الله عليه وسلم বৃদ্ধি করে, যা স্পষ্ট বিদআত।

৭৯২ হিজরির সফর মাসে আল মানসুর সুলতান হয়। মৃত্যু অবধি ৮০১ হিজরি পর্যন্ত সে এ পদেই বহাল থাকে। তারপর তার ছেলে ফরজ নাসর উপাধি নিয়ে সুলতান হয়। ৮০৮ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ছয় তারিখে তাকে অপসারণ করে তার ভাই আবদুল আযিযকে আল মানসুর উপাধি দিয়ে তখতে বসিয়ে দেওয়া হয়। এ বছর জমাদিউল আখের মাসের ৪ তারিখে তাকে অপসারণ করা হয় আর নাসর দ্বিতীয়বার সুলতান মনোনীত হয়।

৮০৮ হিজরির রজব মাসের ১৮ তারিখ সোমবার রাতে খলীফা মুতাওয়াক্কিল ইন্তেকাল করেন।

তার যুগে যেসব ওলামা ইন্তেকাল করেছেন তারা হলেন - শামস বিন মুফলী, সালাহুস সফদী, শিহাব বিন নাকিব, মুহিব নাযিরু জায়েশ, হাফেজ শরিফুল হুসাইনী, কুতুব তাহতানী, বিচারপতি আযুদ্দীন বিন জামাত, তাজ বিন সুবকী, বাহাউদ্দিন বিন সুবকী, জামাল আসতুবী, ইবনে সানিহ হানাফি, জামাল বিন বানাত, আফীফ ইয়াফগী, জামাল শুরায়শী, শরফ বিন কাযি জাবাল, সিরাজ আল হিন্দি, ইবনে আবি হাজালা, হাফেজ তকীউদ্দিন বিন রাফে, হাফেজ উমামুদ্দিন বিন কাসির, নাহুবিদ আতাবী, বাহা আবুল বাকা সুবকী, শামস বিন খতীব বৈরুত, উম্মাদ হিসবাতী, বদর বিন হাবিব, যিয়াউল কারমী, শায়খ আকমালুদ্দীন, শায়খ সাআদুদ্দীন, বদর, সিরাজ ইবনে মানকিন, সিরাজ বালকিনী, হাফেজ যাইনুদ্দীন ইরাকী প্রমুখ।

আল ওয়াসিক বিল্লাহ উমর

আল ওয়াসিক বিল্লাহ উমর বিন ইব্রাহীম বিন ওলী আহাদ আল মুসতামসিক বিন হাকিম। মুতাওয়াক্কিলের অপসারণের পর ৭৮৫ হিজরির রযব মাসে লোকেরা তার হাতে বাইয়াত করে।

৭৮৮ হিজরির শাওয়াল মাসের ১৯ তারিখে বুধবারে খলীফা থাকা অবস্থায় তার ইন্তেকাল হয়।

আল মুসতাসিম বিল্লাহ যাকারিয়া

আল মুসতাসিম বিল্লাহ যাকারিয়া বিন ইব্রাহীম বিন আল মুসতামসিক। তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার বাইয়াত হয় আর ৭৯১ হিজরিতে তাকে অপসারণ করা হয়। এর বিবরণ আমরা পেশ করেছি।

আল মুসতাইন বিল্লাহ আবুল ফজল

আল মুসতাইন বিল্লাহ আবুল ফজল আল আব্বাস বিন মুতাওয়াক্কিল বাঈ খাতুন নামক তুর্কি বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

৮০৮ হিজরিতে মুতাওয়াক্কিলের মৃত্যুর পর তার বাইয়াত হয়। আল মুলকুন নাসর ফারাজ সে সময় সুলতান।

নাসর শায়খের সাথে লড়াইয়ে পরাজিত ও নিহত হলে ৮১৫ হিজরির মুহাররম মাসে খিলাফতমুক্ত হয়ে সুলতানও খলীফার কাছে বাইয়াত করে। খলীফা বাগদাদে পরিপক্ক বাইয়াত গ্রহণের পর আমীর উমারাদের নিয়ে মিসরে আসেন। পয়সায় তার নাম খোদাই করা হয়। শায়খুল ইসলাম ইবনে হাযার তাকে নিয়ে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন।

খলীফা মিসর এসে দুর্গে অবস্থান করেন। শায়খুল আসতাবলও সেই দুর্গে ছিল। মিসরের রাষ্ট্রীয় কাজ করার জন্য শায়খকে মনোনীত করা হয়। তাকে নিযামুল মুলুক উপাধি দেওয়া হয়। উমারাগণ খলীফার দরবারে কাজ শেষ করে শায়খের খিদমতে হাজির হতো। সব কাজের দায়িত্ব তার উপর ছিল। তারা খলীফার কাছ থেকে কাজের লিখিত অনুমোদন নিতো। আর শায়খ ফরমান জারি করতো, আস্তে আস্তে কাজ তার হাতে চলে আসে। এমনকি খলীফার অজান্তেও অনেক ফরমান জারি হতে থাকে। ফলে খলীফা মর্মাহত হোন। অবশেষে শায়খ তার উপর সালতানাত অর্পণের জন্য খলীফা সমীপে আবেদন করেন। খলীফা এ শর্তেই এই প্রস্তাব গ্রহন করে যে, তাকে কেল্লা ছেড়ে নিজ বাড়িতে চলে যেতে হবে। শায়খ এ শর্ত প্রত্যাখ্যান করে মুঈদ উপাধি ধারণ করে জবরদস্তিমূলক সুলতান হয়ে যায়। এরপর সে খলীফাকে অপসারণ করে তার ভাই দাউদের কাছে বাইয়াত করে নেয়। মুসতাইন কেল্লা ছেড়ে সপরিবারে আপন নিবাসে চলে আসেন। শায়খ মুসতাইনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ আর তার সভা সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এ সংবাদ পেয়ে সিরিয়ার নায়েব নওরুজ বিচারক আর ওলামাদের সমবেত করে এ ব্যাপারে ফতোয়া জানোতে চায়। তারা মুঈদের কাজ অবৈধ হিসেবে ফতোয়া দেন। ফলে নওরুজ মুঈদের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সংবাদ পেয়ে ৮১৭ হিজরিতে মুঈদ সসৈন্যে যুদ্ধে যায়। মুসতাইন ইস্কানাদারিয়া চলে গেলে সেখানে গিয়ে তাকে বন্দী করা হয়। ততর সুলতান হলে তাকে মুক্তি দিয়ে কায়রো যাওয়ার অনুমতি দেয়। কিন্তু তিনি ইস্কান্দারিয়াকে নিজের স্বপ্নের নগরী মনে করে সেখানেই তার বসবাসের জন্য ভবন নির্মাণ করেন আর সেখানেই থেকে যান। অবশেষে ৮৩৩ হিজরির জামাদিউল আখের মাসে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে খলীফা ইন্তেকাল করে।

৮১২ হিজরিতে প্রথম দিন নীল নদের পানি আশ্চর্যজনক ভাবে কমে যায়। পরের দিন আবার নীল নদের পানিতে শহর প্লাবিত হয়।

৮১৪ হিজরিতে ভারত সম্রাট গিয়াসউদ্দিন শাহ বিন ইস্কান্দার শাহ খলীফার কাছে অনেক ধন দৌলত ও উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে খিলাফতের দরবারে উপাধি প্রদানের আবেদন জানান।

তার শাসনামলে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তার হলেন - ইয়ামনের কবি আল মুফিক আন নশরী, হাম্বলী আলেম নাসরুল্লাহ বাগদাদী, নাহুবিদ শামসুল মুঈদ মক্কী, শিহাবুল হিসবানী, ইয়ামানের মুফতি শিহাবুন নশরী, ফারাইয আর হিসাব গ্রন্থের লেখক ইবনুল বাহায়েম, ইয়ামানের কবি ইবনুল আফীফ, কাযি আসাকিরের পিতা হানাফী আলেম মুহিব বিন শিহনা প্রমুখ।

আল মুতাযদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ

আল মুতাযদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ দাউদ বিন আল মুতাওয়াক্কিল কাজল নামের এক তুর্কি বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

নিজের ভাইয়ের অপসারণের পর ৮১৫ হিজরিতে তিনি খিলাফতে আরোহণ করেন। সে সময় সালতানাত সুলতান মুঈদের দখলে ছিল।

৮২৪ হিজরিতে সুলতানের তিরোধানে তার ছেলে আহমাদ মুযাফফর উপাধি নিয়ে তখত দখল করে। ততর তার সহকারী নিযুক্ত হয়। শাবান মাসে ততর তাকে বন্দী করলে খলীফা তাকে যাহির উপাধিসহ সালতানাত প্রদান করেন। ততর জিলহাজ্জ মাসে মৃত্যুবরণ করলে তার ছেলে মুহাম্মদ সালিহ উপাধি নিয়ে সুলতান নিয়োগ হয়। বরসিয়ায়ী আক্রমণ চালিয়ে সালিহকে তখত থেকে নামিয়ে দেয়। খলীফা ৮২৫ হিজরির রবিউল আখির মাসে বরসিয়ায়ীকে সুলতান বানিয়ে দেন। সুলতান থাকাকালীন ৮৪১ হিজরির যিলহাজ্জ মাসে তার মৃত্যু হলে তার স্থানে তার ছেলে আল আযীয উপাধী নিয়ে বাদশাহ মনোনীত হয়। হিকমাক তার সহযোগী নিযুক্ত হয়। ৮৪২ হিজরিতে হিকমাক আযীযের কাছ থেকে সালতানাত কেড়ে নিলে খলীফা যাহির উপাধি দিয়ে তাকে সুলতান বানিয়ে দেয়। খলীফা এ সুলতানের যুগেই ইন্তেকাল করেন।

খলীফা মুতাযদ হলেন বুজুর্গ খলীফাদের নেতা, মেধাবী, সচেতন ওলামাদের সহচারয গ্রহণকারী ও দানশীল। সৃজনশীলতায় তার অবদান অপার। ৮৪৫ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের চার তারিখে রবিবারে ৭০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। এটা ইবনে হাজার আসকালানির গবেষণা। কিন্তু আমার (গ্রন্থকারের) কাছে খলীফার ভাতিজা বলেছেন, তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৮১৬ হিজরিতে সদরুদ্দীন বিন আদমীকে বিচার আর হিসাব সংরক্ষণ উভয় দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি একত্রে দুই দায়িত্ব পালন করেন।

৮১৯ হিজরিতে মুতাকাল্লীবাগার উপর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সে-ই প্রথম তুর্কি ব্যক্তি, যার উপর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এ বছর এক লোক আকাশে গিয়ে আল্লাহ'র সাথে দেখা করার দাবী করে। লোকটি ছিল পাগল। অনেক আম জনসাধারণ তার কথা বিশ্বাস করেছিলো। তাকে বন্দী করা হয়।

৮২১ হিজরিতে দুটো গর্দান আর ছয় পা বিশিষ্ট একটি মহিষের জন্ম হয়। এটা ছিল মহান আল্লাহ'র এক অপূর্ব নিদর্শন।

৮২২ হিজরির ভূমিকম্পে অধিকাংশ লোক নিহত হয়। এ বছর মাদরাসাতুল মুঈদাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। শায়খ শামস বিন মুদিরীকে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সুলতানের উপস্থিতিতে ক্লাস শুরু হয়েছিলো। সুলতানের ছেলে ইব্রাহীম শিক্ষকের জায়নামায নিয়মিত বিছিয়ে দিতেন।

৮২৩ হিজরিতে গাজা শহরের একটি উট যবেহ করা হলে তার গোশত প্রদীপের মতো আলো ছড়াতে থাকে।

৮২৪ হিজরিতে নীল নদের পানিতে পার্শ্ববর্তী জনপদ প্লাবিত হয়।

৮২৫ হিজরিতে ফাতিমা বিনতে কাযী জালালুদ্দীন বালকীনী একটি বাচ্চা প্রসব করে যার পুরুষ লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই ছিল। মাথায় গরুর মতো দুটো শিং ফুঁড়ে উঠে, সে সাথে সাথে মারা যায়। এ বছর কায়রো শহরে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় আর নীল নদের পানি ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।

তার শাসনামলে যেসব ওলামায়ে কেরামগণ ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - শাফী মাযহাবের মুফতী শিহাব বিন হুজ্জাহ, আদীব বুরহান বিন রিফা, মদিনা শরীফের মুফতি ও মুহাদ্দিস আবু বকর আল মুরাগী, মক্কা শরীফের হাফেজ জামাল বিন যহির, কামুসের লেখক মুজাদ সিরাজী, শামস বিন কাবানী হানাফী, আবু হুরায়রা বিন নিকাশ, দানুয়ী, উস্তাদ অযুদ্দিন বিন জামাত বিন হিশাম আজমী, জালাল বালকীতী , বুরহান বিজুরী, ইরাক শাসনকর্তা শামস বিন মুদিরী, আলা বিন মুয়ালা, বদর বিন দাযামেনী, তাকিউল হাসিনী, শারেহ ইবনে শুজা, হারবী, ইবনে জারজী, কবি তকী বিন হুজ্জা, মক্কার নাহুবিদ জালাল মুরশিদি, মুহাদ্দিস শিহাব বিন মুহমাররাহ, আলা আল বুখারি, শামস আল বাসাতী, জামাল বিন খাইয়াত, তয়্যিব বাগদাদী প্রমুখ।

আল মুসতাকফী বিল্লাহ আবুর রাবী

আল মুসতাকফী বিল্লাহ আবুর রাবী সুলায়মান নিজের ভাই মুতাযদের যুগে উত্তরাধিকার মনোনীত হোন। তিনি হলেন মুতাযদের আপন ভাই। আমার (গ্রন্থাকারের) সম্মানিত পিতা একটি দলীল লিখে গেছেন। যার বিবরণ নিন্মরুপ -

"এটি একটি অঙ্গীকার পত্র, যাতে আবু রাবি'র জীবনী উল্লেখ করেছি। আল্লাহ একে সংরক্ষণ করুন। আমাদের মহান নেতা, বনু আব্বাস, আমিরুল মুমিনীন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার আওলাদ, খুলাফায়ে রাশেদার ওয়ারিশ, মুসতাকফির পদচারনা মুখরিত হয়ে উঠে দ্বীন ইসলাম, উপকৃত হয় মুসলিম মিল্লাত। আল্লাহ তার খিলাফতের সাথে তার শান ও মর্যাদার শীর্ষ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন আর মুসলমানদের ইমাম বানিয়ে দিয়েছেন। এটি সম্পাদিত হয়েছে যখন মুকতাফির দ্বীন, নেকী, ন্যায়পরায়নতা আর অধিকার পরিপক্ক হয়েছে। তিনি আল্লাহ'র দ্বীনে খুবই নির্ভরযোগ্য আর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।"

মুকতাফী খুবই নেককার, দ্বীনদার, ইবাদাতকারী, কুরআন তিলাওয়াতকারী, নীরব, লোকদের অপরাধ ক্ষমাকারী আর সচ্চরিত্রবান খলীফা ছিলেন। খলীফা মুকতাযদ অধিকাংশ সময় তার প্রশংসা করতেন।

আমার (গ্রন্থকারের) পিতা তার ইমাম ছিলেন। মুকতাফী তাকে দারুন সমাদর করতেন। আমি তাদের ঘরেই লালিতপালিত হয়েছি। তার আওলাদেরা ছিলেন দ্বীনদার আর ইবাদাতকারী। আমার ধারণা উমর বিন আবদুল আযিয (রহঃ) এর আওলাদের পর কোন খলীফার আওলাদ এতো ইবাদাতকারী আর দানশীল ছিল না।

৮৫৪ হিজরির যিলহাজ্জ মাসের শেষ জুমার দিনে খলীফা মুসতাকফী ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আমার পিতা খলীফার মৃত্যুর পর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। ৪০ দিন পর তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সুলতান নিজেই জানাযার সাথে কবর পর্যন্ত যান।

মুকতাফির খিলাফতকালে যেসব ওলামায়ে কেরামগণ ইন্তেকাল করেন তারা হলেন - তকী আর মাকরিরী, শায়খ উবাদা, কবি ইবনে কামিল, ওফায়ী, কাবানী, ইবনে হাযার আসকালানী প্রমুখ।

আল কায়িম বি আমরিল্লাহ আবুল বাকা

আল কায়িম বি আমরিল্লাহ আবুল বাকা হামযা বিন মুতাওয়াককিল তার ভাইয়ের পর বাইআত গ্রহণ করেন। খলীফা মুসতাকফী কাউকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেননি। কায়িমের স্বভাব ছিলো তেজোদীপ্ত। তিনি ছিলেন বীর বাহাদুর ব্যক্তি। তিনি প্রতাপের সাথে কিছুদিন খলীফা ছিলেন। তবে তিনি তার ভাইয়ের মতো ছিলেন না।

৮৫৭ হিজরীতে সুলতান মুলকুয যাহির হিকমাক ইন্তেকাল করলে তদস্থলে তার ছেলে উসমান আল- মানসুর উপাধি নিয়ে উপবেশন করে। দেড় মাস পর ইনাল হামলা চালিয়ে তাকে বন্দী করে। খলীফা রবিউল আউয়াল মাসে ইনালকে আশরাফ উপাধি দিয়ে সুলতান মনোনীত করেন। কয়েকদিন পর রণাঙ্গনে সৈন্য বাহিনী পাঠানোকে কেন্দ্র করে সুলতানের সাথে খলীফার মনোমালিন্য হয়। এ কারণে ৮৫৯ হিজরীর জামাদিল আউয়াল মাসে সুলতান খলীফাকে অপসারণ করে ইসকান্দারিয়া পাঠিয়ে দেয়। খলীফা মৃত্যু অবধি ৮৬৩ হিজরী পর্যন্ত সেখানেই বন্দী ছিলেন। মৃত্যুর পর ভ্রাতা মুসতাইনের পার্শ্বে তাকে সমাহিত করা হয়। উল্লেখ্য, দুজনকেই ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হয়। উভয়কে ইসকান্দারিয়া শহরে বন্দী রাখা হয় এবং তাদের কবর পাশাপাশি হয়।

তার শাসনামলে আমার পিতা ইন্তেকাল করেন।

আল মুসতানজিদ বিল্লাহ আবুল মুহাসিন

আল মুসতানজিদ বিল্লাহ আবুল মুহাসিন ইউসুফ বিন মুতাওয়াককিল্ তার ভাইয়ের অপসারণের পর তিনি খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন। সে সময় সুলতান আশরাফ ইনাল সালতানাতের তখতে উপবিষ্ট ছিলো।

৮৬৫ হিজরীতে সুলতানের মৃত্যু হলে তার ছেলে আহমদ মুঈদ উপাধি নিয়ে সুলতান হয়। এ বছর রমযান মাসে খোশকদম তার উপর হামলা চালিয়ে তাকে বন্দী করে এবং যাহির উপাধি নিয়ে নিজেই সুলতান হয়ে যায়।

৮৭২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সুলতান মারা যায়। তার স্থানে বালবায়ী যাহির উপাধি নিয়ে নিযুক্ত হয়। দুই মাস পর তার সৈন্যরা হামলা চালিয়ে তাকে তখত থেকে নামিয়ে দেয় এবং তামরীগাকে যাহির উপাধি দিয়ে সুলতান মনোনীত করে। দুই মাস পর তার উপরও হামলা চালানো হয় এবং তদস্থলে সর্বশেষ সুলতান ফাতিয়ায়ী আশরাফ উপাধি নিয়ে সালতানাতের তখতে আরোহণ করে। সে প্রভাব- প্রতিপত্তি, শান-শওকত, ক্ষিপ্রতা এবং কৌশলের মাধ্যমে সালতানাতের ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়।

নাসর মুহাম্মাদ বিন কালাদুনের সালতানাত থেকে আজ পর্যন্ত এমন সুলতান আর কখনই পাওয়া যায়নি। সে সসৈন্যে মিসর থেকে ফোরাতের উপকূল পর্যন্ত চষে বেড়িয়েছে। সে কাযী আর শিক্ষককে বেতন দিয়ে পুষতো না।

৮৮৪ হিজরীর মুহাররম মাসের ১৪ তারিখে দুই বছর পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগে আক্রান্ত থাকার পর তিনি ইন্তেকাল করেন। সে সময় তার বয়স ছিল নব্বই বছর অথবা এর চেয়ে কিছু বেশী। কেল্লায় তার নামাযের জানাযা পড়ানো হয় এবং সমাহিত খলীফাদের পার্শ্বে তাকে দাফন করা হয়।

আল মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ

আল- মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ আবুল আয আব্দুল আযীয বিন ইয়াকুব বিন মুতাওয়াককিল জিন্দীর মেয়ে হাজ মুলক- এর গর্ভে ৮১৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। খিলাফত তার পিতার হস্তগত ছিল না। তিনি শৈশব থেকেই সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

তিনি জ্ঞানা আহরণে মশগুল থাকতেন। তিনি আমার পিতার কাছেও ইলম অর্জন করেছেন। তার চাচা মুকতাফী তার মেয়ের সাথে তাকে বিয়ে দেন। তার ঔরসে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে যিনি খুবই নেককার, হাশিমী আর হাশিমীর আওলাদ। মুসতানজিদের অসুস্থতার সময় তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করা হয়। তার মৃত্যুর পর ৮৮৪ হিজরীর মুহাররম মাসের ১৬ তারিখ সোমবারে সুলতান, বিচারপতিগণ আর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে আম জনতা তার হাতে বাইআত করে।

বাইআতের পর কেল্লা থেকে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। সেদিন তার সাথে ছিল গোটা মন্ত্রী পরিষদ। সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে আবার কেল্লায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি মুসতানজিদের মতো কেল্লায় বসবাস করতেন।

এ বছর সুলতান মুলকুল আশরাফ হাজ্জের জন্য হিজায যান। তার পূর্বে একশো বছর কোন সুলতান হাজ্জ করেননি। হাজ্জের আগে তিনি মদীনা শরীফে যিয়ারত করেন আর সেখানে ছয় হাজার দিনার খরচ করেন। অতঃপর মক্কায় এসে পাঁচ হাজার দিনার ব্যয় করেন। সেখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে একজন বড় মাপের উস্তাদকে নিয়োগ দেন। হাজ্জের আহকাম শেষ করে ফেরার সময় শহরে খুশির বন্যা বয়ে যায়।

৮৮৫ হিজরীতে দাওয়াদারের নেতৃত্বে মিসরের সৈন্যরা ইরাকের উপর হামলা চালায়। ইয়াকুব শাহ বিন হাসান রাহী অঞ্চলে তাদের সাথে লড়াই করে। এ যুদ্ধে মিসরীরা পরাজিত, অনেক মিসরী নিহত আর দাওয়াদার কয়েদ হয়। পরে তাকে হত্যা করা হয়। এ যুদ্ধটি রমযানুল মোবারক মাসের শেষ দিকে সংঘটিত হয়।

৮৮৬ হিজরীর ১৭ই মুহাররম ভূমিকম্প হয়। এতে মাদরাসা সালিহার ছাদ ধসে পড়ে বিচারপতি শরফুদ্দীন বিন আব্দ নিহত হোন।

এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে খাকী নামক একজন ভারতীয় লোক এসে তার বয়স দেড়শ' বছর দাবী করে। আমিও (গ্রন্থকার) তাকে দেখেছি। তার দাড়ি কালো, সে বলেছে, আমি ১৮ বছর বয়সে হজ করে ভারতে ফিরে যাই। সুলতান হাসানের যুগে তাতারীদের আক্রমণের সময় বাগদাদ হয়ে মিসর আসি। আমার মতে সে মিথ্যা বলেছে।

এ বছর শাওয়াল মাসে মদীনা শরীফ থেকে এ মর্মে পত্র আসে যে, রমযানুল মুবারকের ১৩ তারিখে বজ্রপাতের কারণে মসজিদে নববীর ছাদ, খাযানা অ গ্রন্থাদি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। মসজিদের দেয়াল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না - যা এক ভয়ংকর দৃশ্য।

৯০৩ হিজরীর মুহাররম মাসের শেষ বুধবারে খলীফা মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তিনি পুত্র ইয়াকুবকে আলসাতমাসাক বিল্লাহ উপাধি দিয়ে ওলী আহাদ মনোনীত করে যান। এটাই হল সর্বশেষ অবস্থা, যা আমি এই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করলাম।

পরিশিষ্ট

আমি এ গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ইতিহাসগুলো থেকে তাত্ত্বিক সহায়তা গ্রহণ করেছি -

(১) তারীখে যাহাবী - এতে ৭০০ হিজরী পর্যন্ত সংঘটিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(২) তারীখে ইবনে কাসীর - ৭৩৮ হিজরীর ইতিহাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

(৩) মাসালিক - ৭৭৩ হিজরীর ইতিহাস সন্নিহিত।

(৪) ইবনে হাজার আসকালীনী রচিত ইবনাউল উমার - এতে তিনি ৮৫০ হিজরী পর্যন্ত ইতিহাস লিখেছেন।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত ইতিহাসগুলো থেকে সংকলন ও উদ্ধৃতি দিয়েছি -

(৫) তারীখে বাগদাদ - খতীব (১০ খণ্ড)।

(৬) তারীখে দামেশক - ইবনে আসাকির (৫৭ খণ্ড)।

(৭) আওরাক - সূলী (৭ খণ্ড)।

(৮) তওরীয়াত (৩ খণ্ড)।

(৯) হিলয়াহ - আবু নাঈম (৭ খণ্ড)।

(১০) মাজালিসাহ - দিনুরী।

(১১) কামিল - মুবাররদ (২ খণ্ড)।

(১২) আমালী, সালাবা। এছাড়াও ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থাদি।

স্পেনের উমাইয়্যা রাজত্ব

স্পেনের প্রথম বাদশাহ আব্দুর রহমান বিন মুআবিয়া বিন হিশাম বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান। ১৪৮ হিজরীতে স্পেনে পালিয়ে গেলে তার কাছে খিলাফতের বাইআত করা হয়। তিনি আলেম আর ন্যায়পরায়ণ। ১৭০ হিজরীর রবিউল আখির তার মৃত্যু হলে তার স্থানে তার পুত্র হিশাম আবু ওয়ালীদ তখতে আরোহণ করেন। ১৮০ হিজরীর সফর মাসে তার মৃত্যুর পর তার ছেলে আল- হাকাম আবুল মুযাফফর মুর্তজা উপাধি নিয়ে মসনদে বসেন। ২০৬ হিজরীর যিলহজ মাসে তিনি মারা যান।

তার ছেলে আব্দুর রহমান পিতার শূন্য তখত অলংকৃত করেন। তিনি সর্বপ্রথম স্পেনের মাটিতে উমাইয়্যাদের শাসন ব্যবস্থা পরিপক্ব ও মজবুত করেন। তিনি স্পেনে খিলাফতের মহত্ত্ব ও আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার যুগে পোশাক অলংকৃত করা হয় এবং দিরহাম তৈরি করা হয়, এর আগে এখানে মুদ্রা তৈরি হতো না। পূর্বাঞ্চলীয় লোকেরা যে দিরহাম নিয়ে আসতো, সেটাই এখানে চলতো। তিনি মুদ্রা তৈরির কারখানা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি শান- শওকত ও প্রভাব- প্রতিপত্তির দিক থেকে ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিকের মতো এবং দর্শনশাস্ত্র প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বনূ আব্বাসের খলীফা মামুনের অনুরূপ ছিলেন। তিনি স্পেনে সর্বপ্রথম দর্শন নিয়ে আসেন।

২৩৯ হিজরীতে তার ইন্তেকালের পর তার ছেলে মুহাম্মাদ তখত নসীন হোন। ২৭৩ হিজরীর সফর মাসে তার অন্তর্ধানে তার ছেলে আল মুনযির বাদশাহ হোন। ২৭৫ হিজরীর সফর মাসে তার মৃত্যুর পর তার ভাই আব্দুল্লাহ মসনদে উপবেশন করেন। তিনি স্পেনের খলীফাদের মধ্যে ইলম ও শরীয়তের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। ৩০০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তার ইন্তেকালের পর তার স্থানে তার পৌত্র আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আন নাসর উপাধি নিয়ে তখতে উপবেশন করেন। তিনি সর্বপ্রথম স্পেনকে খিলাফতের উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সর্বপ্রথম তাকে আমিরুল মুমিনীন হিসেবে সম্বোধন করা হয়। খলীফা মুকতাদরের শাসনকালে বনূ আব্বাসের খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ায় তিনি স্পেনের মাটিতে খিলাফত দাবী করেন এবং আমিরুল মুমিনীন উপাধি ধারণ করেন। তার পূর্বের সকল বাদশাহকে আমীর হিসেবে স্মরণ করা হতো।

৩৫০ হিজরীতে তার মৃত্যুতে তার ছেলে আল হাকিম আল মুসতানসির বাদশাহ হোন, যিনি ৩৬৬ হিজরীর সফর মাসে পরলোক গমন করেন। তার পর তার ছেলে হিশাম আল মুঈদ তখতে আরোহণ করেন। ৩৯৯ হিজরীতে তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে বন্দী করা হয়। তার স্থানে মুহাম্মদ হিশাম বিন আব্দুল জাববার বিন নাসের আব্দুর রহমান 'আল মাহদী' উপাধি নিয়ে তখতে আসীন হন। ছয় মাস পর তার ভাতিজা হিশাম বিন সুলায়মান বিন নাসর আব্দুর রহমান হামলা চালিয়ে বাদশাহ হোন। জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে অপসারণ করে। তিনি আত্মগোপন করেন। অবশেষে খুজে বের করে তাকে হত্যা করা হয়।

স্পেনের জনতা হিশামের হত্যাকারীর ভাতিজা সুলায়মান বিন হাকাম আল মুসতানসিরকে 'আল- মুসতাইন' উপাধি দিয়ে তার কাছে বাইআত করে। এরপর প্রজাবৃন্দ তার সাথে লড়াই করে ৪০৬ হিজরীতে তাকে বন্দী করে এবং আব্দুর রহমান বিন আব্দুল মালিক বিন নাসরকে মুর্তজা লকব দিয়ে তার কাছে বাইআত করে নেয়। বছরের শেষে তাকেও হত্যা করা হয়। তার অন্তর্ধানে উমাইয়্যা শাসনের পতন হয়। তদস্থলে গড়ে উঠে ফাতেমী শাসনের সৌধ।

৪০৭ হিজরীর মুহাররম মাসে আন নাসর আলী বিন হামুদ ফাতেমী রাজত্বের তখতে সমাসীন হোন। ৪০৮ হিজরীর যিলকদ মাসে তাকে হত্যা করে তদস্থলে তার ভাই আল মামুন আল কাসিম বাদশাহ হোন। ৪১১ হিজরীতে তাকে অপসারণের পর তার ভাতিজা ইয়াহইয়া বিন নাসর আলী বিন হামুদ 'আল মুসতাআলা' উপাধি নিয়ে বাদশাহ হোন। এক বছর সাত মাস পর তাকে হত্যার মাধ্যমে আবার উমাইয়্যা রাজত্ব ফিরে আসে। আল মুসতাযহার আব্দুর রহমান বিন হিশাম বিন আব্দুল জাব্বার (উমাইয়্যা বংশীয়) বাদশাহ হোন।

পঞ্চাশ দিন পর তাকে হত্যা করা হলে মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন উবায়দুল্লাহ বিন নাসর আব্দুর রহমান আল মুকতাফী উপাধি নিয়ে ক্ষমতারোহণ করেন। এক বছর চার মাস পর তাকে অপসারণ করা হয়। তদস্থলে হিশাম বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক বিন নাসর আব্দুর রহমান আল মুতামাদ বাদশাহ হোন। কিছুদিন পর তাকেও অপসারণ ও বন্দী করা হয়। ৪০০ হিজরীর সফর মাসে অথবা এর চেয়ে কয়েক হিজরী পড়ে তিনি বন্দী অবস্থায় মারা যান। তার মৃত্যুর সাথে সাথে স্পেনের মাটিতে উমাইয়্যা শাসনেরও মৃত্যু হয়।

পাশ্চাত্যের উবায়দিয়া রাজত্ব

পাশ্চাত্যে (তথা আরবের পশ্চিমাঞ্চলে - অনুবাদক) ২৯২ হিজরীতে আল মাহদী উবায়দুল্লাহ সর্বপ্রথম উবায়দিয়া শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি ৩২২ হিজরীতে মারা গেলে তার ছেলে আল কায়িমবি আমরিল্লাহ মুহাম্মাদ তদস্থলে উপবেশন করেন। ৩৩৩ হিজরীতে তিনিও মারা যান। কায়িমের পর তার ছেলে আল মানসুর ইসমাঈল তখতে সমাসীন হোন। তিনি ৩৪১ হিজরীতে মারা যান। এরপর তার পুত্র আল মুয়ায লিদ্দীনিল্লাহ সাদ বাদশাহ হোন। যিনি ৩৬২ হিজরীতে কায়রো প্রবেশ করেন আর ৩৬৫ হিজরীতে মারা যান। তার স্থানে তার ছেলে আল আযীয বাযযার আসীন হোন। তিনি ৩৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তারপর তার ছেলে হাকিম বিন আমরিল্লাহ মানসুর তখতে আরোহণ করেন। ৪১১ হিজরীতে তাকে হত্যা করা হলে পুত্র আয যাহির লা আযাযুদ্দীনিল্লাহ সালতানাতে প্রতিষ্ঠা পান। তিনি ৪২৮ হিজরীতে মারা যাওয়ায় পুত্র আল মুনতাসির মুহাম্মাদ সালতানাতের তখত অধিকার করেন। তিনি ৪৮৭ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তিনি ষাট বছর চার মাস রাজত্ব করেন।

যাহাবী বলেছেনঃ আমার মতে মুসলিম জাহানের কোনো খলীফা বা বাদশাহ এত দীর্ঘ সময় রাজ্য শাসন করেননি।

এরপর তার ছেলে আল মুসতাআলা বিল্লাহ আহমাদ মসনদে আরোহণের পর ৪৯৫ হিজরীতে মারা যান। এরপর তার ছেলে আল আমর বি আহকামিল্লাহ মানসুর পাঁচ বছর বয়সে বাদশাহ হোন। ৫২৪ হিজরীতে তাকে সপরিবারে হত্যা করা হলে চাচাতো ভাই আল হাফিজ লিদ্দীনিল্লাহ আব্দুল মজিদ ইবন মুহাম্মাদ বিন আল মুসতানসির তখত নসীন হোন, যিনি ৫৪৪ হিজরীতে মারা যান। তদস্থলে পুত্র জাফর বিল্লাহ ইসমাঈল উপবেশন করে ৫৪৯ হিজরীতে নিহত হলে ফায়েয বি নাসরিল্লাহ ঈসা তখতে আসীন হোন। যিনি ৫৫৫ হিজরীতে মারা যান। তারপর আল আযদ লিদ্দীনিল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ বিন হাফিয লিদ্দীনিল্লাহ তখত নসীন হন। তিনি ৫৬৭ হিজরীতে অপসারিত হোন আর এ বছরই মারা যান। বর্তমানে মিসরে আব্বাসীয় শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান এবং সেখানে উবায়দিয়া রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

যাহাবী বলেনঃ উবায়দিয়া রাজত্বের চতুর্দশ বাদশাহ নিজেকে খলীফা দাবী করলেও কেউ তার খিলাফত মেনে নেয়নি।

বনূ তাবাতাবাদের শাসন ব্যবস্থা

১৯৯ হিজরীর জামাদিউল উলা মাসে সর্বপ্রথম যিনি এ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তিন হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম তাবাতাবা। তার যুগে আল- হাদী ইয়াহইয়া বিন আল- হুসাইন বিন কাসিম বিন তাবাতাবা ইয়ামানে শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন এবং আমিরুল মুমিনীন উপাধি ধারণ করেন।

২০৮ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে তার ইন্তেকালের পর পুত্র মুর্তজা মুহাম্মাদ তখতে আরোহণ করেন, যিনি ৩২০ হিজরীতে মারা যান। এরপর তার ভাই নাসর আহমদ তখত নসীন হোন। তিনি ৩২৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার পর পুত্র আল মুনতাখিব আল হুসাইন ক্ষমতায় আসেন এবং ৩২৯ হিজরীতে মারা যান। অতঃপর তার ভাই মুখতার আল- কাসিম মসনদে বসেন। ৩৪৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি নিহত হোন। এরপর তার ভাই হাদী মুহাম্মাদ, অতঃপর তার ছেলে রশীদ আব্বাস তখতে উপবেশন করেন। এরপর তাদের শাসন ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে।

তবরিস্তানের রাজত্বের বিবরণ

ছয়জন পর্যন্ত এ রাজত্বের শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল। এদের মধ্যে প্রথম তিনজন হাসান (রাঃ) এর আওলাদ এবং পরের তিনজন হুসাইন (রাঃ) এর বংশধর।

২৫০ হিজরীতে রায় এবং দিলম অঞ্চলে সর্বপ্রথম হিশাম আল দায়ী ইলাল্লাহ হাসান বিন সায়েদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন হুসাইন বিন যায়েদ বিন জাওয়াদ বিন হাসান বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবু তালিব এ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তার ভাই কায়িম বিলহক মুহাম্মাদ তখত নসীন হোন এবং ২৮৮ হিজরীতে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর তার পৌত্র আল মাহদী আল হাসান বিন যায়েদ আল কায়িম বিলহক ক্ষমতায় আসেন। অতঃপর - - - !! (গ্রন্থকার এরপর আর কিছুই লিখেননি - অনুবাদক)।

ফায়দা

ইবনে হাতিম স্বরচিত তাফসীর গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আবহমান কাল থেকে আজ অবধি পৃথিবীতে প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে কোনো না কোনো দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়ে আসছে।

আমার মতে, হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে হাজ্জাজের ফিতনা প্রকাশ পায়।

হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে খলীফা মামুনের ফিতনা দেখা দেয়। তিনি তার ভাইকে হত্যা এবং লোকদের খলকে কুরআনের প্রতি আহবান জানান। এটা ছিল এ উম্মতের জন্য বড় ফিতনা আর সর্বপ্রথম বিদআত। এর পূর্বে কোনো খলীফা লোকদের বিদআতের প্রতি আহবান করেননি।

তৃতীয় হিজরীতে কারমতীর পর খলীফা মুকতাদারের ফিতনা প্রকাশ পায়। তাকে অপসারণ করে তার ভাইয়ের হাতে সকলে বাইআত করলে তিনি পুনরায় দ্বিতীয় দিন খলীফা হোন। বিচারপতিগণ আর অনেক ওলামায়ে কেরাম নিহত হোন, ইতোপূর্বে কোনো বিচারককে হত্যা করা হয়নি।

চতুর্থ শতাব্দীতে হাকিমের ফিতনা, যা শয়তানের ইশারায় সংঘটিত হয়।

পঞ্চম শতাব্দীতে সিরিয়া আর বাইতুল মুকাদ্দিস ফিরিঙ্গীদের কাছে চলে যায়।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যা ইউসুফ (আঃ) এর যুগের পর থেকে এত তীব্র দুর্ভিক্ষ আর কখনই হয়নি। এ শতাব্দীতে তাতারীদের উত্থান হয়।

সপ্তম শতাব্দীতে তাতারীদের উপমাহীন হত্যাযজ্ঞে মুসলমানদের রক্তের বন্যা বয়ে যায়।

অষ্টম শতাব্দীতে তাইমুর লং এর ফিতনা প্রকাশ পায়, যার তুলনায় তাতারীদের ফিতনা কিছুই না।

আমি মহান আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেনো নবম শতাব্দীর ফিতনা আমাদের না দেখান। আর আল্লাহ'র হাবীব আমাদের নেতা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বদৌলতে রহমতের বারিধারায় আমাদের সিক্ত করুন। আমীন! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!